পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়সমূহের বাণিজ্য-ধারার (Commerce Stream) ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত।

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা

(বাণিজ্য-ধারার জন্য)

সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ

অরুণকুমার সেন, এম. এ. (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত),

এম্. এস্-সি. (ইকন, লণ্ডন), ব্যারিষ্টার এ্যাট্-ল

প্রণীত

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে টাকাকড়ির মূল্য, অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত অংশের পরিমার্জনা ছাড়াও পশ্চিমবংগে জিলা-পরিষদ ব্যবস্থার আলোচনা এবং ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সকল পরিবর্তন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার ফলে সংস্করণটি ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর উপযোগী হইবে। তবে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারের ভার মাননীয় শিক্ষক মহোদয়গণের উপর ন্যস্ত, আমার উপর নহে।

বর্তমান সংস্করণটি প্রণয়নে আমার সহকর্মী অধ্যাপক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশীলকুমার সেনের নিকট হইতে অকুণ্ঠ সাহায্যলাভ করিয়াছি। ইহা আমি আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিতেছি।

অরুণকুমার সেন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকার অংশ

আমার 'পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা পরিচয়' হইতে সকল প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া এবং সকল প্রয়োজনীয় নূতন বিষয় যোগ করিয়া বর্তমান সংস্করণটি বাণিজ্য-ধারার (Commerce Stream) ছাত্রছাত্রীদের জন্য নূতন-ভাবে রচিত হইল। রচনায় সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্য-ধারার সিলেবাস অনুসারেই বিষয়বস্তু সাজানো হইয়াছে।

আশা করি, স্বতন্ত্র সংস্করণটি বাণিজ্য-ধারার ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী হইবে এবং কিভাবে ভবিষ্যতে গ্রন্থখানি ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর উপযোগী হইতে পারে সে-বিষয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিরত আমার সহকর্মীবৃন্দ আমাকে পরামর্শ দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন।

অরুণকুমার সেন

SYLLABUS FOR ECONOMICS & CIVICS

Civics including **Indian Administration**

Class X

1. Meaning and Scope of the Study of Civics.
2. Nature and stages of Society.
3. The Individual, Society, the State and the other Associations.
4. Ends and Functions of the Modern State.
5. Citizenship—Citizens and Aliens—Acquisition and termination of Citizenship—Indian Citizenship. Rights and Duties of a Citizen—The Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy as included in the Constitution of India.
6. Law—Meaning of Law. Law and Liberty.
7. Forms of Government—Democracy and Dictatorship. Merits and Demerits of Democracy—Conditions for Democracy. Unitary and Federal Government—their advantages and disadvantages. Nature of Indian Federation.
8. Constitution—Nature of a Constitution—Written and Unwritten. Rigid and Flexible Constitutions.
9. The Executive, the Legislature and the Judiciary. Theory of Separation of Powers.
10. The Electorate—Adult Suffrage—Extent of Electorate—Minority representation. Voters and Constituencies in India.
11. Public Opinion and Political Parties : Nature of Public Opinion—Methods of influencing Public Opinion. Nature of Political Parties—Functions of Political Parties. Merits and Demerits of Party system.
12. Relations between States—Nationalism and Internationalism. The United Nations.
13. Government of India—Union Executive and Union Legislature. State Executive and State Legislature. Judicial System—Local Self-Governing Bodies with reference to West Bengal.

Economics including **Indian Economic Problems**

Class XI

1. The economic activities of man—The subject-matter of Economics.

[An outline description of the main features of present-day economic structure and activity in India in conjunction with the elements only of the theory of demand and supply, may be the starting point.]

2. Some Fundamental Concepts : Wealth, Goods, Utility, Production and Consumption. Supply and Demand. Value and Price.

3. Wants and their characteristics—Law of Diminishing Utility —Total and Marginal Utility.

4. Law of Demand —Elasticity of Demand.

5. Factors of Production—Land, Labour, Capital and Organisation. Land and other factors of production—Laws of Returns. Supply and efficiency of Labour—Division of Labour. Capital—Wealth and Capital, Capital formation—Capital formation in India. The Functions of the Organiser.

6. Large-scale Production—Internal and External Economics of large-scale production. Small-scale Production. Localisation of industries. Organisation of large and small Industries in India.

7. Exchange : What is a market ? Conditions determining size of market—Value and Price. Value and Competition—Theory of Value. Market Value and Normal Value—Equilibrium of demand and supply in the case of Market value and in the case of Normal value. Value and the Laws of Returns.

8. International Trade : Territorial Division of Labour. Protection and Free Trade—Fiscal Policy in India.

9. Money : Barter. What is money ? Functions of money. Different kinds of money in India. Paper money—Value of money. Index Numbers. Quantity Theory of Money—Inflation—Prices in India.

10. Credit and Banking : Nature and characteristics of Credit. Credit instruments. Banking : Central and Commercial Banks and their functions—Clearing House system—Different kinds of Banks in India.

11. Distribution : Rent, Wages, Interest and Profit. National Dividend and National Income—India's National Income and its principal sources.

সূচীপত্র

পৌরবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Subject Matter and Scope of Civics): ভূমিকা; অর্থ ও বিষয়বস্তু; পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি; পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা; ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ ১-৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ (Nature and Stages of Society): সমাজ; সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য; সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ ৭-১৮

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র (State): রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা; রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, স্থায়িত্ব, সার্বভৌমিকতা; রাষ্ট্র ও সরকার; রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ১৮-২৮

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the State): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ; বলপ্রয়োগ মতবাদ; পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ; সামাজিক চুক্তি মতবাদ—হবস্, লক্, রুশো, ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ ২৮-৪২

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (Ends and Functions of the State): রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য; রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবাদ—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ; সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ—রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ; সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা; আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী; ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ ৪২-৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship): নাগরিক, স্বজাতীয় ও প্রজা, নাগরিক ও বিদেশীয়; নাগরিকতা অর্জন—জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি; নাগরিকতার বিলোপ; ভারতীয় নাগরিকতা ৫৪-৬৬

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties of Citizens) : অধিকার কাহাকে বলে ; অধিকারের শ্রেণীবিভাগ—নৈতিক ও আইনগত অধিকার, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ; বিভিন্ন সামাজিক অধিকার, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ; অর্থনৈতিক অধিকার ; ভারতীয় সংবিধানের অংগীভূত মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি—মৌলিক অধিকার ; ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকারসমূহ, অধিকারগুলি অবাধ কি না ; রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ; নাগরিকের কর্তব্য—কর্তব্য কাহাকে বলে, আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য, নাগরিকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য ; অধিকার ও কর্তব্য ৬৮-৮৫

অষ্টম অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty) : আইনের সংজ্ঞা, আইনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ; আইনের উৎস—প্রথা, ধর্ম, বিচারের রায়, ন্যায়বিচার, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা, আইন প্রণয়ন ; আইন ও নীতি ; স্বাধীনতা—স্বাধীনতার স্বরূপ ; আইন ও স্বাধীনতা ; স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ—সামাজিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ; স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ৮৫-৯৮

নবম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ (Forms of Government) : গণতন্ত্র ; গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র ; গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ; গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে ; একনায়কতন্ত্র ও ইহার গুণাগুণ, একনায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ ; এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ও ইহার গুণাগুণ ; যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও ইহার গুণাগুণ ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ৯৯-১১৭

দশম অধ্যায়

শাসনতন্ত্র (Constitutions) : শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র, লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ ; সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ ১১৭-১২১

একাদশ অধ্যায়

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Separation of Powers and Organs of Government) : ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ; ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য ও ইহার সমালোচনা ; সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—ব্যবস্থা বিভাগ এবং ইহার কার্যাবলী ও গঠন ; শাসন বিভাগ এবং ইহার কার্যাবলী ; বিচার বিভাগ এবং ইহার কার্যাবলী ; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ১২২-১৩৬

দ্বাদশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার (Electorate and Suffrage) : নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপকতা ও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ; সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব—সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি ; ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচন-এলাকা—লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন-এলাকা, বিধান পরিষদের নির্বাচন-এলাকা ১৩৬-১৪৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জনমত (Public Opinion) : গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব ; জনমত কাহাকে বলে ; জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম—মুদ্রাযন্ত্র, বেতার ও চলচ্চিত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সভাসমিতি, রাষ্ট্রনৈতিক দল, আইনসভা ১৪৫-১৫০

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties) : রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে ; রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী ; দলপ্রথার গুণাগুণ ; দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা ১৫০-১৫৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা (Nation, Nationalism and Internationalism) : জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ; জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা ; জাতিসংঘ ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—উদ্ভব, উদ্দেশ্য, গঠন, সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অভিভাবক পরিষদ ১৫৮-১৬৯

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (Features of the Constitution of India): ভূমিকা, ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য — ১-৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউনিয়ন সরকারের শাসন বিভাগ (The Union Executive): রাষ্ট্রপতি—নির্বাচন, কার্যকাল ও পদচ্যুতি, ক্ষমতা, উপরাষ্ট্রপতি; মন্ত্রি-পরিষদ; প্রধান মন্ত্রী — ৪-১৪

তৃতীয় অধ্যায়

ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ (The Union Legislature): রাজ্যসভা, লোকসভা, পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্য; পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, পার্লামেন্টের দুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক; পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতি, অর্থ বিল — ১৫ ২৫

চতুর্থ অধ্যায়

রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা (Administration of States): রাজ্যপাল ও তাঁহার ক্ষমতা, মন্ত্রি-পরিষদ; ব্যবস্থা বিভাগ--বিধান পরিষদ, বিধানসভা, বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা; রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি, নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা; কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির শাসন-ব্যবস্থা — ২৪-৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা (System of Judicial Administration): প্রধান ধর্মাধিকরণ ও ইহার এলাকা; মহাধর্মাধিকরণসমূহ; নিম্নতর আদালতসমূহ—দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থা, ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থা — ৩৫-৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা (Local Self-Government): স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা, ভারতের স্বায়ত্তশাসন; স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগঠন; গ্রাম-পঞ্চায়েত—পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েত; ইউনিয়ন বোর্ড; জিলা বোর্ড; পশ্চিমবংগে জিলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ; পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি; কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন; সেনানিবাস সংঘ; নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান; বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান — ৪২-৫৮

অর্থবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Subject Matter and Scope of Economics) : ভূমিকা ; বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ; অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি ; অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী — ১-৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতকগুলি মৌলিক ধারণা (Some Fundamental Concepts) : দ্রব্য ; উপযোগ—স্বাভাবিক উপযোগ ; রূপগত উপযোগ, স্থানগত উপযোগ, সময়গত উপযোগ, সেবাগত উপযোগ ; সম্পদ ও ইহার শ্রেণীবিভাগ ; উৎপাদন ; ভোগ ; মূল্য ও দাম ; চাহিদা ও যোগান — ৯-২২

তৃতীয় অধ্যায়

অভাব ও উপযোগ (Wants and Utility) : অভাব ; ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি ; মোট ও প্রান্তিক উপযোগ, ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির ব্যতিক্রম — ২৩-২৮

চতুর্থ অধ্যায়

চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা (Law of Demand and Elasticity of Demand) : চাহিদার সূত্র ; চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, চাহিদার মূল্যানুগ এবং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ; চাহিদার পরিবর্তন — ২৯-৩৬

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production) : উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ; সংগঠকের কার্যাবলী — ৩৬-৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমি (Land) : জমির সংজ্ঞা ; জমির বৈশিষ্ট্য ; ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; উৎপন্নের বিধিসমূহ—ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি, ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি, সমহারে উৎপন্নের বিধি — ৪০-৫০

সপ্তম অধ্যায়

শ্রম (Labour) : জনসংখ্যা তত্ত্ব ; জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় ; শ্রমের যোগান—জনসংখ্যা, কার্যের সময়, শ্রমিকের দক্ষতা — ৫১-৬১

অষ্টম অধ্যায়

মূলধন (Capital): বাস্তব মূলধন, আর্থিক মূলধন, ঋণ মূলধন; সম্পদ ও মূলধন; মূলধন ও জমি; মূলধনের শ্রেণীবিভাগ; মূলধনের কার্যাবলী; মূলধনবৃদ্ধির উপায়—সঞ্চয়ের ইচ্ছা, সঞ্চয়ের ক্ষমতা; ভারতে মূলধনবৃদ্ধি ৬১-৭৪

নবম অধ্যায়

বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Large and Small-scale Industries): শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার; শিল্পের একদেশতা; বৃহদায়তন শিল্প, বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ; ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; ভারতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; ভারতে বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়ন; কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ৭৪-৯৬

দশম অধ্যায়

বাজার (Market): বাজার বলিতে কি বুঝায়; বাজারের শ্রেণীবিভাগ; বাজারের পরিধি; বাজার ও প্রতিযোগিতা; পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা; একচেটিয়া কারবার ৯৭-১০৫

একাদশ অধ্যায়

দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা (Introduction to Price Determination): মূল্য ও দাম; দাম-নির্ধারণ; মূল্যের শ্রমতত্ত্ব; মূল্যের উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব; পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব; চাহিদা ও যোগান; উৎপাদন-ব্যয় এবং উৎপন্নের বিধিসমূহ; চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ১০৫-১১৪

দ্বাদশ অধ্যায়

বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণ (Price Determination under Different Market Conditions): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ; বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব; কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়; প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় এবং কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান; দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব; পরিশিষ্ট: একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম ১১৫-১২৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade): আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে; ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ; আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তত্ত্ব; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা; অবাধ

বাণিজ্য ও সংরক্ষণ; অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি; সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে যুক্তি—শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি, শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি, প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি, অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের নীতি; সংরক্ষণের ত্রুটি; ভারতের সংরক্ষণ নীতি ১২৬-১৪১

চতুর্দশ অধ্যায়

টাকাকড়ি (Money): টাকাকড়ির কার্যাবলী—বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য; টাকাকড়ি কি; ভারতে বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি; কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা ১৪২-১৫০

পঞ্চদশ অধ্যায়

টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money): টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর; মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ; টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব, সমালোচনা; সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ; সরল সূচক-সংখ্যা প্রণয়ন; মুদ্রাস্ফীতি; মুদ্রাসংকোচ; দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল; ভারতে দ্রব্যমূল্য—যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যবৃদ্ধি, পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি ১৫০-১৬৪

ষোড়শ অধ্যায়

ঋণ ও ব্যাংক-ব্যবস্থা (Credit and Banking): ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য; ঋণপত্র—প্রতিশ্রুতিপত্র, চেক, হুণ্ডি, তমসুক; ব্যাংক, ব্যাংক-ব্যবসায় কাহাকে বলে; ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা; ব্যাংকের কার্যাবলী—সঞ্চয়সংগ্রহ, ঋণ ও বিনিয়োগ, টাকাকড়ির সৃজন, অন্যান্য কার্য; বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক—কেন্দ্রীয় ব্যাংক; কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ—নৈতিক প্রণোদন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন, খোলা বাজারে কারবার, জমার অনুপাতে পরিবর্তন, ঋণ-বরাদ্দ নীতি; বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংক; ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থা; ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যাংক, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, যৌথ পুঁজি ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ ১৬৫-১৮৬

সপ্তদশ অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (Different Types of Factor Incomes): কিভাবে নীট জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় ১৮৬-১৮৯

অষ্টাদশ অধ্যায়

খাজনা (Rent): চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনা ; খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব ও ইহার সমালোচনা ; চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব, খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক, খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক ১৯০-১৯৬

ঊনবিংশ অধ্যায়

মজুরি (Wages): আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি ; মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ; প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব ও ইহার সমালোচনা ; জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব ; শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি ; আপেক্ষিক মজুরি ১৯৭-২০৪

বিংশ অধ্যায়

সুদ (Interest): সুদ কাহাকে বলে ; নীট সুদ ও মোট সুদ ; সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ; সুদের হারে পার্থক্য ২০৫-২১০

একবিংশ অধ্যায়

মুনাফা (Profit): মুনাফার প্রকৃতি ; মোট ও নীট মুনাফা · স্বাভাবিক মুনাফা ২১১-২১৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জাতীয় আয় (National Income): জাতীয় আয় কাহাকে বলে ; জাতীয় আয়ের হিসাব : উৎপাদন-পদ্ধতি, আয়-পদ্ধতি ; ভারতের জাতীয় আয় ২১৩-২২২

লেখক-পরিচিতি ২২৩-২৩১

পরিশিষ্ট : ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা ২৩২

পরিভাষা ২৩৩-২৪৮

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ২৪৯-২৫৩

এই পুস্তকের প্রশ্নোত্তরে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রসমূহে যে-সকল সংকেত-অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা হইল নিম্নলিখিতরূপ :

H. S (H)	Higher Secondary Humanities Group
H. S. (C)	,, ,, Commerce Group
H. S. (C) Comp.	,, ,, Commerce Group (Compartmental)
H. S. (H) Comp.	,, ,, Humanities Group (Compartmental)
C. U.	Calcutta University (Intermediate)
B. U.	Burdwan University (Intermediate)
S. F.	School Final Examination (Elective & Optional)
P. U.	Pre-University (Calcutta)
En.	University Entrance (Burdwan)

পৌরবিজ্ঞান

Com. পৌঃ—১

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি

(Subject Matter and Scope of Civics)

ভূমিকা : বর্তমানে আমরা সভ্য সমাজে বাস করিয়া সুশৃংখল জীবন যাপন করি। আহারের জন্য আমাদের প্রত্যেককে খাদ্য উৎপাদন করিতে হয় না, পরিধানের জন্য পোশাক তৈয়ারি করিতে হয় না। চালডাল, তরিতরকারি, মাছমাংস, জামাকাপড় বাজার হইতে কিনিয়া লইলেই হইল। বর্তমানে দেশের এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্য অঞ্চল হইতে খাদ্য সরবরাহ করা হয়; সারা দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করা হয়। ইহাতেও না কুলাইলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের (food control and rationing) ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের যাতায়াতের জন্য মোটরবাস রেলগাড়ি ট্রামগাড়ি প্রভৃতি যানবাহন নিয়মিত চলিতেছে; আমাদের শিক্ষার জন্য স্কুলকলেজ খোলা আছে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। আবার চোর-ডাকাত প্রভৃতি দুষ্কৃতিকারীর হাত হইতে আমাদের রক্ষা করিবার জন্য পুলিস আদালত জেল প্রভৃতি আছে; দেশকে অন্য দেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী আছে; ইত্যাদি।

এই সকলের ফলে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করিয়া থাকি। কিন্তু চিরকালই এই অবস্থা ছিল না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘদিন ধরিয়া, অতি ধীরে ধীরে। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং মৎস্য ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা সংগৃহীত হইত প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য হইলেও দলের সকলে মিলিয়া তাহা সমভাবে ভোগ করিত। মানুষের যে-কোন সংঘবদ্ধ অবস্থাকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া যায় বলিয়া এই অবস্থাতেও মানুষ সমাজবদ্ধ ছিল বলা যায়; এবং এই সমাজ ছিল সমভোগী সমাজ।

তারপর যত দিন যাইতে লাগিল মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য ও উৎপাদনের অন্যান্য কলাকৌশল শিখিল। ইহার ফলে আদিম সমাজগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। লোকে কৃষিকার্যের জন্য একস্থানে বসবাস করিতে বাধ্য হওয়ায় গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল এবং কৃষিজমি, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি নিজের বলিয়া মনে করিতে সুরু করায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির (private property) উদ্ভব হইল। সমভোগী সমাজ আর রহিল না। তখন এক জনগোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর পশু, শস্য ও অন্যান্য সম্পদ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করায় দেখা দিল যুদ্ধবিগ্রহ। গ্রামীণ সমাজের মধ্যেও জমিজমা ইত্যাদি লইয়া বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সুতরাং তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল যুদ্ধ-পরিচালনা ও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ কর্তৃত্বের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধনায়কগণ এই কর্তৃত্ব

অধিকার করিয়া কায়েম হইয়া বসিলেন ; এবং ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহাদের অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে ; সমাজ ও রাষ্ট্র বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আজ মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক ; আবার সে শ্রমিক-সংঘ, সাহিত্য সভা, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনেরও সদস্য। তাহার সুখদুঃখ, আশা-আকাংক্ষা রাষ্ট্র ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে মানুষের আচরণই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যে-শাস্ত্র এই আলোচনা করে ইংরাজীতে তাহাকে 'সিভিক্‌স' (Civics) এবং বাংলায় 'পৌরবিজ্ঞান' বলা হয়।

পৌরবিজ্ঞান

অর্থ ও বিষয়বস্তু (Meaning and Subject Matter) : ইংরাজী 'সিভিক্‌স' (Civics) শব্দটি দুইটি ল্যাটিন শব্দ হইতে আসিয়াছে—যথা, সিভিটাস্ (civitas) এবং সিভিস্ (civis)। সিভিটাস শব্দের অর্থ 'নগর-রাষ্ট্র' এবং সিভিস শব্দের অর্থ 'নাগরিক'। সুতরাং ইংরাজী শব্দগত অর্থে সিভিক্‌স বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা।

নাগরিককে বাংলায় 'পুরবাসী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং বাংলা শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান হইল পুরবাসীর আচরণের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান।

শাস্ত্র হিসাবে পৌরবিজ্ঞান অতি পুরাতন। প্রাচীন ভারত ও এসিয়ার অন্যান্য দেশ এই শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল ; তবে সুসম্বদ্ধভাবে ইহার আলোচনা করে প্রথমে প্রাচীন গ্রীস এবং পরে প্রাচীন রোম। এই গ্রীক ও রোমকদের শাস্ত্রই উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেও বর্তমান দিনে পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে। ইহার কারণ, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের নাগরিক-জীবন এবং বর্তমান দিনের নাগরিক-জীবনের মধ্যে হইল আকাশ-পাতাল তফাত।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে

গ্রীক ও রোমক যুগে পুরবাসী বা নাগরিকের জীবনের একটিমাত্র দিক ছিল। নাগরিক তখন ছিল মাত্র রাষ্ট্রেরই সভ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল রাষ্ট্র একটিমাত্র নগর লইয়াই গঠিত হইত এবং রাষ্ট্র (State) ও সমাজ (society) আজিকার দিনের মত পরস্পর হইতে পৃথক ছিল না, সম্পূর্ণ একই ছিল। ঐরূপ রাষ্ট্রকে 'নগর-রাষ্ট্র' (city state) বলা হয়। নগর-রাষ্ট্র ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সকল কিছুরই ব্যবস্থা করিত—নাগরিকগণকে নিজেদের কিছু করিতে হইত না। সুতরাং তখন ব্যক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই যথেষ্ট ছিল। এই কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক হিসাবে

পূর্বে ব্যক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখা হইত

ব্যক্তির আচরণ এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

কিন্তু আজিকার দিনের রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স বা স্পার্টার ন্যায় ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র নয়, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ 'জাতীয় রাষ্ট্র' (Nation States)। এইরূপ জাতীয় রাষ্ট্র নাগরিকগণের জন্য সকল ব্যবস্থাই করিতে পারে না। তাই তাহাদিগকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও আত্মবিকাশের জন্য পৌরসভা ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের ন্যায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-সংঘ ও বণিক সমিতির ন্যায় অর্থ নৈতিক সংস্থা, সাহিত্য সভা ও কলা পরিষদের ন্যায় সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হয়। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় পৌরবিজ্ঞান এই সকল প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। উপরন্তু, বর্তমান যুগের নাগরিক বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে বিশ্বের সমস্যা লইয়াও বিব্রত। ফলে ইহাদের আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে, নাগরিককে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সভ্য হিসাবে দেখা হয়

(পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of the Study of Civics): উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, বর্তমানে পৌরবিজ্ঞান চারিটি দিক হইতে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করে—যথা, (১) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে, (৩) বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে, এবং (৪) বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে। এখন এইগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিলেই পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (scope) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাইবে।

আবশ্যিকভাবে নাগরিক কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য—ইহাতে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নাই। রাষ্ট্রই সুশৃংখল সমাজজীবন সম্ভব করিয়া, নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করিয়া তাহাকে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করে। সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্যা হইল নাগরিকের প্রাথমিক সমস্যা, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য তাহার পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। (দেশ সুশাসিত হইলে তবেই নাগরিক ভালভাবে বাঁচিতে পারে—সে তাহার জীবনের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহের বিকাশের সুযোগ পাইতে পারে।) সুতরাং পৌরবিজ্ঞানে প্রথমেই রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করা হয়।

১। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিক

নাগরিক-জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবও কম নহে। দেশব্যাপী রেল-ধর্মঘট, ডাক-ধর্মঘট আমাদের বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলে। পৌরকর্মচারিগণের ধর্মঘটও আমাদের কম বিব্রত করে না। উপরন্তু, বর্তমান যুগে পঞ্চায়েত, করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকতার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। এই সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান করিয়া নাগরিক এই শিক্ষালাভ করে যে, কিভাবে পরস্পরের সমবায়ে সাধারণ সমস্যার

২। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে নাগরিক

সমাধান করিতে হয়—সাধারণের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। এইভাবে গড়িয়া উঠে দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা। তখন নাগরিক বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্বপালনের উপযোগী হইয়া উঠে। এই কারণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনা নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয়ত, নাগরিক-জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গমনাগমনের সুযোগসুবিধা ও পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দিন একরূপ শেষ হইয়াছে। ইহার ফলে যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা যে-কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবনের সুখশান্তি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট করিয়া দিতে পারে। নয়া চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত লইয়া বিবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রাচ্যের দেশগুলিকে সাহায্যদানে অস্বীকার, প্যালেষ্টাইনে আরব-ইসরায়েলে সংঘর্ষ, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মেনীর সংযুক্তির জন্য আন্দোলন, সাইপ্রাসে গোলযোগ, সোবিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য, কাশ্মীর লইয়া ভারত-পাকিস্তানে বিবাদ প্রভৃতি যে-কোন ঘটনা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবনও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে। তাই আমরা মার্কিন সাহায্যদান লইয়া জল্পনাকল্পনা করি, আরব ইস্রায়েল, জার্মেনী ও সাইপ্রাসের সংবাদ আগ্রহ সহকারে পাঠ করি, সোবিয়েত-যুগোশ্লাভিয়ার মনোমালিন্যের ফল মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করি। অনেক সময় আবার শুধু জল্পনাকল্পনা, আলাপ-আলোচনা করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না; যাহাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন না হইয়া উঠে—সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার প্রচেষ্টাও করিতে হয়। এইজন্য দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে কলিকাতার পথে শোভাযাত্রা, হাংগেরীতে সোবিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লণ্ডনস্থ সোবিয়েত দূতাবাসের সম্মুখে জনতার বিক্ষোভ।

৩। বৃহত্তর মানব-সমাজের সভ্য হিসাবে নাগরিক

অতএব, নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা শুধু রাষ্ট্র ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। নাগরিককে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয় বলিয়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সফলতার প্রচেষ্টা করিতে হয় বলিয়া পৌরবিজ্ঞান নাগরিক-জীবনের এই আন্তর্জাতিক দিকটির আলোচনাও করে।

পরিশেষে, সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে পৌরবিজ্ঞানকে আর একপ্রকার আলোচনাও করিতে হয়। ইহা হইল বিভিন্ন সংঘের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণ লইয়া আলোচনা। মানুষ তাহার আত্মবিকাশের জন্য সমাজ গঠন করিয়াছে। রাষ্ট্র ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল সমাজ-সংগঠনের দুইটি রূপ মাত্র। কিন্তু মাত্র এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে না, জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে না। তাই সে সাহিত্য সভা, সংগীত একাডেমী,

৪। অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে নাগরিক

সেবা সমিতি, বণিক সমিতি, শ্রমিক-সংঘ, ধর্ম সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়; আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ (ILO), সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির ন্যায় অনেক সময় আবার ইহারা সমগ্র বিশ্বেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়। কি করিয়া এই বন্ধনসূত্রকে দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে একই গোষ্ঠীভূত করা যায়—যুগ যুগ ধরিয়া দার্শনিকগণ এই স্বপ্নই দেখিয়া আসিতেছেন। কল্যাণকৃৎ শাস্ত্র হিসাবে এই 'এক পৃথিবী'র (one world) স্বপ্ন সফল করাও পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ।

পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ

পূর্বে অবশ্য পৌরবিজ্ঞানের এই আদর্শ ছিল না; ফলে উহার পরিধিও এত ব্যাপক ছিল না। তখন নগর-রাষ্ট্রের সভ্যের জন্য মাত্র 'সুন্দর নগরে'র (city beautiful) পথনির্দেশ করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু আজ নাগরিকের পক্ষে নগর বা স্থানীয় জীবনকে সুন্দর করিতে হইবে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিতে হইবে, সংঘজীবনকে সার্থক করিতে হইবে এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের প্রচার ও প্রয়াস করিয়া এক নূতন পৃথিবী গঠন করিতে হইবে বলিয়া পৌরবিজ্ঞানকেও সকল দিকেই পথনির্দেশ করিতে হইবে।

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা (Utility of the Study of Civics) : বর্তমানে পৌরবিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ বর্তমান যুগ হইল গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রে নাগরিকরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সুতরাং নাগরিকগণের পক্ষে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, অযোগ্য প্রতিনিধিসমূহ নির্বাচিত হইয়া গণতন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিবে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা নাগরিকগণকে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করে।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র পরিচালিত হয় জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সুতরাং জনমতকে সুষ্ঠু সবল ও কল্যাণকামী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা ইহাতে সহায়তা করে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার ফলে নাগরিকগণ নাগরিক-জীবনের সমস্যাসমূহের প্রকৃতি অনুধাবন করিতে পারে, বুঝিতে পারে যে বিভিন্ন সমাধানের মধ্যে কোন্‌টি কাম্য এবং কোন্‌টি অকাম্য। সুতরাং তাহারা যাহা কাম্য, যাহা কল্যাণকর তাহারই পক্ষ সমর্থন করে। ফলে শাসকবর্গও ঐ পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

তৃতীয়ত, পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার ফলে নাগরিকগণের দেশপ্রীতি গভীর হয়। ইহাতে দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ় হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। দেশ যে তাহাদেরই দেশ, সরকার যে তাহাদেরই সরকার এ-সম্বন্ধে নাগরিকগণ সচেতন হইয়া উঠে বলিয়া বিদ্রোহের সম্ভাবনা হ্রাস পায়, বৈদেশিক

আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত মনোবলও গড়িয়া উঠে। ফলে অন্যান্য দেশ এই দেশকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে থাকে।

পরিশেষে, পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা নাগরিককে বৃহত্তর দায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন করিয়া তুলে। সে ভাবিতে শিখে যে সমগ্র মানবজাতি যেন একই পরিবার। অতএব, বিশ্বশান্তিতে, বিশ্বের সমৃদ্ধিতেই দেশের সমৃদ্ধি। আত্মঘাতী যুদ্ধ প্রভৃতির ফলে বিশ্ব যদি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় তবে দেশও বাঁচিবে না।

পূর্বে আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার এতটা গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন দেশের প্রত্যেক ভাবী নাগরিককেই পৌর-বিজ্ঞান পাঠ করিতে হইবে।

ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ (Indian Civic Ideals and the Present Age) : বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতও পৌরবিজ্ঞান বা পুরবাসীর শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল। ফলে প্রাচীন ভারতেও পৌর আদর্শ পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমকদের পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল নগরকে সুন্দর করিয়া তোলা, প্রাচীন ভারতে পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলা। ইহার কারণ, এই গ্রামই ছিল প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি।

ভারতীয় পৌর আদর্শ : গ্রামকে সুন্দর করিয়া গঠন ও অরাজকতা পরিহার করা

পঞ্চায়েতের অধীনে পরিচালিত গ্রামসমূহ বহু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। এক রাজার রাজ্য অন্য এক রাজা কাড়িয়া লইলেও গ্রাম-ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিত না। গ্রামগুলি পুরাতন রাজার পরিবর্তে নূতন রাজাকে কর প্রদান করিয়া পূর্বের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। স্বাভাবিক-ভাবেই গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য মৎস্যন্যায় বা অরাজকতা ঘটিলে গ্রামের জীবন-যাত্রাতেও বিশৃংখলা দেখা দিত। সেইজন্য অরাজকতা পরিহার করাও ছিল প্রাচীন ভারতের নাগরিক-জীবনের আদর্শ।

স্বাভাবিকভাবে ইহার তুলনাতেও বর্তমান দিনের নাগরিক-আদর্শ ব্যাপকতর

এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনাতেও যে বর্তমান দিনের পৌর আদর্শ বহু পরিমাণ ব্যাপকতর হইয়াছে তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যাইবে। এখন আর গ্রামকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা এবং অরাজকতা পরিহার করাই নাগরিক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ইহার উপর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিয়া গঠন করা, সংঘজীবনকে সার্থক করা এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের পথে এক নূতন পৃথিবী গঠন করা।

সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা : প্রথম অবস্থায় মানুষ পশুর মতই বন-বনান্তরে ঘুরিয়া ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। কিন্তু পশুর মত কখনও সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করে নাই;

আদিমতম যুগ হইতেই সে সংঘবদ্ধ। এই সংঘবদ্ধতার ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হইয়াছে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার।

যে শাস্ত্র রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ লইয়া আলোচনা করে তাহাকে পৌরবিজ্ঞান বলে।

অর্থ ও বিষয়বস্তু: শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা। পূর্বে নাগরিককে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই ছিল যথেষ্ট, কারণ রাষ্ট্র তখন ছিল নগর-রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে নাগরিককে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না—তাহাকে অন্যান্য নানা প্রকার সংগঠনের সদস্য হিসাবেও দেখিতে হইবে। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বর্তমানে ব্যাপকতর হইয়াছে।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি: বর্তমান দিনের ব্যাপকতর পৌরবিজ্ঞান নাগরিককে চারিটি দিক হইতে দেখে—(১) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে, (৩) বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে, এবং (৪) বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে।

পৌরবিজ্ঞান কল্যাণবৃৎ শাস্ত্র। সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা, সার্থক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এবং শান্তি ও মৈত্রীর পথে এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া তোলা ইহার আদর্শ।

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা: বিভিন্ন দিক হইতে পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়—১। ইহাতে গণতন্ত্র সার্থক রূপ গ্রহণ করে ২। সুষ্ঠু জনমত গঠিত হয়, ৩। নাগরিকগণের দেশপ্রীতি গভীর হয়, এবং ৪। বিশ্বমানবতার আদর্শ গড়িয়া উঠে।

ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ: প্রাচীন ভারতের পৌর আদর্শ ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া গঠন করা ও অরাজকতা পরিহার করা। গ্রীক ও রোমক পৌর আদর্শের মত এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনায়ও বর্তমান নাগরিক-জীবনের লক্ষ্য বহু পরিমাণ ব্যাপকতর।

প্রশ্নোত্তর

1. What is Civics? Discuss the subject matter and scope of Civics
পৌরবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়? পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা কর। [১-৫ পৃষ্ঠা]

2. Describe the scope and value of studying Civics. (H. S. (C) Comp. 1961)
পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি এবং উহা পাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
[৩-৫ এবং ৫-৬ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ

(Nature and Stages of Society)

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, এই শাস্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংঘ প্রভৃতি সমাজ-সংগঠনেরই বিভিন্ন রূপ। সুতরাং এককথায় বলা যায়, পৌরবিজ্ঞান সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ লইয়া আলোচনা করে। এখন

প্রশ্ন উঠে, সমাজ কাহাকে বলে ? সমাজ-সংগঠনের কারণ বা উদ্দেশ্য কি ? কিভাবেই বা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে ?

সমাজ (Society) : সমাজবিজ্ঞানীদের (Sociologists) মতে, মানুষ যখন স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে বা বজায় রাখে তখনই সমাজ গঠিত হয়। এই স্বেচ্ছামূলক সম্পর্কের মূলে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য। অতএব সমাজের দুইটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায় : (ক) স্বেচ্ছামূলক সম্পর্ক, এবং (খ) বিশেষ উদ্দেশ্য। এই অর্থে আদিমতম যুগেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছিল ; বন্য জীবজন্তু ও অন্য বন্য মানুষের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এবং ফলমূল আহরণ ও পশুপক্ষী শিকারের উদ্দেশ্যে তাহারা শৈশবাবস্থাতেই সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমানেও কিছুসংখ্যক লোক যখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়, শ্রমিকরা যখন তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য সংঘ (trade unions) গঠন করে এবং পল্লীবাসীরা যখন নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিবার জন্য কতকগুলি রীতিনীতি মানিয়া চলে তখন উহাদিগকে যথাক্রমে ধর্মীয় সমাজ, শ্রমিক সমাজ ও পল্লীসমাজ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ঐ একই অর্থে খেলাধূলার জন্য স্থাপিত ক্লাব-এসোসিয়েশন প্রভৃতিকে ক্রীড়া-সমাজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

কার্যক্ষেত্রে সকল সময়ই যে স্বেচ্ছামূলক সম্পর্ক থাকিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। অনেক সময় ঐরূপ সম্পর্কের কল্পনাও করিয়া লওয়া হয়। যেমন, পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের মধ্যে সম্পর্কের কল্পনা করিয়া বলা হয় পাশ্চাত্য সমাজ।

মানবসমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের মত বৃহত্তর পরিধির সমাজের কল্পনা যখন করা হয় তখন ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যেমন, মানবসমাজের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকে, অসংখ্য প্রতিষ্ঠান থাকে।

বর্তমানে অবশ্য মানবসমাজ, পাশ্চাত্য সমাজ ইত্যাদির ন্যায় অতি বৃহৎ পরিধির সমাজের কল্পনা না করিয়া অধিকাংশ সময়ে জাতির (Nation) গণ্ডির মধ্যেই সমাজের ধারণা করা হয়—যেমন বলা হয়, ভারতীয় সমাজ, চৈনিক সমাজ, মার্কিন সমাজ ইত্যাদি। এই সকল সমাজ 'জাতীয় সমাজ' (National Society) নামে অভিহিত। বৃহত্তর পরিধির বলিয়া এইরূপ প্রত্যেকটি জাতীয় সমাজের মধ্যেও নানারূপ সংঘ—যথা, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংগঠন প্রভৃতি থাকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দেশ বা জাতির অন্তর্গত সকল সংগঠন মিলিয়াই হইল জাতীয় সমাজ।

জাতীয় সমাজ

জাতীয় সমাজের অন্তর্গত সংগঠনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) রাষ্ট্র, এবং (খ) অন্যান্য সংঘ। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে আবশ্যিক সংগঠন ; অন্যান্য সংঘ স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, জাতীয় সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র থাকিবেই, কিন্তু অন্যান্য সংঘ নাও থাকিতে পারে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আইনের মাধ্যমে সামগ্রিক সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করা ; অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশে সহায়তা করা। সামগ্রিকভাবে সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া রাষ্ট্র জাতীয় সমাজের কেন্দ্রস্থল

অধিকার করিয়া থাকে এবং অন্যান্য সংঘ ইহার চারিদিকে আবর্তিত হয়। এই কারণে অন্যান্য সংঘের অস্তিত্ব ও কার্যাবলী নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর। রাষ্ট্রের নীতির সহিত অন্য যে-কোন সংঘের নীতির সংঘর্ষ বাধিলে ঐ সংঘকে হয় নীতি-পরিবর্তন করিতে হইবে, না-হয় উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

রাষ্ট্র জাতীয় সমাজের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে

অপরদিকে আবার রাষ্ট্রও যথাসম্ভব সংঘের নীতিসমূহকে মান্য করিয়া চলে। অবশ্য রাষ্ট্র দেখে যে এই নীতিগুলির সহিত সমাজের আদর্শের মিল আছে কি না। যদি মিল না থাকে তবে রাষ্ট্র উহাদের মান্য করার পরিবর্তে পরিবর্তনসাধনের দ্বারাই সমাজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা করে। জাতীয় সমাজের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে এইভাবে সমাজের আদর্শের প্রতিষ্ঠাই রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য।*

রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য

সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য (Purpose of Social Organisation):

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে স্বভাবগত কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। অর্থাৎ, মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি মানুষকে সমাজাভিমুখী করিয়াছে। মানুষের এই স্বভাব বা প্রকৃতির দুইটি দিক আছে—সংঘবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা। আদিমকাল হইতেই ইহারা মানুষকে সমাজ-সংগঠনের প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে। সংঘবদ্ধতার কারণে মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। এইজন্য সে আদিম যুগেই দল ও পরিবার গঠন করিয়াছিল। আবার বিচ্ছিন্ন হইবার প্রেরণার জন্য এক দল অপর দলের সহিত মিলিতে পারে নাই।

সমাজ-সংগঠনের কারণ মানুষের প্রকৃতিগত সংঘবদ্ধতা

বস্তুত, মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, নিঃসংগ অবস্থায় যে-ব্যক্তি বাস করে, হয় সে পশু, না-হয় দেবতা। অপরের সহিত কথা বলা, অপরের সহিত ভাবের আদানপ্রদান করা, অপরের সুখদুঃখের ভাগী হওয়া, অপরকে সুখদুঃখের ভাগী করা মানুষের সহজাত ইচ্ছা। সুতরাং সে পরিবারের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়।

মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না

শুধু যে মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না তাহা নহে, সে একাকী বাঁচিতেও পারে না। শৈশবে পিতামাতার স্নেহযত্ন না পাইলে শিশুর জীবন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে। কিন্তু পার্থক্য হইল যে পশুপক্ষী-শাবককে মানব-শিশুর ন্যায় অত দীর্ঘদিন লালনপালন করিতে হয় না। শিশুর লালনপালন কালে মানব-মাতার

সে একাকী বাঁচিতেও পারে না

* সমাজের আদর্শ বিভিন্ন রকমের হয়—যেমন, আমাদের সমাজের আদর্শ অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির বিলোপ, সোবিয়েত সমাজের আদর্শ সাম্যবাদ (Communism) প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। সুতরাং ভারতে যদি অস্পৃশ্যতার সমর্থনে কোন সংঘ গড়িয়া উঠে তবে ভারত-রাষ্ট্র ঐরূপ সংঘকে দমন করিবে। অনুরূপভাবে, সোবিয়েত ইউনিয়নে কোন সাম্যবাদ-বিরোধী সংঘ গড়িয়া উঠিলে সোবিয়েত-রাষ্ট্র উহার বিলোপসাধন করিবে।

পক্ষে আর কোন কার্য করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাতাকে আহার্য যোগাইবার জন্য প্রয়োজন হয় অপরের সহযোগিতার। সুতরাং শিশুর জীবনরক্ষার জন্যও আদিম মানুষকে সংঘবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, শৈশবাবস্থা হইতেই মানবজাতিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইতেছে। এই সংগ্রামকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence)। পরস্পরের সহিত সংঘবদ্ধ হইতে না পারিলে, সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে জীবন-সংগ্রামে মানুষ জীবনের সূত্রপাতেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। আদিম যুগে আহার সংগ্রহে অসুবিধা, বন্য জীবজন্তু এবং অন্য বন্য মানুষের কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির জন্য মানুষ বুঝিয়াছিল যে একতাই বল—জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ হইয়াই সে জয়ী হইল, অন্যান্য জীবের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল।

রবিনসন ক্রুসোর গল্পে দেখিতে পাওয়া যায় যে জাহাজ দুর্ঘটনায় ক্রুসো এক নির্জন দ্বীপে একাকী পতিত হইয়াও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রুসোর জাহাজটি দ্বীপের নিকটই বালির চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছিল; এবং তাঁহার পক্ষে ঐ জাহাজ হইতে নানারূপ শস্যবীজ, যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসা সম্ভব হইয়াছিল। ক্রুসো দ্বীপে আসিবার পর জাহাজটি যদি সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইত তাহা হইলে ক্রুসোর জীবন-সংগ্রামের গল্প আর লেখা হইত না। হয়ত কোন জন্তু তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত; না-হয় অনাহারে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইত। সুতরাং ক্রুসো পরোক্ষভাবে সমাজের সহায়তালাভ করিয়াই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। জাহাজ হইতে তিনি যে শস্যবীজ, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণই উৎপাদন করিয়াছিল।

মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া বাঁচিতে চাহে সত্য, কিন্তু সে সকলের সহিত মিলিতে পারে না। সে মাত্র তাহাদের সংগই কামনা করে যাহাদের সহিত তাহার স্বার্থের মিল আছে। এই কারণে আদিম যুগে মানুষ বিভিন্ন দল গঠন করিয়াছিল।

পশুর মত শুধু জীবনধারণ করাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়; সে সুখী হইয়া বাঁচিতে চায়—জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। মানুষের বাক্‌শক্তি আছে, পশুর নাই।

মানুষ সুখী হইয়া বাঁচিতে চায়

অ্যারিস্টটলের মতে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রকৃতির ইচ্ছা সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই সুখী হউক। সুখের এই অন্বেষণে বা সুন্দর জীবনের সন্ধানে মানুষ শুধু দল বা পরিবার গঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে ধীরে ধীরে গড়িয়াছে রাষ্ট্র, অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান।

এই কারণে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন উদ্ভূত হইয়াছে

সুতরাং বলা যায়, মানুষ সমাজ-সংগঠন করিয়াছিল জীবনরক্ষার প্রয়োজনে এবং বিচ্ছিন্ন হইবার প্রেরণায়। কিন্তু সমাজকে ক্রমবিকশিত করিয়া চলিয়াছে উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে।

সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ (Evolution of Social Life) : কবে এবং কিভাবে সমাজজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না ; তবে আদিমতম যুগ হইতেই মানুষ যে সংঘবদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়া আসিতেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মানুষ কিভাবে প্রথমে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল

মানুষের এই সংঘবদ্ধতা প্রথমে কি রূপ গ্রহণ করে—পরিবার না দল—সে-বিষয়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। প্রাচীন লেখকগণের মতে, প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল পরিবার (family) ; এবং পরে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া ও বিভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিল দল বা গোষ্ঠীর। আধুনিক লেখকগণ কিন্তু বলেন, মানুষ আদিমতম যুগ হইতেই দল বা গোষ্ঠীতে (clan) সংঘবদ্ধ ছিল : এবং পরে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের সংগে সৃষ্টি হইয়াছিল পারিবারিক সংগঠনের। আধুনিক লেখকদের এই মত মানিয়া লইয়াই নিম্নে সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা হইতেছে।

আধুনিক লেখকগণ বলেন, দল বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে

গোষ্ঠী হইতে সমাজজীবনের ক্রমবিকাশের বর্ণনা :

স্বাভাবিক সংঘপ্রিয়তা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ আদিমতম যুগ হইতেই দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়া আসিতেছে। মানুষ তখন খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখে নাই ; খাদ্য আহরণ করিয়াই তাহাকে জীবনধারণ করিতে হইত। বনজংগল হইতেই প্রধানত তাহারা ফলমূল আহরণ ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া খাদ্যসংগ্রহ করিত বলিয়া আদিম জনগোষ্ঠীকে বনজংগলের নিকটবর্তী অঞ্চলেই বসবাস করিতে দেখা যাইত।

১। খাদ্যাহরণের যুগ

এই অবস্থায় জীবন-সংগ্রাম ছিল অতি কঠোর ; ফলমূল ও শিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট ছিল না। কোন এক বিশেষ দিনে কতটা খাদ্য সংগৃহীত হইবে সে-বিষয়েও নিশ্চয়তা ছিল না। তখন তাহারা সঞ্চয়ও করিতে শিখে নাই, সঞ্চয় করিবার অবকাশও ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা কিছু সংগৃহীত হইত তাহা দল বা গোষ্ঠীর সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত। কেহ নিজের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিত না। ফলে যেদিন ভাল শিকার হইত সেদিন বসিত ভোজ, আর কিছু পাওয়া না গেলে চলিত অনাহার।

এই অবস্থায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই

আদিম মনুষ্যসম্প্রদায় শুধু যে আহৃত খাদ্য সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত তাহাই নয়, সকল দ্রব্যই ছিল গোষ্ঠীর সামগ্রিক সম্পত্তি (collective wealth)। কোন ব্যক্তি একটি হাতিয়ার তৈয়ারি করিলে তাহা দলের সকলে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিত। কেহই বলিতে পারিত না, "এ-জিনিসটি আমি তৈয়ারি করিয়াছি, সুতরাং তুমি ব্যবহার করিতে পারিবে না।"

আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই, তেমনি পারিবারিক জীবনও গঠিত হয় নাই। ফলে শিশুর প্রতিপালন ছিল গোষ্ঠীভুক্ত সকলের দায়িত্ব; এবং শিশুদের নিকট সকল বয়ঃপ্রাপ্তই ছিল তাহাদের পিতামাতা।

পারিবারিক জীবনও গঠিত হয় নাই

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি ছিল গোষ্ঠীর অংগীভূত; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism) বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল পূর্ণ সাম্য এবং প্রকৃত গণতন্ত্র। সকলে সমান ভোগ করিত এবং গোষ্ঠীজীবন পরিচালনায় সকলেরই মত গ্রহণ করা হইত।

কালক্রমে কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। যতদিন পর্যন্ত আদিম জনগোষ্ঠী শান্তিপূর্ণভাবে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া বেড়াইত ততদিন পর্যন্ত কোন নায়ক বা নেতার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু যখন কোন গোষ্ঠী অপর এক গোষ্ঠীর মৃগয়াভূমি বা মৎস্য-শিকারক্ষেত্র কাড়িয়া লইতে চাহিত তখনই প্রয়োজন হইত যুদ্ধনায়কের। প্রথম প্রথম যুদ্ধের সংগে সংগেই যুদ্ধনায়কের প্রয়োজন ফুরাইত; কিন্তু ক্রমে তাঁহারা শান্তির সময়েও সম্প্রদায়ের নায়কত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অধীনে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, পূজাপার্বণ প্রভৃতি কার্য পরিচালিত হইতে লাগিল। এইভাবে সমাজে 'রাজকর্তৃত্বে'র উদ্ভব হইল। এই কর্তৃত্বই পরে সরকারে রূপান্তরিত হইয়া সমাজকে রাষ্ট্রে পরিণত করিল। এ-ঘটনা অবশ্য ঘটিয়াছিল বহুদিন পরে।

অন্যতম পূর্ববর্তী ঘটনা হইল গোষ্ঠীজীবনে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিবর্তন—যাহাকে অর্থনৈতিক বিপ্লব (economic revolution) বলিয়াও অভিহিত করা যায়। এই অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয় প্রধানত দুইটি আবিষ্কারের ফলে: (ক) পশুপালন, এবং (খ) উদ্ভিদপালন বা কৃষিকার্য।

২। গোষ্ঠীজীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তন: পশুপালন ও কৃষিকার্য

পশুপালন আবিষ্কৃত হইলে গোষ্ঠীজীবন নূতন রূপ গ্রহণ করিল। এইবার খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। খাদ্যের জন্য মানুষকে আর সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল না। গৃহপালিত পশুর নিকট হইতে মাংস ছাড়া দুগ্ধও পাওয়া যাইত; আবার উহাদের পশম হইতে পোশাকপরিচ্ছদ এবং চর্ম হইতে তাঁবু ইত্যাদি নির্মিত হইত। পালিত পশু ভারও বহন করিতে লাগিল। এইভাবে গড়িয়া উঠিল পশুপালক সমাজ।

পশুপালনের ফলে পরিবর্তন

পশুপালক সমাজও ছিল ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠী, শিকারী জীবনের ন্যায় এ-জীবনেও তাহারা একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারে নাই। একস্থানের জীবজন্তু মৎস্য প্রভৃতি ফুরাইয়া আসিলে শিকারী জীবনে মানুষকে যেমন খাদ্যান্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিতে হইত, তেমনি পশুপালক সমাজকেও পশুখাদ্যের সন্ধানে এক তৃণাঞ্চল হইতে অন্য তৃণাঞ্চলে প্রায়ই সরিয়া যাইতে হইত। অনেকে বলেন, এই পশুপালক সমাজের মধ্যেই প্রথমে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয়; পালিত পশুর সম্পর্কেই মানুষ প্রথম বলিতে শিখে, "এগুলি আমার, বাকিগুলি অপরের।"

ব্যক্তিগত ধনসম্পদের উদ্ভব

এই আমার এবং অপরের মধ্যে পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে উদ্ভিদপালন বা কৃষিকার্য সুরু হইলে। কিভাবে উদ্ভিদপালন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তাহা অবশ্য জানা যায় না। তবে এই মত প্রচার করা হয় যে ইহা স্ত্রীলোকের আবিষ্কার। গোষ্ঠীজীবনে পুরুষেরা যখন শিকারে বাহির হইত স্ত্রীলোকগণ তখন গৃহে থাকিয়া তাহাদের অস্থায়ী আবাসের নিকটবর্তী স্থানে বীজ মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করিত। এইভাবে একদিন তাহাদের মধ্যে কেহ আবিষ্কার করিল যে "একটি বীজ হইতে আরও অনেক বীজ, একটি মূল হইতে আরও অনেক মূল পাওয়া যায়।" এই আবিষ্কারের ফলে কৃষিকার্য সুরু হইল। মানুষ তখন নিজের ইচ্ছায় ফসল ফলাইতে শিখিয়া খাদ্যের জন্য অদৃষ্ট নির্ভরশীলতা হইতে নিজেকে অনেকাংশে মুক্ত করিল। তাহার খাদ্যাহরণ জীবন (food-gathering life) খাদ্যোৎপাদন জীবনে (food-producing life) রূপান্তরিত হইল।

কৃষিকার্যের ফলে আরও পরিবর্তন

কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষ ভ্রাম্যমাণ জীবনও পরিত্যাগ করিল, কারণ এক-স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস না করিলে কৃষিকার্য সম্ভব হয় না। স্থায়ী বসবাসের ফলে তাহারা গৃহনির্মাণ করিতেও শিখিল; এবং ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল গ্রাম-ব্যবস্থা।

ক। মানুষ ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করিল

খাদ্যাহরণ জীবনের খাদ্যোৎপাদন জীবনে রূপান্তরের ফলে পূর্বতন সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর গড়িয়া উঠিল নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, নূতন নূতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'পরিবার'ই হইল প্রথম।

খ। পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিল

পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয় অতি সাধারণভাবে। বলা হইয়াছে, প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল বলিয়া শিশুদের নিকট সকল বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ছিল পিতামাতার স্বরূপ। অবশ্য মাতার পক্ষে প্রত্যেক শিশুকে কয়েক বৎসর ধরিয়া পালন করিতে হইত বলিয়া শিশু মাতাকেই আপনজন বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিত। এইভাবে কতিপয় সন্তানসন্ততির মাতা ক্রমশ তাহাদের কর্ত্রী হইয়া দাঁড়ান; এবং যে পারিবারিক সংগঠনের উদ্ভব হয় তাহাকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (matriarchal family)।

প্রথমে উদ্ভূত হয় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে বংশ উত্তরাধিকার প্রভৃতি সকলই মাতার দিক হইতে নির্ণীত হইত। পরিবারের প্রাচীনতম স্ত্রীলোক ছিলেন পরিবারের মধ্যে প্রধানা। সকলকেই তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বা ভগিনীর নিকট এই কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হইত। প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এইরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে আজও তাহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া কেরলে, এখনও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশরে পারিবারিক জীবনের সাধারণ রূপই ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পর আসে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। শিকার ও ফলমূল আহরণের পরিবর্তে আদিম

পরে আসে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

জনগোষ্ঠী যখন প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারাই জীবনধারণ করিতে শিখে, তখন স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষের কর্তৃত্ব। কৃষিকার্য সম্পাদনের ফলে মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে শিখে; এবং এই সঞ্চয় বিনিময় করিয়া অন্যান্য দ্রব্য 'ক্রয়' করিতে সুরু করে। এই অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যাহা সে প্রথম ক্রয় করে তাহা হইল একটি নারী—যে-নারী তাহার 'স্ত্রী' হিসাবে পরিগণিত হয়।

নারী এইভাবে পুরুষের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইতে থাকিলে যে পারিবারিক সংগঠন সৃষ্ট হইল তাহাকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আমাদের হিন্দু যৌথ পরিবারেরই (joint family) মত। ইহা দ্বারা বুঝায় যে, একই পূর্বপুরুষের বংশধরেরা একান্নবর্তী হইয়া, একই গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে বসবাস করিতেছে। যৌথ ধনসম্পত্তি, যৌথ ঘরকন্না এবং যৌথ ধর্মাচরণ হইল যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আমাদের হিন্দু যৌথ পরিবারের মত

যৌথ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের নিজ নিজ উপার্জন গৃহস্বামী বা কর্তার নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য থাকে। বিনিময়ে যৌথ পরিবার তাহাদের ভরণপোষণ, পুত্রকন্যার বিবাহাদি প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, যৌথ পরিবার পরিচালনার সকল ব্যাপারে গৃহস্বামীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমানে বহু পরিমাণে ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সেদিন পর্যন্ত যৌথ পরিবার প্রথা ছিল ভারতের সামাজিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে যে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবার বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহার মূলে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, ইহা কতকগুলি উচ্চ আদর্শকে সমর্থন করে। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পরস্পরের সহযোগিতা করা, প্রবীণতম ব্যক্তির ও নিয়মকানুনের অনুগত হইয়া চলা, প্রভৃতি যৌথ পরিবার প্রথার ভিত্তি। ইহাতে লোকে নিজের সামর্থ্যমত কায করে এবং প্রয়োজনমত ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ফলে পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় থাকে। দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবারে লোকে ভবিষ্যতের ভয়ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কেহ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যৌথ পরিবার যে তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবে তাহা সে জানে। তৃতীয়ত, যৌথ পরিবারে মাথাপিছু ব্যয় কম হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক দিয়া যৌথ পরিবার সমর্থনযোগ্য। পরিশেষে, যৌথ পরিবারের জন্য সম্পত্তি বন্টিত হয় না; ফলে কৃষি-জমিও খণ্ড খণ্ড হয় না। সুতরাং বৃহদায়তনে চাষ করিবার সুবিধা মিলে।

প্রাচীনকালে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারের প্রাধান্যের কারণ

তবুও যৌথ পরিবার প্রথা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। কারণ, ইহা নিরুদ্যম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়, মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হইতে দেয় না, ঝুঁকি লইয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিতে দেয় না, রক্ষণশীল করিয়া তুলে, ইত্যাদি। ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব, সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে ব্যবসা-

যৌথ পরিবারের অবনতির কারণ

বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির সংগে সংগে যৌথ পরিবারও ভাঙিয়া পড়িয়াছে . অবশ্য এ-ঘটনা অনেক পরের। ইহার পূর্বে সমাজজীবনের বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

গ। গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইল

ভূমির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যে গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইল তাহা এক নূতন ধরনের সমাজ। এই সমাজ পূর্বের ন্যায় সাম্যবাদী না থাকিলেও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল। গ্রামীণ জীবন পরিচালিত হইত 'সমিতি' বা পঞ্চায়েতের নির্দেশে। প্রত্যেক গৃহস্বামী এই পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন।

গ্রামীণ সমাজে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কতক লোক মাত্র কৃষিকর্মেই নিযুক্ত রহিল; আবার কতক লোক অন্যান্য পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। তারপর সুরু হইল দ্রব্য-বিনিময়। যাহার বেশী ধান্য ছিল সে ধান্যের পরিবর্তে কাপড় লইতে লাগিল, ইত্যাদি। ক্রমে বিনিময় বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইত বিভিন্ন গ্রামের মধ্যবর্তী এক স্থানে। এই মধ্যবর্তী স্থান পরে বাজারে (market place) পরিণত হইল; এবং অনেক ক্ষেত্রে বাজারকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল নগর (city)।

ঘ। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উৎপত্তিতে ক্রমে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইল

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি: বলা হইয়াছে, পশুচারণ জীবনে মানুষ প্রথম আপন ও পর ভেদ করিতে শিখে এবং ভেদজ্ঞান আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে কৃষিকার্য শুরু হইলে। তারপর শ্রমবিভাগ ও পণ্য-বিনিময়ের উদ্ভবের ফলে ধনবৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। তখন সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হয় চুরি-জুয়াচুরির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার। এই উদ্দেশ্যে সমিতি বা গ্রাম-পঞ্চায়েত কর্তৃক নিয়মকানুন প্রণীত হইতে থাকে। পরবর্তী যুগে এই নিয়মকানুনই 'আইনে' (Law) পরিণত হয়।

ঙ। ফলে প্রয়োজন হইল আইনকানুন প্রণয়নের এবং

এইভাবে শ্রমবিভাগ, বিনিময়, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সমাজ কতকটা সুসংগঠিত হইলে যে স্তর বা পর্যায়ের সৃষ্টি হয়, তাহাকে উপজাতি (tribe) আখ্যা দেওয়া হয়। উপজাতিকে পশুপালক যাযাবর জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইত। আত্মরক্ষা করিতে করিতে উপজাতি আক্রমণ করিতেও শিক্ষা করিল; এবং ফলে যুদ্ধবিগ্রহও হইয়া দাঁড়াইল উপজাতীয় জীবনের অন্যতম স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যুদ্ধনায়কদের প্রয়োজনও ফুরাইল না।

চ। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহের

ছ। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজার জন্ম হইল

ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজপদ অধিকার করিয়া বসিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে একটি সুপ্রচলিত উক্তি আছে যে, রাজার জন্ম হইল যুদ্ধের ফলে (war begot the king)।
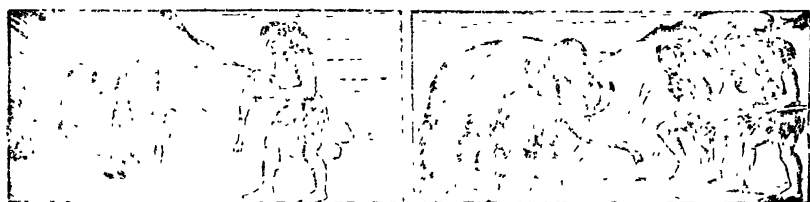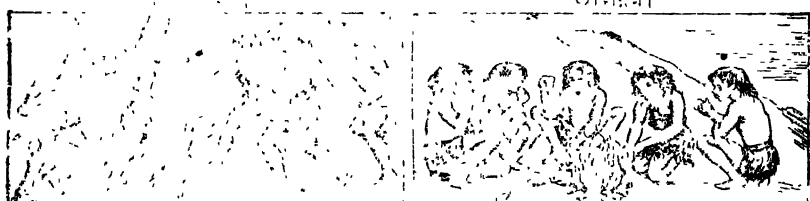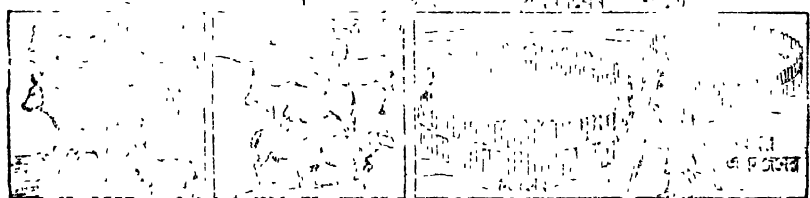
তারপর আসিল পরিবার ও গ্রাম-ব্যবস্থা
শেষে যুদ্ধের ফলে জন্ম হইল রাষ্ট্রের

যুদ্ধের ফলে রাজার জন্ম হইলেও রাজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক সময় ধর্মের সাহায্যও লওয়া হইয়াছিল। রাজার আদেশ ঈশ্বরেরই আদেশ এই ধারণা প্রচার করিয়া সমাজে সংহতি আনয়ন করা হইয়াছিল। এইভাবে সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

তখন হইতে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথমে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রে পৃথক সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না, পৃথক সংঘেরও অস্তিত্ব ছিল না। তারপর আসিল বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation States) দিন।* জাতীয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংঘ লইয়া যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহাকে বলে জাতীয় সমাজ (National Society)। এই জাতীয় সমাজই ছিল এতদিন পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বর্তমানে বৃহত্তর মানবসমাজের কল্পনাও করা হইতেছে—সকল জাতির সমবায়ে এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। সুতরাং বর্তমানে পৌরবিজ্ঞানে এ-সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাহা করা হইবে।

সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়

সংক্ষিপ্তসার

সমাজ: যখন কিছুসংখ্যক লোক পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করে তখনই সমাজ গঠিত হয়। অতএব, বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ সংঘবদ্ধ হইলেই সমাজ গঠন করিয়াছে বলা যায়। মানুষ আদিমকালেই আত্মরক্ষা ও জীবিকার্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমানে নানা উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া মানুষ বিভিন্ন প্রকার সমাজ গঠন করে। তবে এখন আমরা জাতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ধারণা করিয়া থাকি—যেমন বলিয়া থাকি ভারতীয় সমাজ, মার্কিন সমাজ ইত্যাদি। জাতির অন্তর্গত সকল সংগঠন মিলাইয়াই হল জাতীয় সমাজ। এই সংগঠনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) রাষ্ট্র, এবং (খ) অন্যান্য সংঘ। রাষ্ট্র সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আবশ্যিক সংগঠন; আর অন্যান্য সংঘ স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত।

সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য: মানুষ একাকী বাস করিতে বা বাঁচিতে পারে না বলিয়া তাহারা আদিমকাল হইতেই সংঘবদ্ধ। কিন্তু জীবনরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ সমাজ গঠন করিলেও সমাজকে ক্রমবিকশিত করিয়া চলিয়াছে উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে।

সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ: এই সংঘবদ্ধতার প্রথম রূপ সম্পর্কে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। আধুনিক লেখকগণ বলেন যে আদিমতম যুগে মানুষ দল বা গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ ছিল। এই আদিম জনগোষ্ঠী ছিল সাম্যবাদী। কারণ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির তখন উদ্ভব হয় নাই। ফলমূল আহরণ ও পশুপক্ষী শিকারের দ্বারা যাহাই সংগৃহীত হইত তাহা সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত। কালক্রমে কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। মানুষ পশুপালন ও কৃষিকার্য শিখিল। খাদ্যাহরণ জীবন রূপান্তরিত হইল খাদ্যোৎপাদন জীবনে। মানুষ ভ্রাম্যমাণ জীবন ত্যাগ করিল এবং পারিবারিক জীবন ও গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল। পারিবারিক জীবনের প্রথমে মাতার কর্তৃত্ব বর্তমান ছিল। এইজন্য এইরূপ সমাজকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক। কৃষিকার্য শিখিবার পর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সৃষ্ট হয়। নানা কারণে সমাজে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি উদ্ভব হয়, এবং ধনবৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত

---

* ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ধনসম্পত্তি লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়। পরবর্তী যুগে এই নিয়মকানুনই 'আইনে' পরিণত হয়। আবার আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ করারও প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধনায়কগণ ইহার সুযোগ লইয়া রাজপদ অধিকার করিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন। রাজশক্তিকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের সাহায্যও লওয়া হইয়াছিল। এইভাবে সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল।

তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমানের জাতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় সমাজ ও কল্পিত বৃহত্তম মানবসমাজ সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the term 'Society'? Discuss the purpose of social organisation.

'সমাজ' বলিতে কি বুঝায়? সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর। [৮-৯ এবং ৯-১০ পৃষ্ঠা]

2. Trace briefly the evolution of Society.

কিভাবে সমাজ বিবর্তিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১১-১৭ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(State)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of the State) : বর্তমানে নাগরিক জীবনের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে রাষ্ট্র। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা বহুলাংশে রাষ্ট্র সম্বন্ধেই আলোচনা।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবুও বলা যায় যে কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই ইহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রকে এক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাকে বলা হয় সার্বভৌম ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা (sovereignty)।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

সার্বভৌমিকতাকে 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' ('united power of the community'—MacIver) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন সামাজিক সংগঠনের নাই। সমাজের এই সম্মিলিত ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী হইতে ইহার পার্থক্য এইখানে যে আইন মান্য করা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক; কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী পালন করা সভ্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। আইন অমান্য করিলে

আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ও রাষ্ট্র

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে ; অন্য যে-কোন সংঘের নিয়মাবলী ভংগ করিলে সেই সংঘ অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য।)

রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন্ (President Wilson) রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।"* উইলসনের প্রায় প্রতিধ্বনি করিয়াই ব্লুন্টসলি (Bluntschli) বলিয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র। এ-ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রনৈতিকভাবে' শব্দটির অর্থ হইল 'আইনানুসারে'। আইনই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

উইলসন্ এবং ব্লুন্টস্লি প্রদত্ত সংজ্ঞা দুইটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও রাষ্ট্রের অন্যান্য অসংখ্য সংজ্ঞার মতই কিছুটা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। সুতরাং ইহাদের হইতে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। (সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় অধ্যাপক গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে।) (গার্ণারের সংজ্ঞা অবশ্য মৌলিক নয় ; ইহা বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় মাত্র। গার্ণারের মতে, "রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে।"**)

গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the State) : এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে—যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, (৪) স্থায়িত্ব, এবং (৫) বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে এই পাঁচটি উপাদানই অপরিহার্য। রাষ্ট্র বলিতে শুধু জনসমাজ বা ভূখণ্ড বা শাসন-ব্যবস্থা বা স্থায়িত্ব বা সার্বভৌম শক্তি বুঝায় না। এই পাঁচটি উপাদান লইয়া গঠিত যে প্রতিষ্ঠান তাহাকেই 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের এই উপাদান বা লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য : ১। জনসমষ্টি, ২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ৩। সরকার, ৪। স্থায়িত্ব, ৫। সার্বভৌমিকতা

---

* "A State is a people organised for law within a definite territory."

** "A State is a community of persons, *more or less numerous*, permanently occupying a definite portion of a territory, independent of external control,...... and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

জনসমষ্টি (Population) : আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। মানুষের জন্যই সমাজ, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কল্পনাও করা যায় না। জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র-গঠনের জন্য প্রথম অপরিহার্য উপাদান হইল জনসমষ্টি।

জনসমষ্টির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত নিয়ম নাই। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে স্বল্প সংখ্যাই সুশাসনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ; কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রভৃতির ফলে বৃহৎ জনসংখ্যা সুশাসনের অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয় না। পূর্বে দিল্লী হইতে বাংলাদেশ শাসন করাই কঠিন ছিল ; আধুনিক যুগে ইংরাজদের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশও শাসন করা কঠিন হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকরা দশ হাজার জনসংখ্যাকেই সুশাসনের দিক হইতে কাম্য মনে করিতেন ; বর্তমানে ঐ একই দিক দিয়া ভারত তাহার ৪৫ কোটির মত লোককে এবং চীনদেশ তাহার প্রায় ৭০ কোটি লোককে অকাম্য বিবেচনা করে না।* তবে কাম্য জনসংখ্যা নির্বাচনে একমাত্র সুশাসনকে মাপকাঠি করিলে চলিবে না ; দেশের আর্থিক সম্পদ কি পরিমাণ জনসংখ্যার উপযোগী তাহাও দেখিতে হইবে।

জনসমষ্টির আয়তন

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory) : সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। জনসমাজের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা নিজস্ব বাসভূমি না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ইতিহাসে যাযাবর জাতির মধ্যে সংগঠনের উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সকল যাযাবর জনসমাজ নিয়ন্ত্রণ ও আইনের অধীন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে মানবসমাজের এইরূপ অবস্থাকে 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয় না। যাযাবর জনসমাজ যখনই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র বলিয়া কোন কিছুর কল্পনাও করা যায় না।

রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত তাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না থাকিলে নির্ধারণ করা যায় না। রাষ্ট্রের সীমা যতদূর বিস্তৃত, সার্বভৌম শক্তির এলাকাও ততদূর ব্যাপ্ত। রাষ্ট্রের সীমা বলিতে স্থল, জল ও বায়ুমণ্ডল বুঝায়। এইজন্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের, ভূখণ্ডের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের এবং ভূখণ্ডের উপকূলবর্তী সমুদ্রের কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ধরা হয়।

সার্বভৌম শক্তির এলাকা রাষ্ট্রের সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির ন্যায় ভূখণ্ডের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। প্রাচীন গ্রীকদের নিকট একটিমাত্র নগর ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত ; আবার রোমকদের নিকট সমগ্র পৃথিবীও যথেষ্ট ছিল না। রোমকদের মতই প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে চাহিতেন। বর্তমান যুগে অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ ভূখণ্ড কোনটিও কাম্য বিবেচিত হয় না। ভূখণ্ড অতি

ভূখণ্ডের আয়তন

* ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে ভারত ও চীনদেশের আনুমানিক জনসংখ্যা।

ক্ষুদ্র হইলে স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে; আবার অতি বৃহৎ হইলে সুশাসন ব্যাহত হয়। সুতরাং যে পরিমাণ ভূখণ্ড সুশাসনের সহায়ক সেই পরিমাণ ভূখণ্ডই কাম্য।

শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার (Government): জনসমাজ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র-গঠনের জন্য পরবর্তী যে-উপাদানের প্রয়োজন হয় তাহা হইল সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার। রাষ্ট্র একটি সংগঠন। যে-কোন সংগঠনের পরিচালনার ভার একদল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার যাহাদের উপর থাকে, সমষ্টিগতভাবে তাহারা সরকার বলিয়া পরিচিত। সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অন্তর্বর্তী সংগঠন। রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ধারণা মাত্র; ইহা মূর্ত হইয়া উঠে সরকারের মধ্যে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে। সরকার না থাকিলে জনসমষ্টি বিশৃংখল জনতায় পরিণত হইয়া সুন্দর সুশৃংখল সমাজ সৃষ্টির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত; ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইত না।

সরকারের স্বরূপ

স্থায়িত্ব (Permanence): স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসমাজ স্থায়ীভাবে সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিলে, তবেই রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততদিনই বজায় থাকে, যতদিন ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকে। অপর রাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত হইলে বা অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা হারায়। ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

রাষ্ট্র স্থায়ী; কিন্তু চিরস্থায়ী নাও হইতে পারে

সার্বভৌমিকতা (Sovereignty): পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে সার্বভৌমিকতা বা চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য; এবং তত্ত্বগত সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে।* ইহাও বলা হইয়াছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া একমাত্র রাষ্ট্রই আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিতে পারে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতাকেই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই ইচ্ছা ও আদেশের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা স্বাধীনতা। সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা-সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক—ক। আভ্যন্তরীণ, এবং খ। বাহ্যিক

* সার্বভৌমিকতাকে তত্ত্বগত বলা হইয়াছে, কারণ সার্বভৌমিকতা বলিতে যে বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় তাহা বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই নাই। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ তারিখের পূর্বে ভারতবর্ষে জনসমাজ ছিল, সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল, সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু সার্বভৌম শক্তির অধিকারী না হওয়ায় ভারতবর্ষ পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। উক্ত তারিখে ভারতবাসীর হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র-পর্যায়ভুক্ত হয়।

ভারত-রাষ্ট্রের জন্ম

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, স্থায়িত্ব এবং সার্বভৌমিকতা—এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে সংগঠনকে 'রাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারত একটি রাষ্ট্র, কারণ ইহার উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যই আছে; পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে, কারণ

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে
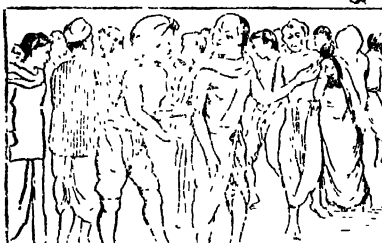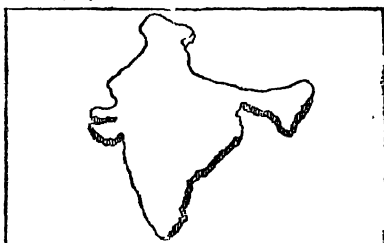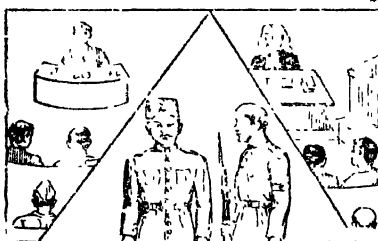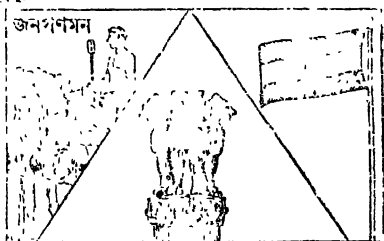
ইহাদের সার্বভৌমিকতা নাই। ইহারা ভারতীয় রাজ্যসংঘ বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি অংশ মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি (Units) কখনই রাষ্ট্র নহে। বাংলায় ইহাদের 'রাজ্য' বা 'প্রদেশ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।*

রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি

কোন দেশ রাষ্ট্র কি না, তাহা বিচারের মাপকাঠি কি? আধুনিক লেখকগণের মতে, এই মাপকাঠি হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য অন্ততঃ কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাইতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নয়া চীন একটি রাষ্ট্র, কারণ উহা সকলের না হইলেও অনেক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্র ও সরকার
এক নহে

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government): রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সেইজন্য সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিতে সরকারকেই জানে; তাহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। প্রাচীনকালেও অনেক সময় 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইত না। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র"। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদেরও দুই একজন অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। এইভাবে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, সুসংগঠিত জনসমাজ। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের এই কার্য সম্পাদিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধন করিবার যন্ত্র মাত্র; সরকারই রাষ্ট্র নহে।

সরকার রাষ্ট্রের
মস্তিষ্কস্বরূপ

অধ্যাপক গার্ণার কয়েকটি উপমার সাহায্যে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এই পার্থক্যটি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। তাহারই মধ্যে একটি উপমায় তিনি রাষ্ট্রকে প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রাণীর মস্তিষ্কটাই যেমন প্রাণী নহে, তেমনি সরকারও রাষ্ট্র নহে। তবুও মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রাণীটি যেমন চলাফেরা করে, তেমনি সরকারের নির্দেশেই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

সরকার রাষ্ট্রের
অংশ মাত্র

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র কয়েকটি উপাদান লইয়া গঠিত হয়। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হয় না সত্য, কিন্তু সরকার রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র উপাদান নহে—অন্যতম উপাদান মাত্র। রাষ্ট্র-গঠনের জন্য সরকার ছাড়া আরও চারিটি উপাদান—যথা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ, সার্বভৌমিকতা ও স্থায়িত্ব প্রয়োজন। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। অংশকে সমগ্র বলিয়া মনে করিলে যেরূপ ভুল হয়, সরকারকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে সেইরূপই ভুল হইবে।

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে (Units) 'রাজ্য' (States) বলা হয়; কানাডায় ইহারা 'প্রদেশ' (Provinces) বলিয়া অভিহিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ইহাদের 'প্রদেশ' আখ্যাই দেওয়া হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সভ্যসংখ্যা সরকারের সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র জনসাধারণকে লইয়া, কিন্তু সরকার গঠিত হয় মাত্র শাসনকার্য পরিচালকগণকে লইয়া। 'শাসনকার্য পরিচালকগণ' বলিতে যাঁহারা আইন প্রণয়ন, শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন মাত্র তাঁহাদের বুঝায়। তাঁহাদের সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসাধারণের শতাংশের একাংশও নয়।

রাষ্ট্র স্থায়ী, কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল

চতুর্থত, স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সরকার কিন্তু চিরপরিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনের অর্থ শাসকগণের পরিবর্তন। শাসকগণের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। রাশিয়ার জারের, জার্মেনীর কাইজারের পতন হইয়াছিল; কিন্তু রাশিয়া বা জার্মান রাষ্ট্রের পতন হয় নাই। মিশরের রাজা ফারুকের হাত হইতে শাসনভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে আসিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে মিশরীয় রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানেও সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় সরকার থাকায় আজ এই দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর দল সরকার গঠন করিতেছে। সরকারের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে রাষ্ট্র কিন্তু ভাঙিতেছে না বা নূতন করিয়া গড়িতেছে না। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে রাষ্ট্র সাধারণত অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে।

রাষ্ট্র একই ধরনের কিন্তু সরকার বিভিন্ন ধরনের হয়

পঞ্চমত, সকল রাষ্ট্র একই ধরনের—অর্থাৎ, সকল রাষ্ট্রই জনসমাজ, ভূখণ্ড প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। সরকার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়—অর্থাৎ, সকল সরকারের একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে থাকিতে পারে, কয়েকজনের হস্তে থাকিতে পারে, আবার সমগ্র জনসাধারণের হস্তে থাকিতে পারে। আর একদিক দিয়া দেখিলে শাসনক্ষমতা ইংলণ্ডের ন্যায় একই সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে, আবার ভারতের ন্যায় সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের অংশ-সমূহের সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিতও হইতে পারে। ইহার ফলে আমরা একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), গণতন্ত্র (Democracy), যুক্তরাষ্ট্র (Federal State), এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সরকারের সাক্ষাৎ পাই।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and other Associations): সমাজের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে সমাজের ধারণা জাতির (Nation) পরিপ্রেক্ষিতে করিয়া বলা হয় জাতীয় সমাজ—যেমন, ভারতীয় সমাজ, মার্কিন সমাজ ইত্যাদি। ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই সকল জাতীয় সমাজের অভ্যন্তরে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে: (ক) রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র, এবং (খ) অন্যান্য সংঘ—যথা, ধর্ম সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, বণিক সমিতি, সাহিত্য সভা, কলা পরিষদ ইত্যাদি। রাষ্ট্রের ন্যায় এই সকল সংঘও মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল

বর্তমান যুগে একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের সকল দিক পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না বলিয়াই এই সকল সংঘের উদ্ভব হয়। বস্তুত, আধুনিক জীবনের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে মানুষ এই সকল সংঘের সহিত নিজেকে বিশেষ জড়াইয়া ফেলে।

এইভাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ—উভয়ই মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য :
১। রাষ্ট্রের সভ্যপদ আবশ্যিক : অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ স্বেচ্ছাধীন

প্রথমত, রাষ্ট্রের সভ্যপদ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। রাষ্ট্রের সভ্যপদ সাধারণত মানুষের জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়; অপরদিকে সংঘের সভ্যপদ নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর। আবশ্যিকভাবে আমি ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য; কিন্তু ফুটবল ক্লাব, সাহিত্য সভা প্রভৃতির সভ্য না হইলেও আমার চলে। উপরন্তু, কোন ব্যক্তি একসংগে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না; কিন্তু সে একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে।

২। রাষ্ট্র ও সংঘের উদ্ভব পদ্ধতি এক নহে

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে; কিন্তু অন্যান্য সংঘ মানুষ স্বেচ্ছায় গঠন করিয়াছে।

৩। সংগঠনও পৃথক

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংঘের মধ্যে সংগঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে। এই ভূখণ্ডের বাহিরে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে না; ইহার বাহির হইতে উহা সভ্য সংগ্রহও করিতে পারে না। অন্যান্য সংঘের কার্যক্ষেত্র কিন্তু এইরূপ সীমানির্দিষ্ট নহে অথবা তাহাদের সভ্যগ্রহণের বেলাতেও এরূপ কোন বাধা নাই। ভারত-রাষ্ট্র পাকিস্তানে গিয়া রেলপথ পাতিতে পারে না বা ঐ দেশ হইতে সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান, ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যে কোন দেশেই শাখা খুলিতে বা যে-কোন দেশ হইতেই সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

৪। উদ্দেশ্যও বিভিন্ন

চতুর্থত, উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। অন্যান্য সংঘের সাধারণত দুই-একটি করিয়া উদ্দেশ্য থাকে। ফলে ইহাদের কার্যাবলীও সংখ্যায় পরিমিত। যেমন, ক্রীড়াসংঘের উদ্দেশ্য হইল ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার করা, ইত্যাদি। সুতরাং ক্রীড়াসংঘের কার্য ক্রীড়া-ব্যবস্থায় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য ধর্মপ্রচারেই সমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রীড়াসংঘ ধর্মের ব্যাপারে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খেলা-ধূলার ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামায় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করা। এই কারণে রাষ্ট্র মাত্র দুই-একটি কার্য সম্পাদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই উহাকে করিতে হয়। ফলে আধুনিক যুগে রাষ্ট্র কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে—পূর্বে যে-সকল কার্য ব্যক্তি স্বয়ং সম্পাদন করিত বর্তমানে তাহার অধিকাংশই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রভুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র

বর্তমানে মোটরবাস চালায়, খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করে, কলকারখানা স্থাপন করে, জলসেচ বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য বিশেষ বলিয়া উহাদের কার্যক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধারণ বলিয়া উহার কার্যক্ষেত্রও সীমাহীন।

৫। স্থায়িত্বও একপ্রকার নহে

পঞ্চমত, রাষ্ট্র সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী; কিন্তু অন্যান্য সংঘ দীর্ঘস্থায়ী নাও হইতে পারে। অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও উহাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। এইরূপে প্রত্যেক জাতীয় সমাজে কত সংঘই না লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, নূতন নূতন কত সংঘেরই না উদ্ভব ঘটিতেছে। সামাজিক সংগঠনের এই চিরপরিবর্তনের মধ্যে অধিকাংশ সময় রাষ্ট্র নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

৬। কিন্তু প্রধান পার্থক্য ক্ষমতাগত

পরিশেষে, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল ক্ষমতাগত। একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই কারণে রাষ্ট্র উহার নিয়মাবলী বা আইন মান্য করাইতে বাধ্য করিতে পারে, বলপ্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সংঘের বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বাধ্য করিতে পারে না বা নিয়মভঙ্গকারীকে শারীরিক শাস্তিপ্রদানও করিতে পারে না।

এই সার্বভৌম বা সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতার জন্যই আবার প্রত্যেক সংঘকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হয়। না মানিলে রাষ্ট্র ঐ সংঘের বিলোপসাধন করিতে পারে। উহার স্থলে নূতন সংঘের সৃষ্টিও করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের স্রষ্টা, নিয়ামক ও বিলুপ্তকারী হিসাবে দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুশৃংখল সমাজজীবন গঠন করা। এই কারণে ইহাকে সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা প্রদান করা হইয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও বলবৎকরণের ক্ষমতা মাত্র।

রাষ্ট্রের বহু সংজ্ঞা আছে। ইহাদের মধ্যে গার্নার-প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) স্থায়িত্ব, এবং (৫) সার্বভৌমিকতা। এই পাঁচটি উপাদানের সমবায়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়; ইহাদের কোন একটির অভাব থাকিলে সংগঠন রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয় না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে সার্বভৌমিকতা না থাকার জন্য ভারতবর্ষ রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইত না। ঐ তারিখে সার্বভৌমিকতা ভারতবাসীর নিকট হস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র-পদবাচ্য হয়।

কোন দেশ রাষ্ট্র কি না তাহা বিচারের মাপকাঠি হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না পাইলে কোন দেশ রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে; ইহারা 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে'র এক একটি অংশ মাত্র।

রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র; সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। তবে অন্যান্য সংঘের সহিত ইহার সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাগত পার্থক্য রহিয়াছে। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টি ও বিলোপসাধন করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. **What is a State ? What are its chief characteristics ?**

রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ?

2. **Define State. Explain its characteristics and distinguish it from Government.**

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর এবং সরকারের সহিত উহার পার্থক্য দেখাও।

3. **What is meant by the term 'State' ? Is West Bengal a State ?**

'রাষ্ট্র' শব্দটি দ্বারা কি বুঝায় ? পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র ?

4. **What do you understand by 'Sovereignty' ? Why is it regarded as the most essential characteristic of the State ?**

'সার্বভৌমিকতা' বলিতে কি বুঝ ? উহাকে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয় কেন ?

5. **Define the term 'State' and distinguish it from other associations.**

'রাষ্ট্র' শব্দটির সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার সহিত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য দেখাও।

6. **What do you mean by the term 'State' ? Are the following States ?—**
(a) **The State of West Bengal,** *(b)* **A Football Club,** *(c)* **The United Nations (Fn. 1962). Give reasons for your answer.**

'রাষ্ট্র' শব্দটির দ্বারা কি বুঝ ? নিম্নলিখিতগুলি কি রাষ্ট্র ?—(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, (খ) কোন ফুটবল ক্লাব, (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত: ফুটবল ক্লাব অন্যতম সংঘ, রাষ্ট্র নহে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি রাষ্ট্রসমবায় বা সংঘ-গুলির বাহিরে ভিন্ন সংস্থা, তদুপরি রাষ্ট্র নহে।...[১৮-১৯, ২২-২৩ এবং ২৪-২৫ পৃষ্ঠা]

7. **"A State is a people organised for law within a definite territory." Explain the statement.**

'রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।' উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

(Origin of the State)

মানুষের স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতাই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ। উদ্ভবের পর বহুদিন পর্যন্ত এই দুই সংগঠন মানুষের কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই ক্রমবিকশিত হইতেছিল। তারপর এমন এক অবস্থা আসিল যখন মানুষ ইহাদের উপযোগিতা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল এবং ইহাদিগকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইল। ইহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইল। এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৃষ্ট মতবাদগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) বৈজ্ঞানিক মতবাদ, এবং (খ) কল্পনাপ্রসূত মতবাদ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ

মানুষের সংঘবদ্ধতার ফলেই যে সমাজ ক্রমবিকশিত হইয়া একদিন রাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করিয়াছে, রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক মতবাদ। আধুনিক কালে নানা বিদ্যার চর্চার ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘন তমসাবৃত ছিল। তখন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে কল্পনাপ্রসূত মতবাদসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে বলিয়া ইহাদের আলোচনা প্রয়োজন। উপরন্তু, কোন মতবাদকে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহার বিপরীত মতবাদগুলিকে খণ্ডন করা প্রয়োজন। এই দিক দিয়াও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির পর্যালোচনার সার্থকতা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of the Origin of State):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদই প্রধান। অপরদিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এখন প্রথমে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির আলোচনা করিয়া পরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইতেছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Theory of Divine Origin):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মতবাদের মূল বিষয়ের বর্ণনা এইভাবে করা যায়: রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাজা হইলেন ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি। সুতরাং রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছা অমান্য

এই মতবাদের মূল বক্তব্য

করা। অর্থাৎ, রাজদ্রোহিতার অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়িত্বশীল; প্রজাদের নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। তিনি প্রজাদের মতামত ও প্রচলিত আইনকানুনের ঊর্ধ্বে।

অনেক সময় নৃপতিবিহীন রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ রাষ্ট্র ধর্মশাস্ত্রের নীতি অনুসারে শাসিত হয়; এবং রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হইলেও তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic States) নামে অভিহিত। এইরূপ ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা যে ঈশ্বর-প্রেরিত শাসক ইহাতে প্রাচীন ভারতীয়গণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য বিভিন্ন রাজবংশের নাম ছিল সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ ইত্যাদি। ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে ব্রাহ্মণ তখন রাজার মাথায় মুকুট পরাইয়া দিতেন। এখনও অনেক জাপানী তাহাদের রাজবংশকে সূর্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করে। ইউরোপে মোটামুটিভাবে ষোড়শ শতাব্দী অবধি ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল সর্বপ্রধান মতবাদ। তাহার পর হইতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার, গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব প্রভৃতির ফলে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিতে থাকে; এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা একরূপ ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হয়।

ধর্মীয় রাষ্ট্র

সমালোচনাঃ বর্তমানে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে বিশ্বাস শিক্ষিত লোক সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে বলা চলে। রাষ্ট্রকে ঈশ্বর-সৃষ্ট মনে করিলে আইনকানুনকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিতে হয়। ইহার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করা। যুক্তি দিয়া, যুক্তি দিয়া বিচার করিলে স্বেচ্ছাচারিতাকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না।

১। ইহা অযৌক্তিক

দ্বিতীয়ত, রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে মন চায় না। ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি এত নির্দয় হইতে পারেন না যে তিনি নির্মম অত্যাচারীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিবেন। তৈমুর লং, নাদির শা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব!

২। ইহা অত্যাচার সমর্থন করে

তৃতীয়ত, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় ঈশ্বরের প্রতিনিধির সন্ধান দিতে পারে না। ভারতের ন্যায় প্রজাতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে? এ-প্রশ্নের উত্তর এই মতবাদে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ মতবাদ।

৩। ইহা অসম্পূর্ণ মতবাদ

এই সকল কারণে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে। মানুষ যখন বর্বর ও বিশৃংখল জীবনযাপন করিত, যখন ধর্ম ছাড়া আর কিছুই মানিত না তখন রাজা ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এইরূপ প্রচার করিয়া আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার (allegiance and discipline) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। রাজাও অনেক সময়

ঐতিহাসিক মূল্য

বিশ্বাস করিতেন যে তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি; ফলে প্রকৃতই প্রজাপালন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই দুই-এর ফলে সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force): এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে মাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা। মতবাদের সমর্থকগণের মতে, মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব তাহা নহে, কলহপ্রিয় জীবও বটে। ক্ষমতালিপ্সা মানুষের অন্যতম প্রবৃত্তি। কলহপ্রীতি ও ক্ষমতালিপ্সার জন্য সে আদিমকাল হইতেই বলপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রথমে বলবান ব্যক্তি বা বলশালী জনগোষ্ঠী (clan) কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি বা কোন দুর্বল গোষ্ঠীকে বশীভূত করিয়া তাহার বা তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল। এইরূপে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। তারপর বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বাধিল সংঘর্ষ। সংঘর্ষের ফলে বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বিজয়ী উপজাতির দলপতি নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। এইভাবে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই বলপ্রয়োগ মতবাদ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ডাঃ লীকক (Dr. Stephen Leacock)। তিনি বলেন, "ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করিতে হইবে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ ও তাহাদিগকে অধীনতায় আনয়ন করার মধ্যে, স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্ব-লিপ্সার মধ্যে।"

সমালোচনা: রাষ্ট্রের উদ্ভবে যে পাশবিক বলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। তরবারির দ্বারাই পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ-মত স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় না যে, একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি শক্তি কাজ করিয়াছে। কোন দলপতি গোষ্ঠী বা উপজাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিত না, যদি-না গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ তাহার আনুগত্য স্বীকার করিত। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে। উক্তিটি হইল, "প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজ হাতে বল কত।" কতকটা স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতার প্রেরণায়, কতকটা ধর্মভয়ে, কতকটা উপযোগিতার জন্য এবং কতকটা বলপ্রয়োগে বশীভূত হইয়াই মানুষ রাজনেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল—একমাত্র বলপ্রয়োগের কারণে করে নাই। সুতরাং বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া বর্ণনা করিলে ভুল হইবে; ইহা অন্যতম কারণ মাত্র।

এই মতবাদে কিছুটা সত্য নিহিত আছে

কিন্তু বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ নয়

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories): পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে

পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই দুই মতবাদ কিন্তু অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিম সমাজে পিতাই ছিলেন গৃহস্বামী এবং পিতার দিক হইতে বংশ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি নির্ণীত হইত। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইত মাতার দিক হইতে, পিতার দিক হইতে নহে।

এই দুই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকগণ বলেন, আদিম যুগের সমাজ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের উপর প্রাচীনতম পুরুষসভ্য বা গৃহস্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এক পরিবার যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইল তখন এই সকল পরিবারের উপর আদি পরিবারের গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব বজায় রহিল। এইভাবে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। উপজাতির মধ্যে কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল; এবং ফলে একটির স্থলে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইল। আত্মীয়তাবোধ এই উপজাতিগুলির মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল; তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে লাগিল এবং ক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

দুই দিক দিয়া পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম সমালোচনা অনুসারে সমাজ প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হইয়াছিল এবং পরে আসিয়াছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। অর্থাৎ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণ বলেন, সমাজ সংগঠনের আদিমতম রূপ গোষ্ঠি (clan), পরিবার নহে। পারিবারিক জীবন সৃষ্ট হইয়াছিল বহু পরে—সামাজিক জীবন ক্রমবিকাশের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলে।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে রাষ্ট্রের উদ্ভব বিশেষ জটিলতায় আবৃত; পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মত অত সরলভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে প্রাচীনকালে পরিবারের উপর কর্তৃত্ব ছিল মাতার, পিতার নহে। ক্রমে এই কর্তৃত্ব সমগ্র উপজাতির (tribe) উপর পরিব্যাপ্ত হইল। এইভাবে প্রবীণতমা গৃহকর্ত্রী জননেত্রী হইয়া বসিলেন এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতায় নারী পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন। সুতরাং স্ত্রীলোক যে সর্বস্থানেই এবং বহুদিন ধরিয়া পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে—এইরূপ মতবাদ অযৌক্তিক। প্রথমে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক থাকিলেও কিছুদিন পরেই নারীর প্রভুত্বের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরুষের কর্তৃত্ব। উপরন্তু, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মতই মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ একমাত্র পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিয়া

এই দুই মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র

মনে করে। সুতরাং প্রথমোক্ত মতবাদের মতই ইহা রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র। আত্মীয়তাবোধ বা পরিবারের সম্প্রসারণ ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি নানা কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে এই মতবাদকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে: রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ ‘প্রাকৃতিক অবস্থা’র (State of Nature) মধ্যে বাস করিত। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, এই অবস্থায় সমাজও সংগঠিত হয় নাই; আবার কয়েকজনের মতে, তখন সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নাই। ‘প্রাকৃতিক অবস্থা’য় সমাজ সংগঠিত হউক আর না-হউক রাষ্ট্রের উদ্ভব না হওয়ায় তখন মানুষের দ্বারা প্রণীত কোন আইনকানুন ছিল না। মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করিত। এই যথেচ্ছাচারিতার উপর কোন বাধা ছিল না। অনেকে কিন্তু বলেন যে একমাত্র বাধা ছিল কতকগুলি ‘ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি’ (Natural Laws)। এই সকল ‘স্বাভাবিক নীতি’র ফলে মানুষের হিংসা, হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি দমিত থাকিত। এই অবস্থায় বেশীদিন বাস করা সম্ভব না হওয়ায় আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে স্বাভাবিক নীতির স্থানাধিকার করিল মানুষের দ্বারা প্রণীত আইনকানুন।

অতি প্রাচীন মতবাদ

আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে—এই মতবাদ অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যে এবং আমাদের দেশে মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই মতবাদকে পরিস্ফুটিত করিয়া ইহার বর্তমান রূপদান করিয়াছেন তিনজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। ইহারা হইলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ চিন্তাবীর হবস্ ও লক্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো।

সমাজের উদ্ভবের পূর্বে মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ

হবস্ (Hobbes): হবসের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনরূপ সমাজজীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কারণে এই অবস্থা ছিল অতি ভয়াবহ। আদিম মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের কোন বিরাম ছিল না। কোনরূপ আইনকানুনের বাধা ছিল না বলিয়া মানুষ তখন অসৎ উপায়ে ও নির্মমভাবে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিত। ফলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু এবং প্রত্যেকেই ছিল প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত; সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রতিবেশীকে এড়াইবার একমাত্র উপায় ছিল নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা। আদিম মানুষ তাহাই

* হবস্ প্রাকৃতিক অবস্থায় ‘ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি’র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

করিতে লাগিল। ফলে জীবন হইয়া উঠিল নিঃসংগ, অসহায়, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং অনিশ্চিত (Life became solitary, poor, nasty, brutish and short)।

দুঃসহ জীবন হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিল সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া

তারপর মানুষ এই দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায় খুঁজিতে লাগিল। মুক্তি আসিল সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। আদিম মনুষ্যগণ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের (assembly of men) হস্তে তুলিয়া দিল। এইভাবে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ হইলেন সার্বভৌম (sovereign)। সার্বভৌম শক্তির উদ্ভবের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটিল, বিরোধ সংযত হইল এবং প্রতিষ্ঠিত হইল সুশৃংখল সমাজজীবন বা রাষ্ট্র।

লক্ (Locke) : লক্ যে প্রাকৃতিক অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার মত ভয়াবহ নহে। হবসের ধারণার বিরোধিতা করিয়া লক্ বলেন যে প্রাকৃতিক অবস্থায় একপ্রকার সমাজজীবন গঠিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। এই অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত 'ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি' দ্বারা।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে সমাজজীবন ছিল অসম্পূর্ণ

তবুও প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক ত্রুটি ছিল। প্রথমত, কোন্‌টি ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি এবং কোন্‌টি নয়—সে-সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সকল নীতির ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তৃতীয়ত, আইন ভংগ করিলে যেরূপ শাস্তিপ্রদান করা হয় এই সকল নীতি ভংগ করিলে সেরূপ কোন শাস্তিপ্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।

এইজন্য মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিল

এই সকল অসম্পূর্ণতার জন্য প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন যাপন নিরাপদ হইতে পারে নাই। এই নিরাপত্তার জন্যই মানুষ চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের। এই চুক্তি হইয়াছিল সম্প্রদায়ের সকলের সহিত প্রধান বা রাজা বলিয়া নির্বাচিত ব্যক্তির সংগে।

প্রথমে গোষ্ঠীজীবন ছিল সুন্দর

রুশো (Rousseau) : লক্ হইতে আরও এক স্তর ঊর্ধ্বে উঠিয়া রুশো বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল একরূপ মর্ত্যের স্বর্গ। এই অবস্থায় সমাজ সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ছিল এবং মানুষ সুন্দর সহজ সুখী ও সরল জীবনযাপন করিত। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই আদিম সরলতা ও সুখ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে লাগিল; এবং মানুষ নিজের এবং অপরের দ্রব্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে শিখিল। তখন প্রাকৃতিক অবস্থা প্রকৃত-

কিন্তু পরে ইহা ভয়াবহ হওয়ায় মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন

পক্ষেই হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ, নরহত্যা, সন্ধিবিগ্রহ প্রাকৃতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় মানুষ ইহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানেও মুক্তি আসিল চুক্তির মধ্য দিয়া, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া।

হবস্ ও লকের মত রুশোর কল্পিত চুক্তিতে কিন্তু রাজার স্থান নাই। আদিম মনুষ্যগণ চুক্তি দ্বারা ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে সমর্পণ করে নাই, ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সমাজকে যাহাকে রুশো 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রুশোর মতবাদে রাজার স্থান নাই

সমালোচনা: সামাজিক চুক্তি মতবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই বিভিন্ন দিকে সমালোচিত হইয়া ইহার প্রভাব কমিয়া আসিতে থাকে।

এই মতবাদের প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে ইহা অনৈতিহাসিক। আদিম যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য মনুষ্যগণ হঠাৎ একদিন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠন করিল এইরূপ উদাহরণ কোন দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদ সত্য নহে।

১। ইহা অনৈতিহাসিক

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি বলিতে বুঝায় আইনানুমোদিত ব্যাপার। অর্থাৎ, আইনসংগতভাবে পরস্পরের মধ্যে যে অংগীকার করা হয় তাহাকেই চুক্তি বলে। সুতরাং চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল আইন প্রণয়নের। সামাজিক চুক্তি মতবাদে কল্পনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেই, আইন প্রণয়নের পূর্বেই মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। এইরূপ ধারণা যুক্তির দ্বারা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

২। ইহা ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

তৃতীয়ত, যে প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ অলৌকিক। লোকে রাষ্ট্রের উপযোগিতা বুঝিতে পারে, ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার (political consciousness) উন্মেষ হইলে। আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র কাহাকে বলে তাহা জানিত না, সংগঠন সম্বন্ধেও তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। এই অবস্থায় তাহারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল কিরূপে? কি করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে রাষ্ট্র গঠিত হইলেই তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থার দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটিবে? এই প্রশ্নের উত্তর সামাজিক চুক্তি মতবাদে পাওয়া যায় না।

৩। আরও একটি কারণে ইহা অলৌকিক

চতুর্থত, অনেকের মতে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক—ইহা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার ঘোরতর পরিপন্থী। শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এই ধারণা প্রচার করা হয় বলিয়া শাসিতেরা সকল সময় শাসকের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ফলে দেখা দেয় গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি প্রধান বিপ্লব—ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল সামাজিক চুক্তি মতবাদ হইতে।

৪। ইহা বিপজ্জনক মতবাদ

উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটনে এই মতবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মূল্য

সামাজিক চুক্তি মতবাদের পূর্বে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল প্রচলিত মতবাদ। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ অনুসারে রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত; সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে ক্ষমতা কিন্তু জনসাধারণ বা শাসিতের নিকট হইতে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এইভাবে শাসিতকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করা হইয়াছে—ঈশ্বরের আদেশের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে জনমতের প্রাধান্য।

এই মতবাদ গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করিয়াছে
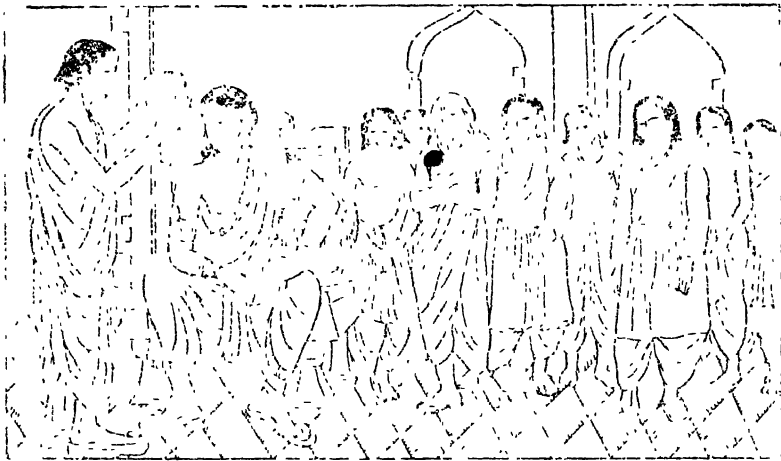
ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory) : দেখা গেল যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ—কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কোনটিই যথেষ্ট নহে। এ-সম্বন্ধে গার্ণার সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে, পাশবিক শক্তিরও ফল নহে, প্রস্তাব বা চুক্তির দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই। শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ বলিয়াও ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।" তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যাইবে কিভাবে? রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এই মতবাদ দীর্ঘ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল—মানুষের কল্পনা-সৃষ্ট নহে। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের জটিল রূপ গ্রহণ করিয়াছে—হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হয় নাই। এ-সম্বন্ধে বার্জেসের (Burgess) উক্তি হইল, "রাষ্ট্র মানবসমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল।"*

রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রকৃত ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক মতবাদে পাওয়া যায়

কবে এবং কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব অতি আদিমকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; এবং ধীরে ধীরে এই সামাজিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাও বলা যায় যে অন্তত কয়েকটি শক্তি এই রূপান্তরকার্যে—অর্থাৎ, রাষ্ট্র-গঠনে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শক্তিগুলি হইল রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। এখন ইহাদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাদের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করা হইলেও পৃথক পৃথক ভাবে কার্য করে নাই। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত থাকিয়া ইহারা সকলেই একসংগে কার্য করিয়াছে। তবে কোনটি কোন্ সময় কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে কার্যকর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

রাষ্ট্রের সূত্রপাত তমসাচ্ছন্ন

কি কি শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে

১। রক্তের সম্বন্ধ (Kinship) : রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস সুরু করিতে পারা যায় সমাজে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাতের পর হইতে। পারিবারিক জীবনের পূর্বে মানুষ যখন সাম্যবাদী সমাজজীবন যাপন করিত তখন তাহারা আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে নাই। অথচ আনুগত্যই প্রকৃত সংঘবদ্ধ জীবনের মূলসূত্র। মানুষের আনুগত্য প্রথম প্রকাশ পায় পারিবারিক জীবনে। পরিবারের প্রতি স্নেহ-মমতা

মানুষ পরিবারের মধ্যেই আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে

* "The State is the product of continuous development of human society."

প্রদর্শনের সংগে সংগে তাহারা গৃহকর্তারও আদেশপালন করিতে শিখে। এইভাবে আনুগত্যের ভিত্তিতে নূতন সংঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়।

পরিবারের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একই পরিবার বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়া গেল। তখন আর গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইল না। এই অবস্থাতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল আত্মীয়তা-বোধ। বিভিন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ একই পূর্বপুরুষের বংশধর হইয়া নিজেদের পরিচয় দিত বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রহিল। এইভাবে এক নূতন গোষ্ঠীজীবনের* (a new clan life) উদ্ভব হইল। এইরূপ গোষ্ঠীর উপর সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি বা গোষ্ঠীপ্রধান। সকলে তাঁহার আদেশপালন করিয়া চলিত।

গোষ্ঠীজীবনে আত্মীয়তাবোধ সংহতি বজায় রাখিয়াছিল

২। ধর্ম (Religion): রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধের সমসাময়িক অপর একটি শক্তি যাহা প্রাচীন সমাজের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল তাহা হইল ধর্ম। গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন আত্মীয়তা-বোধ শিথিল হইয়া পড়িল তখন ধর্ম না থাকিলে সমাজ যে ধ্বংস হইত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ধর্ম সমাজকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়াছিল

ধর্ম বলিতে তখনকার দিনের লোক বুঝিত প্রাকৃতিক পূজা এবং পূর্বপুরুষদের পূজা। আদিম মানুষ ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঋতু-পরিবর্তন, জীব ও উদ্ভিদের মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনাকে দেবতার কোপ বলিয়া মনে করিত; এবং ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বজ্রের দেবতা, ঋতুর দেবতা, সংহারের দেবতা প্রভৃতির পূজা করিত। অপরদিকে তাহারা আবার বিশ্বাস করিত যে যত রোগশোক, দুঃখদুর্দশা পূর্বপুরুষদেরই অভিশাপের ফল। সুতরাং পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যও তাহারা তাঁহাদের পূজা করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল পূজাপার্বণ সম্পাদিত হইত গোষ্ঠীপতির অধীনে। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রবীণদের মাধ্যমেই পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং বজ্র ঋতু সংহার প্রভৃতির দেবতাগণকে কিভাবে সন্তুষ্ট করিতে হয় তাহা একমাত্র প্রবীণরাই জানেন। গোষ্ঠীপতিই ছিলেন প্রবীণতম ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে অমান্য করার অর্থ পূর্বপুরুষদের আত্মা ও অসংখ্য দেবদেবীর অভিশাপ কুড়ানো। এইভাবে গোষ্ঠীপতি সমাজের প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বীকৃত হইয়া ধর্মাচরণ পরিচালনা করিতে লাগিলেন; সংগে সংগে আবার সমাজকে শাসনও করিতে লাগিলেন। সকল সময়ই যে গোষ্ঠীপতি সমাজ শাসন করিতেন তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে লোকে গোষ্ঠীপতি অপেক্ষা যাদুকরদেরই বশ্যতা স্বীকার করিত, কারণ যাদুবিদ্যার সাহায্যে তাহারা লোককে ভীত করিতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, ক্রমে সমাজের উপর গোষ্ঠীপতি বা যাদুকরের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

* নূতন গোষ্ঠীজীবন বলা হইতেছে, কারণ আদিমতম যুগে যখন পরিবারের উদ্ভব হয় নাই তখনও মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিত। এই অবস্থাকে 'পুরাতন গোষ্ঠীজীবন' বলা হয়।

৩। যুদ্ধবিগ্রহ (War): যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে খাদ্যাহরণের যুগ হইতে মানুষ যখন পশুচারণ যুগে গিয়া পড়িল তখন হইতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। পরবর্তী—অর্থাৎ, কৃষিকর্মের যুগে এই সংঘর্ষের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। সুবিধা পাইলেই এক দল অপর দলের উপর আক্রমণ করিয়া উহার কৃষিজমি, ফসল, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিত। অনেক সময় আবার যাহারা পরাজিত হইত তাহাদের বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসেও পরিণত করিত। ফলে জনগোষ্ঠীকে সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা একদিন আক্রমণ করিতেও শিখিল; এবং ফলে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া দাড়াইল সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধবিগ্রহ সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় যুদ্ধনায়কের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব করা ছাড়াও তিনি শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার তিনি সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের কাজও করিতেন। এইরূপে যুদ্ধনায়ক সমাজের সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়া একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

রাষ্ট্র-গঠনে যুদ্ধবিগ্রহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

৪। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (Private Property): ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বে আইনকানুনের কোন প্রয়োজন ছিল না; তখন সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী। আহৃত খাদ্য সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত; শিশু ছিল জনগোষ্ঠীর সকলের শিশু। তারপর মানুষ যখন পশুচারণ জীবনে গিয়া উপনীত হইল তখন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের জন্য* চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকারের সম্পর্কে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে এই সম্পর্কে প্রণীত হইল বিভিন্ন নিয়মকানুন ও প্রথা। পশুচারণ জীবনের পর মানুষ যখন কৃষি-জীবন সুরু করিল তখন ভূমি ও ক্রীতদাসকেই প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হইতে লাগিল। কৃষি-জীবনে অধিকতর ধনবৈষম্যের জন্য ধনসম্পত্তি লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য আরও অধিকসংখ্যক নিয়মকানুন প্রণীত হইল। তারপর পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাণিজ্যের প্রসার হইল; এবং ইহার ফলে উদ্ভব হইল বণিকশ্রেণীর। বণিকশ্রেণীর স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে এক জনগোষ্ঠীকে অপরাপর জনগোষ্ঠীর সহিত বিরোধ সংযত করিতে হইত; অনেক সময় আবার বিরোধে লিপ্ত হইতে হইত।

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলে

এইভাবে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন ও যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলে। সরকার সৃষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ হইল।

৫। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political Consciousness): রাষ্ট্রের ক্রম-বিকাশে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। আদিমকাল

* ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

হইতেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিলেও তাহারা সংঘবদ্ধতার আদর্শ সম্বন্ধে গুরু হইতেই সচেতন ছিল না। প্রথমে আত্মীয়তাবোধ ও ধর্মের বন্ধন গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন লোকে ভয়ে বা অপরের অনুকরণে গোষ্ঠীপতিদের আনুগত্য স্বীকার করিত। এই অন্ধ আনুগত্যের যুগকে 'রাষ্ট্রনৈতিক অবচেতনা'র যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। গোষ্ঠী ক্রমশ সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে এই অবচেতনা ঘুচিয়া গেল। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাতের ফলে মানুষ দলীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল—

প্রথমে ছিল অন্ধ আনুগত্য
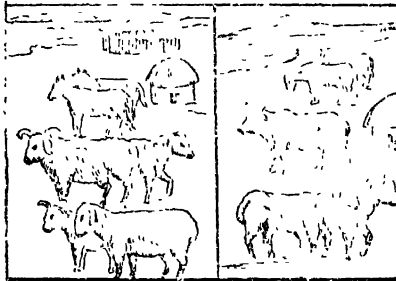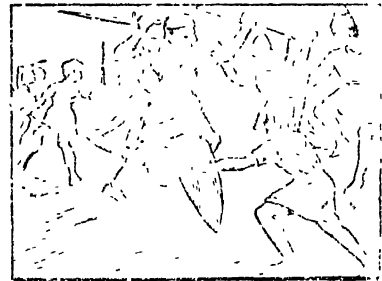
বুঝিল ঐক্য ব্যতীত সংঘর্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থাকে 'রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ' (dawn of political consciousness) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে লোকে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে যুদ্ধনায়কদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল; এবং ইহার ফলে যুদ্ধনায়কদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকৃত হইল।

পরে আনুগত্য সচেতন হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব করিল

শান্তির সময়েও লোকে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণ এবং বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য সচেতনভাবে ঐ যুদ্ধনায়কদের অনুগত হইয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজার আসনে বসিলেন এবং প্রজার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজার অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের সার্থকতা: ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু-না কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, রক্তের সম্বন্ধ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের নির্দেশ করে; দ্বিতীয়ত, ধর্ম ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ইংগিত দেয়; তৃতীয়ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্র গঠনে বলপ্রয়োগের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে; এবং চতুর্থত, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সামাজিক চুক্তিবাদের আভাস দেয়। এই কারণগুলির কোনটিই এককভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে না, অথচ ইহাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে অল্পবিস্তর সাহায্য করিয়াছে। ঐতিহাসিক মতবাদের সার্থকতা এইখানে যে অন্য কোন মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সকল কারণের ব্যাখ্যা সমভাবে করে নাই; তাহারা একটিমাত্র শক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ভুল করিয়াছে।

একমাত্র এই মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের সকল কারণকে সমভাবে ব্যাখ্যা করে

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কল্পনাপ্রসূত মতবাদ, (২) বৈজ্ঞানিক মতবাদ। একমাত্র ঐতিহাসিক মতবাদই বৈজ্ঞানিক মতবাদ, অন্য সকল মতবাদই কল্পনাপ্রসূত।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ: এই মতবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি; এই কারণে তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী।

এই মতবাদ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করে বলিয়া এবং অলৌকিক ও অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবুও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ: একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে—ইহাই এই মতবাদের মূল বক্তব্য।

এই মতবাদ আংশিকভাবে সত্য। বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবের অন্যতম কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নয়।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ: এই দুই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ: রাষ্ট্রের কল্পনাপ্রসূত মতবাদসমূহের মধ্যে এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনজন দার্শনিক—হবস, লক ও রুশো ইহাকে পরিস্ফুট করেন।

এই তিনজন দার্শনিকের মতেই রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র মধ্যে বাস করিত। কিন্তু এই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনজন দার্শনিক পরস্পরের সহিত একমত নহেন। প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল—(১) হবসের মতে, বর্বরসুলভ অবস্থা; (২) লকের মতে, শান্তি ও শুভেচ্ছার রাজ্য কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থা; এবং (৩) রুশোর মতে, মর্ত্যের স্বর্গ।

ফলে (১) হবসের মতে, মানুষ দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল; (২) লকের মতে, অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র-গঠন করিয়াছিল; (৩) রুশোর মতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাহার কল্পিত মর্ত্যের স্বর্গে সুখশান্তি বিনষ্ট হওয়ায় মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র-গঠন করিয়াছিল পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে। রুশোর মতবাদে রাজার স্থান নাই।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক মতবাদ বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। ইহা গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ: ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমানের জটিল রাষ্ট্র-রূপ ধারণ করিয়াছে। এই ক্রমবিকাশে প্রধানত পাঁচটি শক্তি—যথা, রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি কোন পর্যায়ে এবং কি পরিমাণে কার্য করিয়াছে তাহা অবশ্য নির্ণয় করা কঠিন।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss critically the Social Contract Theory of the origin of the State.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা কর।

2. Explain the Social Contract Theory about the origin of the State.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত: ১নং প্রশ্ন হইতে এই প্রশ্নটির পার্থক্য আছে। ১নং প্রশ্নের উত্তরে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উভয়ই করিতে হইবে। কিন্তু এই ২নং প্রশ্নের উত্তরে মতবাদের শুধু ব্যাখ্যা করিতে হইবে—সমালোচনা করিতে হইবে না।...... (৩২-৩৪ পৃঃ)]

3. "The State is the result of brute force." Discuss the validity of this theory of the origin of the State.

"পাশবিক বলপ্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই মতবাদ কতদূর সত্য আলোচনা কর।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—

"The State is the result of the subjugation of the weaker by the stronger." Do you accept this theory of the origin of the State? Give reasons for your answer.

"বলবান কর্তৃক দুর্বলকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করার ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য কি না? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

4. "Briefly describe the Historical Theory of the origin of the State."
(C. U. 1956)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—

"The State is neither a divine institution nor a deliberate human contrivance; it has come into existence as the result of natural evolution." Discuss this statement and indicate the process through which the State has come into existence.
(C. U. 1944)

"রাষ্ট্র ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে, মানুষের কলাকৌশলের ফলও নহে; ইহা স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর এবং যেভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

[৩৬-৪০ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

(Ends and Functions of the State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (Ends of the State) : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একমত হইতে পারেন নাই। এ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণের মতে, রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ; সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই ইহার অস্তিত্ব। রাষ্ট্র ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুন্দর জীবন উপলব্ধি করা বা আত্মবিকাশ কোনমতেই সম্ভব নয়। অপরদিকে আবার কাহারও কাহারও ধারণায়, রাষ্ট্র অকল্যাণকর অথচ অপরিহার্য সংগঠন মাত্র। মানুষের প্রকৃতিগত ত্রুটির জন্যই ইহার অস্তিত্ব। মানুষের মধ্যে যদি হিংসা, দ্বেষ, পরদ্রব্য-লোভ, হত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি না থাকিত তবে ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন হইত না। বস্তুত, এগুলিকে দমিত রাখাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই দুই বিপরীত চরম মতবাদের মধ্যপন্থাও অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে ইহাদের মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ : (ক) আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সুশৃংখল সমাজজীবন সম্ভব করা; (খ) জনসাধারণের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের পথ সুগম করা; এবং (গ) মানব-সভ্যতার উন্নয়নে সহায়তা করিয়া বিশ্বজনীন উদ্দেশ্যসাধন করা।

ল্যাস্কি প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণের মত হইল যে, উপরি-উক্তভাবে চিরকাল ও সবদেশের লোকের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় না। দেশ ও কাল ভেদে রাষ্ট্রেরও উদ্দেশ্যের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

তবুও সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুন্দর জীবন সম্ভব করা। এই সুন্দর জীবন সকলেরই সুন্দর জীবন—ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের নয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন—শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসাধন নয়। জনসাধারণের কল্যাণের পরিবর্তে রাষ্ট্র যদি কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বার্থসাধনে নিয়োজিত থাকে তবে ঐ রাষ্ট্র উদ্দেশ্যচ্যুত হইয়াছে—আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এ্যারিস্টটল এরূপ রাষ্ট্রকে 'বিকৃত রাষ্ট্র' (Perverted State) আখ্যা দিয়াছিলেন।

তবুও বলা যায়, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবাদ (Theories of State Functions) :— সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিলে প্রশ্ন উঠে যে, কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে? দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মোটেই একমত নহেন। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে—(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং (খ) সমাজকল্যাণবাদ।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) : যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ঠ—ইহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য। এই প্রকার শাসনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণের মতে, ইহা রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। একমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণ দ্বারাই রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্যসাধন—অর্থাৎ সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে পারে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণ যখন রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য তখন উহার কার্যাবলী হইবে ন্যূনতম—সংখ্যায় মাত্র দুইটি : (১) দেশে শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা, এবং (২) বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইল পুলিসের ন্যায় রক্ষাকার্য মাত্র। এইজন্য এই প্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র (Police State) বলা হয়।

নানা দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিই তাহার নিজের ভালমন্দ সম্যকভাবে বুঝিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন

জীববিজ্ঞানের দিক হইতে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া দুর্বলকে রক্ষা করা অযৌক্তিক ও অন্যায়।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে; এবং ইহাতে ভোগ্যদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হয়। সুতরাং সমাজও বিশেষ লাভবান হয়।

অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শান্তিশৃংখলা রক্ষা ছাড়া সমাজজীবনের অন্যান্য অংশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বলিতে বুঝায় সরকারী হস্তক্ষেপ ; এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা বলিতে বুঝায় দলীয় সরকার (Party Government) কর্তৃক পরিচালনা। দলীয় সরকারের নীতি প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আবার সরকার বিভিন্ন নীতি লইয়া পরীক্ষাও চালায়। ফলে জনসাধারণের জীবন হইয়া উঠে ব্যতিব্যস্ত ; ইহাতে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে।

কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিগুলি উপেক্ষণীয় নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তিনটি প্রধান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—যথা, (ক) প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের ভালমন্দ বুঝিবার সমান ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি আছে ; (খ) প্রত্যেকেরই নিজের মংগল-

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটি :

সাধনের জন্য অপরের সমান ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে, এবং (গ) প্রত্যেকে নিজ নিজ অভাবপূরণের চেষ্টা করিলে সমাজের কল্যাণ আপনা আপনিই সাধিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচকগণ দেখাইয়াছেন যে এই তিনটি ধারণাই ভ্রান্ত। প্রথমত, প্রত্যেকেরই ভালমন্দ বুঝিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে মানুষ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যে ধারণাগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত

কর্মপ্রচেষ্টায় অনেক সময় অন্ধভাবে অগ্রসর হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য-সংকটের সময় খাদ্য-মজুতের উল্লেখ করিতে পারা যায়। খাদ্য-সংকট দেখা দিলে লোকে অন্ধভাবে খাদ্য-মজুতে অগ্রসর হইয়া অবস্থাকে আরও সংগীন করিয়া তুলে। সুতরাং অন্ধ কর্মপ্রচেষ্টাকে হাত ধরিয়া ঠিক পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজন হইল রাষ্ট্রের। আমাদের উদাহরণে রাষ্ট্র ব্যক্তির খাদ্য-মজুতের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া খাদ্য-সংকটকে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকেরই নিজের মংগলসাধনের জন্য অপরের সমান ক্ষমতা থাকে না। কারখানার মালিকের সহিত দরাদরি করিয়া শ্রমিক কখনই শ্রমের উচিত মূল্য আদায় করিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে শ্রমিকের 'দরাদরির অবাধ স্বাধীনতা'র অর্থ তাহার পক্ষে অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকিবার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ স্বাধীনতাকে আদর্শ হিসাবে কখনই সমর্থন করিতে পারা যায় না। অতএব, রাষ্ট্রের কর্তব্য মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া তাহাকে ন্যায্য মজুরি প্রদান করিতে বাধ্য করা।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকেই তাহার ব্যক্তিগত অভাবপূরণের চেষ্টা করিলেই যে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। সকলেই খাদ্য-মজুতের চেষ্টা করিলে দেশে খাদ্য-সংকট দূর না হইয়া বরং বিপরীত ফলই হইবে।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকা রহিয়াছে

উপসংহার : রাষ্ট্র যে মাত্র পুলিস-সংগঠন নহে, একথা বর্তমানে সকলেই স্বীকার করেন। রক্ষাকার্য ছাড়াও এমন কতকগুলি কার্য আছে যাহা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বা বেকার-সমস্যার সমাধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবশ্য একটি বিশেষ গুণও আছে। ইহা ব্যক্তিকে

আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেয়, তাহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ভরশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র কখনই সমাজজীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে থাকে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা। ইহার ফলে ক্ষমতাবান ও ধনীরা বিশেষ সুবিধাভোগ করে এবং দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তি পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। মালিকের সহিত দরাদরির সমান ক্ষমতা থাকে না বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী সর্বদা বেকারাবস্থা, অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে বাস করে। দ্বিতীয়ত, এই কারণে সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকে। তৃতীয়ত, অবাধ প্রতিযোগিতার জন্য কাম্য ভোগ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হইবে—এরূপ ধারণা করা ভুল। পুঁজিপতি মাত্র সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদনে মনোযোগী হয় যাহাতে তাহার মুনাফার সম্ভাবনা অধিক থাকে। ঔষধের পরিবর্তে যদি মদ্য বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ হয় তবে সে ঔষধের কারখানা তুলিয়া দিয়া মদ্যের কারখানাই খুলিবে। ফলে ঔষধের উৎপাদন কমিবে কিন্তু সমাজে মদ্যপানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের প্রতিবাদে সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই সকল কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে যে কর্মনুখর রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করা হয়, তাহাই সংক্ষেপে সমাজতন্ত্রবাদ নামে অভিহিত। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের পক্ষে শুধু রক্ষাকার্য বা পুলিসের কার্য সম্পাদন করিলেই চলিবে না; রাষ্ট্রকে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা নিজ মালিকানায় আনিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উহার পরিচালনার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ইহাতে যথেষ্ট উৎপাদন হইবে, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পাইবে এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিবে। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইবে। অবশ্য ইহাতেও যদি সমাজজীবনে পূর্ণ মংগলের পদধ্বনি শুনা না যায়, তবে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-জীবনের অন্যান্য দিকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। মোটকথা, সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সীমা নির্দেশ করা যায় না। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা নাই, শোষণ নাই, মানুষে মানুষে ভেদ নাই—যেখানে সকলেই সুখী, সকলেই তৃপ্ত। এইরূপ সমাজ-গঠনের জন্য প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিকের (friend, guide and philosopher) কাজ করিতে হইবে। এইরূপ সমাজে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা কিছু থাকিবে না; সে হইবে সমাজ বা রাষ্ট্রেরই একটি অংশ। সমাজের মংগলকেই সে নিজের মংগল বলিয়া গণ্য করিবে এবং ঐ

সমাজতন্ত্রবাদ কাহাকে বলে

সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংকুচিত করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে

সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ঃ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন

মংগলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইল সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ (Forms of Socialism): সমাজতন্ত্রের মূলনীতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও উহা উপলব্ধির পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার গঠন সম্পর্কে সমর্থকগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে—যথা, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ।

সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের কারণ

(ক) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism): রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ সমষ্টিবাদ (Collectivism) নামেও অভিহিত। ইহা ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিয়া সমাজে সাম্য ও সার্বিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। বলা হয় ভারত এইরূপ সমাজতন্ত্রবাদের পথেই চলিয়াছে।

(খ) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism): সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রবাদের এই রূপ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। রাষ্ট্র গঠিত হইবে শ্রমিক এবং যাহারা উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে—অর্থাৎ, জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া। এইরূপ পুনর্গঠিত রাষ্ট্র দেশরক্ষা, করধার্য প্রভৃতি সাধারণ কার্য সম্পাদন করিবে মাত্র—উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে শ্রমিক-সংঘগুলির (Trade Unions or Trade Guilds) দ্বারা। তবে যাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করে (consumers) তাহাদেরও সংঘ থাকিবে। শ্রমিক-সংঘগুলি ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের এই সকল সংঘের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিবে।

(গ) যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism): যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ কিন্তু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিপ্লবের পক্ষপাতী। ধর্মঘট, ধ্বংসাত্মক কার্য (sabotage) প্রভৃতির দ্বারা অর্থনৈতিক বিপ্লব আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে পারে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইলে পর শ্রমিক-সংঘগুলি মিলিয়া একটি শ্রমিক সমবায় (Confederation of Labour) গঠন করিবে। ইহা রেলপথ, ডাক-বিভাগ, মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কার্য সম্পাদন করিবে। বিশেষ বিশেষ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা থাকিবে বিশেষ বিশেষ শ্রমিক-সংঘের হস্তে—যথা, বয়ন-শিল্প পরিচালনা করিবে বয়ন শ্রমিক-সংঘ, ইত্যাদি।

(ঘ) সাম্যবাদ (Communism): সাম্যবাদও রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিতে চায়। সাম্যবাদিগণের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের উদ্দেশ্যে ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিলে শোষণের অবসান ঘটিবে, এবং ফলে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজনীয়তা ফুরাইবে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক যুগের পরই

রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয় না। ধনতন্ত্রের পর আসে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র কিন্তু আপনা হইতেই আসে না; ইহা আনয়ন করে সর্বহারার বিপ্লব (Proletarian Revolution)। সমাজতান্ত্রিক যুগে পূর্বেকার পুঁজিপতি এবং জমিদার, জোতদার, মহাজনগণ নানারূপ ছলে-বলে-কৌশলে আবার পূর্বতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চায়। ইহাদের বাধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির। তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে থাকিলে একদিন এরূপ অবস্থা আসিবে যখন প্রত্যেকে সমাজের জন্য আনন্দ সহকারেই সাধ্যমত কার্য করিবে এবং প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্যাদি পাইবে। এই অবস্থায় শোষণ ও মুনাফা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। সুতরাং রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (The State will wither away), এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে সাম্যবাদী সমাজ (Communistic Society)।

রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই সাম্যবাদের উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা: সমাজতন্ত্রবাদ অসাম্য ও অন্যায়ের জগতে সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ যে কোনমতেই সমর্থনীয় নয়, ধনী-দরিদ্র ও শ্রমিক-মালিকের ব্যবধান যে কোনমতেই সুন্দর সমাজ-জীবনের সহায়ক নহে—ইহাই সমাজতন্ত্রবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদ নির্দেশ দেয় যে প্রকৃতির সকল দানে (in all gifts of Nature) সাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হউক, মানুষে মানুষে সাম্য স্থাপিত হউক, এবং সকল শোষণের অবসান ঘটিয়া মানুষ পরস্পরের সহিত সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হউক। অতএব, আদর্শের জগতে সমাজতন্ত্রবাদের স্থান অতি উচ্চে।

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ অতি উচ্চ

কিন্তু প্রশ্ন হইল, ইহা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে সামগ্রিক কাজকর্ম (collective activity) এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে যে তাহা কোন রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে মানুষের প্রকৃতি বিচারে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ ভুল করিয়াছেন। মানুষ সমাজের জন্য আনন্দ সহকারে কার্য করিতে চায় না—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই চায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

কিন্তু প্রশ্ন যে ইহা কি সম্ভব?

আরও বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রবাদ কাম্যও নহে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় বলিয়া জীবন হইয়া উঠে যান্ত্রিক। পরিচালকগণের কোন মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া উৎকোচ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে; পরিচালকগণ পদে পদে ভুল করিতে পারেন; ইত্যাদি।

এবং ইহা কি কাম্য?

উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা প্রায় সর্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই আজ অল্পবিস্তর সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে।

উপসংহার

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of Modern States) :

পূর্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিত

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হইত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা। তারপর হইতে নানা কারণের জন্য দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারই প্রধান।

বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজ-তন্ত্রবাদ উভয়ই রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করে

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রসারিত হইলেও পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যায় এখনও নগণ্য। অধিকাংশ রাষ্ট্রই বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজ-তন্ত্রবাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া তাহাদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে গতি হইল কর্মক্ষেত্র প্রসার করার দিকে। এই সকল আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়: (১) মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য, (২) গৌণ বা ইচ্ছামূলক কার্য বা কর্তব্য।

মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য হইল সেইগুলি যেগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র সম্পাদন না করিয়া পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া

সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্য

রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে পুলিস-বাহিনী, স্থল-নৌ-বিমানবাহিনী প্রভৃতি রক্ষিবাহিনী পোষণ করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলার জন্য শুধু পুলিসবাহিনী পোষণই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে গঠিত জনসমাজ। সুতরাং আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন আছে। আইন না থাকিলে শুধু পুলিসবাহিনী দ্বারা শান্তিরক্ষা অরাজকতারই নামান্তর। আইন প্রণয়নের সংগে সংগে বিচার-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করাও প্রয়োজনীয়। সুতরাং রাষ্ট্রকে ইহাও করিতে হয়।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র রক্ষিবাহিনী পোষণ করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ (diplomatic relations) স্থাপন করিতে হয়, পররাষ্ট্র-নীতি (foreign policy) নির্ধারণ করিতে হয়, ইত্যাদি।

গৌণ কার্য হইল সেগুলি যাহা রাষ্ট্র সম্পাদন করে নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া নয়—সমাজজীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্যই। শুধু আভ্যন্তরীণ

সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত গৌণ কার্যাবলী

শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াই পূর্ণাংগ সমাজজীবন গঠন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রয়োজন হয় অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের। এই কর্তব্যগুলি প্রধানত হইল: (১) শিক্ষার বিস্তার করা, (২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা, (৩) ডাক-বিভাগ, রেলপথ, বিমানপথ পরিচালনা করা, (৪) পরিবহণের অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, (৫) মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা (currency and credit) পরিচালনা করা,

(৬) ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজন হইলে সরকারী কর্তৃত্বে আনয়ন করা, (৭) শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করা, (৮) বেকার-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া, (৯) কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা, (১০) কতকগুলি বিশেষ শিল্প-গঠন এবং ইহাদের পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র
ঊনবিংশ শতাব্দী
ব্রিটেন
আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা
পুলিস
বিচার
জেল
দেশরক্ষা

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র
বিংশ শতাব্দী
শান্তিরক্ষা
অন্যান্য
দেশরক্ষা
জনস্বাস্থ্য
কৃষি-উন্নয়ন
আর্থনৈতিক পরিকল্পনা
শিল্প
শিক্ষা
যানবাহন
ডাক ও তার

উন্নততর রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়। ইহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার (planning) দ্বারা দেশের সর্বাংগীন উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে এবং দেশের সম্পদ ও সুযোগ যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্যভাবে বন্টিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে।

উপরি-উক্ত গৌণ কর্তব্যগুলির অধিকাংশই সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি দ্বারা নির্দিষ্ট। এইগুলি ব্যক্তির হস্তে রাখিলে সমাজের মংগল হইতে পারে না, কারণ ব্যক্তি হয় সঠিকভাবে ইহার পরিচালনা করিতে পারে না—না-হয় অধিক মুনাফার লোভে সমাজের ক্ষতি করে। যে-সকল রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদকে পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই অথচ উপরি-উক্ত গৌণ কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিতেছে, তাহাদিগকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Social Welfare States) বলা হয়। সমাজের সেবার উদ্দেশ্যে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র দিন দিন প্রসার করিয়া চলিয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র

ভারতের উদাহরণ লইয়া সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান (Constitution) অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারত অন্যতম সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র

সংবিধানের এই নির্দেশের রূপদান করিবার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক

পরিকল্পনা (economic planning) গ্রহণ করিয়াছে। সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, রাষ্ট্রের মালিকানায় নূতন নূতন শিল্পের পত্তন, পরিবহণের উন্নতিবিধান, কৃষি ও কুটির শিল্পের পুনর্গঠন প্রভৃতি এই পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া ভারত-রাষ্ট্র অন্যান্য দিকেও হস্তক্ষেপ করিতেছে। খাদ্যাভাবের সময় বিদেশ হইতে খাদ্য আনয়ন করিতেছে, খাদ্য নিয়ন্ত্রণের (food rationing) ব্যবস্থা করিতেছে, ইত্যাদি। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিসাধনের দিকেও রাষ্ট্র দৃষ্টি দিতেছে।

বলা হয়, এইভাবে সমাজ-কল্যাণের পথ বাহিয়া ভারত সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ (The Individual in relation to Society) : রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ যে মতবাদ দুইটির আলোচনা করা হইল, উহারা আবার ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ লইয়াও মতবাদ। বস্তুত, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্বন্ধ—এই তিনটি বিষয়ই পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রই সমাজের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই ইহার লক্ষ্য।* কিভাবে রাষ্ট্র এই লক্ষ্য সাধন করিবে—অর্থাৎ, কিভাবে রাষ্ট্র সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে—তাহাই হইল ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রশ্ন। রাষ্ট্র যদি সমাজজীবনকে অধিক নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে উহা হইবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র; অপরদিকে যদি অধিক নিয়ন্ত্রণই উহার নীতি হয় তবে উহা হইবে সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র। যাহা হউক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধের মূল নীতিগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে :

সমাজ ব্যতীত মানুষ যখন বাঁচিতে পারে না, বাঁচিতে পারিলেও যখন বাঁচার মত বাঁচিতে পারে না—তখন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে বাধ্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, মানুষ পশুর মত জীবনযাপন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; সে চায় সুখী হইয়া বাঁচিতে, কাম্য জীবনযাপন করিতে। এই উদ্দেশ্যে সে আদিমতম কাল হইতেই সমাজকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং মানুষের উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার জন্য সমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ

সমাজে বসবাস করিতে হইলে কতকগুলি সামাজিক নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। অনেকের মতে, এই সকল নিয়মকানুন ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ইহাদের জন্য ব্যক্তি অব্যাহতভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করিতে পারে

* ১৮ পৃষ্ঠা।

না বলিয়া সে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। এই মত অবশ্য বর্তমানে মানিয়া লওয়া হয় না। ব্যক্তিকে লইয়া এবং ব্যক্তির জন্যই সমাজ। সুতরাং প্রকৃত সামাজিক কল্যাণ কখনই ব্যক্তি-কল্যাণের বিরোধী হইতে পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তির কল্যাণের সমন্বয়ই সামাজিক কল্যাণ; এবং এই সমন্বয়সাধনের জন্যই রাষ্ট্র সমাজে আইনকানুন চালু রাখে। ইহাতে হয়ত কয়েকজনের যথেচ্ছাচারিতা ব্যাহত হয়; কিন্তু কাহারও প্রকৃত কল্যাণের হানি ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, আইনকানুনের ফলে দস্যুতস্কর ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের ক্ষতি হয়, কারণ তাহারা অপরের দ্রব্য জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে পারে না। অপরদিকে আইনকানুনের জন্য তাহাদের ভালও হয়, কারণ তাহাদের সম্পত্তিও কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। সুতরাং সামাজিক নিয়মকানুন সকলেরই কল্যাণসাধন করে, সকলেরই আত্মবিকাশে সহায়তা করে। নিয়মকানুন আছে বলিয়াই লোকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের গুণাবলী বিকশিত করিতে পারে। যেমন, ভাল ফুটবল খেলোয়াড় অপরের সহিত মিলিত হইয়া দল গঠন করিলে তবেই তাহার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে—অর্থাৎ, আত্মবিকাশ করিতে পারে।

সামাজিক নিয়মকানুন ব্যক্তি-কল্যাণের প্রতিবন্ধক নহে

আত্মবিকাশ ও প্রকৃত কল্যাণের জন্য প্রয়োজন অপরের সহযোগিতার। সহযোগিতা তখনই পাওয়া যায় যখন লোকে বুঝে যে সমাজ তাহারই জন্য এবং সমাজের কল্যাণে তাহারও কল্যাণ। লোকের মনে এইরূপ ধারণা গাথিয়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সাম্য ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার। অর্থাৎ, সকলকেই আত্মবিকাশের বা নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সমান সুযোগসুবিধা দিতে হইবে। ধনী-দরিদ্রে, অভিজাত-অভাজনে ভেদ করিলে চলিবে না।

সামাজিক নিয়মকানুন উন্নততর জীবনযাত্রা সম্ভব করে

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করাই সভ্য সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য; ইহার জন্যই আবার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বারট্রাণ্ড রাসেলের (Bertrand Russell) ভাষায় বলা যায়, সমাজ যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদের সুন্দর জীবন সম্ভব করাই উহার উদ্দেশ্য। কোন্ সমাজ এই উদ্দেশ্য কতটা সাধন করিতে পারিয়াছে তাহাই উহার উৎকর্ষের মাপকাঠি।

সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশে নিযুক্ত থাকে বলিয়া ব্যক্তিরও কর্তব্য রহিয়াছে সর্বদা সমাজের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকিবার। সমাজের কল্যাণ বলিতে সমষ্টিগত কল্যাণই বুঝায়। এই সমষ্টিগত কল্যাণসাধনের দ্বারাই সমাজ-ব্যবস্থা সুন্দর ও সুগঠিত হইয়া ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম হইতে পারে। সুতরাং নিজ মংগলের জন্যই ব্যক্তিকে সমষ্টিগত কল্যাণসাধনের দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

সমাজের কল্যাণসাধন ব্যক্তির দায়িত্ব

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। তবুও বলা যায় যে সামগ্রিক কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে সে-সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে: (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং (খ) সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্র অকল্যাণকর অথচ অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান, মানুষের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্যই ইহার অস্তিত্ব। সুতরাং এই ত্রুটি দূরিকরণের জন্য যাহা প্রয়োজন রাষ্ট্র মাত্র সেই কার্যই সম্পাদন করিবে—কোনমতে অন্যভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতায় বা স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে এরূপ প্রয়োজনীয় কার্য হইবে সংখ্যায় দুইটি—(ক) আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা, এবং (খ) বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য পুলিসের ন্যায় রক্ষাকার্য মাত্র। এইরূপ রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র বলা হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে (১) মনস্তত্ত্বের দিক হইতে, (২) জীববিজ্ঞানের দিক হইতে, (৩) অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে, এবং (৪) অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করা হইয়াছে। ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেই সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজের সকলে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন নয় বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা পুলিসী রাষ্ট্র সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। যাহা হউক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে যথেষ্ট বলিষ্ঠতা আছে—ইহা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করার বিরুদ্ধে।

সমাজতন্ত্রবাদ: সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে দেখা যায় ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা। ইহাতে কতিপয় লোক বিশেষ সুখভোগ করে এবং দরিদ্র জনসাধারণ পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। এইরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম।

সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কতটা প্রসারিত করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই করিয়া কিছু বলা যায় না। সামগ্রিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং দার্শনিকের কাজ করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে—যথা (১) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, (২) যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ, (৩) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, এবং (৪) সাম্যবাদ।

সমাজতন্ত্রবাদ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হইল—(১) ইহা কি সম্ভব? এবং (২) ইহা কি কাম্য? সমালোচকগণ বলেন ইহা সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। তবুও দেখা যায় যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী: বর্তমান সময়ে অধিকাংশ রাষ্ট্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র যে যে কার্য সম্পাদন করে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) অপরিহার্য কার্য, এবং (২) ইচ্ছাধীন কার্য। রাষ্ট্র অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পাদন করে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য; কিন্তু ইচ্ছাধীন কার্য সম্পাদন করে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে। এইজন্য এই সকল রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র বলা হয়। ভারত এই সকল সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের অন্যতম।

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ: রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নির্ধারণের প্রশ্ন আবার ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়েরও প্রশ্ন, কারণ রাষ্ট্রই সমাজের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রই সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সামাজিক নিয়মকানুন ব্যক্তি-কল্যাণের সহায়ক, পরিপন্থী নহে। ব্যক্তির কল্যাণসাধন করা সমাজের এবং উহার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের আদর্শ। এই কারণে ব্যক্তির পক্ষেও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিবার দায়িত্ব রহিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What should, in your opinion, be the functions of a modern State ?

তোমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি ?

[ইংগিত : পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ—কোনটাই কাম্য নহে। সুতরাং এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ, সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলি যে যে কার্য সম্পাদন করে আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে সেই সকল কার্য সম্পাদন করা উচিত মনে হয়।......(৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)]

2 Briefly describe the functions of a modern State. Would you regard India as a modern State according to this concept ?

কোন আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এই বর্ণনা অনুসারে তুমি কি ভারতকে অন্যতম আধুনিক রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিবে ?

3. What are the essential functions of Government ? Why do Socialists want an enlargement of these functions ?

রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী কি কি ? সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে চায় কেন ?

[ইংগিত : সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র বা সরকারের অপরিহার্য কার্য হইল দুইটি : (১) দেশে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, এবং (২) প্রতিরক্ষা। শান্তিশৃংখলা রক্ষার জন্য সরকারকে পুলিস-বাহিনী পোষণ করিতে হয়, আইন প্রণয়ন ও বিচারের ব্যবস্থা করিতে হয়। অপরদিকে প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী পোষণ ছাড়াও সরকারকে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করিতে হয়, ইত্যাদি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে সরকার মাত্র এই সকল অপরিহার্য কার্য সম্পাদন করিয়াই চলিবে। ইহার ফলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যও সংরক্ষিত হইবে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণও সাধিত হইবে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, মাত্র এই প্রকার পুলিসী কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র বা সরকার সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে পারে না। সুতরাং সরকারের অপরিহার্য কার্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সরকারকে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত ব্যক্তি-জীবনের অন্যান্য দিকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। • (৪৩, ৪৫ এবং ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)]

4. Explain the Socialistic Theory of State functions.

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

5. What are the functions of Social Welfare States ?

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি ?

6. Write notes on : (*a*) Individualism, (*b*) Socialism, (*c*) Social Welfare States.

টীকা লিখ : (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, (খ) সমাজতন্ত্রবাদ, (গ) সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র।

7. What is meant by Socialism ? Give your arguments for and against it.

সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝায় ? উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে তোমার যুক্তিগুলি প্রদর্শন কর।

8. Explain the relation between Individual and Society

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

পৌরবিজ্ঞানে সমাজ ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করা হয়। এ-পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল; এখন ইহাদের সভ্য নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

নাগরিক (Citizen): শব্দগত অর্থ ধরিলে নাগরিক হইল নগরবাসী। ইহার কারণ প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র (City States)। সুতরাং যাহারা নগর-রাষ্ট্রের সভ্য ছিল তাহাদেরই 'নাগরিক' বলা হইত। কিন্তু নাগরিকতা সম্পর্কে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগের ধারণা এবং প্রাচীন গ্রীসের ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে নগর ও রাষ্ট্র অভিন্ন থাকিলেও নগরের সকল অধিবাসীই নাগরিক-অধিকার ভোগ করিত না। রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক বলিয়া পরিগণিত তাহারাই, যাহারা নগর-রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রত্যেক গ্রীক নাগরিকই প্রত্যক্ষ-ভাবে একাধারে সৈন্য, বিচারক ও শাসনকার্য-পরিচালনাকারী সংস্থার সদস্য ছিল। তাই গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের মতে, যাহারা শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মাত্র তাহারাই নাগরিক। এই সকল নাগরিক মাত্র শাসন-পরিচালনার কার্যেই ব্যাপৃত থাকিত, আর তাহাদের জীবনধারণের দ্রব্যাদি যোগাইত অসংখ্য ক্রীতদাস। উহারা জনসংখ্যার অধিকাংশ হইলেও শাসনকার্যে উহাদের কোন অংশ ছিল না; সুতরাং উহারা নাগরিক-পর্যায়ভুক্ত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টপূর্ব ৪১৩ অব্দে এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে ১ লক্ষ ১৫ হাজার পুরুষের মধ্যে ৫০ হাজার ছিল ক্রীতদাস এবং এথেনীয় নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার; আর বাকী ১৫ হাজার ছিল বিদেশীয়।

শব্দগত অর্থে নাগরিক নগরবাসী মাত্র

প্রাচীনকালে নাগরিক-অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল

রোমক সভ্যতার যুগেও নাগরিক-অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫১ অব্দে দেখা যায় প্যাট্রিসিয়ান (Patricians) বা অভিজাতশ্রেণীই মাত্র নাগরিক-অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ ছিল; অন্যান্যরা নাগরিকতা পাইত না। পরে অবশ্য নাগরিক-অধিকার কেবলমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। সামন্তপ্রথার যুগে (Feudal Age) অধিকাংশ লোক ছিল ভূমিদাস (serfs); এবং তাহাদের কোনপ্রকার নাগরিক-অধিকার ছিল না।

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে ইহা সম্প্রসারিত হয়

তারপর সমাজ-বিবর্তনের ফলে দাসত্বপ্রথা ও সামন্তযুগের অবসান ঘটে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র প্রবর্তিত হয়। ফলে নাগরিক-অধিকার সম্প্রসারিত হয়।

বর্তমানে সাধারণত 'নাগরিক' বলিতে সেই সকল ব্যক্তিদের বুঝায় যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ফলে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলারের (Mr. Justice Miller) ভাষায় বলা যায়: "নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সভ্য। তাহারা সেই জনসমষ্টি যাহার দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করে বা সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে।"

আধুনিক অর্থে নাগরিক

নাগরিকের আইনগত সংজ্ঞা

কে বা কাহারা নাগরিক হইবে এবং কোন্ কোন সর্তে নাগরিক-অধিকার অর্জিত হইবে, কোন্ কোন কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটিবে ইত্যাদি বিষয় প্রত্যেক রাষ্ট্র আইন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন রূপে পরিগণিত হইবার ফলে তাহারা কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হয় যাহা বিদেশীয়রা পায় না। এগুলিকে সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (political rights) বলা হয়। অবশ্য সকল নাগরিকের সকল সময় পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাও থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবি[illegible] অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার নির্বাচনে ভোটদানে সমর্থ হয় না; এবং ২৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না। আবার যে-ব্যক্তি বিকৃত মস্তিষ্ক অথবা যে বেআইনী বা দুর্নীতিপরায়ণ কার্যে লিপ্ত হয় তাহাকে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়। যাহা হউক, বলা যাইতে পারে যে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ হইল নাগরিকের লক্ষণ।

আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকের লক্ষণ

অধিকার দায়িত্ব বা কর্তব্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে কতকগুলি সুযোগসুবিধা বা অধিকার ভোগ করে তেমনি আবার তাহাকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকের আইনগত ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ইঁহারা অধিকারের সহিত নাগরিকের কর্তব্যের উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে নাগরিককে অন্যান্য কর্তব্যপালনের দ্বারাও সমাজের মংগলসাধনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। নাগরিকের এই লক্ষণ বিচার করিয়া শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নাগরিকের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন: "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভ্য এবং রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়া পূর্ণভাবে আত্মবিকাশের জন্য সচেষ্ট এবং সমাজের সর্বাধিক মংগল সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহাকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায়।" লণ্ডন

আধুনিক বা পূর্ণ অর্থে নাগরিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যাস্কিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নাগরিকতা হইল সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য নিজের জ্ঞানসম্পন্ন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ।"* সমাজের মধ্যে ব্যক্তির প্রকাশ ; সমাজকে অবলম্বন করিয়াই সে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, আত্মবিকাশ ত দূরের কথা। সমাজের কল্যাণ ব্যক্তি-কল্যাণের সূচনা করে। তাই নাগরিককে সমাজের মংগলে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার বিচারবুদ্ধি যাহাতে জ্ঞানপ্রসূত হয় তাহাও দেখিতে হইবে, কারণ অশিক্ষিত অজ্ঞের বিচারবুদ্ধি সমাজ-কল্যাণের সহায়ক হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি সমাজের জটিল সমস্যা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না।

স্বজাতীয় ও প্রজা (Nationals and Subjects)ঃ নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে 'স্বজাতীয়' ও 'প্রজা' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

'স্বজাতীয়' শব্দের দুই অর্থ

'স্বজাতীয়' (Nationals) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত সমস্যা প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ একই জাতির (Nation) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অর্থে বিভিন্ন দেশে যে ভারতীয়গণ বসবাস করে তাহাদের আমরা আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে (International Law) 'স্বজাতীয়' শব্দটিকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই দ্বিতীয় অর্থে কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদানকারী সমস্ত ব্যক্তিকেই ঐ রাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলা হয়। কিন্তু স্বজাতীয় হইলেই যে নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই।

সকল স্বজাতীয় নাগরিক-মর্যাদা নাও পাইতে পারে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা দেওয়া হয় না, যদিও তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। বর্তমানেও তাহাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়, নাগরিক বলিয়া নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সকল নাগরিকই স্বজাতীয়, কিন্তু সকল স্বজাতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে।

'প্রজা' (Subjects) শব্দটির মধ্যেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। অনেক লেখক আছেন যাঁহারা ভোটাধিকারী নয় এমন সমস্ত স্বজাতীয়কে 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী।

'প্রজা' শব্দের অর্থ

এই অর্থ গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের সভ্যদের দুই ভাগ করিয়া যাহারা পূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাহাদের নাগরিক আখ্যা দিতে হয়, আর যাহারা ঐ অধিকার আংশিকভাবে

---

* "Citizenship is the contribution of one's instructed judgement to the public good."

ভোগ করে তাহাদের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কিন্তু প্রজা শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া অনেকে ইহার ব্যবহারে আপত্তি করেন। তাই গণতান্ত্রিক দেশসমূহে রাষ্ট্র-সভ্যদের 'নাগরিক' আখ্যাই দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল ভারতীয়ই ভারতের নাগরিক—কেহই ভারত-রাষ্ট্রের 'প্রজা' নহে।

বর্তমানে শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি

নাগরিক ও বিদেশীয় (Citizens and Aliens): নাগরিক রাষ্ট্রের আপন জন। আপন জন হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে। রাষ্ট্রও তাহাকে নাগরিক হিসাবে কতকগুলি সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করে। অপরদিকে বিদেশীয় (Aliens) হইল অপর কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা সেই রাষ্ট্রের আপন জন। সুতরাং তাহার স্থায়ী আনুগত্য হইল নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাস করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি অস্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়, সম্পূর্ণভাবে ঐ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হয় এবং সাধারণ আইনকানুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে—অর্থাৎ, বিদেশী রাষ্ট্রের আইনকানুন ভংগ করিলে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকের মত তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আবার বিদেশীয়কে নাগরিকের মতই কর প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। তবে নাগরিকদের মত তাহাকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করানো যায় না।

স্থায়ী আনুগত্য ও পূর্ণ অধিকারের ভোগ নাগরিকের লক্ষণ

বিদেশীয়ের আনুগত্য কিন্তু অস্থায়ী

বিদেশীয় হইলেও কতকগুলি বিষয়ে নাগরিকের মত তাহাকে অধিকার প্রদান করা হয়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এই অধিকারের পরিমাণ ক্রমশই সুপ্রসারিত হইতেছে। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিদেশীয়ের অন্যতম স্বীকৃত অধিকার। অপরাপর সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রেও নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় না। আমাদের দেশে নাগরিকের জন্য সংবিধানে যে-সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিদেশীয়রা সমভাবে ভোগ করিতে পারে। যেমন, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি ভারতে অবস্থানকারী বিদেশীয় ভারতীয় নাগরিকের মতই ভোগ করিয়া থাকে।

ফলে অধিকারও আংশিক

তবে ইহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে

কিন্তু বিদেশীয়দের সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। এই অধিকার একমাত্র নাগরিকরাই ভোগ করিতে পারে। ভারতে একমাত্র নাগরিকরাই আইন-সভার সদস্য নির্বাচন করিবার অথবা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার অধিকার ভোগ করে; ভারতে অবস্থানকারী কোন বিদেশীয়, যেমন রুশ বা চৈনিক বা মার্কিন নাগরিক,

ঐ অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই আবার জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে বিদেশীয়দের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত অথবা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে বিদেশীয়ের মর্যাদা ও অধিকার সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে এখনও পার্থক্য রহিয়াছে।

নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া

বিদেশীয়দের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যাহারা বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাসের অভিপ্রায়ে অবস্থান করে তাহাদিগকে বসবাসকারী বিদেশীয় (resident or domiciled aliens) আখ্যা দেওয়া হয়। আর যাহারা সাময়িকভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করে তাহাদিগকে অ-বসবাসকারী বিদেশীয় (non-resident aliens or temporary sojourners) বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর বিদেশীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রে স্থাবর সম্পত্তি ভোগদখল করিবার অধিকার একমাত্র বসবাসকারী বিদেশীয়দেরই থাকে।

বিদেশীয়দের শ্রেণীবিভাগ : ১। বসবাসকারী ও অ বসবাসকারী বিদেশীয়

অন্য আর একভাবেও বিদেশীয়দের ভাগ করা যায়। বিদেশীয়রা মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় (friendly aliens) অথবা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy aliens) হইতে পারে। যুদ্ধ বাধিলে শত্রুপক্ষীয় বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়; আর যে-সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সংগ্রাম থাকে না তাহাদের নাগরিকদের মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের সহিত অপর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সংগ্রাম বাধিলে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে; অপরপক্ষে, ভারতের সহিত সংগ্রাম নাই এমন সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় থাকিবে।

২। মিত্রভাবাপন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয়

এই আলোচনা প্রসংগে ভারতে কে বা কাহারা বিদেশীয় তাহা জানা প্রয়োজন। স্বভাবতই মনে হইতে পারে যে, অপরাপর সকল রাষ্ট্রের নাগরিকই ভারতের নিকট বিদেশীয়। এই ধারণা কিন্তু ভুল। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি যে-কোন রাষ্ট্রকে 'বিদেশী রাষ্ট্র নয়' বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৫০ সালে এইরূপ একটি ঘোষণার দ্বারা যুক্তরাজ্য (U. K.), কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে ভারতের নিকট বিদেশী রাষ্ট্র নয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সুতরাং এই সকল দেশের নাগরিকগণও ভারতের নিকট বিদেশীয় নয়। ১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইনে* এই সকল ব্যক্তিকে 'কমনওয়েলথ নাগরিকে'র মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে; এবং ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে ইহাদের সকল নাগরিক-অধিকার প্রদান করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন,

ভারতে বিদেশীয় কাহারা

* Citizenship Act, 1955

সোবিয়েত ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কমনওয়েলথের বহির্ভূত দেশগুলির নাগরিকেরা ভারতের নিকট বিদেশীয়। অপরদিকে যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নাগরিক ভারতের নিকট বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত নয়।

নাগরিকতা অর্জন (Acquisition of Citizenship): প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়: (১) জন্ম দ্বারা (by birth or descent), এবং (২) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন দ্বারা (by formal grant or conferment by the State)। যাহারা প্রথম উপায়ে নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদিগকে জন্মসূত্রে নাগরিক (natural-born citizens) এবং যাহারা রাষ্ট্রের অনুমোদন দ্বারা নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয় তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (naturalized citizens) বলা হয়।

নাগরিকতা অর্জনের দুইটি পদ্ধতি

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Birth): জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের আবার দুইটি মূলনীতি আছে—রক্তের সম্পর্ক-নীতি (*Jus Sanguinis*) এবং জন্মস্থান-নীতি (*Jus Soli* or *Jus Loci*)। রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে শিশু যে-স্থানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে পিতামাতার নাগরিকতা পাইবে—অর্থাৎ, পিতামাতা যে-রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়মানুসারে ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে ভারতীয় নাগরিকতা পাইবে। অপরদিকে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে শিশু যে-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে—তাহার পিতামাতা যে-রাষ্ট্রেরই নাগরিক হউন না কেন। যেমন, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়ম অনুসারে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতের অভ্যন্তরে যে-ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। কোন জাহাজে বা বিমানে জন্ম হইলে ঐ জাহাজ বা বিমান যে-রাষ্ট্রের সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্ম হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে পররাষ্ট্রদূতের ক্ষেত্রে জন্মস্থান-নীতি প্রযুক্ত হয় না। যেমন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভারতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জন্মস্থান-নীতি তাহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুইটি পদ্ধতি:

১। রক্তের সম্পর্ক-নীতি

২। জন্মস্থান-নীতি

উপরি-উক্ত দুইটি নীতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই নীতি অনুসৃত হইত। পরে রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতার* ধারণা প্রসারের সংগে জন্মস্থান-নীতিও গৃহীত হয়। যাহা হউক, পৃথিবীর সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয় না; অনেক রাষ্ট্রই উভয় নীতিকে অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়া থাকে।

* ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারত রক্তের সম্পর্ক-নীতি ও জন্মস্থান-নীতি উভয়কেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অনুরূপভাবে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি নীতিই প্রচলিত। জন্মস্থান-নীতি অনুসরণের ফলে যাহারা ইংলণ্ড কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে তাহারা স্বভাবতই ঐ দেশের নাগরিকতা পায়; আবার বিদেশে অবস্থানকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের কোন নাগরিকের সন্তানসন্ততি হইলে সে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের নাগরিকতা অর্জন করে।

অনেক রাষ্ট্র উভয় নীতিই অনুসরণ করে

এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করার ফলে অসংগতি ও বিরোধের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকের সন্তান যদি ইংলণ্ডের সীমানার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে সে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে ইংলণ্ডের, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এইভাবে দ্বৈত নাগরিকতার (double citizenship) সমস্যা দেখা দিবে—একই ব্যক্তি দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইবার অধিকারী হইবে; এবং দুই রাষ্ট্রই তাহাকে আপন নাগরিক বলিয়া দাবি করিলে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিবে।

উভয় নীতি অনুসরণের ফলে দ্বৈত নাগরিকতার উদ্ভব হয়

অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে মীমাংসার ব্যবস্থাও আছে। সাধারণত এরূপ নাগরিক রাষ্ট্রের সীমানার বাহিরে থাকিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তিকে আপন জন বলিয়া দাবি করে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার দ্বৈত নাগরিকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাকে যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাছিয়া লওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়। ভারতীয় আইনের এক নিয়ম অনুযায়ী কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একই সময় ভারত এবং অপর কোন দেশের নাগরিক হইলে সে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চুক্তির সাহায্যেও দ্বৈত নাগরিকতার সমস্যার সমাধান করা হয়।

দ্বৈত নাগরিকতার সমস্যার মীমাংসা

এখন প্রশ্ন হইল, জন্মস্থান-নীতি ও রক্তের সম্পর্ক-নীতির মধ্যে কোন্‌টি যুক্তিসংগত? গুণাগুণ বিচার করিয়া বলা যায় যে, দুইটি নীতির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। জন্মস্থান-নীতির একমাত্র গুণ হইল যে জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য দিক হইতে দেখিলে জন্মস্থান-নীতি অযৌক্তিক ও অকাম্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা এবং উহার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা নির্ধারণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তিসংগত নহে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ভ্রাম্যমাণ মার্কিন নাগরিকের তিনটি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে জন্মস্থান-নীতি অনুযায়ী ঐ তিনটি সন্তান ভিন্ন ভিন্ন তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিবে। এইরূপ অদ্ভুত অবস্থাকে কোনপ্রকারে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

এই দুই নীতির কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে

রক্তের সম্পর্ক-নীতি এইদিক হইতে ত্রুটিবিহীন। কিন্তু জন্মস্থান যেমন সহজেই নির্ণয় করা যায়, পিতার নাগরিকতা অনেক ক্ষেত্রে অত সহজে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে রক্তের সম্পর্ক-নীতিকেই অপেক্ষাকৃত সমীচীন এবং স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

তবে রক্তের সম্পর্ক নীতিই অপেক্ষাকৃত সমীচীন

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Naturalisation) : অনুমোদন দ্বারা বিদেশীয় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। 'অনুমোদন' (naturalisation) শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয়, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, সরকারী চাকরিতে প্রবেশ, দীর্ঘকাল বসবাস প্রভৃতি উপায়ের যে-কোনটিকে অবলম্বন করিয়া পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। মোটকথা, যে-কোন ভাবেই বিদেশীয়কে নাগরিকতা প্রদান করা হইলে ব্যাপক অর্থে তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (naturalised citizen) বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে অনুমোদন

ইংলণ্ড ভারত প্রভৃতি দেশে 'অনুমোদন' শব্দটি সাধারণত সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সংকীর্ণ অর্থে 'অনুমোদন' বলিতে বুঝায় কতকগুলি নির্দিষ্ট সর্ত পূরণ করিয়া শাসন বিভাগ বা আদালতের মাধ্যমে পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। এইভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার জন্য বিদেশীয়কে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; তাহাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকতার জন্য আবেদন করিতে হয়; এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট সর্ত পালন করিলে তবেই আবেদন করিতে পারা যায়। এই সকল সর্তের মধ্যে 'বসবাসের সর্ত' (condition of domicile) প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত। ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী অন্তত ৪ বৎসর কাল বসবাস করিয়াছে বা অন্তত ঐ সময়ের জন্য সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছে অথবা অংশত বসবাস ও অংশত সরকারী চাকরিতে তাহার ৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ তাহাকে দিতে হইবে। বসবাসের সর্ত ব্যতীত আবেদনকারীকে অন্যান্য সর্ত পূরণ করিতে হইতে পারে। যেমন, ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী বিদেশীয়কে প্রমাণ করিতে হইবে—প্রথমত, সে সচ্চরিত্র; দ্বিতীয়ত, নাগরিকতা প্রদত্ত হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় তাহার আছে; এবং তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষার যে-কোন একটিতে সে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন।

সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন

এই প্রকার অনুমোদন বিভিন্ন সর্তাধীন

অনুমোদনের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ (grand) বা আংশিক (partial) হইতে পারে। যে-সকল রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদাভেদ করা হয় না, সেই সকল রাষ্ট্রে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা

পূর্ণ নাগরিকতা। ভারত ও ইংলণ্ডে অনুমোদন-পদ্ধতির সাহায্যে এইরূপ পূর্ণ নাগরিকতা অর্জিত হয়। অর্থাৎ, এই দুইটি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিক ও অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক একই মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কয়েক ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়। যেমন, কোন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে পারে না। একমাত্র জন্মসূত্রে নাগরিকরাই ঐ দুই পদ অলংকৃত করিতে পারে। এইভাবে যেখানে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিককে সকল প্রকার অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয় না সেখানে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন অপূর্ণাংগ বা আংশিক।

পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকতা অর্জন

বলা হইয়াছে, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদন ছাড়াও বিবাহ, সম্পত্তি-ক্রয়, সরকারী চাকরি প্রভৃতি দ্বারাও পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া যায়। ইহার উপর ভারত ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নিয়ম আছে যে, অন্য কোন দেশ ঐ সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ দেশের অধিবাসীদের নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতি দ্বারা নাগরিকতা অর্জনকে অনেক সময় 'সমষ্টিগত অনুমোদনকরণ' (group naturalisation) বলা হয়। এই পদ্ধতিতেই গোয়ার ভূতপূর্ব পর্তুগীজ নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমষ্টিগত অনুমোদন

নাগরিকতার বিলোপ (Loss or Termination of Citizenship):

নাগরিকতার আবার অবসানও ঘটিতে পারে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এখানে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমত, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। যেমন, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক বা স্বজাতীয় হয় তাহা হইলে সে ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের মত কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবে। তৃতীয়ত, অনেক সময় আবার অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করিয়াও কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাইতে পারে। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ রাষ্ট্রে অনুপস্থিতি, অসদুপায়ে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন, দেশদ্রোহিতা, বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি বা সম্মান গ্রহণ প্রভৃতি কারণেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকতার অবসান ঘটিয়া থাকে। এইভাবে নাগরিকতার অবসান ঘটিলে ব্যক্তি নাগরিকতাহীন বা রাষ্ট্রহীন (Stateless) হইয়া পড়ে।

ক। নাগরিকতা পরিত্যাগ করা যায়

খ। এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইলে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবসান ঘটে

গ। নানা কারণে ব্যক্তি নাগরিকতা-হীনও হইতে পারে

ভারতীয় নাগরিকতা (Indian Citizenship): 'স্বজাতীয় ও প্রজা'র আলোচনা প্রসংগে ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল ভারতীয় ভারতের নাগরিক—কেহই ভারত-রাষ্ট্রের প্রজা নহে। এখন সংবিধানের নাগরিকতার অন্যান্য ধারা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে প্রথমেই দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। (১) সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কে বিস্তৃত-ভাবে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে পার্লামেণ্ট বা সংসদের হস্তে। মোটা-মুটিভাবে সংবিধান প্রবর্তনের সময়—অর্থাৎ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে; এবং ১৯৫৫ সালে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন দ্বারা এ-সম্পর্কে বিস্তৃততর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতীয় নাগরিকতার দুইটি বৈশিষ্ট্য:

১। এই সম্বন্ধে সংবিধান বিস্তৃত ব্যবস্থা করে নাই

(২) অনেক যুক্তরাষ্ট্রে 'দ্বৈত নাগরিকতা'র* ব্যবস্থা থাকে; ভারতে কিন্তু ইহা নাই। সকল নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক এবং একশ্রেণীভুক্ত। রাজ্যগুলির কোন পৃথক নাগরিকতা নাই।

২। ভারতে 'দ্বৈত নাগরিকতা' নাই

সংবিধান অনুসারে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা অর্জিত হইয়াছে:

(ক) জন্মস্থান, বসবাস এবং স্থায়ী বসবাসগত পদ্ধতি: যাহারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা তাহারা যদি ভারতে জন্মিয়া থাকে অথবা তাহাদের পিতামাতার মধ্যে কেহ যদি ভারতে জন্মিয়া থাকেন তবে তাহারা ভারতের নাগরিক। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর ঠিক আগে যাহারা ভারতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তবে তাহারাও ভারতের নাগরিক।

নাগরিকতা অর্জনের তিনটি পদ্ধতি:

সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে যে স্থায়ী বসবাস (domicile) নাগরিকতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য সর্ত। কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি নিজে বা তাহার পিতা বা মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ অথবা সেই ব্যক্তি সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ বৎসরকাল ভারতে বসবাস করিয়া থাকিলেই চলিবে না। নাগরিকতা অর্জনের জন্য এই সর্তগুলির যে-কোন একটির সহিত চাই স্থায়ী বসবাসের অভিপ্রায়।

(খ) পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কিত পদ্ধতি: ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পূর্বে যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহারা যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকে, অথবা তাহাদের পিতামাতা পিতামহ পিতামহী মাতামহ মাতামহীর মধ্যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকেন, এবং তাহারা যদি ভারতে আসিবার পর হইতে এ-দেশে সাধারণত বসবাস করিয়া থাকে, তবে তাহারা ভারতের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে।

---

* 'দ্বৈত নাগরিকতা' বলিতে বুঝায় একই সংগে যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যের নাগরিকতা—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা ও নিউইয়র্ক রাজ্যের নাগরিকতা।

১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই বা ঐ তারিখের পর উপরি-উক্ত ধরনের যে-সকল ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছে তাহারা যদি ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে ভারত সরকারের কোন যোগ্য কর্মচারীর নিকট আবেদন করিবার পর উক্ত কর্মচারী কর্তৃক নাগরিক বলিয়া যদি পরিগণিত হইয়া থাকে, তবে তাহারাও ভারতের নাগরিক। কিন্তু আবেদন করিবার পূর্বে অন্তত ছয় মাস ভারতে বসবাস করিতে হইবে।

(গ) ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী মূলত ভারতীয় ব্যক্তিদের নাগরিক-অধিকার : ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশে যে-সমস্ত ভারতীয় আছে তাহারাও ভারতের নাগরিক হইতে পারে, যদি তাহারা অথবা তাহাদের পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ বা পিতামহী অথবা মাতামহ বা মাতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি তাহারা যে-দেশে বাস করিতেছে সেই দেশস্থ ভারত সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন : নাগরিকতা সম্পর্কে সংবিধানের উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই সংবিধান প্রবর্তনের সময় নাগরিকতা অর্জন করিবার মূল নিয়মাবলী মাত্র ; এগুলি ভারতীয় নাগরিকতার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে না। এই পূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকতা কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে অর্জন করা যাইতে পারে এবং কি কি কারণে উহার অবসান ঘটে তাহা এই আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান আইনটিতে জন্মগতভাবে, রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে, রেজিস্ট্রিকরণের সাহায্যে, দেশীয়করণের মাধ্যমে এবং কোন ভূখণ্ডের ভারতভুক্তির ফলে সংবিধান প্রবর্তনের পর নাগরিকতাপ্রাপ্তির ব্যাপক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আইনে নাগরিকতার বিলোপ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা আছে। পরিশেষে, ইহাতে কমনওয়েলথ্ নাগরিকতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে ভারত পারস্পরিক ভিত্তিতে কমনওয়েলথ্ দেশগুলির নাগরিকগণকে ভারতীয় নাগরিক যে-সকল অধিকার ভোগ করে তাহা প্রদান করিতে পারে।

এই আইনে নাগরিকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে

সংক্ষিপ্তসার

শব্দগত অর্থে নাগরিক বলিতে বুঝায় নগরবাসী মাত্র। প্রাচীনকালে শাসনকার্য পরিচালনাকারী ব্যক্তিদেরই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। বর্তমানে আইনের দৃষ্টিতে (১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, (২) রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার, এবং (৩) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারভোগকে নাগরিকের লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়।

নাগরিক-অধিকার ভোগ করে বলিয়া তাহাকে কর্তব্যও পালন করিতে হয়, কারণ কর্তব্য অধিকারের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কর্তব্যপালনের জন্য নাগরিককে উপযুক্ত হইতে হইবে।

স্বজাতীয় ও প্রজা : নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে 'স্বজাতীয়' ও 'প্রজা' শব্দ দুইটি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। স্বজাতীয় বলিতে রাষ্ট্রের সকল 'আপন জন'কে বুঝায়। সুতরাং সকল নাগরিকই স্বজাতীয়, কিন্তু সকল স্বজাতীয় নাগরিক নাও হইতে পারে।

অনেক সময় যাহারা পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এরূপ স্বজাতীয়দের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু 'প্রজা' শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া বর্তমানে ইহার ব্যবহারে অনেকে আপত্তি করেন।

নাগরিক ও বিদেশীয়: নাগরিক বিদেশীয় হইতে পৃথক। নাগরিকের আনুগত্য স্থায়ী এবং তাহার অধিকার পূর্ণ—অপরদিকে বিদেশীয়ের আনুগত্য অস্থায়ী এবং অধিকারও আংশিক; নাগরিকের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আছে, বিদেশীয়ের নাই।

বিদেশীয়রা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা, (ক) বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়; (খ) শত্রুভাবাপন্ন ও মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয়।

নাগরিকতা অর্জন: নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি প্রধানত দুইটি—(১) জন্ম, এবং (২) অনুমোদন।

জন্ম দ্বারা আবার দুইভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায়—(ক) রক্তের সম্পর্কে, এবং (খ) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া। এই নীতি দুইটি যথাক্রমে রক্তের সম্পর্ক-নীতি এবং জন্মস্থান-নীতি নামে পরিচিত। নীতি দুইটির কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে; তবে রক্তের সম্পর্ক-নীতিই অধিকতর সমীচীন।

অনুমোদন দ্বারা যাহারা নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়। 'অনুমোদন' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অনুমোদন আবার পূর্ণ বা আংশিক হয়।

নাগরিকতার বিলোপ: নাগরিকতার বিলোপ বলিতে নাগরিকতার পরিবর্তন মাত্র বুঝাইতে পারে। (১) নাগরিক স্বেচ্ছায় কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে; (২) এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিলে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবসান ঘটে; এবং (৩) নানা কারণে ব্যক্তি নাগরিকতাহীনও হইতে পারে।

ভারতীয় নাগরিকতা: সংবিধান অনুসারে সকল ভারতীয়ই ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক, কেহই প্রজা নহে।

ভারতীয় নাগরিকতার দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে: ১। সংবিধান নাগরিকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করে নাই; এ-বিষয়ে পার্লামেন্টের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে। ২। ভারতে দ্বৈত নাগরিকতা নাই। সংবিধান অনুসারে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি হইল তিনটি: ১। জন্মস্থান, বসবাস এবং স্থায়ী বসবাসগত পদ্ধতি; ২। পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কে পদ্ধতি; ৩। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে পদ্ধতি।

ইহা ব্যতীত ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন দ্বারা জন্মগতভাবে, রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে, রেজিস্ট্রিকরণের সাহায্যে, দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতাপ্রাপ্তির ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ আইন অনুসারে পারস্পরিক ভিত্তিতে ভারত কমনওয়েলথ্ দেশগুলির নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিক-অধিকার প্রদান করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define 'Citizen'. Distinguish a Citizen from an Alien.

'নাগরিকে'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

2. Describe the different ways of acquiring citizenship. How is citizenship lost?

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন প্রকৃতির পদ্ধতির বর্ণনা কর। নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় কিভাবে?

3. Distinguish between citizens and aliens. How can citizenship be acquired?

নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে নাগরিকতা অর্জিত হয়?

4. Distinguish between: (*a*) Resident Aliens and Non-resident Aliens; (*b*) Friendly Aliens and Enemy Aliens.

পার্থক্য নির্দেশ কর: (ক) বসবাসকারী বিদেশীয় এবং অ-বসবাসকারী বিদেশীয়; (খ) মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় এবং শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয়।

5. Describe the different methods by which Indian citizenship can be acquired.

যে যে পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করা যায় তাহা বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

(Rights and Duties of Citizens)

অধিকার কাহাকে বলে? (What are Rights): সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী হইতে চায়—তাহার আত্মশক্তিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। জনসাধারণের এই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া সুন্দর নাগরিক জীবন সম্ভব করাই সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি সুযোগসুবিধার। যেমন সাধারণের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য চাই শিক্ষার সুযোগ। ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য এই সকল প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলিয়া অভিহিত হয়।

অধিকার বলিতে আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা বুঝায়

প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের নিকট হইতে এই সকল সুযোগসুবিধা বা অধিকার দাবি করিতে পারে; আর রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হইল ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য অধিকার-গুলি প্রদান করিয়া নাগরিককে সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন গঠন করিতে সহায়তা করা। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা অধিকারের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিতে পারি: যে-সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত মানুষ তাহার পূর্ণ উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইতে পারে না তাহাদিগকে অধিকার বলা হয়।

অধিকারের সংজ্ঞা

অধিকারের বৈশিষ্ট্য: এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, অধিকারের উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগপ্রদান।

১। অধিকার আত্ম-বিকাশে সহায়তা করে

দ্বিতীয়ত, অধিকার হইল সামাজিক সুযোগসুবিধা—অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে থাকিয়াই মানুষ অধিকার ভোগ করিতে পারে, সমাজের বাহিরে নয়। সমাজবদ্ধ লোকের পারস্পরিক স্বীকৃত দাবিই অধিকার। যেমন, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের জন্য আমি দাবি করি যে অপরে আমার গতিবিধিতে বাধা দিবে না; অপরেও সেইরূপ দাবি করে যে আমি

২। সমাজের বাহিরে অধিকার থাকিতে পারে না

তাহাদের গতিবিধিতে বাধা দিব না। কিন্তু সমাজ-বহির্ভূত লোক কাহার উপর দাবি করিবে? এবং কেই বা তাহার দাবি মানিয়া লইবে? সুতরাং সমাজ-বহির্ভূত অধিকার বলিয়া কিছুই নাই।

তৃতীয়ত, অধিকার চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে ইহারাও পরিবর্তিত হইতেছে। অন্যভাবে বলা যায়, অধিকার স্থান কাল এবং অবস্থার আপেক্ষিক। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। আদিম যুগে মানুষ যখন বনেজংগলে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন শ্রমিক-সংঘ গড়িবার অধিকারের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু বর্তমান শিল্প-সভ্যতার যুগে শ্রমিক-সংঘ গঠনের অধিকার শ্রমিকদের একটি বিশেষ মূল্যবান অধিকার। আবার এক সময় ছিল যখন কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা একটি প্রধান অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইত; এখন কিন্তু সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা প্রবর্তিত হইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

৩। অধিকার স্থান ও কালের আপেক্ষিক

উদাহরণ

চতুর্থত, অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা হইলেও বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই সুযোগসুবিধা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলেই সমানভাবে এই সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে। যখন এইরূপ ঘটে তখনই অধিকার হইয়া উঠে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক সার্থক অধিকার। এইরূপ সার্থক অধিকারের প্রতিষ্ঠাই গণতান্ত্রিক আদর্শ।

৪। অধিকার সকলের জন্য

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights): নানাভাবে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। আইনগত অধিকার আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—প্রধানত এই দুই প্রকারের হয়। ইহার উপর সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। নিম্নে অধিকারের এই সকল শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

(১) নৈতিক ও আইনগত অধিকার (Moral and Legal Rights): সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবিকেই 'নৈতিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইরূপ অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি বা আইনের সমর্থন থাকে না। ফলে, নৈতিক অধিকার ভংগ করা হইলে আইনসংগতভাবে প্রতিকারবিধানের কোন উপায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সমাজে মাতাপিতার নৈতিক অধিকার রহিয়াছে বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের নিকট হইতে আদর-যত্ন পাইবার। এখন কোন সন্তান যদি এই কর্তব্যপালন না করে তবে মাতাপিতা আইনে তাহার প্রতিবিধান পাইতে পারেন না।

নৈতিক অধিকার সমাজের ন্যায়বোধ দ্বারা সমর্থিত

আইনগত অধিকার হইল আইনানুমোদিত পারস্পরিক দাবি। আইন দ্বারা অনুমোদিত বলিয়া রাষ্ট্র ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ইহা ভংগ করা হইলে আইন-আদালতে প্রতিকার পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেকের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার আছে। কেহ অপরের জীবননাশ করিলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

আইনগত অধিকারের ভিত্তি রাষ্ট্রের আইন

আইনগত অধিকারই নাগরিকের প্রকৃত অধিকার। নৈতিক অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকে না বলিয়া নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে ইহা লইয়া বড় একটা আলোচনা করা হয় না।

(২) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights): বলা হইয়াছে যে, আইনগত অধিকারকে সাধারণত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সামাজিক অধিকার বলিতে বুঝায় সেই অধিকারগুলিকে যাহা ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুসভ্য সামাজিক জীবনযাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জীবনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার, পরিবার-গঠনের অধিকার প্রভৃতি এই সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এগুলি না থাকিলে মানুষের জীবন বন্য পশুর জীবনে পরিণত হইয়া পড়িত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ-গ্রহণ করিবার সুযোগ। বর্তমান যুগে নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত।

সামাজিক অধিকার কাহাকে বলে

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কাহাকে বলে

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার: দেশ ও কাল ভেদে সামাজিক অধিকারের পার্থক্য ঘটিয়া থাকিলেও কতকগুলি সামাজিক অধিকারকে মৌলিক হিসাবে গণ্য করা হয়। এই অধিকারগুলি না থাকিলে মানুষের পক্ষে সামাজিক জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে। নিম্নে মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির বর্ণনা করা হইল:

(ক) জীবনের অধিকার (Right to Life): জীবনের অধিকার বলিতে বাঁচিয়া থাকার অধিকার বুঝায়। ইহা মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। এই অধিকার না থাকিলে অন্য সকল অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমাকে যদি কেহ যখন ইচ্ছা হত্যা করিতে পারে এবং তাহার যদি কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমার পক্ষে সমাজে বা রাষ্ট্রে বাস করা অর্থহীন। এই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পুলিসবাহিনী, বিচার-ব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে। হব্‌সের মতে, এইভাবে জীবনরক্ষার সুযোগ লাভ করিবার জন্যই আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। আত্মরক্ষার অধিকার জীবনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করাও অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

(খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty): "জীবনধারণই যথেষ্ট নয়, ধারণোপযোগী জীবনও হওয়া প্রয়োজন।" মানুষ সামাজিক জীব। সে চায়

পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে। এইজন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন স্বাধীনতার অধিকারের। স্বাধীনতার অধিকার বলিতে দুইটি অধিকার বুঝায়—যথা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিবার অধিকার বা সুযোগ। এই অধিকার থাকিলেই মানুষ নিজেকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে। বর্তমানে কেহই যে দাসত্বপ্রথা সমর্থন করে না, তাহার কারণ হইল দাসত্ব মানুষের স্বাধীনতার বিরোধী। স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া ইহা সুন্দর ও সার্থক জীবনেরও পরিপন্থী। স্বাধীনতার অধিকার অব্যাহত অধিকার নয়। যুদ্ধের সময়ে বা আভ্যন্তরীণ শৃংখলার প্রয়োজনে ইহা কিছুটা খর্ব করা যাইতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকার বলিতে কি বুঝায়

(গ) স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার (Right to Freedom of Opinion): গণতন্ত্র হইল সেই শাসন-ব্যবস্থা যাহা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত-গঠনের জন্য প্রয়োজন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের—(ক) বাক্-স্বাধীনতা, এবং (খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। মৌখিক ও লিখিতভাবে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাহাদের অধিবাসীদের দিয়াছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনই অবাধ স্বাধীনতা হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া মানহানিকর, দুর্নীতিমূলক, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক প্রভৃতি কোনকিছু বলিবার বা লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময় বা জনস্বার্থের খাতিরে ইহা খর্বও করা যাইতে পারে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): জীবনধারণের জন্য কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপরিহার্য এবং ইহা ভোগ ও অর্জনের ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিগত। এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজ-বন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থি।" ইহার অর্থ হইল, যে-সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করে, সে-সমাজের বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িবে। ফলে সমাজ ভাঙনের পথে চলিবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিষয়ে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত যে, স্বোপার্জিত সম্পত্তিভোগের অধিকার প্রত্যেককেই দেওয়া উচিত। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অবাধ নয়; সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

(ঙ) চুক্তির অধিকার (Right to Contract): স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের সংগে চুক্তির অধিকার জড়িত। মানুষের যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকে, তবে তাহার পক্ষে চুক্তি করিবার অধিকার থাকাও প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ন্যায্য চুক্তির অধিকার আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। একথাও অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন চুক্তির অধিকারকেই স্বীকার করে যাহা সামাজিক জীবনের অনুকূল। বেআইনী, দুর্নীতিমূলক অথবা সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী কোন চুক্তিকে রাষ্ট্র কখনই চুক্তির মর্যাদা দেয় না।

(চ) পরিবার-গঠনের অধিকার (Right to Family): পারিবারিক জীবন যাপনের অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার। পরিবারই আদিমতম সমাজ কি না, সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও* বর্তমানে যে ইহা সমাজজীবনের কেন্দ্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে হয়ত সমাজ চলিতে পারে, পারিবারিক জীবন না থাকিলে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। সুতরাং এই অধিকার সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

(ছ) স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Religion): বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই অধিকারটিকে মানিয়া লইয়াছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতা সমাজের প্রগতির লক্ষণ। ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

(জ) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right to Association): সমাজে বাস করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত। রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আশা ও আকাংক্ষাকে রূপায়িত করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাংক্ষা ছাড়াও অন্যান্য আশা-আকাংক্ষাও আছে। তাই প্রয়োজন হয় অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের। মানুষের জীবন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া এই অধিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই মানিয়া লইয়াছে।

(ঝ) আইনের চক্ষে সমানাধিকার (Right to Equality before Law): বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের চক্ষে সমানাধিকার অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও ইতরজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নাই।

(ঞ) ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার (Right to Preserve Distinct Language and Culture): সংখ্যালঘুদের জন্য এই অধিকারটি অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার লিখিতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

এই অধিকারটি সংখ্যালঘুদের জন্য

(ট) শিক্ষার অধিকার (Right to Education): শিক্ষা ব্যতীত মানুষ আত্মবিকাশে সমর্থ হয় না বলিয়া অনেক দেশে শিক্ষার অধিকারও অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের প্রগতির সংগে সংগে সামাজিক মৌলিক অধিকারের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার:

(ক) স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার (Right to Residence): রাষ্ট্রের যে-কোন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার নাগরিকের আছে। বিদেশীয়ের এই অধিকার নাই।

(খ) প্রবাসী জীবনের নিরাপত্তার অধিকার (Right to Protection while staying Abroad): নাগরিকের বিদেশে অবস্থানকালীন রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা

* ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদি নাগরিক বিদেশে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের কাছে যদি কোন প্রতিকার না পায়, তবে নাগরিকের রাষ্ট্র তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) নির্বাচন করিবার বা ভোটদানের অধিকার (Right to Vote): নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার নাগরিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। নাগরিক ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া ইহার প্রসার বিশেষ কাম্য এবং জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের উপলব্ধি হইলে তবেই শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে।

ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার

এ-সম্বন্ধে অবশ্য কিছুটা মতবিরোধ আছে এবং এই কারণে এ-সম্পর্কে পরে আবার আলোচনা করা হইতেছে।*

(ঘ) নির্বাচিত হইবার অধিকার (Right to be Elected): গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের নির্বাচিত হইবার অধিকারও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ পদে নির্বাচিত হইবার জন্য নাগরিকের পক্ষে উপযুক্ত বয়স্ক বা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজন হয়। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচিত হইবার অধিকার সকল নাগরিকের না থাকিলেও যোগ্যতাসম্পন্ন, উপযুক্ত বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের থাকে।

(ঙ) সরকারী চাকরিতে অধিকার (Right to hold Public Office): অধিকাংশ রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার আছে। সরকারী চাকরি করিয়াও নাগরিক শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অনেক সময় বিদেশীয়কেও সরকারী চাকরিতে লওয়া হয়; কিন্তু বিদেশীর কোন অধিকার নাই।

(চ) আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition): নাগরিকগণ আবেদন দ্বারা অভাব-অভিযোগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে।

অর্থনৈতিক অধিকার: পূর্বে বলা হইয়াছে যে নাগরিকের আইনগত অধিকার প্রধানত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—এই দুই প্রকার হইলেও, সম্প্রতি অর্থনৈতিক অধিকার (economic rights) বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ ও বেকারত্বের ভয়ভাবনা হইতে মুক্তি। ইহার জন্য নাগরিকের যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে, তাহার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহাকে পর্যাপ্ত মজুরি দিতে হইবে, সে যাহাতে যথেষ্ট অবকাশ পায়

অর্থনৈতিক অধিকারের স্বরূপ

* দ্বাদশ অধ্যায় দেখ।

তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি। আধুনিক সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে এই সকল অধিকার মানিয়া লওয়া হইতেছে। ইহার উপর কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনার অধিকারও দেওয়া হইতেছে।

ভারতীয় সংবিধানের অংগীভূত মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (The Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy as embodied in the Constitution of India) : ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকের কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লিখিত অধিকারসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কতকগুলিকে 'মৌলিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে 'রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য হইল যে 'মৌলিক অধিকার' আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য, কিন্তু 'নির্দেশ-মূলক নীতি' আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নহে। 'মৌলিক অধিকারগুলি' সুস্থ নাগরিক-জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উহাদিগকে একমাত্র আপৎকালীন অবস্থা ভিন্ন অন্য কোন সময় ক্ষুণ্ণ করা যায় না। রাষ্ট্রের যে কোন আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী হইলে তাহা বাতিল হইয়া যায়।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর অধিকার

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) : আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধাগুলিকেই অধিকার বলা হয়। ইহাদের মধ্যে যেগুলি আবার অপরিহার্য—অর্থাৎ, যেগুলি ব্যতিরেকে সুস্থ সুন্দর সমাজ-জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভব নয়, সেগুলিকে 'মৌলিক' (fundamental) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অতএব, মৌলিক অধিকার হইল সুস্থ সবল সুন্দর সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য ন্যূনতম সুযোগসুবিধা।

মৌলিক অধিকার কেন বলা হয়

আধুনিককালে মৌলিক অধিকারসমূহকে শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা একরূপ রীতিতে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানও ইহা করিয়াছে। অবশ্য কোন কোন লেখকের মতে, শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক। কিন্তু দেখা যায় যে অধিকার শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট না থাকিলে উহা পর্যাপ্তভাবে সংরক্ষিত হয় না, কারণ ক্ষমতার আসনে বসিয়া প্রতিনিধিবর্গ জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে সচেষ্ট হইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য অধিকারসমূহ—যথা, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, সভাসমিতি সংগঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাহত করিয়া সরকারী দল সমালোচনার পথ রুদ্ধ করিতে পারে। এইজন্য প্রয়োজন হয় মৌলিক অধিকারসমূহকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া উহাদের সংরক্ষণের ভার আদালতের হস্তে সমর্পণ করিবার। এইরূপ করিলে তবেই ঐ সকল অধিকার আইনসভা ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে 'মৌলিক' হইয়া উঠে। উপরন্তু, অধিকার শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে দেওয়া থাকিলে নাগরিকগণ

শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয় কেন

সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারে তাহাদের অধিকার কি কি। ফলে, তাহারা সতর্ক দৃষ্টি লইয়া অধিকার সংরক্ষণে আগ্রহশীলও থাকে।

৮ ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights incorporated in the Constitution of India) : মোটামুটিভাবে ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত সাত প্রকারের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

(১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality) : সাম্যের অধিকার বলিতে নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে বুঝায়—(ক) আইনের দৃষ্টিতে সমতা ; (খ) কেবলমাত্র ধর্ম জাতি অথবা নারী বা পুরুষ বলিয়া অথবা জন্মস্থানের দরুন রাষ্ট্র ভেদবিচার করিতে পারিবে না ; (গ) সরকারী চাকরিতে সুযোগের সমতা ; (ঘ) অস্পৃশ্যতা বর্জন ; (ঙ) সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক উপাধি ভিন্ন অন্য উপাধি বিলোপ।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) : প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের (ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হইবার অধিকার, (গ) সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার, (ঘ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার, (ঙ) ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার, (চ) সম্পত্তি ভোগদখল ও ক্রয়বিক্রয় করিবার অধিকার, এবং (ছ) যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যে-কোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার স্বাধীনতা আছে। ইহা ছাড়া, কাহারও জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আইনসংগত পন্থা ছাড়া হরণ করা চলিবে না। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাইতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী আটক রাখা যাইবে না। কিন্তু গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এই অধিকার শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy aliens) এবং নিবারক নিরোধের (Preventive Detention) জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এমন ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নহে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) : মানুষ লইয়া ব্যবসায় ও বেগার খাটানো এবং অন্য কোনপ্রকারে বলপূর্বক শ্রম করানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকাদের কারখানায় বা খনিতে অথবা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) : সকল ব্যক্তিরই স্বাধীনভাবে ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রচারের অধিকার আছে। তবে জনশৃংখলা, স্বাস্থ্য ও সদাচারের স্বার্থে এই অধিকার সীমাবদ্ধ করা যায়।

(৫) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights) : নাগরিকদের সকলেরই নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার আছে। কেবল ধর্ম, মূলবংশ, জাতি বা ভাষার দরুন কোন নাগরিককে সরকার পরিচালিত বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না।

(৬) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): আইনের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। রাষ্ট্র যদি কাহারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জনসাধারণের স্বার্থে দখল বা অধিকার করিতে চায় তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies): সংবিধানে যে-সমস্ত মৌলিক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে বলবৎ করিবার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে সুপ্রীম কোর্টে বা প্রধান ধর্মাধিকরণে আবেদন করা চলিবে। সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ যে-কোন অধিকারকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (*habeas corpus*), পরমাদেশ (*mandamus*), প্রতিষেধ (prohibition), অধিকার-পৃচ্ছা (*quo warranto*), এবং উৎপ্রেষণ (*certiorari*)* প্রভৃতি ধরনের নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ (writs) বাহির করিতে পারে। হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণেরও এই সমস্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতা আছে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকারকে অকার্যকর করিয়া রাখিতে পারেন।

অধিকারগুলি অবাধ কি না? (Are these Rights absolute ?): উপরি-উক্ত অধিকারগুলি নিরংকুশ বা অবাধ নহে। কোন অধিকারই অবাধ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সমাজজীবনে বিশৃংখলা বা অরাজকতা দেখা দিবে। সুতরাং যাহাতে সকল ব্যক্তি সমানাধিকার ভোগ করিতে পারে, যাহাতে রাষ্ট্র বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ বসাইতে হয়। মোটকথা, সামাজিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধান এইজন্য বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের উপর কি কি বাধানিষেধ থাকিবে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছে।

কোন অধিকারই অবাধ হইতে পারে না

*বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (*habeas corpus*): কি কারণে আটক করা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য আদালত এই প্রকার আদেশ দ্বারা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার হুকুম দিতে পারে; এবং আটক আইনসংগত না হইলে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিবার নির্দেশ প্রদান করে।

পরমাদেশ (*mandamus*): ইহা দ্বারা আদালত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, নিম্নতর আদালত ও সরকারকে আপন কর্তব্য পালন করিতে আজ্ঞা দেয়।

প্রতিষেধ (prohibition): ইহার সাহায্যে উচ্চতর আদালত নিম্নতর বিচারালয়কে আপন অধিকারের সীমার মধ্যে থাকিয়া কাষ করিতে বাধ্য করে।

অধিকার-পৃচ্ছা (*quo warranto*): যখন কোন ব্যক্তি যে-পদের যোগ্য নয় সেই পদ অধিকার বা দাবি করে তখন অধিকার-পৃচ্ছা দ্বারা তাহার দাবি বৈধ কি না অনুসন্ধান করা হয়; এবং দাবি বৈধ না হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়।

উৎপ্রেষণ (*certiorari*): কোন আদালত বা প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীমা লংঘন করিলে উহার হস্ত হইতে বিচারকে উচ্চতর আদালতের হস্তে অর্পণ এবং ক্ষমতা-বহির্ভূত সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্য উৎপ্রেষণের লেখ (writ of *certiorari*) জারি করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, বাক্ ও মতামতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা যায়। সংবিধান এই অধিকারটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বাধানিষেধের উল্লেখ করিয়াছে: (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (২) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন, (৩) জনশৃংখলা, (৪) শ্লীলতা বা সদাচার, (৫) বিচারালয়ের অবমাননা, (৬) মানহানি, এবং (৭) অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা। আবার আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা প্রবর্তিত থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রদান করিয়া আদালতের মাধ্যমে অধিকারসমূহকে বলবৎ করিবার অধিকারকে স্থগিত রাখিতে পারেন।

রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy): ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিগুলি বিবৃত করার ব্যাপারে প্রেরণা যোগাইয়াছে আয়ারল্যণ্ডের শাসনতন্ত্র। নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হইল 'অর্থনৈতিক ও সমাজ-কল্যাণমূলক অধিকার'। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, দেশশাসন ব্যাপারে এই নীতিগুলি মৌলিক এবং আইন প্রণয়নে এই সকল নীতির প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নীতিগুলির তাৎপর্য

অন্যভাবে বলিতে গেলে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে সংবিধানে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র-গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সংগে সংগে আবার সংবিধানে একথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নহে। অর্থাৎ, সরকার যদি এই নীতিগুলি অনুসরণ না করে অথবা ভংগ করিয়া চলে, তাহা হইলে আদালতে তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইবে না। সুতরাং নীতিগুলি প্রয়োগ করা বা না-করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সরকারের খুশির উপর। মৌলিক অধিকারগুলির বেলায় কিন্তু আদালতের ক্ষমতা রহিয়াছে ঐগুলিকে কার্যকর করিবার। কোন মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যদি কোন আইন পাস করা হয়, তাহা হইলে আদালত ঐ আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে বাধ্য। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিবিরোধী কোন আইনকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে না।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে পার্থক্য

আবার একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকার হইতে ব্যাপকতর এবং সমাজ-কল্যাণকর ও অর্থনৈতিক অধিকার হইল এই নীতিগুলির বিষয়বস্তু। কিন্তু এই নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় রাষ্ট্রকে মৌলিক অধিকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে। যদি মৌলিক অধিকারের সহিত নির্দেশমূলক নীতির বিরোধ বাধে তাহা হইলে নির্দেশমূলক নীতি-সম্বলিত আইন বাতিল হইয়া যাইবে। তবুও নির্দেশমূলক নীতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উহারা সমাজ কল্যাণের দ্যোতক এবং উহারা আদালতে বলবৎযোগ্য না হইলেও শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বলিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ উহাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। করিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিবে।

নীতিগুলির গুরুত্ব

ভারতীয় সংবিধানে যে-সমস্ত নির্দেশমূলক নীতির কথা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল :

সংবিধানে উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

(১) জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবে যাহাতে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

(২) রাষ্ট্র এমন নীতি অবলম্বন করিবে, (ক) যাহাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই জন্য উপযুক্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হয়, (খ) যাহাতে সর্বসাধারণের কল্যাণে দেশের সম্পদ সকলের মধ্যেই কাম্যভাবে বণ্টিত হয়, (গ) যাহাতে ধনদৌলত ও ব্যবসাবাণিজ্য মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে, (ঘ) যাহাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান কার্যের জন্য সমান বেতন পায়, (ঙ) যাহাতে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না হয়, এবং (চ) যাহাতে শৈশব ও যৌবন শোষণের হাত হইতে রক্ষা পায়।

(৩) কার্য ও শিক্ষার অধিকার এবং বেকারাবস্থায় ও বার্ধক্যে, পীড়িতাবস্থায়, অংগহানি হইলে অথবা অন্যভাবে অভাবে পড়িলে সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) সকল শ্রেণীর শ্রমিক যাহাতে জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পায়, এবং পর্যাপ্ত অবসর, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত সুযোগ ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) রাষ্ট্রকে সমবায় বা ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসারসাধনের বিশেষ প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) সংবিধান চালু হইবার দশ বৎসরের মধ্যে বালকবালিকারা যাহাতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৭) গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠন, তপশীলভুক্ত জাতি ও জনজাতি (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষাবিষয়ক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতিবিধান, খাদ্যপুষ্টি বৃদ্ধি ও জীবিকার মান উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষি ও পশুপালন সংগঠন প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৮) গুরুত্বপূর্ণ স্মারক স্থান ও বস্তুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকিকরণ এবং ভারতের সর্বত্র নাগরিকদের জন্য একই প্রকারের দেওয়ানী আইনের প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

(৯) ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, জাতিতে জাতিতে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং সালিসির মারফত আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen) : নাগরিকের অধিকারের আলোচনার পর তাহার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়, কারণ অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত রহিয়াছে। আমি যদি অধিকার ভোগ করিতে চাই তাহা হইলে অপরকে কর্তব্যপালন করিয়া চলিতে হইবে। আবার অপরে যদি অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে আমাকে কর্তব্যপালন করিতে হইবে। যেমন, আমার যদি জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকে তাহা হইলে অপরের কর্তব্য রহিয়াছে আমার জীবননাশ না করার। আবার অপরের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকিলে আমার কর্তব্য রহিয়াছে অপরের জীবনহানি না করার। সুতরাং কর্তব্যের তাৎপর্য, বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

অধিকারভোগের জন্যই কর্তব্যপালন করিতে হয়

কর্তব্য কাহাকে বলে ? (What are Duties ?) : কোনকিছু করিবার অথবা না করিবার দায়িত্বকেই কতব্য আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রকে আনুগত্য প্রদান করিবার অথবা অপরের জীবনহানি না করিবার। আধুনিক কালে নাগরিকের দায়িত্ব বা কর্তব্যের উপর অধিকারের মতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য (Legal and Moral Duties) : অধিকারের মত কর্তব্যকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আইনগত কর্তব্য, এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। আইনের দ্বারা যে-সকল দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা ভংগ করিলে রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা থাকে তাহাদের আইনগত কতব্য বলা হয়। যেমন, আয় অনুযায়ী আয়কর দেওয়া নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। কেহ এই কর্তব্য-পালন না করিলে তাহাকে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী শাস্তিপ্রদান করিয়া থাকে। অপরদিকে নৈতিক কর্তব্য হইল সেই সকল দায়িত্ব যাহা ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক বোধের উপর নির্ভরশীল। নৈতিক দায়িত্ব পালন না করা হইলে ব্যক্তি সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় হয় না। অর্থাৎ, তাহাকে আইন-আদালতের হস্তে শাস্তিভোগ করিতে হয় না। যেমন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু কোন সন্তান এই কর্তব্য অবহেলা করিলে বা পালন না করিলে তাহাকে আইন-নির্দিষ্ট শাস্তিভোগ করিতে হয় না। অবশ্য নৈতিক ও আইনগত কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ সকল দেশে এক নহে। এক দেশে যাহা নৈতিক কর্তব্য অপর দেশে তাহা আইনগত কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। যেমন, অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের নির্বাচনের সময় ভোটপ্রদান করা নৈতিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু বেলজিয়াম বা সুইজারল্যাণ্ডে ভোটপ্রদান করা আইনগত অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সমর্থিত

নৈতিক কর্তব্যের ভিত্তি সমাজের বিবেক

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সকল সময় সুস্পষ্ট নয়

অনেক সময় নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। যেমন আইন মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য; কিন্তু ইতিহাসে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে অনেক সময় আইন অধিকাংশ লোকের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করিয়াছে, এবং ফলে কাম্য সমাজজীবনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য হইল এই প্রকার বিকৃত রাষ্ট্র ও বিকৃত আইনের বিরোধিতা করা। এই কারণেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একসময় আমরা 'আইন অমান্য আন্দোলন' চালাইয়াছি। তবে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, সমস্ত দিকের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত আইন ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে

নাগরিকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য (Different Kinds of Duties of a Citizen) ঃ ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে প্রত্যেক নাগরিকের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য রহিয়াছে।

সামাজিক সংগঠনের মূল ভিত্তি ও প্রাথমিক সংস্থা হইল পরিবার। পরিবারের অংগ হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিতপালিত হয় এবং আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়; ইহার মধ্য দিয়াই সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সহিত তাহার প্রথম পরিচয় ঘটে; ইহার মধ্যেই স্নেহ মমতা ভালবাসা সহযোগিতা প্রভৃতি মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। সুতরাং সুস্থ ও সবল পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের অপরিহার্য সর্ত।

ক। পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব-বন্ধনের দ্বারাই সুখী ও সুস্থ পরিবার গড়িয়া তোলা সম্ভব। পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে সন্তানসন্ততিদের লালনপালন করা ও শিক্ষা দেওয়ার; সন্তানসন্ততিদের কর্তব্য রহিয়াছে পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি ও মান্য করার; স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব রহিয়াছে সুখেদুঃখে এক সহযোগে ও একাত্মভাবে সংসারধর্ম পালন করার। ভারতীয় সমাজে পরিবার শুধু স্বামীস্ত্রী সন্তানসন্ততিদের লইয়া গঠিত নয়, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই দিক দিয়া পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের অপর সকলের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে হয়। যাহা হউক, পারিবারিক দায়িত্বপালনের দ্বারাই নাগরিক কল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে। যেখানে পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল সেখানে সামাজিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে।

নাগরিকের এই কর্তব্যই প্রাথমিক

পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই নাগরিকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে। সমাজকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে; সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই সে বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রা সম্ভব করিয়াছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণবিকাশের যে আকাংক্ষা রহিয়াছে তাহা কখনও সমাজের বাহিরে

খ। সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

সফল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মংগল ও সমষ্টিগত মংগল অংগাংগিভাবে জড়িত। অপরের শক্তির সহিত নিজের শক্তিকে সংযুক্ত করিয়া, অপরের কল্যাণের সহিত নিজের কল্যাণের সামঞ্জস্যসাধন করিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথ মুক্ত করিতে পারে। এইজন্য প্রত্যেক নাগরিককে অপরের প্রতি দরদ ও সহযোগিতার ভার লইয়া চলিতে হইবে। অপরের অধিকার যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় তাহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে। যাহারা অক্ষম, যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের কল্যাণসাধন করা তাহার নাগরিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত; সকল প্রকার সমাজসেবামূলক কার্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন নাগরিকের অন্যতম আদর্শ।

সমাজের প্রতি কর্তব্য কিভাবে পালন করিতে হইবে

ভারতের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশাল ভারতের অগণিত জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করে পল্লী অঞ্চলে এবং পল্লীই ভারতের প্রাণকেন্দ্র। দুর্ভাগ্যবশত বহুদিনের অবহেলা ও শোষণের ফলে পল্লীজীবন আজ নিষ্প্রাণ। সেখানে না আছে শিক্ষা, না আছে সম্বল, না আছে স্বাস্থ্য। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে এই অবহেলিত জনগণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, সমবায় সংগঠন, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি পন্থার সাহায্যে পল্লীসমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে-প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য। মোটকথা, সামাজিক ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। এই কর্তব্যপালন করিয়া সামাজিক শান্তি, সামঞ্জস্য ও মংগল প্রতিষ্ঠিত করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

ভারতের উদাহরণ

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতিও কতকগুলি কর্তব্যপালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনগত পালনীয় হইলেও কতকগুলি সমাজের নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি হইল (ক) আনুগত্য প্রদর্শন, (খ) আইন মান্য করা, এবং (গ) করপ্রদান করা।

গ। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

(ক) আনুগত্য : আনুগত্য (allegiance) নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না হয়, তবে তাহার নাগরিক-অধিকার কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতিও অনুগত হওয়া। নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শকে মানিয়া লইয়া সর্বদা তাহার উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে নাগরিককে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হইবে; আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষায় সর্বদা তাহাকে সরকারী কর্মচারীর সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। এইভাবেই আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়।

(খ) আইন মান্য করিয়া চলা : নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত। সুতরাং সে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলিবে। নিজে আইন মান্য করাই যথেষ্ট নয়,

অপর সকলে যাহাতে মান্য করে তাহার দিকেও নাগরিককে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নাগরিককে আইন মান্য করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে হইবে বলিয়া যে সকল আইনই বিনা প্রতিবাদে মান্য করিয়া চলিতে হইবে এইরূপ মতবাদ অনেকে সমর্থন করেন না। আইন যদি ব্যক্তির অধিকার হরণ করে, ইহা যদি সুষ্ঠু সমাজ-জীবনের পরিপন্থী হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান : রাষ্ট্র নাগরিকগণের সংগঠন ; নাগরিকগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কোন সংগঠনের কার্যই অর্থ ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। নাগরিকগণের সংগঠন রাষ্ট্র যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান করা। যে-ব্যক্তি কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে সে নাগরিক-মর্যাদা পাইবার অধিকারী নহে।

(ঘ) অন্যান্য কর্তব্য : উপরি-উক্ত তিনটি মুখ্য কর্তব্য ছাড়া নাগরিকের আরও কয়েকটি কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের উপর কোন কর্মভার অর্পণ করে তবে নাগরিকের পক্ষে তাহা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা উচিত। যদি নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, তবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নাগরিকের পক্ষে সে-কর্ম গ্রহণ করা উচিত। যেমন, কোন বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলিলে, আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা গ্রহণ করা উচিত। দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সৎভাবে ভোট দেওয়াও নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য।

২. অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties) : অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে।

অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে

বস্তুত, মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও কর্তব্য উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর কতকগুলি দাবি থাকে। এই দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ হইল কতকগুলি দায়িত্ব-পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই দায়িত্বগুলিই কর্তব্য। আইনের দ্বারা অনুমোদিত হইলে ইহারা আইনগত কর্তব্যে পরিণত হয়। সুতরাং কর্তব্য ব্যতীত অধিকারের কল্পনা করা যায় না। আমার অধিকারভোগ অপরের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে এবং অপরের অধিকারভোগ আমার কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে। যেমন, ধাক্কা না খাইয়া পথ চলিবার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দেওয়া।* যাহাতে এই অধিকার অপর সকলেও ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য আমারও কর্তব্য অপরের চলার পথ ছাড়িয়া দেওয়া। আবার জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করিবার।

উদাহরণ

* **"If I have the right to walk along the street without being pushed off the pavement, it is your duty to give me reasonable room."**

অধিকার হইল ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা সমাজ-বহির্ভূত নয়, সমাজের মধ্যেই ইহা নিহিত। সুতরাং এই সকল সামাজিক সুযোগসুবিধাকে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন ব্যক্তি ও সমাজের—উভয়েরই সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অসামাজিকভাবে ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকারের উদ্ভব হয় নাই। এইজন্য প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত একই সময় ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধন করিবার পূর্ণ দায়িত্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। মোটকথা, সমাজের মধ্যে থাকিয়া অধিকার ভোগ করা হয় বলিয়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজকে কিছুটা প্রতিদান দেওয়া প্রয়োজন। এইজন্যই এইরূপ উক্তি প্রচলিত আছে যে, যে-ব্যক্তি কার্য করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সমাজের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ না করিয়া সমাজের নিকট হইতে ভোগের দাবি করিতে পারে না। আবার, নাগরিকের যদি ভোটদানের অধিকার থাকে, তাহার কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এবং সমস্যাসমূহের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটদান করা।

প্রত্যেকটি অধিকারের সংগে কর্তব্য সংযুক্ত আছে

অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই আইনের দৃষ্টিতে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না, এবং ঐ অধিকারকে আইনগতভাবে বলবৎ করিবারও উপায় থাকে না। শুধু ইহাই নয়। স্বীকৃত অধিকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত না করিলে উহার মূল্য বিশেষ থাকে না—উহা নামমাত্র অধিকার হইয়া পড়ে। আমাদের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে তবেই রাষ্ট্র আমাদের নিকট হইতে আনুগত্য, করপ্রদান প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য দাবি করিতে পারে। সুতরাং একদিকে অধিকারভোগের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যেমন কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রের কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে নাগরিকের আত্মোপলব্ধির উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার। এই কারণেই উন্নত দেশসমূহে মৌলিক অধিকারসমূহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেশের প্রধান আদালতের উপর উহাদের সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত করা হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ইহাই করা হইয়াছে।

ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য

এই কর্তব্যপালন করিয়া তবেই রাষ্ট্র আনুগত্য প্রভৃতি দাবি করিতে পারে

রাষ্ট্র যদি তাহার কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয় তবে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ল্যাস্কি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন যে, প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা নাগরিকের কর্তব্য; কিন্তু সমস্ত দিকের বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না করিলে আইন ও শৃংখলার পরিবর্তে অরাজকতা ও সমাজবিরোধী শক্তি প্রশ্রয় পাইবে।

রাষ্ট্র তাহার কর্তব্যপালন না করিলে নাগরিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধাকেই অধিকার বলা হয়। অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। অধিকার আত্মবিকাশে সহায়তা করে; ২। সমাজের বাহিরে অধিকার থাকিতে পারে না; ৩। অধিকার স্থান ও কালের আপেক্ষিক; ৪। অধিকার সকলের জন্য।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ: প্রথম শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। নৈতিক অধিকার সমাজের ন্যায়বোধ দ্বারা সমর্থিত; আইনগত অধিকারের ভিত্তি রাষ্ট্রের আইন। দ্বিতীয় শ্রেণী-বিভাগ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে। ইহা ছাড়া, অর্থনৈতিক অধিকারও আছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: সামাজিক অধিকার বলিতে সেই সকল সুযোগসুবিধাকে বুঝায় যাহা সুষ্ঠু সমাজজীবনের সহায়ক। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল রাষ্ট্রের কার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ।

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার: ১। জীবনের অধিকার, ২। স্বাধীনতার অধিকার, ৩। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, ৫। চুক্তির অধিকার, ৬। পরিবার-গঠনের অধিকার, ৭। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, এবং ৮। ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার—এই কয়টি হইল মৌলিক সামাজিক অধিকার।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: ১। স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার, ২। বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তার অধিকার, ৩। ভোটাধিকার, ৪। নির্বাচিত হইবার অধিকার, ৫। সরকারী চাকরিতে অধিকার, এবং ৬। আবেদন করিবার অধিকারকে মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়।

অর্থনৈতিক অধিকার: সম্প্রতি অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানের অংগীভূত মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি: ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নাগরিক-অধিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লিখিত অধিকারসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) মৌলিক অধিকার, এবং (খ) শাসনকার্য পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত অধিকারগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালতে বলবৎযোগ্য নহে।

মৌলিক অধিকার: আত্মবিকাশের উপযোগী অপরিহার্য সুযোগসুবিধাগুলিকে 'মৌলিক অধিকার' বলা হয়। বর্তমানে শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা একরূপ রীতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে এইভাবেই অধিকারের সম্যক সংরক্ষণ সম্ভব।

ভারতীয় সংবিধানে সাত প্রকারের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে—যথা, (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার, এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

এই অধিকারগুলি নিরংকুশ বা অবাধ নহে। কোন অধিকারই অবাধ হইতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানে উক্ত অধিকারগুলির উপর কি কি বাধানিষেধ থাকিবে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

নির্দেশমূলক নীতি: সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ ব্যাপারে প্রেরণা যোগাইয়াছে আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নহে। এখানেই মৌলিক অধিকারগুলির সহিত ইহাদের মূল পার্থক্য। উপরন্তু, নির্দেশমূলক নীতির বিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে কিন্তু মৌলিক অধিকার-বিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে না। পরিশেষে, মৌলিক অধিকারের সীমার মধ্যে থাকিয়াই নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে কার্যকর করিতে হইবে।

সমাজ-কল্যাণকর ও অর্থনৈতিক অধিকারই এই নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বিষয়বস্তু। বিশেষ বিশেষ নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে—১। সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, ২। সকলের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা, ৩। শোষণের অবসান, ৪। পীড়িত ও বৃদ্ধাবস্থায় সাহায্যের ব্যবস্থা, ৫। জীবনধারণোপযোগী মজুরির ব্যবস্থা, ৬। সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসারসাধন, ৭। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, ৮। গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন, ৯। গুরুত্বপূর্ণ স্মারক ও বস্তু সংরক্ষণ, এবং ১০। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টা—ভারত-রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নাগরিকের কর্তব্য: অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। কর্তব্য হইল কিছু করিবার বা না-করিবার দায়িত্ব। কর্তব্য আইনগত ও নৈতিক উভয়ই হইতে পারে। নাগরিকের কর্তব্যের তিনটি দিক আছে—১। পরিবারের প্রতি কর্তব্য, ২। সমাজের প্রতি কর্তব্য, এবং ৩। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য প্রধানত চারি প্রকারের—১। আনুগত্য; ২। আইন মান্য করিয়া চলা, ৩। নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান; এবং ৪। অন্যান্য কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্য: মানুষের সমাজবোধ হইতে উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক দাবি অধিকার ও কর্তব্য বলিয়া অভিহিত হয়। প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত কর্তব্য সংযুক্ত আছে। ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য; ব্যক্তির নিকট হইতে আনুগত্য রাষ্ট্রের অধিকার।

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the rights and duties of a citizen.

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৬৭-৭২ এবং ৭৮-৮০ পৃষ্ঠা]

[প্রশ্নটির উত্তর সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা অতি দীর্ঘ হইবে মনে করে বলিয়া নিম্নে উত্তরের পুরা কাঠামো বা একপ্রকার পূর্ণ উত্তর দেওয়া হইল।

উত্তরের কাঠামো: নাগরিক রাষ্ট্রের আইন দ্বারা অনুমোদিত অধিকার বা আইনগত অধিকার ভোগ করে। পূর্বে এই প্রকার অধিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—এই দুই শ্রেণীর বলিয়া ধরা হইত। বর্তমানে উহার সহিত অর্থনৈতিক অধিকারও যোগ করা হয়। সুতরাং বর্তমান দিনে নাগরিকগণ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক—এই তিন প্রকার অধিকারই ভোগ করিয়া থাকে। তবে সকল রাষ্ট্রের নাগরিক ঠিক একই অধিকার ভোগ করে না। যে-দেশ যত উন্নত সে-দেশে নাগরিক-অধিকারের পরিমাণও তত বেশী। নিম্নে উন্নত দেশের নাগরিকগণ সাধারণত যে-সকল সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করিয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

সামাজিক অধিকার: সামাজিক অধিকারের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল ১। জীবনের অধিকার, ২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও জীবিকার্জনের অধিকার, ৩। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, ৫। চুক্তির অধিকার, ৬। পরিবার-গঠনের অধিকার, ৭। স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, ৮। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, ৯। আইনের চক্ষে সমানাধিকার, ১০। ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার, এবং ১১। শিক্ষার অধিকার।

এই সামাজিক অধিকারগুলিকে উন্নত দেশে মৌলিক বা ন্যূনতম বলিয়া গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিহার্য হইল ১। স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার, ২। প্রবাসী জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, ৩। নির্বাচন করিবার অধিকার, ৪। নির্বাচিত হইবার অধিকার, ৫। সরকারী চাকরিতে অধিকার, এবং ৬। আবেদন করিবার অধিকার। এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অপরিহার্য, কারণ ইহারা না থাকিলে শুধু যে গণতন্ত্র সম্ভব হয় না তাহাই নহে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক অধিকার : বর্তমানের ধারণা অনুসারে নাগরিককে আত্মবিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হইলে, তাহাকে যথার্থ সক্রিয় নাগরিক করিয়া তুলিতে হইলে উপরি-বর্ণিত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ছাড়া কয়েকটি অর্থনৈতিক অধিকারও দিতে হইবে—যথা, কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার, পর্যাপ্ত মজুরির অধিকার, পর্যাপ্ত অবকাশের অধিকার, ইত্যাদি। উন্নত দেশসমূহে নাগরিকের এই অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে।

অধিকার কর্তব্যের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত বলিয়া নাগরিকের শুধু অধিকার নাই, বিভিন্ন কর্তব্যও রহিয়াছে। এই সকল কর্তব্য হইল ১। পরিবারের প্রতি, ২। সমাজের প্রতি, এবং ৩। রাষ্ট্রের প্রতি। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যই আইনগত কর্তব্য। সুতরাং নাগরিক উহা এড়াইয়া যাইতে পারে না। যদি এড়াইবার চেষ্টা করে তবে তাহার নাগরিকতার অবসান ঘটিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি এই কর্তব্য প্রধানত তিনটি—১। আনুগত্য, ২। আইন মান্য করিয়া চলা, ৩। নিয়মিতভাবে ন্যায্য কর প্রদান। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক অর্পিত কর্মভার গ্রহণ করা, সৎভাবে ভোট দেওয়া, সমাজের উন্নতিসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা, প্রভৃতি কয়েকটি নৈতিক কর্তব্যও নাগরিকের রহিয়াছে।]

2. What is meant by the term 'Right'? Distinguish between (a) Legal and Moral Rights, (b) Civil and Political Rights. Give illustrations.

অধিকার কাহাকে বলে? (ক) আইনগত ও নৈতিক অধিকার, এবং (খ) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

3. Define the term 'Right' of a citizen. Enumerate the principal Civil and Political Rights of a citizen.

নাগরিকের অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিকের প্রধান প্রধান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের উল্লেখ কর।

4. Describe the Fundamental Civil Rights of a citizen of a modern State.

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর।

5. Write an essay on the Duties of a citizen.

নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে ছোট একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

[ইংগিত : পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের প্রতিই নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। (৭৭-৮০ পৃষ্ঠা)]

6. Show that rights imply duties. Mention some of the important rights of a citizen.

অধিকার বলিলেই যে কর্তব্য বুঝায় তাহা দেখাও। নাগরিকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের উল্লেখ কর।

প্রশ্নের প্রথম অংশটি এইভাবেও আসিতে পারে—Rights and Duties are correlative. Explain.

অথবা—"Rights and Duties go together." Explain.

"অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত জড়িত।" ব্যাখ্যা কর।

7. What are the Fundamental Rights of the citizen under the Constitution of India? Why are they called 'Fundamental'?

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে নাগরিকের মৌলিক অধিকার কি কি? উহাদিগকে 'মৌলিক' বলা হয় কেন?

8. State at least four of the Fundamental Rights of an Indian Citizen. How are these Fundamental Rights protected in the Indian Constitution?

ভারতীয় নাগরিকের অন্তত চারিটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ কর। কিভাবে এই সকল মৌলিক অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত করা হইয়াছে?

9. Show how the Indian Constitution secures Liberty and Equality for all citizens.

ভারতীয় সংবিধানে সকল ভারতীয় নাগরিকের জন্য স্বাধীনতা ও সাম্য কিভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা দেখাও।

10. What are the Directive Principles of State Policy as stated in the Indian Constitution? What is their significance?

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি কি কি? উহাদের তাৎপর্যই বা কি?

11. What are the Directive Principles of State Policy? Distinguish them from the Fundamental Rights.

রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি কাহাদের বলে? মৌলিক অধিকার হইতে উহাদের পার্থক্য নির্দেশ কর।

12. What is meant by the Directive Principles of State Policy as adopted in the Constitution of India? Illustrate your answer.

ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি বলিতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ উত্তর দাও।

অষ্টম অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

নিয়মকানুন সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য সর্ত

সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কোন উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুন প্রবর্তন করা এবং মানিয়া চলা প্রয়োজন। তাহা না হইলে বিশৃংখলা দেখা দিবে, সামাজিক কাজকর্ম অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি সুদূর অতীতেও যখন রাষ্ট্র সরকার জেল পুলিস প্রভৃতি গড়িয়া উঠে নাই, মানব তখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসন মানিয়া লইয়া সহজ সরল সামাজিক জীবন যাপন করিত। মোটকথা, নিয়মকানুন ব্যতীত জীবনের কোন ক্ষেত্রেই চলা সম্ভব নয়। সভা বল, সমিতি বল, মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক বল, সর্বত্রই নিয়মকানুন না থাকিলে অরাজকতা বিরাজ করিবে। সাধারণ ফুটবল খেলার কথা ধরিলে দেখা যায় যে, খেলার নিয়মকানুন না থাকিলে বা না মানিলে খেলাই হইবে না। স্কুলের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, স্কুল-পরিচালনার নিয়মকানুন না থাকিলে এবং উহাদের না মানিয়া চলিলে স্কুলের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার কথা ধরিলে দেখা যায়, যানবাহন চলাচলের নিয়মকানুন না মানিয়া চলিলে দুর্ঘটনা ও বিশৃংখলা দেখা দিবে। মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, যাহার যাহা ইচ্ছা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকিলে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়াই থাকিবে। সুতরাং নিয়মকানুন সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং উহারা সমাজজীবনের মধ্যেই নিহিত।

কিন্তু সকল সামাজিক নিয়মকানুন আইন নয়

কিন্তু সমাজে মানুষ যে-সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলে তাহাদের প্রত্যেকটিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন আখ্যা দেওয়া হয় না। আইন বলিতে রাষ্ট্রের বিধি বুঝায়। অর্থাৎ, যে-সকল নিয়মকানুনকে রাষ্ট্র সৃষ্টি বা স্বীকার করিয়া লইয়া বলবৎ করে তাহাদিগকেই আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই আইন কেহ ভংগ করিলে রাষ্ট্র শাস্তি-প্রদান করে। পুলিস সৈন্য আদালত ও জেল এই কারণেই রাখা হয়।

যে-সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয় তাহাই আইন

আইন ব্যতীত সমাজে অন্যান্য নিয়মকানুনও আছে—যথা, সামাজিক নিয়মকানুন, নৈতিক নিয়মকানুন, বিভিন্ন সমিতির নিয়মকানুন ইত্যাদি। প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, ফ্যাসান প্রভৃতি হইল সামাজিক নিয়মকানুন; আর সত্যকথন, সত্যভংগ ও প্রবঞ্চনা না করা, অপরের অনিষ্টসাধন না করা ইত্যাদি নৈতিক নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির সংগে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান পার্থক্য হইল যে আইনভংগ করা হইলে রাষ্ট্রশক্তি শাস্তিপ্রদান করে, কিন্তু অন্যান্য নিয়মকানুন মান্য না করা হইলে রাষ্ট্রের নিকট কোন ব্যক্তিকে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। তবে রাষ্ট্রের হাতে শাস্তিভোগ না করিতে হইলেও তাহাকে সমাজের নিন্দা অথবা বিবেকের দংশন সহ্য করিতে হয় অথবা সভাসমিতি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিয়ম অনুসারে বয়ঃকনিষ্ঠ বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মান করিয়া চলিবে। কেহ যদি এ-নিয়ম ভংগ করে অপর দশজনে তাহার নিন্দা করিবে, কিন্তু আইন-আদালতে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। নৈতিক নিয়মানুসারে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা অন্যায়; কিন্তু এ-নিয়ম ভংগ করা হইলে রাষ্ট্র প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। তবে ব্যক্তি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিলে তাহার অনুশোচনা হয়।

অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুনের সহিত আইনের পার্থক্য

তবে একথা মনে করা ভুল হইবে যে, সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের নীতির সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল রীতিনীতি ও ন্যায়-অন্যায়ের নীতি গড়িয়া উঠে তাহার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের আইনকানুন প্রণীত হয়। একসময় আমাদের দেশে সহমরণ প্রথা বা সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু আজ উহা আইনত দণ্ডনীয়।

সামাজিক রীতিনীতির সহিত আইনের সম্পর্ক

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট উইলসনের (Woodrow Wilson) ভাষায় "আইন হইল মানুষের প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।"* অধ্যাপক হল্যাণ্ড (Holland) বলেন,

আইনের সংজ্ঞা

* Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government.

আইন হইল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মকানুন।"*

এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রথমত, আইন মাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণকেই নিয়ন্ত্রিত করে; মানুষের আভ্যন্তরীণ মনের চিন্তা বা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যেমন, চুরি করা আইনত দণ্ডনীয়, কেহ চুরি করিলে তাহাকে শাস্তিপ্রদান করা হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি চুরির চিন্তা বা বাসনা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ধরা এবং তাহাকে বাধাপ্রদান করা সম্ভব হয় না। সুতরাং মানুষের বাহিরের ব্যবহার বা আচরণ লইয়াই আইনের কাজ-কারবার। দ্বিতীয়ত, আইনের পিছনে থাকে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তি। অর্থাৎ, রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুলিস আদালত জেল প্রভৃতির মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করিয়া আইন মান্য করিতে বাধ্য করায়। তৃতীয়ত, যে-পর্যন্ত-না রাষ্ট্র প্রচলিত রীতিনীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহা বলবৎকরণের ব্যবস্থা করে সে-পর্যন্ত উহা আইন বলিয়া গণ্য হয় না।

আইনের বৈশিষ্ট্য :

১। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে

২। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই আইন বলবৎ করে

৩। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন নিয়মকানুনই আইনে পরিণত হয় না

আইনের উৎস (Sources of Law) :

আইনের উৎস প্রধানত ছয়টি—যথা, প্রথা, ধর্ম, বিচারের রায়, ন্যায়বিচার, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা এবং আইন প্রণয়ন।

১। প্রথা (Custom) : আইনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল প্রথা। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র আইনসভা জেল পুলিস সৈন্য প্রভৃতি ছিল না। তবুও সমাজজীবন বিশৃঙ্খল ছিল না। মানুষ তখন প্রথার সাহায্যেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া লইত। পরিবার, গোষ্ঠী এবং উপজাতির আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রথা গড়িয়া উঠে। ধর্মের ভয়েই হউক অথবা অপরের অনুসরণে বা প্রয়োজনের তাগিদেই হউক সকলে আচার-ব্যবহার বা প্রথাকে মানিয়া চলিত। সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়া সমাজের নেতৃবৃন্দ এই সকল প্রথার ভিত্তিতেই দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানেও রাষ্ট্রের আইনকানুনের উপর প্রথার অসামান্য প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের বহু আইনই প্রথাগত আইন।

প্রথা সর্বপ্রাচীন উৎস

বর্তমানেও প্রথার গুরুত্ব রহিয়াছে

২। ধর্ম (Religion) : প্রাচীনকালে প্রথাগত অনুশাসন ও ধর্ম এমনভাবে মিশিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইত না। প্রথাই ছিল আইন, আর আইনই ছিল ধর্ম। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা প্রথাকে সমর্থন করিয়া উহার স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল; এবং প্রত্যক্ষভাবে

ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা

* A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority.

দলপতি রাজা বা পুরোহিতকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহার নির্দেশকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। বর্তমানেও আইনের উপর ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহাদের ভিত্তিতে মনু ও কোরানের বিধান বর্তমান রহিয়াছে।

বর্তমানে ধর্মের প্রভাব

৩। **বিচারের রায় (Judicial Decisions):** বিচারের রায় আইনের আর একটি উৎস। অতি প্রাচীনকালে প্রথা ও ধর্মীয় নিয়মকানুনের সাহায্যে সহজেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যাইত। কিন্তু পরে যখন সমাজ জটিল রূপ ধারণ করিল তখন আর প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফলে বিচারকের আসনে আসীন দলপতি বা রাজা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিচারের রায় ভবিষ্যতে বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হইতে লাগিল।

বিচারের রায় হইতে আইনের সৃষ্টি

শুধু প্রাচীনকালেই নয়, বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের সৃষ্টি হয়। মূল আইনে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে; আইনের অর্থও সুস্পষ্ট না হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বিচারের রায় দ্বারা আইনের ফাঁক পূরণ করেন, আইনের অর্থও সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন। এই কার্য প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নকার্য। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিচারপতি হোমস (Holmes) বলিয়াছেন, "বিচারপতিগণ অবশ্যই আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই করিয়া যাইবেন।"

এখনও বিচারপতিগণ আইন প্রণয়ন করেন

৪। **ন্যায়বিচার (Equity):** ন্যায়বিচার আইনের আর একটি উৎপত্তি-স্থল। এই সূত্রটির প্রকৃতি বিচারের রায়ের মতই। বিচারপতির কাজ ন্যায়বিচার করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় ন্যায়বিচার করা যায় না। বর্তমান সমাজ বিশেষভাবে গতিশীল বলিয়া কোন আইন কিছুদিন ধরিয়া প্রবর্তিত থাকিলে পর উহা সমাজের ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। ধরা যাউক, দেশের আইন অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে; কিন্তু সমাজে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ জাগরিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিজস্ব ন্যায়বোধ অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে আইনের রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে, নূতন আইনেরও সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের উদাহরণে অস্পৃশ্যতা সমর্থনকারী যে-আইন বর্তমান আছে তাহার স্থলে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আইন প্রবর্তিত হইতে পারে।

ন্যায় বিচারের ফলেও আইনের সৃষ্টি হয়

৫। **পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা (Scientific Commentaries):** আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক সভ্য দেশেই আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আইনজীবী ও বিচারপতিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইন অনেক সময় প্রথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। পরবর্তী

যুগে প্রথার পরিবর্তন ঘটিলেও আইনটি প্রচলিত থাকে। ফলে ঐ আইন সমাজের ধ্যানধারণার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে। আবার অনেক সময় আইন যে-উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ বর্ণনা করেন। ইহা হইতে আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আইনের উপর টীকা ও রচনা বিভিন্ন দেশের আইনের অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছে। কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে মনুর টীকাই ছিল হিন্দু আইনের মূলভিত্তি। বর্তমানে অবশ্য হিন্দু সংহিতা (The Hindu Code) পাস হওয়ায় হিন্দু আইন মনুর ব্যাখ্যা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছে।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উদ্ভব হয়

৬। **আইন প্রণয়ন (Legislation):** আইন প্রণয়ন বলিতে বুঝায় আনুষ্ঠানিকভাবে আইনসভা কর্তৃক আইন রচনা। আধুনিক যুগে এই আইন প্রণয়নই আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আইন-সভা জনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের রূপদান করে। প্রথা, ধর্মীয় নীতি, ন্যায়বোধ প্রভৃতি প্রায় সকলই আইনসভা দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হইতেছে। ফলে সমাজে অন্যান্য সূত্র হইতে উদ্ভূত আইন ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, আবার হিন্দু সংহিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হিন্দু সংহিতা, প্রথা, ধর্ম, পণ্ডিত ব্যক্তিদের টীকা প্রভৃতির ভিত্তিতে উদ্ভূত পুরাতন হিন্দু আইনকে অপ্রচলিত করিয়াছে।

বর্তমানে আইনসভা প্রণীত আইনই সর্বপ্রধান উৎস

উপসংহার: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে আইনের উৎসসমূহ সকল সময়ে একই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। প্রাচীনতম যুগে প্রথার ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর ক্রমে ঐ স্থান অধিকার করে ধর্ম, বিচারের রায় ও ন্যায়বিচার। পরে সভ্যতা আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে আইন প্রণয়ন ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা উভয়ে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে আবার একমাত্র আইন প্রণয়নই আইনের প্রধান উৎপত্তিস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আইন ও নীতি (Law and Morality):

প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না, কারণ তখন রাষ্ট্রীয় জীবন একমাত্র নৈতিক আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইত। এই দিক দিয়াই এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে মংগলময় জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব—অর্থাৎ, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মংগলময় জীবন গঠন করা; এবং একমাত্র এই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও এইরূপ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের সমন্বয় দেখিতে পাই।

অতীতে আইন ও নীতি অভিন্ন ছিল

যায়। ভবভূতি লিখিয়াছেন, "নাগরিকগণ সকল অসত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হউক, রাষ্ট্রপাল নীতিপরায়ণ হইয়া দেশরক্ষা করুন, মেঘ নাগরিকগণের সুকৃতির ফলে সর্বঋতুতে বারিবর্ষণ করুক, এবং সকলে বন্ধু-স্বজন সহবাসে আনন্দ উপভোগ করুক।" আইন ও নৈতিক বিধি প্রাচীনকালে এইভাবে অভিন্ন থাকিলেও বর্তমানে উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে।

পরে অবশ্য উভয়ে পৃথক হইয়া পড়ে

প্রথমত, নীতিশাস্ত্রের পরিধি আইন অপেক্ষা ব্যাপকতর। নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের বাহিরের আচরণ ও মনের চিন্তা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র অনুসারে শুধু যে লোকের অনিষ্ট করা অন্যায় তাহাই নহে, অনিষ্টের চিন্তা করাও অনুচিত। অপরদিকে আইনের উদ্দেশ্য হইল লোকের বাহিরের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বভাববশে চুরি করিলে যে-শাস্তি হয়, কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া চুরি করিলে তদপেক্ষা লঘু দণ্ডই হয়। উপরন্তু, আইন মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না; কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন বাহ্যিক আচরণকেই বাদ দেয় না। ফলে দেখা যায় যে, এরূপ অনেক কার্য দুর্নীতিমূলক বলিয়া ঘোষিত হয় যাহা আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় নহে। মিথ্যা বলাকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না; কিন্তু মিথ্যা কথা দ্বারা যতক্ষণ কাহারও ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইহা আইনের গণ্ডির মধ্যে আসে না।

১। বর্তমানে উভয়ের পরিধি এক নহে

দ্বিতীয়ত, সমাজের কল্যাণসাধন আইনের উদ্দেশ্য। এই কারণে সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়াও আইন প্রণীত হয়, কিন্তু নৈতিক সূত্র রচিত হয় একমাত্র ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ফলে যাহা বেআইনী তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। প্রেক্ষাগৃহে বা ট্রামে-বাসে ধূমপান করা বেআইনী, কিন্তু দুর্নীতিমূলক নহে।

২। উদ্দেশ্যও পৃথক

তৃতীয়ত, প্রয়োগের দিক হইতেই আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আইন প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনভংগকারীকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নীতি প্রযুক্ত হয় মানুষের নিজের বিবেক ও সমাজের অনুশাসন দ্বারা। ফলে নৈতিক বিধিভংগের শাস্তি হইল সম্পূর্ণ মানসিক - নিজের বিবেকের দংশন এবং লোকের 'ছি ছি' সহ্য করা।

৩। প্রয়োগের দিক হইতেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে

পরিশেষে, আইন নির্দিষ্ট, কিন্তু নৈতিক সূত্র অনির্দিষ্ট। আইন কি তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, কিন্তু কোন্‌টি সুনীতি এবং কোন্‌টি দুর্নীতি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নৈতিক বিশ্বাস অনেকাংশে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং একজনের নিকট যাহা দুর্নীতিমূলক, অপর একজনের নিকট তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। অস্পৃশ্যতাকে অনেকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করেন, অনেকে করেন না।

৪। আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক বিধি অনির্দিষ্ট

এইভাবে আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হইলেও উভয়ের মধ্যে আজও গভীর সম্পর্ক বর্তমান আছে, এবং চিরকালই থাকিবে। আইন ও নৈতিক সূত্র উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উভয়ে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে বাধ্য। সমাজের ন্যায়বোধ—অর্থাৎ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। আইনও আবার কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। পূর্বে যে আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথার বিলোপের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই সুনীতি-আহ্বানেরও অন্যতম উদাহরণ।* কিন্তু আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র যদি জোর করিয়া সহসা কোন নৈতিক ধারণা সমাজের উপর চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সে-আইনকে বলবৎ করা কঠিন। উদাহরণ-স্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ লোক মদ্যপানকে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করা অসম্ভব। এই কারণে অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে আইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই। সুতরাং আইনের কার্যকারিতা সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এইজন্য আইন প্রণীত হয় নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। অবশ্য প্রচলিত নীতি যদি বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে তবে আইনের মাধ্যমে উহার পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা না করিলে রাষ্ট্র কখনই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সামগ্রিক কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে এখনও গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে

স্বাধীনতা (Liberty): আইনের পরই স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে; অপরদিকে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আইন স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী নহে; বরং আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি। এই কারণে স্বাধীনতার স্বরূপ এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

আইন স্বাধীনতার বিরোধী নহে

স্বাধীনতার স্বরূপ (Nature of Liberty): স্বাধীনতা অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (political ideal)। এই আদর্শ যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তবে স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়াছে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীকদের অনুসরণে প্রাচীন-কালে স্বাধীনতা বলিতে বুঝাইত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুসরণের জন্য বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি বাধাবিহীনভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকিতে পারে তবেই সে স্বাধীন। স্বাধীনতার এই অর্থ গ্রহণ করা হইলে আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী হিসাবে

স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

* ৮৬ পৃষ্ঠা।

গণ্য করিতে হইবে, কারণ আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিয়া তাহার কার্যাবলী নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা

কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা না বুঝাইয়া এমন একটি পরিবেশকে (atmosphere) বুঝায় যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি সেইরূপ পরিবেশ রক্ষার কথা বলিতেছি যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।"*

স্বাধীনতা অধিকারের ফল

অতএব, বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। এই পরিবেশের সৃষ্টি হয় অধিকারের দ্বারা। সুতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল।**

বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। স্বাধীনতা হইল আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। আত্মবিকাশের বিশেষ বিশেষ সুযোগসুবিধা বা অধিকারের অস্তিত্ব থাকিলে তবেই এই পরিবেশ সৃষ্ট হয়। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে অধিকারভোগের উপর। আমার যদি স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থাকে, তবেই আমার গতিবিধির স্বাধীনতা থাকিতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন অধিকার যখন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তির আত্মবিকাশের সহায়ক হয়, তখনই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে।

স্বাধীনতা বলিতে যে অধিকার বুঝায় তাহা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইবে

দেখা গেল, স্বাধীনতা বলিতে বাধানিষেধ রহিত অবস্থা বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় না—বুঝায় অধিকারের অস্তিত্ব।† এক দিক দিয়া কিন্তু স্বাধীনতাকে 'নিয়ন্ত্রণবিহীনতা' বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা দ্বারা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় না, বুঝায় আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা বা অধিকারের উপর বাধানিষেধ সম্পূর্ণভাবে অপসারিত থাকা। অর্থাৎ, যে যে অধিকার স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি করে তাহারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না; হইলে স্বাধীনতা সংকুচিত হইয়া পড়িবে। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার সীমাবদ্ধ অধিকার হইলে গতিবিধির স্বাধীনতাও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না।

ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতা থাকিলেই যে ব্যক্তি তাহার পূর্ণ আত্মবিকাশে সমর্থ হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষ স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের সুযোগসুবিধার যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। বাক্-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি সরকারের সমালোচনায় বিমুখ থাকিয়া সরকারকে স্বৈরাচারী হইবার সুযোগ প্রদান করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে

* By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves.

** "Liberty is a product of rights." Laski

† Liberty implies not the absence of restraints but the presence of rights.

স্বাধীনতা হইয়া উঠে নিরর্থক। এইজন্যই ইংরাজ লেখক ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold) বলিয়াছেন, "যদি আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না করিতে পারি তবে স্বাধীনতা পাই বা না-পাই তাহাতে কিছু যায় আসে না।" সুতরাং স্বাধীনতা প্রদান করা যেরূপ রাষ্ট্রের কর্তব্য, ইহার যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা ইহাকে সার্থক করিয়া তোলাও তেমনি ব্যক্তির কর্তব্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ব্যক্তির যদি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অধিকার থাকে তবে ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার দায়িত্ব বা কর্তব্যও তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

ব্যক্তি যদি স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারে তবেই উহা সার্থক হয়

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty): রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে তবেই স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারে। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। এইভাবে স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং আইনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহাকে আইনসংগত স্বাধীনতা (Legal Liberty) বলা হয়। আইনসংগত বলিয়া এরূপ স্বাধীনতা অব্যাহত বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না, কারণ আইনের অর্থই নিয়ন্ত্রণ—সকলের জন্য ব্যক্তির যথেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ। সকলকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যেই আইন দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইংরাজ লেখক বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।" কারখানার মালিকের পক্ষে যেমন শ্রমিকের কাযের সর্ত নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি শ্রমিকের পক্ষেও সে যে-কাযে নিযুক্ত হইবে তাহার সর্তাবলী—যথা, মজুরি, কয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইবে, ইত্যাদি—নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। শ্রমিকের এই স্বাধীনতা না থাকিলে শ্রমিক একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, সে তাহার আত্মশক্তিকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইবে না। সুতরাং মালিকের স্বাধীনতা ও শ্রমিকের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে; শ্রমিকের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেই মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে হইবে।

স্বাধীনতা আইন ও রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল

আইনসংগত স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মবিকাশের জন্য স্বাধীনতা যখন প্রত্যেকের পক্ষেই প্রয়োজনীয় তখন ইহা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। বস্তুত, নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বজায় থাকে না। আইনই এই নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করে বলিয়া আইন স্বাধীনতার ভিত্তি।

আইন স্বাধীনতার ভিত্তি

যাঁহারা আইনকে স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতাকে তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। যথেচ্ছাচারিতার ফলে কয়েকজনের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু

অধিকাংশেরই আত্মবিকাশ হয় ব্যাহত। শিল্পপতির যথেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা থাকিলে শ্রমিকের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্পপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট কাযের সর্ত মানিয়া লইতে হইবে, তাহাকে যে-কোন মজুরিতে কার্য করিতে হইবে। আবার যদি ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অব্যাহত হয় তবে এক ধর্মসম্প্রদায়ের উগ্র আচরণের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঐ স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। এই-ভাবে অব্যাহত বা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ফলে দুর্বল সবলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, ব্যক্তির লোভে সমষ্টির স্বার্থহানি ঘটে।

আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় থাকে না

তাই প্রয়োজন হইল আইনের। আইন সকলের অধিকার ও আচরণের সীমা নির্দেশ করিয়া সবলের লোভের কবল হইতে দুর্বলকে রক্ষা করে। ইহার ফলে সকলের পক্ষেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই হইল সকলের আত্মবিকাশে সহায়তা করা—মাত্র কয়েক-জনের নহে। সুতরাং আইনই স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় রাখে। আইনই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ। তবে আইনের পক্ষে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ উহা সকলের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সমর্থ হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, ক্রীতদাস প্রথার যুগে আইনের ফলে ক্রীতদাস-মালিকদেরই সুবিধা হইত, ক্রীতদাসের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইত না।

আইনই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty): এতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতার যে-রূপ লইয়া আলোচনা করা হইল তাহাকে ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা বা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক আছে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। উপরন্তু, ব্যক্তির ন্যায় জাতির পক্ষেও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই শেষোক্ত স্বাধীনতাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা' বলা হয়। নিম্নে স্বাধীনতার এই সকল রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক

১। **সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty):** সমাজজীবনে ব্যক্তির পক্ষে যে-স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় তাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলা হয়। সামাজিক অধিকারগুলি (Civil Rights) ভোগের দ্বারাই এই স্বাধীনতা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, অপরের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি বুঝায়।

সামাজিক অধিকার সামাজিক স্বাধীনতার উপাদান

২। **রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty):** রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। নাগরিক-জীবনে এই স্বাধীনতা সামাজিক স্বাধীনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, রাষ্ট্রনৈতিক দল-গঠনের অধিকার, সরকারী কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান

৩। **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) :** সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় অন্নসংস্থান ব্যাপারেও ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার এই তৃতীয় রূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নামে অভিহিত। ইহা দ্বারা বুঝায় নাগরিকের পক্ষে অভাব-অনটনের ভাবনা ও সর্বদা বেকারত্বের ভয় হইতে মুক্তি এবং পর্যাপ্ত অবসর। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে প্রত্যেককে উপযুক্ত মজুরি ও পর্যাপ্ত অবসর প্রদান করিতে হইবে, বেকারত্বের ভাবনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে। অন্নচিন্তাতেই মানুষের যদি দিন কাটিয়া যায়, উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও যদি সে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিতে পারে, বেকার হইবার ভয়ে তাহাকে যদি সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় তবে তাহার নিকট মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, নির্বাচনাধিকার প্রভৃতির কোনই মূল্য থাকে না। এই কারণে সমভোগবাদীরা (Communists) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন

৪। **জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) :** অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও জাতীয় স্বাধীনতা অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে দেশ বা জাতির সর্বপ্রকার মুক্তি। দেশ পরাধীন থাকিলে ব্যক্তির পক্ষে আত্মবিকাশের সহায়ক অধিকারসমূহ ভোগ করা সম্ভব হয় না। মাত্র স্বাধীন দেশের লোকই পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে পারে। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল জাতীয় স্বাধীনতার—অর্থাৎ, বৈদেশিক অধীনতা হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অবস্থার।

জাতীয় স্বাধীনতা অন্য প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty) : আমরা দেখিয়াছি যে, রাষ্ট্রশক্তি আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয় সরকারের দ্বারা; সরকার আমাদের মতই সাধারণ লোক লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতার আসনে বসিয়া অনেক সময় জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে ইহার বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইজন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীনতারক্ষার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার। ইহাদিগকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (safeguards) বলা হয়।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কাহাকে বলে

স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হইল শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) লিখিতভাবে গৃহীত হওয়া। মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে গৃহীত হইলে উহাদের একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে। জনসাধারণ জানিতে পারে যে তাহাদের অধিকার কি কি। নির্দিষ্ট অধিকার ভংগ করা হইলে আদালতে প্রতিবিধানেরও

১। মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা অন্যতম রক্ষাকবচ

ব্যবস্থা থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আদালতের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকেও স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু পূর্ণ অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্ভব বা কাম্য—কোনটাই নহে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। তবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা হইল বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। এ-সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ—ইহা প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

'আইনের অনুশাসন'ও (Rule of Law) স্বাধীনতার একটি প্রধান রক্ষা-কবচরূপে পরিগণিত হয়। 'আইনের অনুশাসন' বলিতে মোটামুটি দুইটি জিনিস বুঝায়—(১) আইনানুসারে শাসন, এবং (২) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। অর্থাৎ, সরকার যে-সকল ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা আইন-প্রদত্ত হইবে এবং সকলের জন্যই একই প্রকার আইন থাকিবে। সুতরাং বেআইনী-ভাবে কাহারও স্বাধীনতা খর্ব করা যাইবে না; এবং একই প্রকার অপরাধ করিলে সকলকে একই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত না হইলেও এইভাবে আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষিত করা হয়।

৩। আইনের অনুশাসন

তবুও বলা যায়, আইনের অনুশাসন স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। কারণ, আইন-প্রদত্ত ক্ষমতারও অপব্যবহার হইয়া থাকে এবং বর্তমান দিনের ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইন পক্ষপাতহীন হইতে পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-সমাজে ধনী-দরিদ্র উভয়ই আছে সে-সমাজের আইনে ধনীদেরই সুবিধা হয়, দরিদ্রদের নহে।

ইহাও প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

অনেকের মতে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ জনপ্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং আইনসভায় বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা সরকারের দোষত্রুটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে। এই দুই কারণে সরকার জন-স্বাধীনতা হরণ করিতে সাহসী হয় না।

৪। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য বর্তমানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়* তাহাদিগকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে এই সকল পদ্ধতি বিশেষ অনুসৃত হইতে পারে না বলিয়া ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য বিশেষ নাই।

৫। গণভোট, গণ-উদ্যোগ প্রভৃতি

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল স্বাধীনতাকামী নাগরিক সম্প্রদায়। এইরূপ নাগরিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার জন্য উগ্র আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য

---

* ১০২ ১০৩ পৃষ্ঠা দেখ

তীব্র আবেগ থাকিবে। বিনামূল্যে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না—ইহার সংরক্ষণের জন্য মূল্য দিতে হয়। নাগরিকগণের চিরন্তন সতর্কতাই এই মূল্য। স্বাধীনতাকামী নাগরিক সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোনরূপে স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে অবিলম্বে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রয়োজন হইলে সেই সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জনও দেয়। এইজন্য গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles) বলিয়াছেন, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য" এবং "সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র"।*

৬। স্বাধীনতাকামী নাগরিকগণই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ

ল্যাস্কি বলেন, সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইলেও ইহার প্রকাশের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি হইল এই সকল ব্যবস্থা। সুতরাং এগুলিও থাকা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

সংঘবদ্ধ জীবনের পক্ষে নিয়মকানুন অপরিহার্য। যে-সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত এবং প্রযুক্ত হয় তাহাদিগকে আইন বলে।

আইনের সংগে অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুনের পার্থক্য এইখানে যে আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্রশক্তি দণ্ডপ্রদান করে; কিন্তু অন্য কোন নিয়মকানুন ভংগ করিলে রাষ্ট্র-প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না—কেবল সামাজিক অবমাননা সহ্য বা অনুশোচনা ভোগ করিতে হইতে পারে।

আইনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়: ১। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে; ২। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন নিয়মকানুনই আইনে পরিণত হয় না।

আইনের উৎস: আইনের উৎস প্রধানত ছয়টি—(ক) প্রথা, (খ) ধর্ম, (গ) বিচারের রায়, (ঘ) ন্যায়বিচার, (ঙ) পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা, এবং (চ) আইন প্রণয়ন।

আইন ও নীতি: অতীতে আইন ও নীতি অভিন্ন ছিল। পরে অবশ্য উভয়ে পৃথক হইয়া পড়ে। বর্তমানে ১। উভয়ের পরিধি এক নহে, ২। উভয়ের উদ্দেশ্য পৃথক, এবং ৩। প্রয়োগের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

তবুও আইন ও নীতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অধিকাংশ সময় রাষ্ট্রের আইন রচিত হয়; আইন আবার কুনীতিকে দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে।

স্বাধীনতা: স্বাধীনতা বলিতে যথেচ্ছাচারিতা বুঝায় না—বুঝায় আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণের দ্বারা। সুতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল।

যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে না পারিলে স্বাধীনতা নিরর্থক।

আইন ও স্বাধীনতা: স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইন ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তি আইনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করিয়া স্বাধীনতাকে প্রকৃত বা সার্থক করিয়া তুলে। তবে আইনের পক্ষে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ: স্বাধীনতা প্রধানত দুই প্রকারের—ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায় বা জাতিগত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জাতিগত স্বাধীনতাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক আছে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। অপর সকল প্রকার স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল।

* "Eternal vigilance is the price for liberty" and "secret of liberty is courage."

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ : স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু শাসকবর্গ ক্ষমতার আসনে বসিয়া আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অকাম্য আইন প্রণয়ন দ্বারা এবং অন্যান্যভাবে জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণে মনোযোগী হইতে পারেন। এইজন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ বিশেষ রক্ষাকবচের।

নিম্নলিখিতগুলিই স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ :

১। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ, ২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ৩। আইনের অনুশাসন, ৪। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা, ৫। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, এবং ৬। স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you define Law? What are the different sources of Law?

কিভাবে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? আইনের উৎস কি কি?

2. Define Law. Indicate the connection between Law and Morality.

আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন ও নীতির মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে দেখাও।

3. How would you define Liberty? Distinguish between different forms of Liberty.

কিভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

4. Examine the relation between Law and Liberty.

আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—

"Law is the condition of Liberty."—Explain.

"আইন স্বাধীনতার সর্ত।"—ব্যাখ্যা কর।

5. What is meant by Liberty? How is it related to Law?

স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়? আইনের সংগে উহার সম্পর্ক কি?

6. Define Liberty. What are its main safeguards?

স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ কি কি?

নবম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

(Forms of Government)

এ্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া ইহার বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক বলিয়া—সকল রাষ্ট্র জনসমষ্টি, ভূখণ্ড প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া—এই শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক হয় নাই। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সরকারেরই বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়া থাকেন।

সরকারের শ্রেণী-বিভাগ: একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র

সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার* শ্রেণীবিভাগে প্রথমে দেখা হয় যে শাসনক্ষমতা একজন না বহুজনের হস্তে ন্যস্ত। ক্ষমতা একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে সরকারকে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), এবং বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে উহাকে গণতন্ত্র (Democracy) বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

গণতান্ত্রিক সরকারের দুইটি রূপ: এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারে কেন্দ্রীভূত থাকিলে উহাকে এককেন্দ্রিক সরকার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বন্টিত হইলে উহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ড ও ভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। অপরদিকে ভারতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্র বা ইউনিয়ন সরকার (Union Government) এবং পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসামের ন্যায় রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বন্টিত। সুতরাং ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়।

এখন সরকারের এই চারিটি রূপ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সমাজ

১। গণতন্ত্র (Democracy): 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায় যাহা পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ সমাজ জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে কোনরূপ মর্যাদা দেয় না, বলপ্রয়োগ বা শোষণকে কোনরূপ সমর্থন করে না। এইরূপ সমাজে সকলেরই দায়িত্ব রহিয়াছে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার ; এবং সমাজের উন্নতিকল্পে সকলের প্রচেষ্টাকেই সমান মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়। এইভাবে একমাত্র সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে। সংকীর্ণ

---

* ইংরাজী শব্দ Government-এর বাংলা 'সরকার' ও 'শাসন-ব্যবস্থা' দুইই করা হয়।

অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় 'গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা'। ইহা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বা সকলের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান নাও মিলিতে পারে।

সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সরকার

সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ, গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার। এই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government):

শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় জনগণের শাসন (rule of the people)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম্ লিংকনের মতে, গণতন্ত্র ইহার উপর জনগণের দ্বারা (by the people) এবং জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য (for the people) শাসন। এই তিনটিকে মিলাইয়া রাষ্ট্রপতি লিংকন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সুপ্রচলিত হইয়াছে। লিংকনের ভাষায়, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হইল "জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন (সরকার)*।"

লিংকন-প্রদত্ত সুপ্রচলিত সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন উঠে যে জনগণ বলিতে কি বুঝায়? জনগণ বলিতে 'কখনই দেশের সকল লোককে বুঝায় না, অধিকাংশকেই বুঝায় মাত্র।' এমন শাসন-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই যাহাতে দেশের সমগ্র জনসাধারণ অংশগ্রহণ করিয়াছে। নাবালক উন্মাদ সমাজদ্রোহী প্রভৃতিকে কখনই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। এই কারণে অধ্যাপক ডাইসি (Prof. A. V. Dicey) গণতন্ত্রের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয় বিবেচিত হয়। ডাইসির মতে, জনসাধারণের অধিকাংশই যদি শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে তাহাই গণতন্ত্র। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা জনগণ বা সম্প্রদায়ের সকলের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। কারণ, সম্প্রদায়ের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সম্প্রদায়ের সকলে একমতাবলম্বী নহে বলিয়া নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনভার প্রাপ্ত হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি:
১। ইহা 'জনগণের শাসন'

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত বলিয়া শাসনক্ষমতা নাগরিক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু সকল নাগরিক একমতাবলম্বী নয়। এই কারণে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলই শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

---

* "...government of the people, by the people, for the people."

২। কার্যক্ষেত্রে ইহা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মাত্র

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'জনগণ' বলিতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; এবং স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক শাসন হইল সংখ্যা-গরিষ্ঠের শাসন, সর্বসাধারণের নহে।

৩। কিন্তু শাসনকার্য পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে

এইভাবে শাসনকার্যের পরিচালনার ভার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর ন্যস্ত থাকিলেও শাসনকার্য কিন্তু পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থেই নহে। গণতান্ত্রিক সরকার কোন অবস্থাতেই সংখ্যালঘিষ্ঠের মংগলকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ফলে এই শাসন-ব্যবস্থা সকলেরই প্রিয়; এই কারণে ইহাকে 'জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা'ও (Popular Form of Government) বলা হয়।

৪। এই শাসন-ব্যবস্থা সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত

গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের শাসনক্ষমতায় আস্থাবান। 'রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য' বলিতে বুঝায় সকলেরই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সমান সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা প্রদান করাই গণতান্ত্রিক আদর্শ। কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণী একচেটিয়াভাবে শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশবিক বলের উপর নয়। এই কারণে শাসনকার্য সর্বদাই জনমতের অনুকূলে পরিচালিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা' (Government based on Public Opinion) বলিয়াও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Direct and Indirect or Representative Democracy): বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক সরকারের সাক্ষাৎ আমরা পাই—যে গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহা হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)। ইহা ছাড়া গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধও (Direct or Pure) হইতে পারে।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হইতে পারে

প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যাহাতে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র নাগরিক কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিত। সময় সময় তাহারা আবার বিচারের ব্যবস্থাও করিত। এইভাবে শাসনকার্য নাগরিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইত। নির্বাচন বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

প্রাচীনকালের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতেও নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতে এইরূপ নগর-রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি সিন্ধু নদের দুই তীরে বহুসংখ্যক নগর-রাষ্ট্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেখানে তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও ভারতের নগর-রাষ্ট্রে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র এবং জনসংখ্যা স্বল্প হইলে এখনও এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ক্ষুদ্র নহে, জনসংখ্যাও স্বল্প নহে। সুতরাং বর্তমান যুগে এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। ফলে মাত্র সুইজারল্যাণ্ডের 'কয়েকটি ক্যাণ্টন' ও 'অর্ধ-ক্যাণ্টনে'* এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্যে (States) এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

আধুনিক কালের পরোক্ষ গণতন্ত্র

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে না—পরোক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় এই প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্র হইল সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যেখানে "জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন-ক্ষমতার ব্যবহার করে।" নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভায় জনমতের অনুকূলে আইন পাস করেন এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করেন।

শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণও হয় নাগরিকগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন, না-হয় আইনসভার প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহারাও জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। প্রতিনিধি যদি জনমতের বিরুদ্ধে কার্য করেন, তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহার নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তিনি জনমতের সপক্ষে কার্য করিতে সচেষ্ট থাকেন।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের ত্রুটি

অবশ্য প্রতিনিধি যে সকল সময় জনমতের অনুকূলেই কার্য করিবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। নির্বাচিত হইয়া তিনি জনমতের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিবার জন্য নির্বাচকগণকে পুনর্নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করিতে হয়। এই কারণে অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহাতে প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ সর্বদা বজায় থাকে। প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পন্থা প্রধানত তিনটি—গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), এবং পদচ্যুতি (Recall)। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলা হয়।

ত্রুটির প্রতিবিধান—প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ :

গণভোট পদ্ধতির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহকে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের দ্বারা পাস করানো বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক

* সুইজারল্যাণ্ডে প্রদেশগুলি 'ক্যাণ্টন' (Cantons) এবং ক্ষুদ্রাকার প্রদেশগুলি 'অর্ধ-ক্যাণ্টন' (Half-Cantons) নামে অভিহিত। ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ১৯ ও ৬।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ অনুমোদন করিলে তবেই ইহা আইনে পরিণত হইবে। এককথায় বলা যায় যে, গণভোটের ব্যবস্থা থাকিলে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হস্তেই থাকে, প্রতিনিধিগণের নিকট হস্তান্তরিত হয় না।

১। গণভোট

গণ-উদ্যোগ বলা হয় সেই ব্যবস্থাকে যেখানে নির্বাচকগণ উদ্যোগী হইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে যে নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে তবে আইনসভা সেই আইন পাস করিতে বাধ্য হইবে।

২। গণ-উদ্যোগ

পদচ্যুতির ব্যবস্থা থাকিলে নির্বাচকগণ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে যে প্রতিনিধি তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কায করিতেছেন, তবে প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হয়। এইভাবে পদ্ধতিগুলি দ্বারা আজিকার দিনের বৃহৎ রাষ্ট্রে বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার প্রচেষ্টাই করা হয়।

৩। পদচ্যুতি

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Defects of Democratic Government): সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইলে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কারণ, একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া শাসনযন্ত্র সকলের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে যাহা মংগলজনক সেইরূপ কার্যই গণতন্ত্রে সম্পাদিত হয়; জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর আইনই গণতন্ত্রে প্রণীত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনস্বার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; করিলে তাহাদের পক্ষে পুনরায় নির্বাচিত হইবার আশা থাকে না।

গুণ:

১। একমাত্র গণতন্ত্রই সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারে

এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, একমাত্র গণতন্ত্রেই ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ন্যায় ও সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। এই কারণে প্রকৃত ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব। একনায়কতন্ত্রে আলাপ-আলোচনার কোন সুযোগ নাই, ভাব-বিনিময়ের কোন ক্ষেত্র নাই। সেখানে একনায়কের মতকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

২। একমাত্র এই শাসন-ব্যবস্থাতেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

গণতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই অধিকার রহিয়াছে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার, অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার। এইজন্য একমাত্র গণতন্ত্রেই সুন্দর ও সার্থক জীবন সম্ভবপর হয়।

৩। ইহা স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত

গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে। গণতন্ত্রে ধনী ও দরিদ্রে, অভিজাত ও অভাজনে, উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণে কোন ভেদ নাই। এখানে সকলেই সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। ধনীরও একটি ভোট, দরিদ্রেরও একটি ভোট; ধনীর নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে, পথচারী দরিদ্রেরও নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে।

৪। ইহা সাম্যকেও সমর্থন করে

গণতন্ত্র সকলকে সমান মর্যাদা দিয়া সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। সকলে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহাদের দেশপ্রীতি গভীর হয় এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। কেহ যখন কাহারও অপেক্ষা কম নহে তখন দেশরক্ষা সকলেরই দায়িত্ব, রাষ্ট্রের উন্নয়ন সকলেরই কর্তব্য—এইরূপ ধারণা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া জাতীয় জীবনকে মংগলের পথে লইয়া যায়। জনসাধারণও শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ফলে উত্তরোত্তর রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠে। মিলের মতে, সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাপ্রদান করাও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সাধন করে।

৫। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে

পরিশেষে, গণতন্ত্রে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের আশংকা বিশেষ থাকে না। গণতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ ইহা বুঝে যে রাষ্ট্র তাহাদেরই রাষ্ট্র, সরকার তাহাদেরই সরকার। বর্তমানে যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা তাহাদের প্রতিনিধি; সুতরাং আজ্ঞাবাহী। সৈন্যসামন্ত, পুলিস, চৌকিদার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি তাহাদেরই ভৃত্য। এই কারণে জনসাধারণ আইনকানুন স্বেচ্ছায় পালন করে। আর যদি তাহারা দেখে সরকার অন্যায় করিতেছে, অযৌক্তিক আইনকানুন পাস করিতেছে তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাহারা সরকার গঠনকারী ঐ দলকে সরাইয়া দিয়া অন্য দলের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণ যদি কংগ্রেস দলের শাসন পছন্দ না করে, তবে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে সরাইয়া অন্য এক দলকে গদিতে বসাইতে পারে। সহজে শাসক-পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে না।

৬। ইহা বিপ্লবের আশংকা হইতে অনেকাংশে মুক্ত

উপরি-উক্ত গুণাবলী সত্ত্বেও গণতন্ত্র বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারে নাই।

ত্রুটি:

এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে, গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসন। ইঁহারা বলেন, শাসন-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে শাসকবর্গের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবিবেচনার উপর। কিন্তু গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। ইহা সকলকেই সমান জ্ঞান করে বলিয়া অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই সাধারণত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে দেখা যায়। সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে, গণতন্ত্র "সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্যের শাসন, কারণ এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় অধিক।"

১। গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন বলিয়া অভিযোগ

ইহাও বলা হইয়াছে যে অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসন বলিয়া গণতন্ত্র বিশেষভাবে রক্ষণশীল। নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন ধ্যানধারণা অশিক্ষিত শাসকবর্গ এবং জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না। ফলে শাসনযন্ত্র পুরাতন পদ্ধতিতেই চলে।

২। ইহা রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা

গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহাও সমালোচকগণের মতে ভুল। বলা হয় যে জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিতে পারে না। প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তাহার কোনটাই সাধারণ লোকের থাকে না। সুতরাং তাহারা গতানুগতিক পথে চলে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে সকলপ্রকার কার্য ও মতামত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে গণতন্ত্রে দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণের আধিক্য। এই নিয়ন্ত্রণাধিক্যের জন্য জনসাধারণের স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হয়।

৩। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক

দলপ্রথা গণতন্ত্রের অংগ। এই কারণে গণতন্ত্রে অপচয় দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়। প্রথমত, নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বিরাট ব্যয় হয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মিতব্যয়িতার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। শাসকবর্গ জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় করিয়াও জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে আবার শাসকবর্গ এবং সাধারণ লোক সকলেই রাষ্ট্রের মংগল অপেক্ষা নিজ দলের স্বার্থের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখে। এই সকলের ফলে জাতীয় কল্যাণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। গণতন্ত্রে পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত থাকায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের পক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার বিশেষ সুবিধা হয়। এই কারণে গণতান্ত্রিক সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। গণতন্ত্রের স্থায়িত্বে সন্দেহ

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইল যে এই শাসন-ব্যবস্থা চারুকলা বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের উন্নতির পরিপন্থী। যে-জনসাধারণ গণতন্ত্রে ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের নিকট এই সকল বিষয়ে প্রগতির কোন মূল্যই নাই। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া তাহারা নিম্নস্তরের সাহিত্য, নিম্নস্তরের শিল্পকলারই পৃষ্ঠপোষকতা করে। ফলে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সৃজনীশক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না এবং গণতান্ত্রিক সভ্যতা 'গদ্য, সাধারণ ও স্থূল' (banal, mediocre and dull) হইয়া দাঁড়ায়।

৬। গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে নিম্নস্তরের বলা হয়

আরও বলা হয় যে বিপৎকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে গণতন্ত্র বিশেষ কার্যকর নহে। গণতন্ত্রে শাসক সংখ্যায় বহু বলিয়া প্রতি পদে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়। ইহাতে শাসনযন্ত্র মন্থরগতি হইয়া পড়ে, এবং বিপদের সময় জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

৭। ইহা জরুরী অবস্থার উপযোগী নহে

পরিশেষে, গণতন্ত্র পুঁজিবাদের (Capitalism) প্রশ্রয় দেয় বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। সংজ্ঞা অনুসারে এবং তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সরকার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা ধনী ও মূলধন-মালিকদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য থাকিলেও অর্থনৈতিক সাম্য থাকে না। ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

৮। ইহা পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে (Conditions for Success of Democracy) : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যে বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গণতন্ত্র যে ত্রুটিবিহীন শাসন-ব্যবস্থা সে-কথাও বলা চলে না। আদর্শের দিক দিয়া গণতন্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু এই সকল আদর্শকে উপলব্ধি করিয়া গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তোলা বিশেষ কঠিন।

গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন হইল 'গণতান্ত্রিক জনগণের' (democratic men)। 'গণতান্ত্রিক জনগণ' বলিতে মিল এরূপ জনসাধারণকে বুঝিয়াছিলেন (১) যাহাদের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে; (২) যাহারা কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নহে; (৩) যাহারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে সদা প্রস্তুত। সুতরাং গণতন্ত্র প্রবর্তন করিলেই উহা সাফল্যলাভ করে না। জনসাধারণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী হইলে তবেই উহা সফল হইয়া উঠিতে পারে।

১। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জনগণের

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট হইতে বুঝাপড়াও দাবি করে। কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া লইতে হইবে। অপরদিকে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষেও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে তবেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে।

২। গণতন্ত্র বুঝাপড়াও দাবি করে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে জনমতই প্রকৃত শাসক বলিয়া জনমত প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইহা না থাকিলে জনগণের পক্ষে শাসকবর্গকে কোনরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া 'জনগণের শাসন' মিথ্যায় পরিণত হইতে পারে।

৩। জনমত প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন

পরিশেষে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হইল জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারের। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার, উপযুক্ত মজুরি পাইবার অধিকার, বেকারত্ব হইতে মুক্তির অধিকার, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অধিকার, ইত্যাদি। এগুলি না থাকিলে লোক ভোটাধিকার লইয়া কি করিবে? নাগরিক যদি দৈনন্দিন অভাব মিটাইতেই সকল সময় ব্যস্ত থাকে তবে সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া কখন চিন্তা করিবে?

৪। এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ অপরিহার্য

কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নাগরিককে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা যায় না। শ্রমিককে যথাযোগ্য মজুরি প্রদান করিতে হইলে নিয়োগকর্তার স্বাধীনতা খর্ব করিতে হয়। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে ইহাই করিতে হইবে; বহুর কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। এরূপ করিলে তবেই সাধারণ নাগরিক গণতন্ত্রে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবে; এবং তখনই গণতন্ত্র হইয়া উঠিবে প্রকৃত জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা (Popular Form of Government)।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship): একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে, একনায়কতন্ত্রে ন্যস্ত থাকে মাত্র একজনের হস্তে। একনায়কতন্ত্রে একনায়কই (Dictator) একমাত্র শাসক; অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা একনায়কের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র।

একনায়কতন্ত্রের অর্থ

প্রাচীনকালে রাজার হস্তেই শাসনের চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিত। এরূপ রাজতন্ত্রকে চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) বলা হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই চরম রাজতন্ত্রও একনায়কতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে 'একনায়কতন্ত্র' শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের নায়ক—উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনপ্রাপ্ত রাজা নহেন। এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক দলের নায়ক প্রথমে বিপ্লবের সাহায্যে বা নির্বাচনের ফলে ক্ষমতা অধিকার করেন। তারপর সকল বিরোধী দলের বিলোপসাধন করিয়া নিজ দলের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দলের মধ্যেও তিনি আর কোন নেতাকে মাথা তুলিতে দেন না। এইভাবে ক্রমে তিনি হইয়া দাঁড়ান দল ও দেশের একমাত্র নায়ক বা একনায়ক। একনায়কগণের প্রত্যেকের নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে বলিয়া গণতান্ত্রিকতার কিছুটা আভাস একনায়কতন্ত্রে পাওয়া যায়।

তবুও বলা যায়, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণ শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শাসকই জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। মানুষে মানুষে সাম্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনমতের প্রাধান্য প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান একনায়কতন্ত্রে পাওয়া যায় না; ইহাদের পরিবর্তে দেখা যায় একদলীয় শাসন, দলের উপর একনায়কের একাধিপত্য, মূল্যহীন ভোটাধিকার, জনমত নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত ও তরবারির নীতি অনুসরণ।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় এবং অনেক সময় তাহাদিগকে দমনও করা হয়। অপরদিকে আবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতার সম্ভাবনা লুপ্ত করা হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠের দমনের জন্য, জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হইলে গুলিগোলা জেল নির্বাসন প্রভৃতি সবকিছু ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়।

গণতন্ত্র
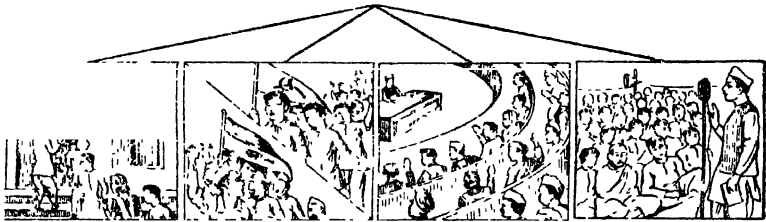
স্বাধীন নির্বাচন বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা জনমতের প্রাধান্য

একনায়কতন্ত্র
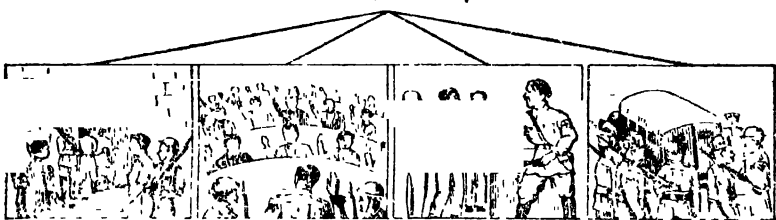
মূল্যহীন জোটোন্দিগের একদলীয় শাসন নায়কের একাধিপত্য রক্তাক্ত নীতি

গুণাগুণ ঃ একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রের যাহা ত্রুটি একনায়কতন্ত্রের তাহা গুণ এবং গণতন্ত্রের যাহা গুণ একনায়কতন্ত্রের তাহা দোষ। প্রথমে গুণ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একনায়কতন্ত্রে বহুজনের কুশাসনের পরিবর্তে একজনের সুশাসনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। নানা মুনির নানা মতের ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে-বিশৃংখলার সম্ভাবনা থাকে, একনায়ক সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং কর্মক্ষম হইলে সে-আশংকা দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে দলীয় বিরোধ না থাকায় অপব্যয়, দলীয় স্বার্থসাধন প্রভৃতি রহিত হইয়া দেশের সর্বাংগীন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তৃতীয়ত, বিপদের সময় এবং জরুরী অবস্থায় একনায়ক দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, বহুজন-শাসিত গণতন্ত্রে যাহা সম্ভব হয় না। পরিশেষে, জনমতের জোয়ারভাঁটার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মত একনায়কতন্ত্রে সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন ঘটে না। সরকারের এই স্থায়িত্বের ফলে একনায়কতন্ত্রে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষ নীতি অনুসৃত হইতে পারে।

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন ব্যবস্থা বলিয়া উভয়ের গুণাগুণ বিপরীত

একনায়কতন্ত্রের গুণ

অপরদিকে কিন্তু একনায়কতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়। শাসন-ব্যবস্থায় কোথায় গলদ তাহা তাহারা জানিতে পারে না; জানিতে পারিলেও সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারে না। একনায়কতন্ত্রে শুধু এই

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই নহে, অন্যান্য স্বাধীনতা ও মানুষে মানুষে সাম্যও অস্বীকৃত হয়। সকলেরই যে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহা মোটেই মানিয়া লওয়া হয় না। ফলে নাগরিকের আত্ম-বিকাশ ব্যাহত হয়; রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাহার আকর্ষণ গভীর হইতে পারে না। একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে সে বিদেশী সরকারের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিখে। এই সরকারের পরিবর্তন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলিয়া পরিবর্তন প্রয়োজনীয় মনে করিলে লোকে বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে একনায়ককে সর্বদা সচেতন হইয়া থাকিতে হয়, বিপ্লবের কানাঘুষা চলিতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য বহু গুপ্তচর পোষণ করিতে হয়। এই বাবদ অর্থের অপচয় ছাড়াও গুপ্তচরদের কার্যকলাপের ফলে সাধারণ লোকের জীবন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

ত্রুটি

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে ত্রুটি সত্ত্বেও একনায়কতন্ত্রে মোটামুটি সুশাসনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে। কারণ, লোকে মাত্র সুশাসনই চায় না, নিজস্ব শাসন বা স্বায়ত্তশাসনও চায়।*

একনায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ (Two Modern Forms of Dictatorship): সাম্প্রতিক একনায়কতন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীর ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Fascist Dictatorship) এবং জার্মেনীর নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Nazi Dictatorship) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্যাসীবাদ প্রচারের সাহায্যে মুসোলিনী এবং নাৎসীবাদের সাহায্যে হিটলার যথাক্রমে ইতালী ও জার্মেনীর সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়ান।

ক। ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র,
খ। নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র

হিটলার

মুসোলিনী

মুসোলিনী গণতন্ত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই যে সুশাসন হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে এমন

* "Good government is no substitute for self-government." H. C. Bannerman

ব্যক্তি থাকিতে পারেন যিনি শাসন পরিচালনার কার্যে যোগ্যতম। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির সন্ধান করিয়া তাঁহার হস্তেই শাসনকার্য পরিচালনার ভার দিতে হইবে। নির্বাচনের প্রয়োজন নাই, আইনসভার বিতর্কও নিরর্থক; শাসনকার্য পরিচালনার ভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে পূজা করাই জনসাধারণের কর্তব্য।

হিটলারও গণতন্ত্রের ধ্বংস করিয়া নেতৃপূজার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। হিটলারই সমগ্র জার্মান জাতির নেতা হইয়া দাঁড়ান; এবং তাঁহার অধীনে নাৎসী দল (Nazi Party) জার্মেনীকে পরিচালিত করিতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইতালী ও জার্মেনী উভয় দেশেই একনায়কতন্ত্র ধ্বংস হইয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে একনায়কতন্ত্র পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; অন্তত ফ্রাংকোর অধীনে স্পেনে ইহা আবার মাথা তুলিয়াছে।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Unitary and Federal Governments): বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ (Nation States) অতি বৃহদায়তন বলিয়া অনেক সময় একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশ শাসন করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে এই সকল রাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার গঠন করা হয়—(১) একটি কেন্দ্রীয় বা সমগ্র দেশের সরকার, এবং (২) কতকগুলি আঞ্চলিক বা দেশের বিভিন্ন অংশের সরকার। দেশের শাসনতন্ত্র অনুসারে সমগ্র শাসনক্ষমতা যদি একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তেই ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই যদি নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করে তবে ঐ শাসন-ব্যবস্থাকে 'এককেন্দ্রিক' (Unitary) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা বণ্টিত হয় তবে ঐরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' (Federal) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখন প্রথমে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government): এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য বর্তমান থাকে। নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি ও উহাদের ক্ষমতা প্রদান করা ছাড়াও অন্যভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রাধান্য প্রকাশ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে ইহা আঞ্চলিক সরকারসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে পারে, ইহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, এমনকি উহাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ সর্বতোমুখী প্রাধান্যের জন্য অন্যতম আধুনিক লেখক ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন, "এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের অস্তিত্ব নাই।"

কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বতোমুখী প্রাধান্যই এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত। ব্রিটিশ আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থাও প্রথমে এককেন্দ্রিক ছিল; পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

গুণাগুণ : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য বর্তমান থাকে বলিয়া সমগ্র দেশব্যাপী একই শাসননীতি ও শাসন-পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে। ইহার ফলে বিভিন্ন সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা লুপ্ত হয় এবং শাসন-ব্যবস্থার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতি অনুসরণের পক্ষে এবং সংকটজনক সময়ে এই দৃঢ়তা বিশেষ উপযোগী। ঐ একই কারণে আবার শাসনযন্ত্র বিরাট ও জটিল হইয়া উঠে না; ফলে ব্যয়াধিক্যও ঘটে না।

গুণ—অখণ্ড শাসন-নীতি কিন্তু সুপরিবর্তনীয় অথচ দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থা

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা হইল যে ইহা বিশেষ সুপরিবর্তনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের ইচ্ছামত আঞ্চলিক সরকারের সৃষ্টি ও বিলোপ এবং তাহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া শাসনকার্যের উন্নতিসাধন করিতে পারে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না।

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে। আঞ্চলিক সরকারসমূহকে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয় বলিয়া স্থানীয় লোকের শাসনকার্যে বিশেষ উৎসাহ থাকে না। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্র-বিরোধী। উপরন্তু, বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এত জটিল জাতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে যে উহার পক্ষে অঞ্চলগুলির প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে আঞ্চলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। আঞ্চলিক বা অংশগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে জাতীয় স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয়, কারণ অংশগুলি লইয়াই ত সমগ্র জাতীয় জীবন।

ত্রুটি: কিন্তু ইহা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে লিখিত সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বর্তমান থাকে। এই লিখিত সংবিধানই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত করিয়া দেয়। ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা বণ্টিত হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার-সমূহের কেহ কাহারও অধীন থাকে না। উভয়ে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ন্যায় আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাও মৌলিক (original) ক্ষমতা; ইহার কোনরূপ পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে প্রথমে সংবিধানের পরিবর্তন-সাধন করিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Federal Government) : যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়:

(১) **শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন :** শাসনতন্ত্র বা সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষমতা বণ্টন নানাভাবে হইতে পারে। তবে সাধারণত যে-বিষয়গুলি জাতির স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়—যেমন,

দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রেলপথ, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি—সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হয়; এবং যে-বিষয়গুলির সহিত আঞ্চলিক স্বার্থই অধিক জড়িত—যেমন, শিক্ষা, স্থানীয় শান্তিরক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি, জলসেচ প্রভৃতি—সেগুলি রাজ্য বা অংশগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের হস্তে সমর্পণ করা যায় না। করিলে বিষয়গুলি ঠিকমত পরিচালিত হয় না। সুতরাং এইরূপ বিষয়গুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সরকারের যুক্ত কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়।

১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন

ক্ষমতা কিভাবে বণ্টিত হয়

(২) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা লিখিত হয় এবং সুপরিবর্তনীয় হয় না। সুপরিবর্তনীয় বলিতে বুঝায় সহজ পরিবর্তনযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রকে সহজে পরিবর্তিত করা যায় না। যাইলে ক্ষমতার ভাগাভাগি লইয়া কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারগুলি পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকিত। ফলে শাসনকার্যও ব্যাহত হইত।

২। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত: পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় 'সাধারণত' একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকে।* এই আদালতের কার্য হইল শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা। কেন্দ্র বা কোন রাজ্য সরকার যদি এমন কোন আইন প্রণয়ন করে যাহা তাহার সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভূত, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যাহাতে কোন সরকার নিজস্ব সীমা লংঘন না করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষা করে।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত।

গুণাগুণ: যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলসমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। স্বায়ত্তশাসনই গণতন্ত্রের মূলকথা। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপোষক।

গুণ: ১। ইহা গণতন্ত্রের পরিপোষক

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূতপূর্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি লইয়া গঠিত। এই উপনিবেশগুলির প্রত্যেকটি যদি একটি করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিত তবে বর্তমানের শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব হইত না।

২। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে

* যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকিতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নে সর্বোচ্চ আদালতের উপর শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভার নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়। একই জাতির বিভিন্ন অংশ যদি পাশাপাশি রাষ্ট্র গঠন করিয়া বাস করে তবে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে। ভারতবাসী এক জাতি। কিন্তু ধরা যাউক যে, তাহারা পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া বাস করিতেছে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্যসাধন করা যাইতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও থাকিবে, অথচ ভারতবাসী একই শাসনাধীনে বাস করিবে।

৩। ইহা জাতীয় ঐক্য-সাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কর্মবিভাগ (division of functions) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রমবিভাগ (division of labour) বা কর্মবিভাগ দক্ষতার মূলসূত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় বলিয়া কর্মও বিভক্ত হয়। ফলে উভয় প্রকার সরকারই দক্ষতার সহিত আপনাপন কার্য সম্পাদন করিতে পারে।

৪। ইহা কর্মবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

লর্ড ব্রাইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণের নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইল, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিকভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা লইয়া পরীক্ষা চালানো যায়; কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র দেশব্যাপী এইরূপ করা বিশেষ বিপজ্জনক।

৫। ইহাতে শাসন ব্যাপারে পরীক্ষা চালানো যায়

পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য (regional autonomy) বর্তমান থাকে বলিয়া আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এরূপ সুষ্ঠুভাবে করা যাইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোনমতেই সম্ভবপর নহে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবংগ সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে যেরূপ যত্নবান হইতে পারে, ভারত সরকারের পক্ষে তাহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

৬। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কয়েকটি সুস্পষ্ট ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকায় শাসনকার্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

ত্রুটি: ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক সন্ধি ও সর্তাদি পালন ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালন নির্ভর করে সমগ্র দেশের সহযোগিতার উপর। কিন্তু আঞ্চলিক সরকারগুলি সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করিয়া সন্ধি ইত্যাদি পালনে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। ইহাতে জাতির আন্তর্জাতিক মর্যাদার লাঘব ঘটে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। অনেক সময় এই বিরোধের ফলে জাতির শক্তিরও হানি ঘটে।

২। ইহাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বর্তমান থাকে

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও জটিল। একটির পরিবর্তে অনেকগুলি সরকার থাকায় এবং ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় শাসনকার্যে ব্যয়বাহুল্য ও জটিলতা দেখা দেয়।

৩। ইহা ব্যয়বহুল ও জটিল

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে নানারূপ অশান্তি ও গোলযোগের আশংকা থাকে। এই অশান্তি ও গোলযোগ ক্রমে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। এই কারণে একজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্রোহের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

৪। দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে

উপসংহার: এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন শাসন-ব্যবস্থাই সকল অবস্থার উপযোগী নহে, তবুও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the Indian Federation): এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি কি তাহা লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বা রাজ্যসংঘ (Union of States) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করিয়া ভারতের বিভিন্ন অংশ যে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ আছে তাহা বুঝানো হইয়াছে। কোন রাজ্য বা অংশের ভারতীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার আইনগত ক্ষমতা নাই।

সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসংঘ' বলা হইয়াছে

ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বা রাজ্যসংঘ বলা হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়া বিচার করিলে ভারতকে এককেন্দ্রিক নহে, যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যই সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। (১) এখানে শাসনক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সংবিধান দ্বারা বণ্টিত হইয়াছে; (২) ভারতীয় সংবিধান লিখিত ও অনেকাংশে দুষ্পরিবর্তনীয়; এবং (৩) ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আছে। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের হস্তে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং ভারতকে সম্পূর্ণভাবে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। উপরন্তু, দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ইত্যাদি ঘোষণার দ্বারা ইহাকে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কিভাবে ইহা করিতে পারেন তাহা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রসংগে পরে আলোচনা করা হইবে।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষণগুলি বিদ্যমান

আমরা দেখিয়াছি যে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমস্ত শাসনক্ষমতা আইনগতভাবে কেন্দ্রের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্র স্থানীয় সরকারসমূহকে কয়েকটি ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয়। এই ক্ষমতাগুলিকে কেন্দ্র আবার ইচ্ছামত ফিরাইয়া লইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র রাজ্যসমূহের ক্ষমতা কোন সময়েই কাড়িয়া লইতে পারে না। সাধারণ সময়ে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য কোন রাজ্যের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; কিন্তু ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে জরুরী অবস্থা ইত্যাদি ঘোষিত হইলে রাজ্যের শাসন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতে পারে।

কিন্তু ভারত প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র নহে

পরিশেষে, ভারতীয় সংবিধান অনেকাংশে দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও সামগ্রিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। অর্থাৎ, সংবিধানের অনেকগুলি ধারার পরিবর্তন কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্ট এককভাবে করিতে পারে; উহাতে অংগরাজ্যগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ব্যবস্থাও দেখা যায় না।

এই সকল কারণে বলা হইয়াছে যে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থা একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক। ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র' (a quasi-federal State) বলিয়াই বর্ণনা করা উচিত।

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। বর্তমানে কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারেরই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সরকারের একটি শ্রেণীবিভাগ হয় একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে। গণতন্ত্র আবার এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হইতে পারে।

গণতন্ত্র: ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক সরকার। গণতান্ত্রিক সরকারই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্বের দিক হইতে গণতন্ত্র জনসাধারণের শাসন হইলেও, কার্যক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনকার্য পরিচালিত হয় সকলের জন্য, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য নহে; উপরন্তু, গণতন্ত্র সকলের সম্মতির উপরও প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ইহা জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা নামেও অভিহিত।

গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয়ই হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান যুগে অচল। তাই বর্তমান সকল দেশেই গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। তবে অনেক দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ: গণতন্ত্রের নিম্নলিখিত গুণগুলির নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। একমাত্র গণতন্ত্রই সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারে; ২। একমাত্র ইহাতেই ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব; ৩। ইহা স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত; ৪। ইহা সাম্যকেও সমর্থন করে; ৫। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে; এবং ৬। ইহাতে বিপ্লবের আশংকা কম থাকে।

ত্রুটি: কিন্তু অভিযোগ করা হইয়াছে যে—১। গণতন্ত্র অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিতের শাসন; ২। এই শাসন-ব্যবস্থা রক্ষণশীল; ৩। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক; ৪। গণতন্ত্র দলগত ত্রুটিসম্পন্ন; ৫। ইহা অস্থায়ী; ৬। গণতান্ত্রিক সভ্যতা নিম্নস্তরের; ৭। এই শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার উপযোগী নহে; এবং ৮। ইহা পুঁজিবাদ সমর্থন করে।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে: গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ অতিরঞ্জিত হইলেও গণতন্ত্রকে সফল করা কঠিন। ইহার জন্য প্রয়োজন—১। গণতান্ত্রিক জনগণের, ২। নাগরিকগণের মধ্যে বুঝা-পড়ার, এবং ৩। অর্থনৈতিক অধিকারের।

একনায়কতন্ত্র: একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। ইহাতে চূড়ান্ত শাসন-ক্ষমতা একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহার গুণাগুণও গণতন্ত্রের বিপরীত। একনায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ হইল—(১) ফ্যাসীবাদ, এবং (২) নাৎসীবাদ।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা: বর্তমানে বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও অনেকগুলি করিয়া আঞ্চলিক সরকার থাকে। এই কেন্দ্রীয় সরকার যদি আঞ্চলিক সরকারসমূহকে সৃষ্টি করে এবং উহাদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখে তবে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বলা হয়।

গুণাগুণ: অখণ্ড শাসন ও নীতি কিন্তু সুপরিবর্তনীয় অথচ দৃঢ় শাসন এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ। অপরদিকে ইহা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে বলিয়া এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী নহে বলিয়া কাম্য নহে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে সংবিধানের প্রাধান্য বর্তমান থাকে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল—১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, ২। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র, এবং ৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

গুণ: ইহা ১। গণতন্ত্রের পরিপোষক; ২। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে; ৩। ইহা জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়; ৪। ইহা কর্মবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; ৫। ইহাতে শাসন ব্যাপারে পরীক্ষা চালানো যায়, ৬। আঞ্চলিক স্বার্থের উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়।

ত্রুটি: কিন্তু ইহা ১। অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ২। সংঘর্ষের সম্ভাবনাপূর্ণ, ৩। [illegible] জটিল, ৪। ইহাতে দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি: সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসংঘ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারত প্রকৃতপক্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্র; কারণ, এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। ভারতকে অবশ্য 'যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। এই কারণে বলা হয় যে ভারত একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you understand by Democracy? Distinguish between Direct and Indirect Democracy.

গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

2. Explain what you mean by Democracy. What are its merits and defects?

গণতন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার গুণাগুণ কি কি?

3. Discuss the merits and defects of Democratic form of Government.

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

4. Define Democracy. How does it compare with Dictatorship?

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহার সহিত একনায়কতন্ত্রের তুলনা করা যায় কিরূপে?

5. What are the essential conditions for the success of a Democracy? Do they exist in India?

গণতন্ত্রের সফলতার অপরিহার্য সর্ত কি কি? ভারতে কি উহাদের সন্ধান পাওয়া যায়?

[ইংগিত: ভারতে এখনও গণতান্ত্রিক জনগণের, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বুঝাপড়ার এবং অর্থনৈতিক

অধিকারের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শিক্ষাবিস্তার, সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে ইহাদের সকলকেই গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।...এবং ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা]

6. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Explain the merits and demerits of each.

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। প্রত্যেকটির গুণাগুণও ব্যাখ্যা কর।

7. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which do you prefer and why?

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি পছন্দ কর; এবং কেন কর?

8. Explain Dictatorship. What are its disadvantages?

একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। ইহার অসুবিধা কি কি?

9. How will you distinguish Unitary Government from Federal Government? Illustrate your answer.

কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হইতে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করিবে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[ইঙ্গিত: ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত।... এবং ১১০-১১১ পৃষ্ঠা]

10. Distinguish between Unitary and Federal Forms of Government. What are their respective merits and drawbacks?

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। এই দুই প্রকার সরকারের প্রত্যেকটির গুণাগুণ কি কি?

11. Explain what is meant by a Federal Government. What are the merits and defects of such a form of Government.

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাহাকে বলে ব্যাখ্যা কর। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ কি কি?

12. State the nature of the Indian Federation as established by the Constitution of India.

ভারতীয় সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

শাসনতন্ত্র

(Constitutions)

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই কতকগুলি করিয়া নিয়মকানুন থাকে। এই নিয়মকানুনগুলি অনুসারেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, সদস্যদিগের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নির্ধারিত হয়। সামগ্রিকভাবে এই নিয়মকানুনগুলিকে শাসনতন্ত্র (Constitution) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

রাষ্ট্রও অন্যতম প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি করিয়া গঠনতন্ত্র থাকে। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রকে রাষ্ট্রনৈতিক গঠনতন্ত্র (Political Constitution) বা 'শাসনতন্ত্র' বলা হয়। শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রের গঠন কি হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা কিভাবে বণ্টিত হইবে, নাগরিকগণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ হইবে ইত্যাদির বিষয় নির্ধারিত হয়। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন শাসনতন্ত্র হইল সেই সকল নিয়মকানুনের সমষ্টি যাহা অনুসারে সরকারের ক্ষমতা, নাগরিকের অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণীত হয়।

শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে।

সংজ্ঞা

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Constitutions) : শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে (ক) লিখিত ও অলিখিত, এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগই সুপরিচিত।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র (Written and Unwritten Constitutions) : শাসনতন্ত্রের মূল নীতি ও বিষয়গুলি এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকিলে উহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র (Written Constitutions) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অপরদিকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় যে, শাসন সংক্রান্ত মৌলিক নীতি ও বিষয়গুলিকে লিপিবদ্ধ বা দলিলভুক্ত করা হয় নাই এবং উহারা প্রধানত প্রথা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রই অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রধানত প্রথা ও রীতিনীতির (Constitutional Conventions) ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করা যায়।

উদাহরণ

লিখিত ও অলিখিত—এই দুই শ্রেণীতে শাসনতন্ত্রসমূহের শ্রেণীবিভাগ মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। কারণ, এরূপ কোন শাসনতন্ত্রই নাই যাহা সম্পূর্ণভাবে লিখিত বা সম্পূর্ণভাবে অলিখিত। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে অলিখিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়; কিন্তু এই শাসনতন্ত্রের একাপ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যাহা লিখিত ও বিধিবদ্ধ। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র মূলত লিখিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকটিতে বেশ কিছু অলিখিত অংশ আছে। যাহা হউক, শাসনতন্ত্র 'প্রধানত' লিখিত হইলে উহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র এবং 'মূলত' অলিখিত হইলে উহাকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Written and Unwritten Constitutions) : লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকার শাসনতন্ত্রেরই গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে লিখিত শাসনতন্ত্র লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা বিশেষ সতর্কতার সহিত ও আলাপ-আলোচনার পর প্রণীত হয়। ফলে স্বভাবতই উহা অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট

হয়। দ্বিতীয়ত, লিখিত সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধতি (special procedure) অবলম্বনের প্রয়োজন হয় বলিয়া উহা অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। অর্থাৎ, জনমতের গতি পরিবর্তন বা শাসকগণের খেয়ালখুশির ফলে উহা যখন তখন পরিবর্তিত হয় না। তৃতীয়ত, লিখিত সংবিধানে সাধারণত নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ থাকে। ইহার ফলে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ

অপরদিকে, লিখিত সংবিধানের পরিবর্তন বিশেষ সহজসাধ্য নহে বলিয়া উহা সময়ের সহিত সংগতি হারাইয়া ফেলিতে পারে। অর্থাৎ, লিখিত শাসনতন্ত্রের জন্য কাম্য সংস্কারসাধন ব্যাহত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সংস্কার-আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিলে দেশে বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটিতে পারে। আরও বলা হয় যে, মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করাই যথেষ্ট নহে; ঐ অধিকার সংরক্ষিত হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করে দেশের জনগণ ও দেশের বিচার-ব্যবস্থার উপর। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত, উহাতে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ নাই, তবুও ইংরাজরা অন্য কোন দেশের লোক অপেক্ষা কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে না। সুতরাং মৌলিক অধিকার ঘোষণার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ-এর জন্যই যে লিখিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, এ-ধারণা ভুল।

ত্রুটি

অলিখিত শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় হয় বলিয়া উহা সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। ফলে এই প্রকার সংবিধান জনপ্রিয় হয় এবং বিপ্লবের আশংকা হইতে মুক্ত থাকে। দ্বিতীয়ত, অলিখিত সংবিধান শুধু তত্ত্বগত ভিত্তিতেই রচিত হয় না; উহা জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি রাখে। সুতরাং উহা সুপরিচালিত হয়।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ

ত্রুটি হিসাবে বলা যায় যে অলিখিত শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না—উভয়কেই সমান মর্যাদা দেয়। উপরন্তু, শাসনতন্ত্র অলিখিত হইলে বিচার বিভাগ অকাম্যভাবে প্রভাবশালী হইয়া উঠে। কারণ, ঐ বিভাগই নির্ধারণ করে যে কোন্‌টি শাসনতান্ত্রিক আইন এবং কোন্‌টি নয়। অনেকের মতে, আবার অলিখিত শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের উপযোগী নয়। কারণ, এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ সর্বদাই শাসকবর্গের ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া সুস্পষ্টভাবে জানিতে চাহে যে শাসনতন্ত্রের বিধান কি।

ত্রুটি

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশীল জনগণের পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র কাম্য হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণ যদি অজ্ঞ ও বিদ্রোহপ্রবণ হয় তবে সুনির্দিষ্ট লিখিত সংবিধান গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Rigid Constitutions) : লিখিত ও অলিখিত—এইভাবে শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া বর্তমানে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীবিভাগই অধিক সুপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগের জন্য আমরা

লর্ড ব্রাইসের নিকট ঋণী। যে-শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে আইন-সভা অতি সহজে পরিবর্তন করিতে পারে তাহাকে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible Constitution) আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে সংশোধন ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য নাই। অপরপক্ষে, যে-শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সম্ভব হয় না—পরিবর্তনের জন্য যখন এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তখন তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Rigid Constitution) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

উদাহরণ

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে-প্রণালীতে সাধারণ আইন পাস করে, ঠিক সেই প্রণালীতেই শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আইন পাস করিতে সমর্থ। অপরপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেস (Congress) যে-পদ্ধতিতে সাধারণ আইন পাস করিতে পারে সে-পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না।

শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই দুষ্পরিবর্তনীয় হয় না

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই উহা দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যেমন, নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত কিন্তু উহা সুপরিবর্তনীয়, কারণ সাধারণ আইনসভা সাধারণ পদ্ধতিতেই উহার পরিবর্তন-সাধন করিতে পারে।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Flexible and Rigid Constitutions):

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের সময় এবং সংকটকালীন অবস্থায় এইরূপ শাসনতন্ত্রকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করা হয়।

ত্রুটি

কিন্তু স্থিতিশীলতার অভাব সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি। পরিবর্তন অতি সহজসাধ্য বলিয়া এইরূপ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়ে এবং কারণে-অকারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সাময়িক উত্তেজনার বশে বহু কল্যাণকর আইনও অপসারিত হয়। সাধারণ আইন হইতে শাসনতন্ত্রের পৃথক মর্যাদা না থাকায় উহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাও থাকে না। সহজ পরিবর্তনযোগ্য বলিয়া সংখ্যালঘুদের স্বার্থও সংরক্ষিত হয় না।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণের ঠিক বিপরীত। দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র স্থিতিশীল, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। সাময়িক উত্তেজনা, গণ-আন্দোলনের ফলে অথবা সাধারণ আইনসভার খেয়ালখুশি অনুযায়ী

ইহা যখন তখন পরিবর্তিত হয় না। এই প্রকার শাসনতন্ত্র অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং ইহা দ্বারা নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যসমূহের অধিকার সংরক্ষণের জন্য দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ

অপরদিকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সময়ের সহিত তাল রাখিতে পারে না। কোন কল্যাণকর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া তাহা কার্যকর করা কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে সংস্কারকামীরা বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারে। মেকলেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, বিপ্লবের প্রধান কারণ হইল, জাতি যখন অগ্রসর হয় শাসনতন্ত্র তখন স্থিতিশীল থাকে। দ্বিতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভার বিচার বিভাগের উপর থাকে বলিয়া এইরূপ শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হয়। বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্রের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে।

ক্রটি

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত দোষত্রুটি অপসারণের জন্য আধুনিক লেখকগণ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, শাসনতন্ত্র ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের মত অতটা সুপরিবর্তনীয় হইবে না, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত অতটা দুষ্পরিবর্তনীয়ও হইবে না। এই দুই-এর মধ্যপন্থাই অনুসরণ করা প্রয়োজন।

উপসংহার

সংক্ষিপ্তসার

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি করিয়া গঠনতন্ত্র থাকে। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রকে শাসনতন্ত্র বলা হয়। শাসনতন্ত্র অনুসারে সরকারের ক্ষমতা নাগরিকদের অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ: নানাভাবে শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দুইটি শ্রেণীবিভাগই অধিক সুপ্রচলিত—(ক) লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে; তবুও এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ পরস্পরের বিপরীত। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণও পরস্পরের বিপরীত। বর্তমানে এই দুই প্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

একাদশ অধ্যায়

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Separation of Powers and Organs of Government)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি (Principle of Separation of Powers) : সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যাবলী বলিতে বুঝায় সরকারেরই কার্যাবলী। সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—যথা, আইন প্রণয়ন করা, আইন বলবৎ বা শাসনকার্য পরিচালনা করা, এবং বিচারের ব্যবস্থা করা। এই তিন প্রকার কার্য পরিচালনার জন্য সরকারী ক্ষমতাকেও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং (গ) বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা। সাধারণতঃ এই তিন প্রকার কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ বা অংগ (organs) থাকে : (ক) আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature), (খ) শাসন বিভাগ (Executive), এবং (গ) বিচার বিভাগ (Judiciary)। সংক্ষেপে, সরকারের তিন শ্রেণীর কার্য বা ক্ষমতা এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ, আইন বলবৎকরণের ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং বিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদানের নীতিই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে ইহা হইল কোন বিভাগের পক্ষে নিজস্ব গণ্ডি ছাড়াইয়া অপর বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি।

সরকারী ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ

সংক্ষেপে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি কাহাকে বলে

এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে : (১) সরকারের এক বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না; (২) একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না; এবং (৩) সরকারের কোন বিভাগ অপর কোন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। এখন দেখা যাউক, এই তিন অর্থের কোনটিতে কতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহা কতদূর প্রযুক্ত হওয়া কাম্য। তাহার পূর্বে অবশ্য আলোচনা করা প্রয়োজন ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য কি ?

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিনটি অর্থ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য : বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক আলোচিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় :

তিনটি উদ্দেশ্য : ১। শাসনকার্যের ক্ষেত্রে কর্মবিভাগের সুবিধা (advantages of division of labour) লাভ করা ; ২। সরকারের তিনটি বিভাগের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সুশাসন সম্ভব করা : এবং ৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা।
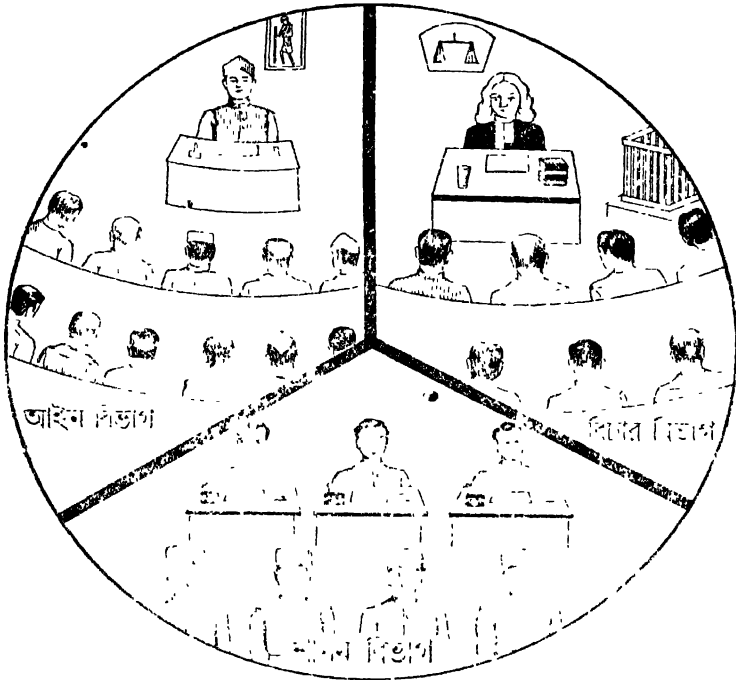
সরকারের তিনটি বিভাগ এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি

একরূপ এ্যারিষ্টটলই প্রথমে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারী কার্যাবলী তিন শ্রেণীর—যথা, নীতি-নির্ধারণ করা, ঐ নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচারকার্য সম্পাদন করা। সরকারী কার্যাবলী এইভাবে বিভক্ত হইলে শাসনকার্য পরিচালনায় কর্মবিভাগ বা শ্রমবিভাগের সুবিধা লাভ করা যায় বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

১। কর্মবিভাগের সুবিধা লাভ করা

পরবর্তীকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সরকারের তিনটি বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপযোগিতা নির্দেশ করেন। ইঁহাদের মতে, সরকারের তিনটি বিভাগ যদি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকে—অর্থাৎ, পরস্পরের কার্যে হস্তক্ষেপ না করে তবেই সুশাসন সম্ভব হয়।

২। সুশাসন সম্ভব করা

ইহার পর ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ আলোচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মণ্টেস্কু (Montesquieu)। মণ্টেস্কুর হস্তে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ। বলা যায়, মণ্টেস্কুই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির ধারণাকে (concept) মতবাদে (theory) পরিণত করিয়া উহার পূর্ণ রূপদান করেন।

৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা

মণ্টেস্কু চরম স্বৈরাচারী ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সমসাময়িক ছিলেন। লুই-এর স্বৈরাচারের ফলে ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল বলা চলে। একবার ইংলণ্ড ভ্রমণে আসিয়া মণ্টেস্কু ঐ দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপক রূপ দেখিয়া একরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এইরূপ পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণই ইংলণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্বের হেতু। এই সিদ্ধান্ত হইতে পরে তিনি স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ (safeguard) হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদের সৃষ্টি করেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও মণ্টেস্কু

মণ্টেস্কুর বক্তব্য হইল, একই ব্যক্তির হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাজা যদি আইন প্রণয়ন, আইন বলবৎকরণ, বিচারকার্য সকলই সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তবে তিনি ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করিয়া অযৌক্তিকভাবে উহাকে বলবৎ করিতে এবং অন্যায়ভাবে আইনভংগকারীর শাস্তিপ্রদান করিতে পারেন। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব, এই তিন প্রকার কার্য পৃথক তিন শ্রেণীর ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

মণ্টেস্কুর মতে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ

মণ্টেস্কু ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুল কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা কোন কালেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় নাই। তবুও মণ্টেস্কুর মতবাদ চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বহুলোকের নিকট ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইয়া দাড়ায়। ১৭৮৯ সালে ফরাসীরা ঘোষণা করে, যে-দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই সে-দেশে শাসনতন্ত্রই নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকায় ভূতপূর্ব ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি মিলিয়া গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রণীত ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির শাসনতন্ত্রেও এই নীতি গৃহীত হয়। ইউরোপে কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোন দেশ এই মতবাদের প্রভাবে পড়ে নাই।

মণ্টেস্কুর মতবাদের প্রভাব ও এই নীতির প্রযোগ

সমালোচনা: বর্তমানে নানাদিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমালোচনা করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে, সরকারের কার্যাবলী ঠিক তিন শ্রেণীর নয়; সুতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি নয়। ইঁহাদের কয়েকজন

বিচারকার্যকে শাসনকার্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলেন যে সরকারী বিভাগ সংখ্যায় মাত্র দুইটি : (১) শাসন বিভাগ, এবং (২) ব্যবস্থা বিভাগ। সমালোচক দলের অপর অংশ সরকারী কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী—যথা, (১) নির্বাচন, (২) আইন প্রণয়ন, (৩) শাসননীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা, (৪) আইন ও নীতিকে কার্যকর করা, এবং (৫) বিচারকার্য। ফলে ইঁহাদের মতে, সরকারী বিভাগও সংখ্যায় পাঁচটি—যথা, (১) নির্বাচকমণ্ডলী, (২) ব্যবস্থা বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণের বিভাগ, (৪) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারিগণের বিভাগ, এবং (৫) বিচার বিভাগ।

১। সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর নহে

সুতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি নহে

প্রয়োগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। সরকারকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ—যথা, হস্ত, পদ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যেরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগও সেইরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত করা একেবারে অসম্ভব। ফলে প্রত্যেকটি বিভাগ এমন সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে যাহা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারে অপর বিভাগের কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ, আইন প্রণয়নের উল্লেখ করিতে পারা যায়। আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা বিভাগের কার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন প্রণীত হয় শাসন বিভাগের নির্দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ প্রধান নীতি হিসাবে গৃহীত সেখানেও আইনসভা অল্পবিস্তর শাসন বিভাগের নির্দেশানুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। উপরন্তু, আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগকে জরুরী আইন (ordinance) পাস করিতে হয়। আবার শাসন বিভাগকে উপ-আইন (by-law) প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা প্রণীত আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিয়া লইতে হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভা আইন প্রণয়নের কিছু ভার শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অপরদিকে আবার আইন প্রণয়ন করা বিচার বিভাগেরও কার্য। বর্তমানে বিচারকগণ প্রণীত আইন (judge-made law) বিচার-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে। প্রচলিত আইন যখন অ-পর্যাপ্ত বা অযৌক্তিক বিবেচিত হয় তখন বিচারসভা এইরূপ আইন প্রণয়ন করে।

২। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পর্কচ্যুত হইতে পারে না :

ক। দেখা যায়, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে

এইভাবে এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য সম্পাদন করে বলিয়া একই ব্যক্তিকে একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিতে হয়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থাতে প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা বিভাগেরই অংশ।

খ। একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িতও থাকে

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তত্ত্বের দিক দিয়া সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতা-সম্পন্ন হইলেও কার্যক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর ব্যবস্থা বিভাগের প্রাধান্য প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। পার্লামেন্টীয় সরকারে শাসন বিভাগের কর্মকর্তা বা মন্ত্রিগণ সরাসরি ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন; আইনসভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের কতিপয় কার্য আইনসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ বলিয়া ঐ শাসন-ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অপরদিকে আবার আইনের বৈধতা-অবৈধতা ঘোষণার দ্বারা বিচার বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ক্ষমতা-স্বতন্ত্রিকরণের তিন অর্থের কোনটিতেই এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

২। এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে

কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়

শুধু যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব তাহাই নহে, ইহার পূর্ণ প্রয়োগ কাম্যও নহে। বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব দেখা দিবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ প্রবর্তিত থাকিলে প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণেই ব্যস্ত থাকিবে এবং কখনই অপর বিভাগগুলিকে সাহায্য করিবে না। ইহার ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার যে-অভাব ঘটিবে তাহা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের সুফল কখনই পূরণ করিতে পারিবে না।

৩। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে

এই দিক দিয়া একজন আধুনিক লেখক ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে এক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই ব্যায়াম-কৌশলে খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার একটু অভাবের ফলে সমস্ত খেলাটাই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ
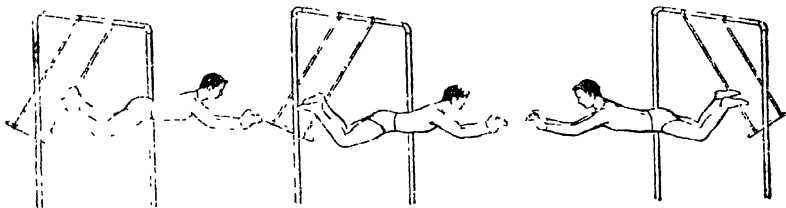
উপরন্তু, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে দেখা ভুল। ইতিহাসের দিক দিয়া মন্টেস্কু ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে শাসনক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ

কোন দিনই ছিল না। তবুও ইংরাজরা কোনকালেই অন্য দেশের লোক অপেক্ষা কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনসাধারণের উপর। জনসাধারণ যদি স্বাধীনতাকাংক্ষী হয় তবে রাষ্ট্র উহা প্রদান না করিয়া পারে না। আবার জনসাধারণকেই স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীনতা ব্যাহত হইতেছে কি না, তাহা জনগণকে চিরকালই সতর্ক দৃষ্টি লইয়া লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। ব্যাহত হইলে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনগণের স্বাধীনতাকাংক্ষা ও নির্ভীকতার উপর, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপর নহে।

৪। ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্রও নহে

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য বর্তমানে এই নীতির মাত্র আংশিক প্রয়োগ সমর্থন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই আংশিক প্রয়োগ বলিতে মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই বুঝায়।

বর্তমানে মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই সমর্থন করা হয়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Organs of Government): ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদে ধরিয়া লওয়া হয় যে সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতা-সম্পন্ন। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায় যে ব্যবস্থা বিভাগ সরকারের অপর দুই অংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। ইহার দুইটি কারণ আছে: প্রথমত, ব্যবস্থা বিভাগ জনপ্রতিনিধি-বর্গকে লইয়া গঠিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থা বিভাগ আইন প্রণয়ন করিলে তবেই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কাযের সুযোগ ঘটে। রাষ্ট্র আইনানুসারে সংগঠিত জনসমষ্টি (a people organized for law) বলিয়া প্রথমেই প্রয়োজন আইন প্রণয়নের। সেই আইন অনুসারে শাসন ও আইনভংগের বিচার হইল পরের কথা। অতএব, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা সুরু করা উচিত ব্যবস্থা বিভাগ হইতে।

সরকারের সকল বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন নহে

ব্যবস্থা বিভাগ (The Legislature): ব্যবস্থা বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইল ইহার কার্যাবলী ও সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা।

কার্যাবলী (Functions): ব্যবস্থা বিভাগের কায আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা অন্যান্য কাযও সম্পাদন করে। ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী পাঁচ প্রকার

(ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য: ইহাই ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কায। পূর্বে অধিকাংশ আইন ছিল প্রথাগত (customary laws)। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আজিকার দিনে ব্যবস্থাপক সভা প্রথাগত আইনের (customary laws) সংশোধন করে এবং প্রয়োজন হইলে ইহার বিলোপসাধন করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করে।

(খ) অর্থসংক্রান্ত কার্য: গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল যে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি লইয়াই করধার্য বা ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে। ইহার ফলে সকল

গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক ব্যবস্থা বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইয়া দাড়াইয়াছে। যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয়ের প্রশ্ন রহিয়াছে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণাও করা যায় না।

(গ) শাসনসংক্রান্ত কার্য : ব্যবস্থা বিভাগকে কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি অনুমোদন প্রভৃতি শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। শাসন বিভাগকে বা মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করাও এই শাসনসংক্রান্ত কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) বিচারসংক্রান্ত কার্য : ব্যবস্থা বিভাগের বিচারসংক্রান্ত কার্যও রহিয়াছে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে ব্যবস্থাপক সভা। ইহা ছাড়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের আচরণের বিচার হয় ঐ ব্যবস্থাপক সভাতেই। ইংলণ্ডে আবার ব্যবস্থাপক সভার ঊর্ধ্বতন কক্ষ লর্ড সভা (House of Lords) ঐ দেশের আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত।

(ঙ) শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত কার্য : শাসনতন্ত্র বা সংবিধান সংক্রান্ত কার্য বলিতে সংবিধানের পরিবর্তন ও ব্যাখ্যার কায বুঝায়। ভারতের ন্যায় অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র বা আংশিক ভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে সংবিধানের ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ভার ঐ দেশের ব্যবস্থাপক সভার হস্তে ন্যস্ত।

গঠন (Organisation) : ব্যবস্থাপক সভা একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। একটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে উহাকে এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা (Unicameral Legislature) এবং দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে উহাকে দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা * (Bi-cameral Legislature) বলা হয়।

এক-পরিষদ ও দ্বি পরিষদসম্পন্ন আইনসভা

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার পরিষদ দুইটিকে যথাক্রমে প্রথম বা নিম্নতর (lower) এবং দ্বিতীয় বা উচ্চতর (upper) পরিষদ বা কক্ষ (chamber) বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিম্নতর পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই জনগণের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা জনপ্রিয় পরিষদ (popular chamber) নামেও পরিচিত।

আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন অথবা এক-পরিষদসম্পন্ন হইবে ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সমর্থকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে যুক্তি

(ক) দুইটি পরিষদ না থাকিলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। একটি-মাত্র পরিষদে প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইতে পারে না। ফলে ইহাতে সর্বদাই অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের আশংকা রহিয়াছে। এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে এরূপ আকস্মিক আইনও পাস করিতে পারে, যাহাতে দেশের ক্ষতি হয়। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ ঘটা দুষ্কর। নিম্ন পরিষদ কোন বিল পাস করিলে দ্বিতীয় পরিষদ ধীরভাবে উহার বিচার করে। ইহাতে বিলটির

১। ইহাতে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভবপর

* 'Legislature' এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ব্যবস্থাপক সভা' ও 'আইনসভা' দুইই করা হয়।

দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং আকস্মিক আইনও প্রণীত হইতে পারে না। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

২। ইহা একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার রোধ করে

(খ) লর্ড ব্রাইসের মতে, দ্বিতীয় পরিষদ নাগরিকগণকে একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। তিনি বলেন, সকল আইনসভারই স্বৈরাচারী হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি আছে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে এই প্রবৃত্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই আইনসভাকে সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পরিষদে বিভক্ত করা উচিত যাহাতে একটি অপরটির স্বৈরাচারিতা রোধ করিতে পারে।*

বর্তমান যুগে ব্রাইসের এই যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় না। দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার সমর্থকরাও উভয় পরিষদকে সমান ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী নহেন।

৩। বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সম্ভব

(গ) উচ্চতর বা দ্বিতীয় পরিষদে মনোনয়ন ও পরোক্ষ নির্বাচনের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির আইনসভার দ্বিতীয় পরিষদে শিল্পকলা বিজ্ঞান সাহিত্য সমাজসেবা প্রভৃতিতে খ্যাতিসম্পন্ন বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোনয়নের ব্যবস্থা আছে।

৪। দুইটি পরিষদ পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারে

(ঘ) অধিকাংশ সময় উচ্চতর পরিষদে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংখ্যায় অধিক থাকেন বলিয়া ঐ পরিষদ নিম্নতর পরিষদের উৎসাহী অথচ অনভিজ্ঞ সভ্যগণকে সংযত রাখিতে পারেন। প্রথম পরিষদও উচ্চতর পরিষদের রক্ষণশীলতা কতকাংশে দূর করিতে পারে।

৫। বর্তমানে একটিমাত্র পরিষদ পর্যাপ্ত নহে

(ঙ) বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুলভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় একটি পরিষদের পক্ষে আইনসভার সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। সুতরাং প্রয়োজন হইল দুইটি পরিষদের।

৬। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে

(চ) দ্বিতীয় পরিষদেও প্রত্যেক বিল সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভ করে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে হয়ত বিতর্ক ও আলোচনার ত্রুটি থাকিয়া যাইত ; ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হইত।

৭। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য

(ছ) অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দুইটি পরিষদ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রকার স্বার্থের সমন্বয়সাধন করা হয়—যথা, জাতীয় স্বার্থ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ। এই দুই পৃথক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি পরিষদের প্রয়োজন। যেমন, ভারতবাসী হিসাবে আমাদিগকে সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, আবার পশ্চিমবংগবাসীদের পশ্চিমবংগের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি দিতে

* "The innate tendency of the assembly to become hateful, tyrannical and corrput needs to be checked by the co-existence of another house."

হইবে। সুতরাং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার একটি পরিষদে থাকিবে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিবর্গ, আর অপরটিতে থাকিবে পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি সকল রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ।

বিপক্ষে যুক্তি :

দ্বি পরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করিয়া ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (Abbes Sieyes) বলিয়াছেন, উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদের সহিত একমত হয় তবে উহা অনাবশ্যক ; আর যদি একমত না হয় তবে উহা অনিষ্টকর। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদকে সমর্থন করিতেই থাকে তবে দুইটি পরিষদ বজায় রাখিয়া অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি ও সময় নষ্ট করিবার কোন হেতু নাই। এ-ক্ষেত্রে উচ্চতর পরিষদের বিলোপসাধনই করা উচিত। অপরদিকে যদি উচ্চতর পরিষদ নিম্নতর পরিষদের কার্যে বাধার সৃষ্টিই করিতে থাকে তবে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা অনিষ্টকর। সুতরাং আইনসভা একটিমাত্র পরিষদসম্পন্নই হইবে।

১। দ্বিতীয় পরিষদকে অনাবশ্যক মনে করা হয়

২। ইহা অনিষ্টকরও হইতে পারে

বস্তুত, উচ্চতর পরিষদ সকল সময় বিবেচনার সহিত কাজ করে না। ইহা একরূপ ধরিয়া লয় যে নিম্নতর পরিষদের বিরোধিতা করাই ইহার কর্তব্য। অর্থাৎ, উহার পক্ষে বিরোধিতা করা একপ্রকার স্বভাবে পরিণত হয়। ফলে অনেক সময় ইহা কাম্য আইন প্রণয়নেও বাধাপ্রদান করিয়া দেশের অনিষ্টসাধন করে।

৩। ইহা অপচয়মূলক

উপরন্তু, দুইটি পরিষদ থাকিলে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়। উচ্চতর পরিষদ যদি অনাবশ্যক এবং অকাম্যই হয় তবে এই অর্থব্যয়কে অপচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। দ্বিতীয় পরিষদ অগণতান্ত্রিক

উচ্চতর পরিষদ সাধারণত ধনী, রক্ষণশীল ও মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। এইরূপ গঠন অগণতান্ত্রিক বলিয়াও দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করা হয়। বলা হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা মাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে লইয়াই গঠিত হইবে, ইহাতে মনোনয়ন বা ইংলণ্ডের লর্ড সভার মত উত্তরাধিকার সূত্রে সভ্যপদপ্রাপ্তির কোন ব্যবস্থাই থাকিবে না।

আর একটি কারণে দ্বিতীয় পরিষদকে অগণতান্ত্রিক মনে করা হয়। গণতন্ত্র হইল জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। ব্যবস্থা বিভাগ জনমতের অনুকূলে আইন পাস করিবে এবং শাসন বিভাগ তাহা বলবৎ করিবে—ইহাই এই শাসন-ব্যবস্থার মূলকথা। কিন্তু দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভায় কোন্‌টি ঠিক জনমত তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, দেখা যায় দুইটি পরিষদ পরস্পরের বিরোধী মত প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং বলা হয়, আইনসভা জনমতের প্রতিফলন ক্ষেত্র বলিয়া ইহা ঐক্যবদ্ধই হইবে, দুইটি পরস্পরবিরোধী পরিষদে বিভক্ত হইবে না।

আরও বলা হয়, আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন হইলে ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং দুইটি পরিষদের প্রত্যেকটি পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে।

৫। ইহা ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত করে

অন্যতম আধুনিক লেখক ল্যাস্কি বলেন, এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভাই বর্তমান যুগের পক্ষে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। বর্তমানে বিশেষ বিচারবিবেচনা না করিয়া কোন আইন পাস করা হয় না। প্রথম পরিষদের পর দ্বিতীয় পরিষদ এই আলোচনারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। ফলে অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় আইন পাসে অযথা বিলম্ব ঘটে। •

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভায় দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয়। ল্যাস্কির মতে ইহাও ভুল। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই ঐ স্বার্থ সংরক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সংখ্যায় তিনটি: (ক) শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, (খ) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র, এবং (গ) ক্ষমতা বণ্টন লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।* আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এইগুলিই যথেষ্ট। ইহার উপর দ্বিতীয় পরিষদ সম্পূর্ণ অহেতুক।

৬। যুক্তরাষ্ট্রেও ইহার প্রয়োজন নাই

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। তবুও অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহার বিলোপসাধন অপেক্ষা সংস্কারেরই পক্ষপাতী। তাঁহারা মনে করেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইলেই দ্বিতীয় পরিষদের ত্রুটিগুলি দূর হইবে এবং তখন ইহা সংশোধনকারী পরিষদ (revising chamber) হিসাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে।

উপসংহার

শাসন বিভাগ (The Executive): সরকারের যে-অংশ আইন বলবৎ-করণের কার্যে নিযুক্ত তাহাকে শাসন বিভাগ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive) হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সংকীর্ণ অর্থে মাত্র প্রধান কর্মকর্তা ও কর্মসচিবকে লইয়া শাসন বিভাগ গঠিত এইরূপ মনে করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণত এই সংকীর্ণ-অর্থেই 'শাসন বিভাগ' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

প্রধান কর্মকর্তা ইংলণ্ডের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পদলাভ করিতে পারেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণের ন্যায় জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন, ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় আইনসভার সভ্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন অথবা কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গভর্ণর-জেনারেলের ন্যায় মনোনীত হইতে পারেন।

প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ

---

* ১১১-১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive):

শাসন বিভাগ নানা প্রকার কায সম্পাদন করে

রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির সংগে সংগে শাসন বিভাগের কার্যও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যে-সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

(ক) আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা: আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা বলিতে দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, নিম্নতন কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, সরকারী কর্মচারীদের জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী আইন (ordinance) পাস প্রভৃতি কার্যাবলীকে বুঝায়। শাসন বিভাগের যে-দপ্তরের উপর আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার ভার থাকে তাহাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বলা হয়।

(খ) পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য: পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার বলিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন, এই সকল রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ, ইহাদের প্রেরিত রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি বুঝায়। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্য বর্তমান জগতে শাসন বিভাগের এই পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গ) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা: অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগের সম্মতি লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলেও যুদ্ধ পরিচালনা প্রধানত শাসন বিভাগই করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শাসন বিভাগের যে-দপ্তরের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী ও যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করা হয় তাহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) বলে।

(ঘ) অর্থসংক্রান্ত কার্য: সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য করধার্যের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা হয়। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত করধার্য ও অর্থব্যয় করা যায় না সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ। যে-দপ্তরের মাধ্যমে এই কার্য করা হইয়া থাকে তাহাকে অর্থদপ্তর (Finance Department) বা রাজস্ব দপ্তর (Treasury) বলে। কর সংগ্রহ বা ব্যয় করা ছাড়াও এই দপ্তর হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

(ঙ) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য: শাসন বিভাগের আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যও কিছু কিছু রহিয়াছে। শাসন বিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করে এবং উহার অধিবেশন স্থগিত রাখে। আবার প্রধান কর্মকর্তার সম্মতি না পাইলে কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে শাসন বিভাগ প্রয়োজন-বোধে জরুরী অস্থায়ী আইনও পাস করিতে পারে। বর্তমানে আইনসভা প্রণীত মূল আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিবার জন্য শাসন বিভাগ নিয়মিতভাবে উপ-আইন

(by-law) প্রণয়ন করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে আইনসভা আইন প্রণয়নের ভার শাসন বিভাগের উপর উত্তরোত্তর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

(চ) বিচারসংক্রান্ত কার্য: দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা শাসন বিভাগ বিচারসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও শাসন বিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে করধার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আপত্তির বিচার করে, কেহ অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হইলে তাহার আবেদনের বিচার করে, ইত্যাদি।

(ছ) অন্যান্য কার্য: বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় শাসন বিভাগকে অন্যান্য কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হয়। আজিকার দিনে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা, ডাক বিভাগ পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি মামুলী কর্তব্যপালন ছাড়াও নানাবিধ সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। ফলে শাসন বিভাগকেও এই সকল কার্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আজিকার দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ উত্তরোত্তর জনকল্যাণের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

বিচার বিভাগ (The Judiciary): সরকারের তৃতীয় অংগ বিচার বিভাগ। ইহার প্রধান কার্য ন্যায়বিচার করা। সমাজ-কল্যাণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বিশেষভাবে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা সরকারের যোগ্যতা বিচারের অধিকতর উপযোগী মাপকাঠি আর নাই।

প্রাচীনকালে শাসনকার্য ও বিচারকার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় কার্যই সম্পাদন করিতেন স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী। এই ব্যবস্থাকে 'স্বৈরাচারের নামান্তর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই বর্তমান সময়ে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত না হইলেও বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে সকলেরই একমত। ফলে অধিকাংশ দেশে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে বা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary): বিচার বিভাগের প্রধান কার্য প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা এবং দণ্ডবিধান করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকগণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন (case law) হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিচারকগণও শুধু আইনের ব্যাখ্যা ও দণ্ড-বিধানই করেন না, আইনের সৃষ্টিও করেন।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের

বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখে। আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর এই ভার ন্যস্ত।

বিচার বিভাগ শাসন বিভাগকে পরামর্শদানও করে। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে পরামর্শদানের ব্যবস্থা আছে।

বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে যাহা ঠিক বিচারকার্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির বিচারাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা, লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময় আবার ইহা দুষ্কর্ম বা অন্যায় রহিত করিবার জন্য নির্দেশ বা লেখ (writs) জারি করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary): পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এই কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

(ক) বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি: বর্তমানে শাসন বিভাগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, সাধারণভাবে ঊর্ধ্বতন বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই নিয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ, বিচারকগণ শাসন বিভাগের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকিলেও নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।

(খ) বিচারকগণের কার্যকাল ও পদচ্যুতি: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারকগণের কার্যকাল তাঁহাদের নিয়োগ-পদ্ধতির ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং অক্ষমতা বা দুষ্কর্ম প্রমাণিত না হইলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না।

(গ) বিচারকগণের বেতন ও ভাতা: বিচারকগণকে উপযুক্ত বেতন ও ভাতা না দিলে তাঁহারা তাঁহাদের পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না। দেখা গিয়াছে, স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিগণ উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কর্মের জন্য উন্মুখ থাকেন।

(ঘ) বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রিকরণ: পরিশেষে, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র না করিলে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যায় না।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি: সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—(ক) আইন প্রণয়ন, (খ) শাসন পরিচালনা, এবং (গ) বিচারের ব্যবস্থা। এই তিনপ্রকার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক সরকারের তিনটি করিয়া বিভাগ থাকে—(ক) ব্যবস্থা বিভাগ, (খ) শাসন বিভাগ, এবং (গ) বিচার বিভাগ। যে-নীতি অনুসারে এই তিন শ্রেণীর কার্য এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিনপ্রকার অর্থ করা হয়: ১। সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের

কার্য পরিচালনা করিবে না ; ২। একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না ; ৩। এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য : ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে ধারণা এ্যারিষ্টটলের সময় হইতে চলিয়া আসিলেও ইহাকে মতবাদে পরিণত করেন মণ্টেস্কু। মণ্টেস্কুর মতে, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ অপরিহার্য।

সমালোচনা : নানা দিক হইতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর নহে বলিয়া সরকারও তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত নয়।

দ্বিতীয়ত, দেখানো হইয়াছে যে উক্ত তিনটি অর্থের কোনটিতেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে কার্যকর হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে।

চতুর্থত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার মূলমন্ত্রও নহে।

এই সকল কারণে বর্তমানে একমাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া আর কোনপ্রকারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের দাবি করা হয় না।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ : সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগই অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন।

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী : ব্যবস্থা বিভাগ পাঁচপ্রকারের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে : ১। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য ; ২। অর্থসংক্রান্ত কার্য ; ৩। শাসনসংক্রান্ত কার্য ; ৪। বিচারসংক্রান্ত কার্য ; ৫। শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত কার্য।

ব্যবস্থা বিভাগের গঠন : ব্যবস্থা বিভাগ একটি না দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে সে-বিষয়ে বিশেষ মতবিরোধ আছে। দুইটি পরিষদের সপক্ষে বলা হয় যে—১। ইহাতে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় ; ২। ইহা একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচারিতা রোধ করে ; ৩। ইহাতে বিশেষ প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা করা সম্ভব ; ৪। বর্তমানে কর্মমুখর রাষ্ট্রে একটিমাত্র পরিষদই যথেষ্ট নয় ; ৫। দুইটি পরিষদ পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারে ; ৬। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ; ৭। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য।

অপরদিকে দুইটি পরিষদের বিপক্ষে বলা হয় যে—১। দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক ; ২। ইহা অনিষ্টকরও হইতে পারে ; ৩। দুইটি পরিষদ অপচয়মূলক ; ৪। ইহা অগণতান্ত্রিক, ৫। ইহা ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত করে, ৬। যুক্তরাষ্ট্রেও ইহা অপ্রয়োজনীয়।

শাসন বিভাগ : শাসন বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে :

১। আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা ; ২। পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য ; ৩। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা ; ৪। অর্থসংক্রান্ত কার্য ; ৫। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য ; ৬। বিচারসংক্রান্ত কার্য, ৭। অন্যান্য কার্য।

বিচার বিভাগ : বিচার বিভাগ বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে—১। আইনের ব্যাখ্যা ; ২। আইনের সৃষ্টি ; ৩। শাসন বিভাগকে পরামর্শদান, ৪। শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখা ; ৫। কিছু কিছু শাসনসংক্রান্ত কার্য।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, ১। বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি, ২। বিচারকগণের কার্যকাল ; ৩। বিচারকগণের বেতন ও ভাতা ; ৪। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকিকরণ।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the Theory of Separation of Powers. (C. U. 1948, '51)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির আলোচনা কর।

[ইংগিত : সংক্ষেপে নীতির ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উভয়ই করিতে হইবে।......(১২২-১২৭ পৃষ্ঠা)]

2. Describe the advantages of separation of powers between the different organs of a Government. What are its limits ?

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সুবিধাগুলি বর্ণনা কর। এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সীমা কি কি ?

[ইংগিত : ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিনটি সুবিধার উল্লেখ করা হয় : ১। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কর্ম বিভাগের (division of labour) সুবিধা, ২। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকার সুবিধা, এবং ৩। সাধারণের স্বাধীনতার সংরক্ষণ।...১২২-১২৭ পৃষ্ঠা]

3. Why is it considered desirable to separate the powers of the legislative, executive and judicial organs of a Government ?

আইন বিভাগীয়, শাসন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় কেন ?

4. Explain the Theory of Separation of Powers. How far is a strict separation of powers practicable and desirable ?

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কতদূর সম্ভব বা কাম্য ?

5. Argue for and against Bi-cameral Legislatures.

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

6. What are the functions of the Legislature in a Cabinet type of Government ?

মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারে আইনসভার কার্য কি কি ?

7. Describe the functions of the Executive in modern States.

আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

8. Indicate the importance of the independence of the Judiciary. Describe the factors on which the independence of the Judiciary depends.

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব নির্দেশ কর। যে-যে বিষয়ের উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে তাহা দেখাও।

ত্রোদশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার

(Electorate and Suffrage)

বর্তমান দিনের গণতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র। ইহাতে নাগরিকগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল ভোটাধিকারের ভিত্তি ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব লইয়া।

এই দুইটি সমস্যাকেই 'নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা' (problems of electorate) বলিয়া অভিহিত করা যায়। নির্বাচকমণ্ডলী (electorate) বলিতে ভোটাধিকারী নাগরিকগণের সমষ্টিকে বুঝায়। এখন প্রশ্ন, নাগরিকগণের মধ্যে কাহাদের এবং কি ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হইবে? অর্থাৎ, নির্বাচকমণ্ডলী কি পরিমাণ ব্যাপক হইবে?

নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা

নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপকতা ও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Extent of Electorate and Universal Adult Suffrage):

ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হইবে তাহা লইয়া মোটামুটি দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) বলে। ইহার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়:

ভোটাধিকারের ভিত্তি
সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তি

গণতন্ত্র যখন জনগণেরই শাসন (rule of the people) তখন সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। নতুবা গণতন্ত্র মুষ্টিমেয়ের শাসনে পরিণত হইয়া মিথ্যায় পর্যবসিত হইবে। বলা যায়, গণতন্ত্রে ভোটাধিকার নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

দ্বিতীয়ত, শাসননীতির ফলাফল যখন সকলকেই ভোগ করিতে হয় তখন ঐ নীতি নির্ধারণের ভার সকলের উপরই থাকা উচিত। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অভিযোগে কেহই কর্ণপাত করে না— তাহাদের দাবি উপেক্ষিতই হইতে থাকে। সুতরাং সর্বসাধারণের মংগলসাধন যদি গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হয় তবে উহাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র সাম্যকে সমর্থন করে বলিয়াও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। একমাত্র বয়স ছাড়া অন্য কোন কারণ বা অজুহাতে নাগরিকগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে বৈষম্যকে সমর্থন করা হয়। ফলে গণতন্ত্রও অলীক প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয় মতবাদে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে যোগ্যতা না থাকিলে এই অধিকার কাহাকেও দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মিলের মতে, শিক্ষাই যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়া সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই ভোটদানের অধিকারী হইবার জন্য কিছুটা পড়িবার, কিছুটা লিখিবার ও কিছুটা অংক কষিবার জ্ঞান অর্জন করা চাই। একথা স্বীকার্য যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা নাগরিককে উন্নত স্তরে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোকে যদি

বিপক্ষে যুক্তি:

সুযোগসুবিধার অভাবে অশিক্ষিত থাকিয়া যায় তাহার জন্য দায়ী হইল সমাজ-ব্যবস্থা; এবং অশিক্ষার অজুহাতে যদি জনসাধারণকে ভোটাধিকার বা নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র কোন সময়ই শিক্ষাবিস্তার ও জনকল্যাণসাধনে আগ্রহান্বিত হইবে না। ইহা ছাড়া নির্বাচনের সমস্যা বুঝিবার জন্য স্কুল-কলেজে শিক্ষার্জনের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই কাম্যভাবে ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে পারে। এমনও দেখা যায় যে উচ্চশিক্ষিত লোক—যেমন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী—রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন এবং নীতি ও বুদ্ধিমত্তার পথে ইহার সমাধান করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন। সুতরাং শিক্ষাকে ভোটদানের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

ক। শিক্ষার যুক্তি

আবার অনেকের মতে, শিক্ষা নহে সম্পত্তির মালিকানাই ভোটাধিকার অর্জনের মাপকাঠি হওয়া উচিত। কারণ, যাহাদের সম্পত্তি নাই দেশের প্রতি তাহাদের দরদ থাকে না এবং তাহাদের বিশেষ কর প্রদান করিতে হয় না বলিয়া তাহাদিগকে সরকারী অর্থের অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়। সম্পত্তিকে ভোটদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অন্যতম সামন্ততান্ত্রিক (feudal) নীতি। সামন্ততান্ত্রিক যুগে মাত্র সম্পত্তির অধিকারিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। বর্তমানে এই নীতিকে কেহই সমর্থন করেন না, কারণ সম্পত্তির মালিকানার সহিত নাগরিকতার গুণের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি করিলে ধনীরাই নিজেদের স্বার্থে শাসনকার্য চালাইবে।

খ। সম্পত্তির যুক্তি

উপসংহারে বলা যায়, জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বলিলাম এইজন্য যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সমস্যা বুঝিবার বা জানিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে না। আমাদের দেশে কোন নাগরিকের একুশ বৎসর বয়স না হইলে সে ভোটাধিকার পায় না। এইভাবে সবত্রই ভোটদানের বয়স নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া গ্রহণকারী বা রাষ্ট্রদ্রোহী তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, কারণ ইহারা দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে অপারগ।

উপসংহার: বর্তমানে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদানের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation):

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি হইতেই। শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে জনগণ বা সর্বসাধারণের শাসন বুঝায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই সরকার হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। অনেকের মতে, এইরূপ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না এবং ইহাকে অন্যায় (injustice) বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে। বস্তুত,

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ জানিবে যে তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। তাহারা নির্বাচকমণ্ডলীর ৪৯ ভাগ হইলেও প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ভোটদানকার্য একরূপ অর্থহীন। এরূপ মনোভাব সংখ্যালঘিষ্ঠদের কাম্য রাষ্ট্রনৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক নহে।

সপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে তাহাদের দাবিও উপেক্ষিত হইতে পারে। কারণ, দেখা গিয়াছে যে আইনসভায় যাহাদের প্রতিনিধি নাই তাহাদের কথা লোকে বড় একটা চিন্তা করে না।

তৃতীয়ত, আইনসভায় প্রতিনিধি না থাকিলে সংখ্যালঘিষ্ঠরা বলিতে পারে যে আইন তাহাদের সম্মতিক্রমে পাস হয় নাই; সুতরাং তাহারা ঐ আইন অমান্য করিবে। ইহার ফলে দেশে নানারূপ গোলযোগ এমনকি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতাও করা হয়। বলা হয় যে এরূপ ব্যবস্থা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে অযথা বিভেদের সৃষ্টি করে। ইহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় দলই নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে সকল বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করে বলিয়া জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং আইনসভা বিরোধী দলসমূহের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। উপরন্তু, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা জটিল বলিয়াও ইহাকে পরিহার করিবার সুপারিশ করা হয়।

বিপক্ষে যুক্তি

বিরুদ্ধ যুক্তি যাহা হউক না কেন, বর্তমানে বিভিন্ন দেশ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে উহার ব্যবস্থা করিয়াছে।

উপসংহার

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Minority Representation): সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(ক) **সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation):** এই পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যে যে-অনুপাত হয় সেই অনুপাতেই তাহাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, কোন নির্বাচন-এলাকায় যখন ভোটদাতৃগণের দুই-তৃতীয়াংশ একদলের পক্ষে এবং এক-তৃতীয়াংশ অপর দলের পক্ষে ভোটপ্রদান করে তখন ঐ নির্বাচন-এলাকা হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুই তৃতীয়াংশ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এক-তৃতীয়াংশ সদস্য আইনসভায় প্রেরণ করে। ইহার জন্য অবশ্য নির্বাচন-এলাকা বহুসদস্য-সমন্বিত (multi-member constituency) হওয়া প্রয়োজন। উপরি-উক্ত উদাহরণে নির্বাচন-এলাকা হইতে অন্তত ৩ জন সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা না থাকিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুই-তৃতীয়াংশ বা ২ জন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এক-তৃতীয়াংশ বা ১ জন সদস্য প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(খ) **পৃথক নিবাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ (Separate Electorate and Reservation of Seats):** সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন

সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াও উহাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশে হিন্দু ও শিখ তপশীলী বর্ণসমূহের জন্য আইনসভাসমূহে আসন সংরক্ষিত আছে। পূর্বে ব্রিটিশ আমলে হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতি সকলের জন্যই স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হইত। ফলে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকই আইনসভায় তাহাদের সদস্য প্রেরণ করিতে পারিত।

(গ) সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি (Limited Vote Plan): এই পদ্ধতিতেও প্রত্যেক নির্বাচন-কেন্দ্র বহু আসনসমন্বিত করা হয়। নির্বাচন-কেন্দ্রে মোট যতগুলি আসন থাকে নির্বাচক তাহা অপেক্ষা একটি কম ভোটদান করিতে পারে। ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল প্রত্যেক নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে অন্তত একজন করিয়া সদস্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়।

(ঘ) স্তূপীকৃত ভোট পদ্ধতি (Cumulative Vote Plan): এই পদ্ধতিতে নির্বাচন-এলাকায় যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক নির্বাচকের ততগুলি করিয়াই ভোট থাকে। নির্বাচক ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারে বা একজন প্রার্থীকেই স্তূপীকৃতভাবে দান করিতে পারে। এইভাবে স্তূপীকৃত ভোটদানের ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কিছু আসন সংগ্রহ করিতে পারে।

ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচন-এলাকা (Voters and Constituencies in India):

এখন দেখা প্রয়োজন, ভারতে নির্বাচক বা ভোটাধিকারী কাহারা এবং নির্বাচন-এলাকাই বা কিভাবে নির্ধারিত হয়।

নির্বাচক (Voters): স্বাধীন ভারতের সংবিধান সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিককেই ভোটাধিকার দিয়াছে। বস্তুত, সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বর্তমান শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংবিধান অনুসারে "লোকসভা এবং প্রতি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে।" পরে আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে সংবিধানের ধারা বা আইন অনুসারে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত নয় এবং ২১ বৎসরের কম বয়স্ক নয়, এইরূপ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই নির্বাচক বা ভোটার বলিয়া গণ্য হইবে। শাসনতন্ত্রের বিধান বা আইন অনুসারে একজন ভারতীয় নাগরিক নির্বাচন-এলাকায় বসবাস না করার জন্য, মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য এবং নির্বাচনের সময় বেআইনী বা অসাধু আচরণের জন্য নির্বাচক হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রত্যেক ভারতীয়ই লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচক যদি সে—

১। অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক হয়;

২। কোন নির্বাচন-এলাকায় সাধারণত বসবাস করে;

৩। সুস্থ মস্তিষ্ক হয়; এবং

৪। কোন নির্বাচনের সময় অসাধু বা বেআইনী কার্যের সহিত জড়িত না থাকে।

শাসনতন্ত্রের এই বিধানের ফলে ভারতবাসীর প্রায় অর্ধেকসংখ্যক ভোটাধিকার পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬২ সালের নির্বাচনে প্রায় ৪৪ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে ২১ কোটির অধিক নির্বাচক-তালিকাভুক্ত হয়।

ভারতে ভোটাধিকারের প্রসার

ব্রিটিশ আমলে
নির্বাচক জনসংখ্যার
শতকরা ১৪ ভাগ
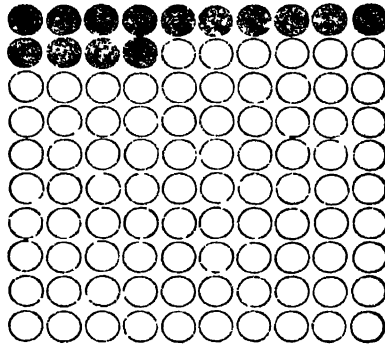
এখন শতকরা
৫০ ভাগ নির্বাচক
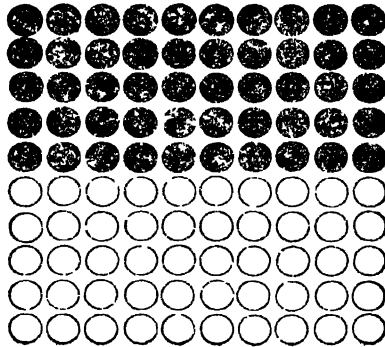
ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের নির্বাচকগণ শেষ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৪ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; আর বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হইল নির্বাচক। ইহার কারণ হইল পূর্বে সম্পত্তি, আয়, শিক্ষা, উপাধি প্রভৃতির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দান করা হইত ; কিন্তু বর্তমানে আইনের চক্ষে অযোগ্য নয় বলিয়া বিবেচিত সকলকেই নির্বাচকশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতে স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিকই নির্বাচক। ২১ বৎসরকে ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স হিসাবে ধরা হইয়াছে। সংবিধানের এই ব্যবস্থাকে সংবিধান-প্রণেতৃবর্গের একজন 'গণতন্ত্রের উৎস' (fountain of democracy) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

গণতন্ত্রের উৎস

স্বাধীন ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না (Whether Provision for Adult Suffrage in Free India has been justified) : সংবিধানে যখন সার্বিক প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় তখন অনেকেই ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে

সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বলিয়াছিলেন, শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা আগে না করিয়া সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়কে ভোটাধিকার প্রদান করায় বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে ভারতে গণতন্ত্র উচ্ছৃংখল জনতার শাসনে পরিণত হইতে পারে। উপরন্তু, ১৯-২০ কোটির মত নির্বাচক লইয়া নির্বাচনকার্য পরিচালনা করাও একপ্রকার অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনা করা যে দুঃসাধ্য নহে, তাহা প্রমাণিত হইল। অপরদিকে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপও বজায় রহিল; উহা উচ্ছৃংখল জনতার শাসনে পরিণত হইল না। বস্তুত, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার গণতন্ত্র বা জনগণের শাসনের প্রধানতম সর্ত। অশিক্ষার অজুহাতে ইহা হইতে দূরে থাকিলে গণতন্ত্র অলীকই প্রতিপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে শিক্ষা, সম্পত্তি প্রভৃতির যুক্তিকে বর্তমানে আর মানা চলিতে পারে না। সুতরাং সকল দিক দিয়াই ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, এই অভিমত স্বচ্ছন্দেই প্রকাশ করা চলে।

লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন-এলাকা ঃ লোকসভার নির্বাচনের জন্য রাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকায় বিভক্ত করা হয়। সংবিধান অনুসারে লোকসভার জন্য নির্বাচন-এলাকা এরূপভাবে নির্ধারিত করিতে হইবে যাহাতে যতসংখ্যক অধিবাসীপিছু একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করা হইবে, তাহা যেন ভারতের সর্বত্র একই হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ঠিক হয় যে ৫ লক্ষ লোক প্রতি ১ জন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করা হইবে তবে ঐ নীতি যেন ভারতের সর্বত্রই অনুসৃত হয়।

পূর্ববর্তী আদমসুমারির ভিত্তিতে প্রথমে রাজ্যগুলির জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়; পরে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে নির্বাচন-এলাকা নির্ধারিত হয়।

লোকসভার মত রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন-এলাকা সম্বন্ধেও সংবিধানে বলা হইয়াছে যে জনসংখ্যা ও সদস্যের মধ্যে অনুপাত সকল এলাকায় যেন যথাসম্ভব একই হয়।

রাজ্যের বিধানসভার বেলাতেও পূর্ববর্তী আদমসুমারিকে ভিত্তি করিয়া জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্বাচন-এলাকা নির্ধারিত হয়।

লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভা উভয় ক্ষেত্রেই তপশীলী বর্ণ ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বিধান পরিষদের নির্বাচন-এলাকা ঃ রাজ্যের বিধান পরিষদ বিধানসভা দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, গ্রাজুয়েটগণ ও শিক্ষকগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত হয়। রাজ্যের বিধান পরিষদে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, গ্রাজুয়েট ও শিক্ষকগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্বাচন-এলাকা নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষকদের মধ্যে অন্তত যাঁহারা তিন বৎসর কোন মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে বা উচ্চতর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহারাই

ভোটাধিকারী হন। গ্রাজুয়েটদের বেলাতেও অন্তত তিন বৎসর পূর্বে পাস করা চাই। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বেলাতে সময়ের কোন বাধা নাই। সকল সভ্যই ভোটাধিকারী হন। ভোটাধিকারী হইবার জন্য সকল ক্ষেত্রেই আবেদন করিতে হয়।

নির্বাচন-পদ্ধতি (Methods of Election): লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। অর্থাৎ, ভোটাধিকারী প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারে। রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্যগণ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। যথা, শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ্য বিধানসভা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গোপন ব্যালটের (secret ballot) দ্বারা হয়।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান দিনের পরোক্ষ গণতন্ত্রের দুইটি প্রধান সমস্যা হইল ভোটাধিকার ও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব লইয়া। এই দুইটি সমস্যাকে 'নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা' বলিয়া অভিহিত করা যায়।

ভোটাধিকারের সমস্যা বা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার: সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার লইয়া বিশেষ মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে, সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত; অনেকের মতে আবার উহা মাত্র যোগ্য নাগরিকদেরই দেওয়া উচিত। এই যোগ্যতার মান কি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, হয় শিক্ষা না-হয় সম্পত্তিকেই ভোটদান-যোগ্যতার মাপকাঠি করা উচিত। বর্তমানে অবশ্য এইভাবে ভোটাধিকার সংকুচিত করার নীতিকে মানিয়া লওয়া হয় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সকলের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব: সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না করিলে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না, সংখ্যালঘিষ্ঠগণও কাম্য রাষ্ট্রনৈতিক জীবনযাপন করিতে সমর্থ হয় না। অবশ্য অনেক সময় সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখানো হয়। যাহা হউক, বর্তমানে বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের নীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে উহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান: ১। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, ২। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ, ৩। সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি, এবং ৪। পুঞ্জীকৃত ভোট পদ্ধতি।

ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচন-এলাকা: ভারতীয় সংবিধান সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করিয়াছে। ব্রিটিশ আমলে শেষ পর্যন্ত জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ ভোটাধিকারী হইয়াছিল; এখন প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ভারতবাসী নির্বাচন-অধিকার ভোগ করে। এই ব্যবস্থাকে 'গণতন্ত্রের উৎস' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতে যখন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় তখন অনেকে ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা মোটেই অযৌক্তিক হয় নাই। বস্তুত, ইহার দ্বারাই ভারতে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে বলা যায়।

ভারতে লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আদমসুমারির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্বাচন-এলাকা নির্ধারিত হয়। রাজ্যের বিধান পরিষদের জন্যও বিশেষ বিশেষ নির্বাচন-এলাকা নির্ধারণ করা হয়।

ভারতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার নির্বাচন-পদ্ধতিই অনুসৃত হয়, তবে নির্বাচন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গোপন ব্যালট দ্বারা করা হইয়া থাকে।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain Adult Franchise and state the arguments in favour of the system

সার্বিক ভোটাধিকার বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর এবং এই ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তিগুলি প্রদর্শন কর।

2. What is meant by Adult Suffrage? How do you justify it? Should there be any limitation to Adult Suffrage?

সার্বিক ভোটাধিকার কাহাকে বলে? তুমি কি ইহা সমর্থন কর? সার্বিক ভোটাধিকারের কি কোন সীমা থাকা উচিত?

3. Discuss the case for and against universal adult suffrage.

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর।

4. Do you justify Adult Franchise in the case of India?

তুমি কি ভারতের ক্ষেত্রে সার্বিক ভোটাধিকার ব্যবস্থা সমর্থন কর?

5. Argue for and against Minority Representation. Describe the different methods that have been adopted for Minority Representation.

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য অবলম্বিত বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা কর।

6. Who are the voters in the elections of the following?—(a) Lok Sabha; (b) Legislative Assemblies in the States; and (c) Legislative Councils in the States.

নিম্নলিখিত পরিষদগুলির নির্বাচনে কাহারা ভোটদানে অধিকারী?—(ক) লোকসভা; (খ) রাজ্যের বিধানসভা; এবং (গ) রাজ্যের বিধান পরিষদ।

7. How are the constituencies of the following determined: (a) Lok Sabha; (b) Legislative Assemblies in the States; and (c) Legislative Councils?

ভারতে লোকসভা, রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের নির্বাচন-এলাকা নির্ধারিত হয়?

8. Write a short note on adult franchise and the system of election in India.

ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং নির্বাচন-ব্যবস্থার একটি বিবরণ লিখ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

গণতন্ত্রে জনমত (Public Opinion in Democracy): গণতন্ত্রকে জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকে জনসাধারণের সেবক বলিয়াই গণ্য করা হয়। জনসাধারণের কল্যাণসাধনের জন্য জনসাধারণের মতামত অনুসারেই তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন—নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য বা নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে নহে।

গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব:

বিভিন্ন দিক হইতে এইরূপ জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইহাতে সকল নাগরিকেরই বুদ্ধিবিবেচনা ও অভিজ্ঞতা রাষ্ট্র ও সমাজের মংগলসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার থাকায় প্রত্যেকেই তাহার ধ্যানধারণা ও আশা-আকাংক্ষাকে ব্যক্ত করিতে পারে। ফলে রাষ্ট্রও জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও অভিমত জানিয়া তদনুযায়ী নীতি-নির্ধারণ ও আইন-কানুন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয়।

১। এরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সকলের ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র সাধারণ লোকের শক্তিতে বিশ্বাসী। ইহা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রত্যেকেরই সমাজকে কিছু-না-কিছু দান করিবার আছে। ফলে ইহা প্রত্যেক নাগরিকের মতামতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ইহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়, ব্যক্তিরও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। অতএব, গণতন্ত্রে জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

২। জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে জনমতের ভয়ে শাসনকার্যের পরিচালকগণ স্বৈরাচারী হইতে সাহসী হন না। জনসাধারণের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সরকারী নীতির সমালোচনার সুযোগ থাকায় শাসনকার্যের পরিচালকবর্গকে সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। কারণ, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ক্ষমতা জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনসাধারণের সমর্থন হারাইলে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব, তাঁহাদিগকে সকল সময়েই জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং জনমত অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। অনেক সময় জনমত অনুকূলে না থাকার জন্য আইনসভা বা মন্ত্রিসভাকে নিজস্ব নীতি বা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরপক্ষে আবার জনমতের চাপে নূতন নীতি সংযোগ বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিহারের তৎকালীন

৩। জনমতের জন্য স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়

তাহারা সংবাদকে বিকৃত করে, সত্য ঘটনাকে চাপিয়া যায় এবং সরকার বা দলের সাফাই গাহিতে থাকে। ইহার কারণ হইল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রগুলি ব্যবসায় বা দলীয় মুখপত্র হিসাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষ সমর্থন বা দলীয় স্তুতিবাদ উহাদের অপরিহার্য নীতি হইয়া দাঁড়ায়।

সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠনে মুদ্রাযন্ত্রের দায়িত্ব

এইজন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত মালিকানা ও দলীয় প্রভাব হইতে সংবাদপত্রগুলিকে মুক্ত করিয়া উহাদিগকে প্রকৃত জনসেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা। সাময়িকপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য প্রযোজ্য। উহাদিগের লেখক ও প্রকাশকদের পক্ষে দল ও স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া প্রকৃত জনমত গঠন ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

২। বেতার ও চলচ্চিত্র (Radio and Cinema) : বেতার ও চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদি শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের নিকট সংবাদাদি পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়। বেতার ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদের হিতাহিত করিবার শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে কাম্য জনমত গঠন ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে বেতার ও চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। দেখিতে হইবে যে উহারা যেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই গুণকীর্তন না করিতে থাকে।

বেতার ও চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক

৩। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Educational Institutions) : জনমত গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যকার ছাত্র হইল আগামী দিনের সক্রিয় নাগরিক, চিন্তানায়ক এবং শাসন-পরিচালক। স্কুলকলেজে ছাত্ররা যে ধ্যানধারণা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। কিভাবে শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় হিটলারের অধীনে জার্মেনীর শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা গণতন্ত্রসম্মত হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যবিষয়কে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অনুকূল করিতে হইবে, শিক্ষকগণকে গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ

৪। সভাসমিতি (Platform) : জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সভা-সমিতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সভাসমিতিতে মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নেতৃগণের আলোচনা ও সমালোচনার ভিত্তিতে জনসাধারণও নিজেদের মতামত গঠন করিয়া থাকে। আবার এই সভাসমিতির মধ্য দিয়া জনগণের মনোভাবের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। এইভাবে সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়। এইজন্য বলা হয় যে সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অংগস্বরূপ।

সভাসমিতি দ্বারা কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়

৫। রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties): সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম অংগ হইলে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ হইল ইহার প্রাণ। রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য নিজ সপক্ষে জনমত গঠন করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করা। ইহা সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক দলই সভাসমিতি আহ্বান করে, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। জনসাধারণ দলীয় আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য হইতে আপন মতামত গঠন করিতে সমর্থ হয় এবং নির্বাচনে সেই মতামত প্রকাশ করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রাণ

৬। আইনসভা (Legislatures): রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত জনমত গঠন ও প্রকাশের আর একটি মাধ্যম হইল আইনসভা। আইনসভা বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্ষেত্র। এখানে বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দোষত্রুটিগুলি জনসমক্ষে ধরিয়া বা নিজ দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করে। আইনসভার তর্কবিতর্ক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনমত গঠনে আইনসভা সভাসমিতি অপেক্ষা কোন অংশে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। উপরন্তু, আইনসভাতেই জনমত প্রতিফলিত হয়। সরকারী দল ও বিরোধী দল আইনসভায় যে আলোচনা-সমালোচনা, সমর্থন ও বিরোধিতা করে তাহা জনমতের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করে।

আইনসভা জনমত গঠন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্র

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম

চলচ্চিত্র
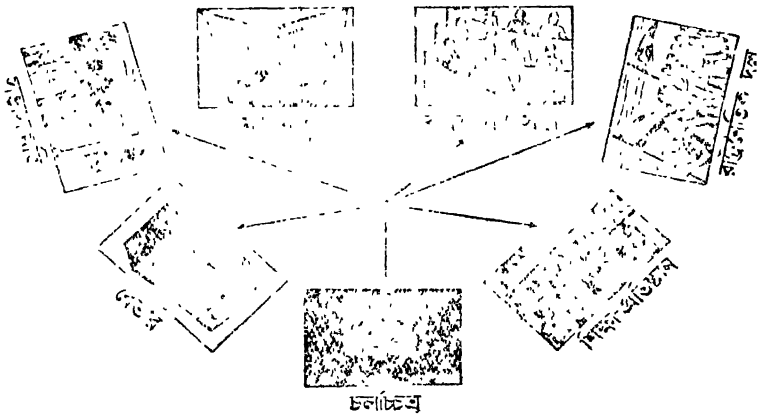
সংক্ষিপ্তসার

গণতন্ত্র জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্বকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। কিন্তু জনমত সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট নহে। তবুও বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে প্রবলতর অভিমতই জনমত। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই যে জনমত হইবে এরূপ কোন কথা নাই।

সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। জনমত সকল সময় সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক হইবে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমের মধ্যে (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, (৪) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল, এবং (৬) আইনসভা—এই কয়টিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নোত্তর

1. Define 'Public Opinion' and explain how it is related to Democracy.

(H. S. (C) Comp. 1961)

জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং কিভাবে ইহা গণতন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত তাহা দেখাও।

[১৪৫-১৪৭ এবং ১৫১ পৃষ্ঠা]

2. Explain the importance of Public Opinion in Democracy. Describe the principal organs through which Public Opinion is expressed.

(H. S. (T) Comp. 1963)

গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব নির্দেশ কর। জনমত প্রকাশের প্রধান প্রধান মাধ্যমের বর্ণনা কর।

[১৪৫-১৪৬, ১৫১ এবং ১৪৭-১৪৯ পৃষ্ঠা]

3. What is meant by Public Opinion? Describe the chief agencies for forming public opinion in modern times. (P. U. 1962)

জনমত বলিতে কি বুঝায়? বর্তমান দিনে জনমত গঠনের প্রধান মাধ্যমগুলির বর্ণনা কর।

[১৪৬-১৪৯ পৃষ্ঠা]

4. Explain the nature and importance of public opinion in modern States.

(C. U. 1960)

আধুনিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রবৃতি ও প্রযোজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [১৪৫-১৪৭ এবং ১৫১ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল

(Political Parties)

তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র জনগণের শাসন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে রাষ্ট্রনৈতিক দল। এইজন্য বলা হয়, রাষ্ট্রনৈতিক দলই গণতন্ত্রের প্রাণ। দলপ্রথা ব্যতীত বর্তমানের বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা (Representative Government) সফল হইতে পারে না, কারণ জনসাধারণের পক্ষে সুসংগঠিত হওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না। লোকে রাম শ্যাম যদু হরির মধ্যে কে উপযুক্ত প্রতিনিধি হইবে তাহা সহজে নির্ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বা প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভাল সে-সম্বন্ধে সহজেই অভিমত প্রদান করিতে পারে। এখন দেখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায় এবং ইহার কার্যাবলী ও গুণাগুণ কি কি?

গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য

রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? (What is a Political Party ?): রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে আলোচনা করিতে হয় যে 'দল' কাহাকে বলে। কিছু সংখ্যক একমতাবলম্বী ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলিত হয় তখন তাহারা দল গঠন করিয়াছে বলা যায়। এই অর্থে দলের সাক্ষাৎ সর্বত্রই পাওয়া যায়—যেমন, ফুটবল খেলার দল, অস্পৃশ্যতা বিরোধী দল, ইত্যাদি।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি ঐ একই। অর্থাৎ, সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি

'রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন' বলিতে বুঝায় জাতীয় কল্যাণের প্রসার। রাষ্ট্রনৈতিক দল বিশ্বাস করে যে তাহাদের কর্মসূচী ও কার্যপদ্ধতিই জাতীয় স্বার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল। সুতরাং তাহারা শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিলেই জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে। এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া তাহারা প্রচারকার্য চালায় এবং শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া নিজ নিজ কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতিকে রূপ দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ লইয়া এরূপ এক জনসমষ্টি যাহা জাতীয় কল্যাণের জন্য গঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা হইতে রাষ্ট্রনৈতিক দলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে: (১) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যগণ একই মতামত ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিষ্ট দলের সভ্যগণ সাম্যবাদের নীতি ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একমত হয়। (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলই জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে। (৩) যাহাতে ইহা নিজ নীতি ও আদর্শকে কার্যকর করিতে পারে তাহার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতালাভের চেষ্টা করে।

বৈশিষ্ট্য:
১। দলের সভ্যগণ একমতাবলম্বী হয়
২। দল জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে
৩। উহা শাসনক্ষমতালাভের চেষ্টা করে

এখন প্রশ্ন উঠে, সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যখন এক তখন বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের হেতু কি? উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে পদ্ধতিগত মতভেদের দরুনই বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ, কোন্ পদ্ধতি, কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে তাহা লইয়া মতবিরোধ থাকে বলিয়াই গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু লোক হয়ত দ্রুত সংস্কারসাধনের পক্ষপাতী, আবার কিছু লোক ধীরে ধীরে সংস্কারসাধন করিতে চায়। এ-ক্ষেত্রে দেশের দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব হইবে।

বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের কারণ

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিক-সংঘ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। নাগরিক হিসাবেই বিভিন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রনৈতিক দলে মিলিত হইয়া তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—

যথা, ভোটাধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রভৃতি—যথাযোগ্যভাবে ভোগ করিতে চেষ্টা করে। বিদেশীয়দের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনেরও কোন প্রশ্ন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন নাগরিকগণের অনন্য (exclusive) অধিকার। এই অধিকার ভোগের জন্য তাহাদের একটি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। দেখিতে হয় যে তাহাদের গঠিত দল যেন জাতীয় কল্যাণের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিক-সংঘ বলা যায়

জাতীয় কল্যাণের পরিবর্তে সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি কোন দল কায করে তবে উহাকে 'উপদল' (Faction) আখ্যা দেওয়া হয়। উপদলের কোন উচ্চ আদর্শ থাকে না, পদ্ধতিও নীতিমূলক হয় না। উহা ন্যায়-অন্যায় যে-কোন পদ্ধতিতে হউক না কেন দলীয় সভ্যগণের স্বার্থসাধন করিতে থাকে। এইরূপ বিকৃত আদর্শের অনুসরণকারী উপদলকে 'চক্রীদল'ও (Clique or Coterie) বলা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দল 'উপদল' হইতে পৃথক

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties) : আধুনিককালে সমাজের সম্মুখে অগণিত সমস্যা বিশৃংখলভাবে ছড়ানো থাকে। ইহাদের মধ্য হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণগুলিকে বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির প্রাথমিক কর্তব্য হইল এই কার্য সম্পাদন করা। তাহারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ করিয়া বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে এইগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং ইহাদেরই আশু সমাধান প্রয়োজন।

১। সমস্যা-নির্বাচন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম কার্য

রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে। নাগরিকগণের পক্ষে সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়াই যথেষ্ট নহে, কিভাবে উহাদের সম্যক সমাধান করা যায় সে-সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিই এই ধারণার সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহারা নির্বাচিত সমস্যাগুলির ভিত্তিতে নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। এইভাবে বিভিন্ন নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে কোন্ পদ্ধতিটি সমস্যা-সমাধানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল।

২। ইহা সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে

উপরন্তু, সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থির মত হইলেও কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন সে-সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক দল না থাকিলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড় করায়। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে অমুক ব্যক্তিকে সমর্থন করিলে সমস্যার সমাধান এইভাবে হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি প্রতিনিধি নির্বাচনেও সাহায্য করে। বর্তমান দিনের গণতন্ত্র প্রতিনিধিমূলক বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দলের এই কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ইহা প্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়তা করে

রাষ্ট্রনৈতিক দলের আরও কার্য আছে। আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি জনমতের বাহন। সভাসমিতির অনুষ্ঠান, দলীয় প্রচার প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক দল জনমতের গঠন ও প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনভার গ্রহণ করে তখন বুঝিতে পারা যায় যে ঐ দলের নীতি ও কার্যসূচী জনমত দ্বারা সমর্থিত। আবার অপর দলের দোষত্রুটিও জনসমক্ষে উপস্থিত করা রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম কার্য। নিজ দলের সপক্ষে সমর্থনলাভের প্রচেষ্টাতেই রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি এই কার্য করিয়া থাকে। এইরূপে বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দলের দ্বারা জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়।

৪। ইহা জনমতের গঠন ও প্রকাশে ভূমিকা গ্রহণ করে

পরিশেষে, সমস্যা-নির্বাচন, নীতি-নির্ধারণ, প্রার্থী-মনোনয়ন প্রভৃতি নিরর্থক হইয়া পড়ে যদি-না নির্বাচিত সমস্যার সমাধান এবং নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর করিবার কোন উপায় থাকে। এই উপায় হইল শাসন-ক্ষমতালাভ। সুতরাং শাসনক্ষমতা অধিকার করাকে রাষ্ট্রনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা সমস্যা-নির্বাচন করে, নীতি-নির্ধারণ করে, প্রার্থী দাঁড় করায় এবং প্রচারকার্য চালায়। শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে সমর্থ হইলে পর রাষ্ট্রনৈতিক দল প্রতিশ্রুত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকে; আর ক্ষমতা হস্তগত করিতে না পারিলে সরকারী দলের দোষত্রুটির আলোচনার দ্বারা জনসাধারণের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে।

৫। ইহা শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করে

৬। ইহা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবেও কাজ করে

দলপ্রথার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Party System): বলা হয় যে রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যেই উহার গুণ নিহিত আছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে যে কার্য সম্পাদন করে তাহা বর্তমান দিনের জাতীয় রাষ্ট্রে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যেই উহার গুণ নিহিত

প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে। অগণিত সমস্যার মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির নির্বাচন, সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশ এবং প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সুশৃংখল শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব করে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিরাট দেশে রাষ্ট্রনৈতিক দল না থাকিলে সুষ্ঠুভাবে শাসন-কার্য পরিচালনা করা কখনই সম্ভব হইত না। কারণ, লোকে তখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিত এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন প্রতিনিধিবর্গ শৃংখলাবদ্ধ-ভাবে কোন কাজই করিতে পারিতেন না।

গুণ: ১। দলপ্রথা বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে

২। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে

দ্বিতীয়ত, দলপ্রথা জনমত গঠনে ও প্রকাশে সহায়তা করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দলপ্রথা না থাকিলে জনমত কি, তাহা বুঝা যায় না বলিয়া প্রতিনিধিগণ খুশিমত কার্য করিতে পারেন। এইরূপ ঘটিলে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না; উহা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

৩। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার করে

তৃতীয়ত, দলপ্রথা জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার করে। দলীয় প্রচারকার্য, দলীয় সমালোচনা প্রভৃতি জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলে এবং তাহাদিগকে ভোটদানে উৎসাহিত করে।

৪। দলপ্রথা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ

চতুর্থত, দলপ্রথার সপক্ষে আরও বলা হয় যে ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে বলিয়া সমালোচনার ভয়ে প্রত্যেক দলকেই সংযত হইয়া চলিতে হয়। শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াও কোন দল স্বৈরাচারিতার পথে চলিতে পারে না। চলিলে অন্যান্য দল উহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; এবং ফলে পরবর্তী নির্বাচনে ঐ দল শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে।

৫। ইহার জন্য শান্তিপূর্ণ পন্থাগতে সংস্কারসাধন সম্ভব হয়

পঞ্চমত, দলপ্রথা থাকিলে শান্তিশৃংখলা ভংগ না করিয়াও কাম্য সংস্কারসাধন করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক দল জনমতকে সপক্ষে পরিচালিত করিয়া নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনের পর বিজয়ী দল নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়া জনমত-অনুমোদিত সংস্কারসাধনে সচেষ্ট হয়। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে যে-স্বার্থের বিরোধিতা বর্তমান থাকে তাহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়।

৬। ইহা শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে

ষষ্ঠত, দলপ্রথাই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে। আমরা দেখিয়াছি যে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কোনমতেই কাম্য নহে; এবং সুশাসনের জন্য ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। পার্লামেন্টীয় সরকারে এই সহযোগিতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সেখানে মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই নিযুক্ত হন, এবং দলীয় নেতা বলিয়াই ব্যবস্থাপক সভার সমর্থনলাভ করিয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃত সেখানেও দলপ্রথার জন্যই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে। আইনসভায় রাষ্ট্রপতির যে-দল থাকে তাহা রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা সমর্থন করিয়া চলে।

৭। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সমন্বয়সাধন করে

পরিশেষে, দলপ্রথা আবার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সহযোগিতা আনয়ন করে। ভারতে বর্তমানে একমাত্র কেরল ছাড়া সকল স্থানে কংগ্রেস-সরকার গঠিত হইয়াছে। কেরলেও সংযুক্ত ফ্রণ্ট (United Front) কংগ্রেসের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিয়াছে।

একই দলভুক্ত বলিয়া এই সকল সরকার পরস্পরের সহিত সহযোগিতা এবং পরস্পরের সমর্থন করিয়া থাকে ; এবং সকলে একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

এইভাবে দলপ্রথার বিশেষ গুণকীর্তন করা হইলেও উহার কতকগুলি দোষক্রটির উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

ক্রটি : ১। বলা হয় দলীয় ঐক্য কৃত্রিম

প্রথমত, বলা যায় দেশের লোকের এত বিভিন্ন মতামত থাকে যে তাহা মাত্র কয়েকটি দলের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং যে দলীয় ঐক্য দেখা যায় তাহা কৃত্রিম। অনেকে তাহাদের মনোমত দলের সন্ধান না পাইয়া বিশেষ একটি দলকে সমর্থন করিতে বাধ্য হয়।

২। দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে

দ্বিতীয়ত, দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশসাধন করে। একবার দলভুক্ত হইলে ব্যক্তির পক্ষে নিজস্ব মতামতকে চাপা দিয়াও দলীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করিয়া যাইতে হইবে। অন্যথায় তাহাকে দল হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে।

৩। নানাভাবে জাতীয় স্বার্থের হানি করে

তৃতীয়ত, অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে ; এবং দলগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। নির্বাচনের সময়ও নানারূপ দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয়। ফলে সমাজের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। সাধারণ সময়ে দল অযথা অর্থব্যয় এবং চাকরি, সম্মান প্রভৃতি বিতরণ করিয়া নিজ সমর্থকদের সন্তুষ্ট রাখে।

৪। অনেক সুযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনকার্যের বাহিরে রাখে

চতুর্থত, দলপ্রথার জন্য অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ বিজয়ী দল নিজেদের সমর্থকদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করে।

৫। অন্যান্য ক্রটি

আরও বলা যায় যে, নির্বাচনের সময় অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয়। ফলে হিংসা, দ্বেষ, মনোমালিন্য, অশোভনীয় বক্তৃতাদি প্রসারলাভ করে এবং জাতীয় জীবনের সংহতি নষ্ট হয়। লোকে দলের ভিত্তিতেই ভাবিতে শিখে, জাতীয় কল্যাণের ভিত্তিতে নয়।

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party and Multi-Party System) : ইহা একরূপ ধরিয়া লওয়া হয় যে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল ব্যতীত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইংরাজ লেখক বার্কারকে অনুসরণ করিয়া অনেকেই বলেন, একটিমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে সেই দেশকে একনায়কতন্ত্রী (dictatorial) বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কারণ, এইরূপ দেশে গণতন্ত্রের অন্যতম সর্ত রাষ্ট্রনৈতিক দল-গঠনের স্বাধীনতা থাকে না বলিয়াই একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

একাধিক দল গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য

সুতরাং গণতন্ত্রে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিতে হইবে বলিয়া ধরা হয়। 'একাধিক' বলিতে যদি মাত্র দুইটি দল থাকে তবে উহাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (bi-party

system) বলা হয় ; দুই-এর অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে উহা বহুদলীয় ব্যবস্থা (multi-party system) নামে অভিহিত হয়। ইংলণ্ডে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। ঐ দেশে রক্ষণশীল (Conservative) ও শ্রমিক (Labour) এই দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল। উদারনৈতিক (Liberal) ও সাম্যবাদী (Communist) দলের সমর্থকসংখ্যা এত কম যে উহাদের অস্তিত্বকেই একরূপ অস্বীকার করা হয়। অপরদিকে ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক দল সংখ্যায় এত বেশী যে কোন দলের পক্ষেই এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না।

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই সমর্থন করিতে হয়। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নাগরিকদের পক্ষে নীতি-নির্বাচন অতি সহজ হয়। দুইটি নীতির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য লোকে তাহার বিচার সহজেই করিতে পারে; কিন্তু বহুপ্রকার নীতি যদি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা নির্ধারণ করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাড়ায়।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার গুণ :

১। ইহাতে নীতি-নির্বাচন সহজ হয়

আলোচনার দিক হইতেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা সমর্থনীয়। দুইটি দলের কর্মসূচী আলোচনা করা যত সহজ, বহু দলের বহু প্রকারের কর্মসূচীর আলোচনা ও বিচারবিবেচনা করা তত সহজ নয়।

২। আলোচনাও সহজ হয়

দ্বিদলীয় ব্যবস্থাতেই সুসংবদ্ধ সরকারী দল ও শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। বহু দল থাকিলে অধিকাংশ সময় কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে সম্মিলিত সরকার (coalition government) গঠন করিতে হয়। সম্মিলিত সরকারের কোন সুদৃঢ় নীতি থাকে না; পদে পদে মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ইহাকে শাসনকার্য চালাইতে হয়। অপরদিকে সরকারের বিরোধী যে-সকল দল থাকে তাহারাও ঐক্যবদ্ধ হয় না বলিয়া বিরোধিতাও শক্তিশালী হয় না।

৩। সরকার এবং বিরোধী দল সুগঠিত হয়

অবশ্য বহুদলীয় ব্যবস্থার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, লোকের যে বিভিন্ন মতামত থাকে তাহা বহু দলের মাধ্যমে সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। দুইটি মাত্র দলের কোনটির নীতির সহিতই যদি আমার মতের মিল না হয় তবে আমি গত্যন্তরবিহীন। বহু দল থাকিলে একটি না একটি নীতির সহিত মিল হইবেই।

বহুদলীয় ব্যবস্থা সকল মতামতের প্রতিফলনের সহায়ক

তবুও সকল দিকের বিচারবিবেচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন দল এককভাবে সরকার গঠন করিতে পারে না বলিয়া সকল সময়ই বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। ফলে সরকারের ঘন ঘন পতন ঘটিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়া তুলে।

তবুও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সমর্থনীয়

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান দিনের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য। রাষ্ট্রনৈতিক দল রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন বলিতে বুঝায় জাতীয় কল্যাণবৃদ্ধি।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—১। দলের সভ্যগণ একমতাবলম্বী হয়, ২। দল জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে, এবং ৩। ঐ উদ্দেশ্যে শাসনক্ষমতালাভের চেষ্টা করে।

কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকে বলিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে 'উপদল' বা 'চক্রীদল' হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থসাধন করে। উপদল দলের সভ্যগণের স্বার্থসাধনে সচেষ্ট থাকে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী: রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—১। সমস্যা-নির্বাচন; ২। সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করা, ৩। প্রতিনিধি নির্বাচনে সাহায্য করা; ৪। জনমত গঠন ও প্রকাশে ভূমিকা গ্রহণ করা; ৫। শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করা; এবং ৬। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করা।

দলপ্রথার গুণ: ১। দলপ্রথা বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে; ২। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে; ৩। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার করে; ৪। ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ; ৫। ইহা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে শাসন-সংস্কার সম্ভব করে; ৬। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে; এবং ৭। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সমন্বয়সাধন করে।

ত্রুটি: বলা হয় ১। দলীয় ঐক্য কৃত্রিম; ২। দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে, ৩। নানাভাবে জাতীয় স্বার্থের হানি করে; ৪। অনেক সুযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনকার্যের বাহিরে রাখে; ৫। হিংসা দ্বেষ মনোমালিন্য প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া জাতীয় কল্যাণের হানি ঘটায়।

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা: গণতন্ত্র একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল ব্যতীত চলে না। সকল দিকের বিবেচনা করিয়া বহুর পরিবর্তে দুইটি দলের পক্ষেই মত প্রদান করিতে হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by a Political Party? Are Political Parties inevitable in a Democracy? Give reasons for your answer.

রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ? গণতন্ত্রের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল কি অপরিহার্য? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর।

2. Define Political Party and point out the functions of Political Parties.

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার কার্যাবলী কি কি তাহা নির্দেশ কর।

3. What is a Political Party? Distinguish between a Party and a Faction.

রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? রাষ্ট্রনৈতিক দলকে উপদল হইতে পৃথক করিয়া দেখাও।

4. Describe the merits and demerits of Political Parties.

রাষ্ট্রনৈতিক দলের গুণাগুণ বর্ণনা কর।

5. Discuss the relative advantages of Multi-Party and Bi-Party system.

বহুদলীয় ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থার আপেক্ষিক সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর।

6. What are the functions of political parties in a democracy ? Explain the merits and demerits of a party system of Government. (H. S. (C) Comp. 1962)

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী কি কি ? দলীয় ব্যবস্থার উপর স্থাপিত সরকারের গুণাগুণ ব্যাখ্যা কর। [১৫০-১৫১ এবং ১৫২-১৫৫ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা

(Nation, Nationalism and Internationalism)

আধুনিক নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতে পারে না, তাহাকে বিশ্বের সমস্যা লইয়াও মাথা ঘামাইতে হয়। এই কারণে তাহার পক্ষে যে-সকল শক্তি বিশ্বশান্তির, বিশ্ব-সমবায়ের পরিপন্থী তাহাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইরূপ অন্যতম সক্রিয় শক্তি হইল জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। সুতরাং নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা একরূপ অপরিহার্য। কিন্তু জাতি (Nation) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না করিয়া জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং আলোচনা 'জাতি' হইতেই সুরু হওয়া উচিত। আমরা তাহাই করিব।

জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব

জাতি (Nation): সংক্ষেপে জাতি বলিতে এমন এক 'জনসমাজ'কে (people) বুঝায় যাহা অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে এবং যাহারা স্বাধীন বা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে। এখন এইরূপ জনসমাজ, যাহাকে জাতি বলা হয় তাহা কিভাবে গড়িয়া উঠে ? জাতি গড়িয়া উঠে ধীরে ধীরে, ক্রমবিকশিত হইয়া। কোন জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধের ফলে প্রথমে গড়িয়া উঠে 'জনসমাজ'। পরে এ জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে যখন উহা স্বাধীন হইতে চায় বা স্বাধীন হয় তখন উহাকে 'জাতি' আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতি কাহাকে বলে

জাতি কিভাবে মূর্ত হয়

জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে নানা কারণে—যথা, একই স্থানে বসবাস, একইভাবে উদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস, ভাষা ধর্ম সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতিতে সমতা, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা, ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে কোনটিই অবশ্য অপরিহার্য নয়। একস্থানে বসবাস না করা সত্ত্বেও জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহুদি জনসমাজ গঠিত হইয়াছিল। আবার একইভাবে উদ্ভূত না হইলেও জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। ইংরাজ বা মার্কিনদের জাতি বলিতে কেহই আপত্তি করিবেন না। কিন্তু উভয়েই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত। অভিন্ন ভাষা ধর্ম সাহিত্য ও ইতিহাসকেও অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা চারিটি স্বতন্ত্র

ভাষাভাষী হইয়াও এক জনসমাজ*; বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীও এক জনসমাজ। ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও জনসমাজ গড়িয়া উঠে। চীন ও সোবিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন ধর্ম জনসমাজ গঠনের অন্তরায় হয় নাই।
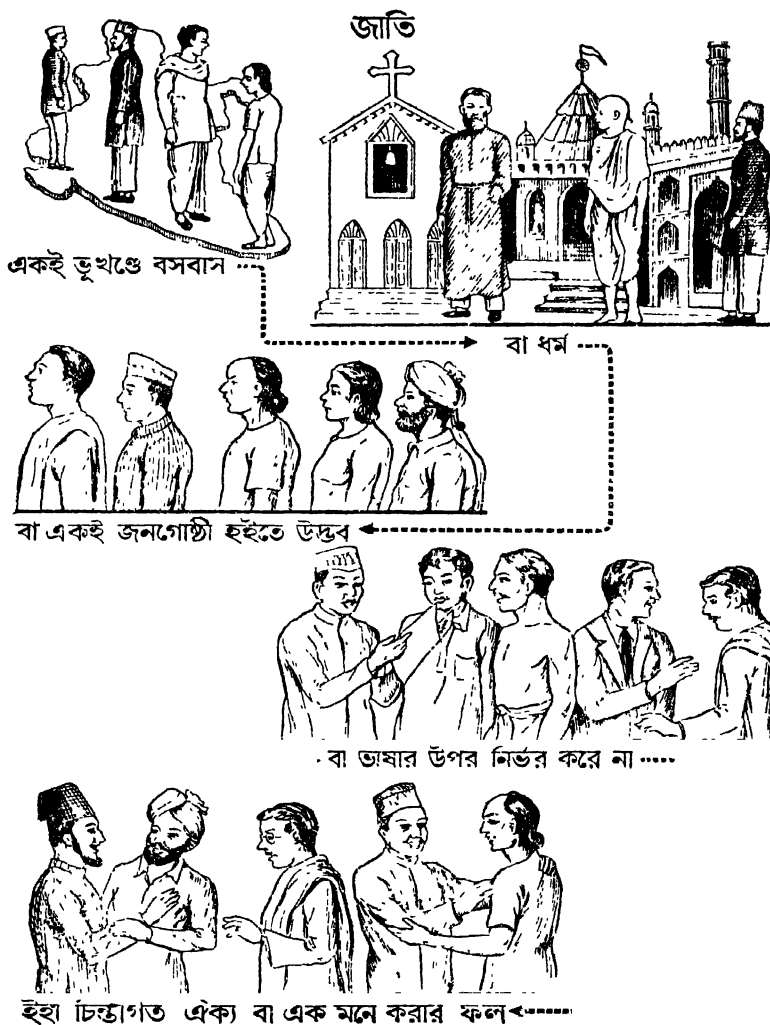
* ভাষা চারিটি হইল জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় এবং রোমান্স (Romonsch); চতুর্থ ভাষাটি মাত্র কিছুদিন পূর্বে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

এইরূপে জনসমাজ গঠনের জন্য কোন উপাদান অপরিহার্য না হইলেও কয়েকটি বর্তমান থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে একমাত্র ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে প্রথমে মুসলমান জনসমাজ এবং পরে মুসলমান জাতি গঠিত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আসল কথা হইল, জনসমাজের যে-ঐক্য তাহা প্রধানত চিন্তা বা ভাবগত। কোন জনসমষ্টি যদি ভাবে যে তাহারা একটি পৃথক জনসমাজ তবেই তাহারা জনসমাজে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা যেদিন ভাবিতে শিখিল যে তাহারা অন্যান্য ভারতবাসী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সেইদিনই তাহারা জনসমাজে পরিণত হইল। তাহার পূর্বে হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন খ্রীষ্টান—সকলেই ছিল ভারতীয় জনসমাজের অন্তর্গত।

জাতি বা জনসমাজের ঐক্য প্রধানত ভাবগত

এইভাবে জনসমাজ গঠিত হইলে ক্রমশই তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইতে থাকে। সেই অবস্থায় জনসমাজকে 'জাতি' (Nation) আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism): জাতির মধ্যে যে ঐক্যবোধ (spirit) বর্তমান থাকে তাহাকে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয়তাবাদ স্বাতন্ত্র্যবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতি ভাবিতে শিখে, তাহারা যখন পৃথিবীর মনুষ্যসম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র তখন তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও থাকা প্রয়োজন। সুতরাং তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করিতে থাকে। ইহাকে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি' বা অধিকার (right of self-determination) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের মুসলমানেরা যখন ভাবিল যে তাহারা এক স্বতন্ত্র জাতি তখন তাহা পাকিস্তান গঠনের দাবি করিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্ব জাতির রূপ আরও সুস্পষ্ট হইল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইলেও জাতি বিলুপ্ত হয় না বলিয়া জাতীয়তাবাদেরও অবসান ঘটে না। তখন জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের পথেও অগ্রসর হইতে পারে।

জাতির মধ্যে যে ভাব বর্তমান থাকে তাহাকে জাতীয়তাবাদ বলে

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Nationalism and Right of Self-determination): বলা হইয়াছে, নবগঠিত জাতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই দাবিকে মানিয়া লওয়া হয়, অনেক সময় ইহাকে অস্বীকার করা হয়। অস্বীকার করার ফল অবশ্য সকল সময় শুভ হয় না; সকল সময় আবার এই দাবিকে মানিয়া লওয়াও যায় না। এই কারণে দেখা প্রয়োজন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কতদূর স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন ধারণা। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইহা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে,

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, "জাতির সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সহিত এক হওয়া প্রয়োজন"—অর্থাৎ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে মাত্র একটি করিয়া জাতি বাস করিবে। ইহাকে একজাতীয় রাষ্ট্রের (Mono-national State) আদর্শ বলা হয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি

মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন এই একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান ও বিশ্বশান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সকল ক্ষেত্রে মানিয়া লইলে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, সকল জাতিরই দাবি পূর্ণ হইবে। ফলে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ বাধিবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে অনেক নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া উইলসনের এই ধারণাকে রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল, অনেক নূতন রাষ্ট্র গঠনের পরও যুদ্ধের আশংকা বিলুপ্ত হইল না। ইহার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতির সীমারেখার সহিত এক হইল না। অনেক পুরাতন ও নবগঠিত রাষ্ট্রে—যেমন, জার্মেনী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় অন্যান্য জাতির অংশবিশেষ রহিয়া গেল। ফলে, আবার উঠিল আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি।

বিপক্ষে যুক্তি

বস্তুত, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান বা শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা—কোনটিই সম্ভব নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নাই; শান্তিভংগের সম্ভাবনাও দূরীভূত হয় নাই। বরং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

ভারতের উদাহরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই পর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লইয়া আলোচনাকালে লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, ইহা এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার। ইহার ফলে জনগোষ্ঠী যেমন নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তেমনি অপরাপর জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক হইবার প্রচেষ্টাও করে। এই পৃথক হইবার প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি নাই। কার্জনের এই উক্তির সারবত্তা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। নবসৃষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে জার্মান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দল আবার পৃথক হইবার দাবি করিতে লাগিল। ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর ভারতে অনেক মুসলমান এবং পাকিস্তানে কিছু হিন্দু রহিয়া গিয়াছে। তাহারা যদি আবার পৃথক হইবার দাবি করে এবং এই দাবি যদি প্রবল হয়, তবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির শেষ বলিয়া কিছুই নাই।

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির শেষ নাই

প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে 'ইতিহাসের পশ্চাৎগতি'র লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইবার দাবি মাত্র। ইহা আদিম অসভ্য যুগের সহিত

বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ। আদিম যুগে এক জনগোষ্ঠী যেমন অন্য জনগোষ্ঠীর সহিত মিলিতে চাহিত না, এই সভ্য যুগেও যদি মানুষ তাহাই করে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহারা পিছনে হাঁটিতেছে। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি পরিত্যাগ করা উচিত।

কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্তমানে শুধু মতবাদই নয়; ইহা একটি সক্রিয় শক্তি। সুতরাং শুধু যুক্তি দ্বারা ইহাকে খণ্ডন করিলেই চলিবে না, কার্যক্ষেত্রে খণ্ডনের ফলাফলও বিচার করিতে হইবে। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি যদি প্রবল হয় তখন উহাকে মানিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, এই দাবিকে অস্বীকার করিলে গৃহযুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে।

তবে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এই দাবিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইতে পারে

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism): জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে। পরাধীন থাকাকালীন জাতি স্বাধীন হইবার আকাংক্ষা প্রকাশ করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানায়। তারপর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইলে জাতীয়তাবাদ প্রথমে স্বাদেশিকতার (patriotism) রূপ ধারণ করে। স্বাদেশিকতা বলিতে বুঝায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অনুরাগের ফলে ঐ জাতিভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য জাতির সব কিছুকেই হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে। তাহারা বিশ্বাস করিতে থাকে যে তাহাদের জাতির মত জাতি নাই, ভাষার মত ভাষা নাই, সাহিত্যের মত সাহিত্য নাই, সংস্কৃতির মত সংস্কৃতি নাই। এইরূপ স্বাদেশিকতাকে জাতি-পূজা (Nation-worship) আখ্যাও দেওয়া হয়। জাতি-পূজার ফলে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাহাদের আছে। ফলে তাহারা সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। হিটলারের অধীনে জার্মান জাতি এইরূপই করিয়াছিল।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির সৃষ্টি করে

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ধারণার আধুনিক স্রষ্টা ইতালীয় স্বদেশপ্রেমিক ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) কিন্তু জাতীয়তাবাদকে এই প্রকার বিকৃত রূপে দেখেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জাতিরই কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা আছে। এই প্রতিভার বিকাশের জন্যই উহার পক্ষে স্বতন্ত্র থাকা প্রয়োজন। স্বতন্ত্র থাকিলেও তাহারা পরস্পরের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইবে না; সাম্য স্বাধীনতা শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের সমবায়ে মানবসমাজের উন্নতিবিধান করিয়া চলিবে।

প্রকৃত জাতীয়তাবাদ কিন্তু উদার নীতি পোষণ করে

সাধারণত ম্যাট্‌সিনির এই আদর্শ স্মরণ করিয়া জাতীয়তাবাদীরা পথ চলে না। মানবতার কথা ভুলিয়া গিয়া জাতীয় স্বার্থকেই ধ্রুবতারকা গণ্য করিয়া অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ"। ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে এবং দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করিলে দেখা দেয় সভ্যতার সংকট

সভ্যতার এই সংকট দূর করিবার জন্য শুধু ম্যাট্‌সিনি নন, যুগে যুগে দার্শনিকগণ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগি প্রসারের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বারবার বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মানবতারই পূজা করিবেন। ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতেই যেমন ব্যক্তির সমৃদ্ধি—সেইরূপ জাতিও বিশ্ব জাতিসংঘের মধ্য দিয়াই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে; মানবসমাজের সমৃদ্ধিতেই জাতির সমৃদ্ধি। এই প্রসংগে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, ব্যক্তি যেমন পরিবারের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়, পরিবার যেমন গ্রামের জন্য, গ্রাম যেমন জিলার জন্য, জিলা যেমন প্রদেশ বা রাজ্যের জন্য এবং রাজ্য যেমন জাতির জন্য অনুরূপ করে—তেমনি জাতিকেও বিশ্বের জন্য, মানবসমাজের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শ

বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ও যাতায়াতের অকল্পিত সুবিধার ফলে পৃথিবী আজ অতি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে। এ-পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিবার দিন আর নাই। সুতরাং মানবতার পথে, আন্তর্জাতিকতার পথেই চলিতে হইবে। বিপরীত মুখে চলিলে—অর্থাৎ, জাতিকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে থাকিলে বাধিয়া উঠিবে সংঘর্ষ। এই পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের যুগে এইরূপ সংঘর্ষের ফলে সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য।*

আন্তর্জাতিকতার আদর্শের গুরুত্ব

জাতিসংঘ (League of Nations) : আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে রূপ দিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠার দ্বারা। যাঁহারা জাতিসংঘ গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশা ছিল যে, ইহার ফলে সকল রাষ্ট্র মিলিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং যুদ্ধ বিলুপ্ত হইয়া পৃথিবীতে অপার শান্তি ও অপূর্ব সমৃদ্ধি বিরাজ করিবে। আশাবাদী উদ্যোক্তাদের এই স্বপ্ন কিন্তু সফল হয় নাই—জাতিসংঘ রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শের রূপদানের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা : জাতিসংঘ

পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও জাতিসংঘ বিশ্বের বহু কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, পৃথিবীব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে ছোটখাট বিরোধের মীমাংসা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* **"Unless we think internationally, we perish."**

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতিসংঘের উদ্ভব হইয়াছিল ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা মহত্তর যুদ্ধের ফলে ঐ একই উদ্দেশ্যে উদ্ভব হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যুদ্ধবিহীন করিবার উদ্দেশ্যে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়াছে।

উদ্ভব : দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথমাবস্থাতেই কয়েকটি মিত্রশক্তি ঘোষণা করে যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে। মিত্রপক্ষীয় শক্তিসমূহের এই ঘোষণা ১৯৪১ সালের 'লণ্ডন ঘোষণা' (London Declaration, 1941) নামে পরিচিত।

ঐ বৎসরই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট আটলান্টিক মহাসাগরে পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁহাদের বিখ্যাত 'আটলান্টিক সনদ' (Atlantic Charter) ঘোষণা করেন। এই সনদে যুদ্ধোত্তর যুগে অন্যান্যের মধ্যে নিরস্ত্রিকরণ ও স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হয় পরবর্তী বৎসরের সূচনায়। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন মিত্রশক্তি-স্বাক্ষরিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা (United Nations Declaration) প্রকাশ করা হয় তাহাতে আটলান্টিক সনদ কার্যকর করিবার নীতি সমর্থন করা হয়।

এ-পর্যন্ত অবশ্য বিশ্বসংঘ প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ করা হয় নাই, জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। ইহা করা হয় মিত্রশক্তিসমূহের পরবর্তী চুক্তিতে যাহা 'মস্কো ঘোষণা' (Moscow Declaration, 1943) নামে পরিচিত। মস্কো ঘোষণায় বলা হয় যে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সাম্যের ভিত্তিতে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

পরবর্তী অধ্যায়গুলি এই সংগঠনের রূপদান করে। ইহার জন্য ওয়াশিংটনে ও ইয়াল্টায় মিত্রশক্তিসমূহের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধান গৃহীত হয়, এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য : সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিতে জাতিপুঞ্জ দৃঢ়সংকল্প। এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ, শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রকে সকলে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দিবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করিবে। সুতরাং সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা। সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা রক্ষার দ্বারা এই শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা হয় বলিয়া ইহাকে 'সামগ্রিক নিরাপত্তা' (collective security) বলে। অতএব, বলিতে পারা যায় যে সামগ্রিক নিরাপত্তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক লক্ষ্য। চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা।

প্রাথমিক ও চূড়ান্ত লক্ষ্য

সংবিধানে আরও কয়েকটি গৌণ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে—যথা, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা; মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা; জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা; এবং পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা।

গৌণ উদ্দেশ্য

যে-সকল গৌণ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইল, আপাতদৃষ্টিতে তাহারা গৌণ হইলেও কার্যত তাহারা চরম লক্ষ্য বা বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে, পরাধীন জাতি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না পাইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের কল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া, মানুষের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া এবং সর্বোপরি সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়া এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। এই পৃথিবীতে জাতি থাকিলেও জাতি নাই, রাষ্ট্র থাকিলেও রাষ্ট্র নাই। সকল জাতি ও রাষ্ট্র সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ; সমগ্র মানবজাতি যেন এক পরিবার। এ এক নূতন পৃথিবী।

গৌণ উদ্দেশ্যগুলি চরম লক্ষ্যের সহিত সম্পর্কিত

গঠন : জার্মেনী ও জাপানের বিরুদ্ধে যে-সকল মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য। ভারতবর্ষও অন্যতম মূল সদস্য। স্বাধীনতার পর ভারত মূল সদস্যপদে আসীন রহিল। পাকিস্তান নূতন সদস্য হিসাবে জাতিপুঞ্জে গৃহীত হইল। মূল সদস্যগণ ব্যতিরেকে যে-কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালও ইহার সদস্য। বর্তমান (মার্চ, ১৯৬৪) সদস্যসংখ্যা ১১৩।*

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন। ইহা নানা বিভাগে বিভক্ত। নিম্নলিখিতগুলিই ইহার প্রধান বিভাগ।

সাধারণ সভা (General Assembly) : ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য-রাষ্ট্র লইয়াই গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের মাত্র একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা আছে,

* ১১২শ এবং ১১৩শ সদস্য হইল যথাক্রমে জাঞ্জিবর ও কেনিয়া। এই দুই রাষ্ট্র ব্রিটেনের অধীনতা-পাশ মুক্ত হইলে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সদস্যমণ্ডলীভুক্ত হয়।

যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রই পাঁচজন করিয়া সদস্য সাধারণ সভায় প্রেরণ করিতে পারে। সভা সংবিধানের অন্তর্গত যে-কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। ইহা যে-কোন সদস্য-রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদকে সুপারিশও করিতে পারে। সভায় জাতিপুঞ্জের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্টের সমালোচনা করা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council): নিরাপত্তা পরিষদই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রকৃত ভার ইহার উপর ন্যস্ত। আন্তর্জাতিক শান্তিভংগ হইল কি না, শান্তিভংগের আশংকা আছে কি না এবং শান্তিভংগ হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে প্রভৃতি সমস্তই নির্ধারণ করে এই পরিষদ। শান্তিভংগ হইলে পরিষদ নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। প্রথমত, ইহা সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে শান্তিবিপন্নকারী দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। এই ব্যবস্থা যথেষ্ট না হইলে পরিষদ বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সাহায্য লইয়া বলপ্রয়োগ করিতে পারে। উত্তর কোরিযার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ এইরূপ বলপ্রয়োগই করিয়াছিল এবং কংগোতে এইরূপ বলপ্রয়োগই করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদকে বিশ্বশান্তির রক্ষক বা অভিভাবক বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহা 'স্বস্তি পরিষদ' নামেও খ্যাত।

নিরাপত্তা পরিষদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। ছয়জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কোন অস্থায়ী সদস্যকে পুনর্নির্বাচিত করা হয় না।

নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলে ঐ প্রস্তাব কাযকর হয় না। স্থায়ী সদস্যদের এইভাবে প্রস্তাব বাতিল করিবার ক্ষমতা 'ভিটো' (Veto) বলিয়া অভিহিত।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice): ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার বিভাগ। এই বিচারালয় ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন। জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য এই বিচারালয়ে মামলা রুজু করিতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council): ইহা সাধারণ পরিষদ দ্বারা মনোনীত ১৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। ঐ সকল উদ্দেশ্যে এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত

বিভিন্ন মানবহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ (ILO); খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (FAO); আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (UNESCO) ; আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) ; বিশ্বব্যাংক (World Bank) * ; বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (WHO); আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (ITO) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়া ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবহিতের জন্য অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছে। এই কমিশনগুলির মধ্যে 'মানুষের অধিকারের উপর কমিশন'ই (Commission on Human Rights) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কমিশনের ফলে ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিশ্বজনীনভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করিয়াছে। স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে ১৯৫৮ সালে একটি অর্থভাণ্ডারও (Development Fund) গঠন করা হইয়াছে।

এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত কয়েকটি মানবহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে

অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council) : স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছে। এই তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালনা করে অভিভাবক পরিষদ। এই পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণও আছেন।

উপরি-উক্ত বিভাগগুলি ছাড়া জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তর আছে। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক বা প্রধান কর্মসচিবই (Secretary-General) হইলেন প্রধান কর্মকর্তা। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। কার্যকাল শেষ হইলে পুনর্নিযুক্তও হইতে পারেন।

যে নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। বিরাট আয়োজন ও সংগঠন সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া আন্তজাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ছায়া মোটেই দূরীভূত হয় নাই; মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষিত হইলেও তাহা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পরাধীন জাতিসমূহ এখনও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় নাই। এই সকল কারণে অনেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য সত্য যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ কিছু কিছু কার্য করিয়াছে; কিন্তু তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তুলনায় একরূপ নগণ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

---

* ইহার পুরা নাম হইল International Bank for Reconstruction and Development. এইজন্য ইহাকে সংক্ষেপে IBRDও বলা হয়।

এই অবস্থায় জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ইংগিত দেওয়া কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণ বিফল হইলে মানবজাতির পক্ষে ভীষণ দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের দ্বারা আমাদিগকে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে। দার্শনিকগণ বলেন, সাধারণ মানুষকেই এই কার্য সুরু করিতে হইবে। সাধারণ লোকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রনেতাগণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। সভ্যতার সংকট তখন দূর হইবে।

কিন্তু সাধারণ মানুষকেই ইহা সফল করিয়া তুলিতে হইবে

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: আধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদ অন্যতম সক্রিয় আন্তর্জাতিক শক্তি। জাতির মধ্যে যে-ভাব বর্তমান থাকে তাহাকেই জাতীয়তাবাদ বলে। জাতি হইল রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনসমাজ। এইরূপ জনসমাজ নানা কারণে গড়িয়া উঠে। পরাধীন জাতির মধ্যে 'ঐক্যভাব' বা 'জাতীয়তাবাদ' জাগ্রত হইলে ঐ জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিতে থাকে। অনেকে বলেন, এই দাবি মানিয়া লওয়া উচিত। অনেকে আবার বলেন যে এই দাবির শেষ নাই—সুতরাং ইহাকে মানিয়া লইবার বেলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে সকল সমস্যার যে সমাধান হয় না ভারতই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা: স্বাধীন জাতির জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা প্রথমে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া পরে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের দ্বারা সভ্যতার এই সংকট দূর করিবার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ এবং বর্তমানের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন এইভাবে আন্তর্জাতিক আদর্শকে রূপদানের প্রচেষ্টারই ফল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হয়। সামগ্রিক নিরাপত্তাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টা, মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা, জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদিও ইহার লক্ষ্য।

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন। ইহা নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত: ১। সাধারণ সভা; ২। নিরাপত্তা পরিষদ; ৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয়; ৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ; ৫। অভিভাবক পরিষদ। ইহা ছাড়া একটি কর্মদপ্তরও আছে। প্রধান কর্মসচিব বা সাধারণ সম্পাদকের অধীনে দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলে মানবজাতির সম্মুখে ভীষণ দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং আমাদিগকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগি পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. **What do you understand by 'Nation' and 'Nationalism'? Illustrate your answer.**

'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ' বলিতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

2. Explain the theory: "One Nation, One State." Would you accept it? State your reasons fully.

"এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—এই নীতির ব্যাখ্যা কর। ইহা কি গ্রহণযোগ্য? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত: জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—অর্থাৎ, একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের পর্যালোচনা করিতে হইবে।

3. Define the term 'Nation' and distinguish it from State. Is India a Nation?

জাতির সংজ্ঞা এবং জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ভারত কি একটি জাতি?

[ইংগিত: রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজই জাতি বলিয়া অভিহিত। এইরূপ জনসমাজ যখন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী ও স্বাধীন হয় তখনই রাষ্ট্র আখ্যা পায়।

ভারত অবশ্যই জাতি বলিয়া গণ্য। ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে ভাষা ধর্ম আচার-ব্যবহারের পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যবোধ আছে; ইহার উপর আছে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা ভারত-রাষ্ট্র। অতএব, ভারত যে একটি জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

4. Discuss the case for and against the Right of Self-determination as a principle of organisation of States.

রাষ্ট্রসমূহের সংগঠনের নীতি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর।

5. State the principal aims and objectives of the United Nations. Give a brief outline of its organisation.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। উহার গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

6. Write a short note on the functions and importance of the United Nations.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী ও গুরুত্বের উপর একটি টীকা রচনা

7. Describe the origin and functions of the United Nations.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

8. What is the United Nations? State its aims and objects.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বলিতে কি বুঝায়? ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

(Features of the Constitution of India)

ভূমিকা : ব্রিটিশ আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইত। যখন ভারতীয়গণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন ঠিক হয় যে স্বাধীন ভারতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হইবে। ১৯৪৬ সালে এই গণপরিষদ গঠন করা হয়; এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 'ভারতের গণপরিষদ' এবং 'পাকিস্তানের গণপরিষদ'—এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

গণপরিষদ

ভারতের গণপরিষদ ভারতীয় জনগণের পক্ষে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে থাকে। রচনাকার্য সমাপ্ত হইলে ইহা ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় জনগণের পক্ষেই গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ঠিক দুই মাস পরে—অর্থাৎ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে এই শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। ইহা 'ভারতীয় সংবিধান' (The Constitution of India) নামে অভিহিত, এবং এই শাসনতন্ত্র অনুসারেই বর্তমান সাধারণতান্ত্রিক ভারতের (Republican India) শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

বর্তমান শাসনতন্ত্রের রচনা, গ্রহণ ও প্রবর্তন

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Features of the Constitution of India) : ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায় :

(১) ভারতীয় সংবিধান লিখিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল। ইহা যখন প্রবর্তিত হয় তখন ইহাতে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ (Articles) এবং ৮টি তপশীল (Schedules) ছিল। তখন হইতে আজ পর্যন্ত এই সংবিধানের মোট ১৬ বার সংশোধন করা হইয়াছে।* ইহার ফলে সংবিধানের বেশ কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমত, তপশীলের সংখ্যা ৮ হইতে ৯-এ দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অনুচ্ছেদের ক্রমিক সংখ্যা ঐ ৩৯৫ থাকিলেও বিভিন্ন সংশোধনের ফলে সংবিধানের মধ্য হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ পুরাপুরি ও কয়েকটি অনুচ্ছেদের কিছু অংশ

১। ভারতীয় সংবিধান সর্বাপেক্ষা বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল

---

* ১৯৬৩ সালেই পঞ্চদশ ও ষোড়শ সংশোধন পাস করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধন দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সহিত হাইকোর্টের বিচারপতিদের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পূর্বে তাঁহারা ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে আসীন থাকিতে পারিতেন এখন উহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৬২ বৎসর করা হইয়াছে। ষোড়শ সংশোধন দ্বারা ভারতের সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা রাজ্যসমূহকে দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে (মার্চ, ১৯৬৪) সপ্তদশ সংশোধনের কার্য চলিতেছে। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য হইল ভূমি-সংস্কারের (land reforms) পথে কয়েকটি প্রতিবন্ধক দূর করা।

বাদ গিয়াছে, এবং কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংগে কিছু কিছু অংশ সংযুক্তও হইয়াছে। তৃতীয়ত, রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের গঠন সংক্রান্ত প্রথম তপশীল, রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত চতুর্থ তপশীল প্রভৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মোটকথা, নানা হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর লিখিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম রহিয়া গিয়াছে।

সংবিধান বিরাট ও জটিল হইবার কারণ

ভারতীয় সংবিধান বিপুলায়তন ও জটিল হইবার মূলে রহিয়াছে নিম্নলিখিত কারণগুলি : (ক) সংবিধানে মাত্র কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থাই সন্নিবিষ্ট হয় নাই ; জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। (খ) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কও বিশেষ জটিল। (গ) সংবিধানে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। যথা, সরকারী চাকরি, ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায়, তপশীলভুক্ত জাতি ও জনগোষ্ঠী (Scheduled Castes and Scheduled Tribes), সরকারী ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবিধানে অনেকগুলি ধারা আছে। (ঘ) সংবিধানে কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারই বর্ণিত হয় নাই, কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিও উল্লিখিত হইয়াছে। (ঙ) সংবিধান বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রকে বহুলাংশে অনুকরণ করিয়াছে।

২। ভারত একটি সাবভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র

(২) সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সাবভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, (ক) ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহি-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় শাসন-ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক। (গ) আবার ভারত সাধারণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ, ভারতে রাজার স্থান নাই—শাসনক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের হস্তে ন্যস্ত। ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

৩। ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র

(৩) সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বা 'রাজ্যসংঘ' (Union of States) বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ, বলা যায় যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে নাই। কিন্তু ভারতকে সম্পূর্ণভাবে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করার বিপক্ষেও যুক্তি রহিয়াছে। ভারতীয় 'যুক্তরাষ্ট্রে' কেন্দ্রের হস্তে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু, আপৎকালীন ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিতে পারেন। এইজন্য বলা হয় যে, সাধারণতান্ত্রিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থা একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক। জনৈক আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদের মতে, ভারত 'অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র' (Quasi-federal State)।

(৪) ভারতীয় সংবিধান একাধারে দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয়। ইহার কতক অংশের সংশোধনে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাকী অংশের পরিবর্তন সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সহজেই করা চলে। এই বৈশিষ্ট্যটির জন্যও ভারতকে 'অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সমগ্রটাই সাধারণত দুষ্পরিবর্তনীয় হয়।

৪। ভারতীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সুপরিবর্তনীয় উভয়ই

(৫) সংবিধানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করিয়া এ-দেশের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলি অবশ্য অবাধ নহে; নানাভাবে উহাদিগকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

৫। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে

(৬) মৌলিক অধিকার ছাড়াও সংবিধানে শাসনকার্য পরিচালনার কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy) ঘোষণা করা হইয়াছে। শাসনকর্তাগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সময় এগুলি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। এই নীতিগুলি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Social Welfare State) দ্যোতক।

৬। নির্দেশমূলক নীতিও ঘোষণা করা হইয়াছে

(৭) ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে (secularism) ভারত-রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট দিক বলিয়া ধরা হয়। ভারতে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম (State Religion) নাই। জাতি ধর্ম বর্ণ বিশ্বাস এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতীয়দের জন্য এক এবং অভিন্ন নাগরিক-অধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে না।

৭। ধর্ম-নিরপেক্ষতা ভারত-রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট দিক

(৮) সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে পূর্ণ পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বশীল সরকারের প্রবর্তন। ব্রিটিশ আমলে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও উহা নানাভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন পূর্ণ দায়িত্বশীলতার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতেও সম্প্রসারিত করা হইয়েছে।

৮। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থাও অন্যতম বৈশিষ্ট্য

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা 'ভারতীয় সংবিধান' অনুসারে পরিচালিত হয়। এই সংবিধান ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক রচিত।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। ভারতীয় সংবিধান সর্বাপেক্ষা বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল; ২। ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র—অর্থাৎ, ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, শাসন ব্যবস্থা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত এবং ভারতে রাজার কোন স্থান নাই; ৩। ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয়

ধরনের রাষ্ট্র ; ৪। সংবিধান আংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় এবং আংশিকভাবে সুপরিবর্তনীয় ; ৫। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ; ৬। ইহাতে নির্দেশমূলক নীতিও ঘোষণা করা হইয়াছে ; ৭। ভারত অন্যতম ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ; ৮। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্নোত্তর

1. **State and explain the chief characteristics of the Indian Cons'itution.**

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

2. **Explain the main features of the present Constitution of India.**

ভারতের বর্তমান সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইউনিয়ন সরকারের শাসন বিভাগ
(The Union Executive)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় ব্যবস্থা বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্বশীলতা। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা 'পার্লামেণ্টীয়' (Parliamentary) বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার (Cabinet Government) নামেও অভিহিত। ভারতের এই দায়িত্বশীল বা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদ লইয়া গঠিত। শাসন বিভাগের আলোচনা রাষ্ট্রপতি হইতে সুরু করিতে হয়।

রাষ্ট্রপতি-পদের প্রকৃতি

রাষ্ট্রপতি (The President): রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া অভিহিত করা চলে। ডাঃ আম্বেদকারের ভাষায়, "আমাদের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের পতি, কিন্তু শাসন বিভাগের কর্তা নহেন। তিনি জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না।" শাসন বিভাগের কর্তা হইলেন প্রধান মন্ত্রী। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর পদের সহিত আমাদের রাষ্ট্রপতির পদের কতকটা তুলনা করা চলে। আইনত উভয়েই প্রধান শাসক হইলেও, কার্যত দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার বিধান অনুসারে উভয়েই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। উভয়েরই পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কাহারও কর্তৃত্ব নাই ; সুতরাং দায়িত্বও নাই।

নির্বাচন (Election): রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন না। তিনি এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচকমণ্ডলী (ক) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, এবং (খ) রাজ্যের বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ লইয়া গঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন

ভোটের ব্যাপারে দুইটি নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে—(ক) দেখা হয় যে পার্লামেন্টের সদস্যগণের মোট যতগুলি ভোট থাকে, যেন মোট ততগুলি ভোট থাকে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণের; এবং (খ) যেন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে সমতা থাকে। এই দুইটি নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারিত হয়।
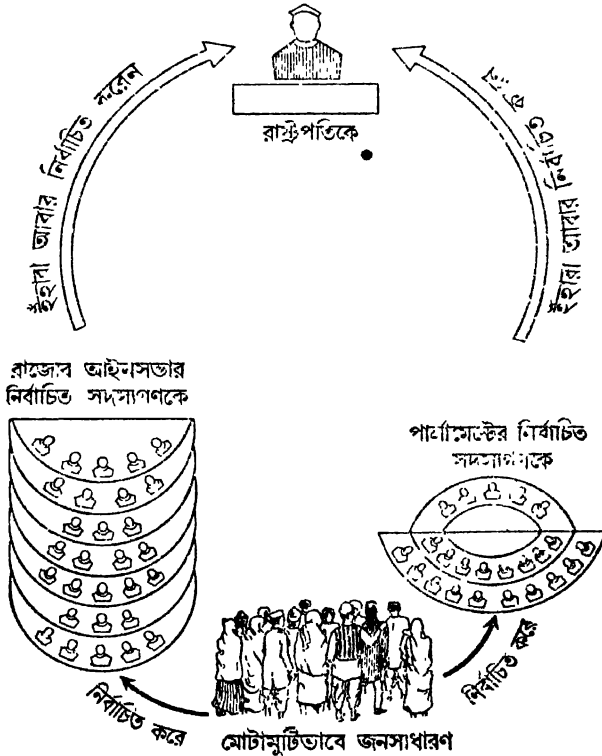
প্রথমে রাজ্যের জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেওয়া হয়। ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করা হয়। এইবার যে

ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই হইল ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটদানের সংখ্যা। এই সংখ্যাকে ঐ রাজ্যের নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ঐ রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে। সকল রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যাগুলি যোগ করিলে যে-সংখ্যা হইবে, তাহাই পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা। (পূর্বেই বলা হইয়াছে রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের মোট যতগুলি ভোট থাকে ততগুলিই ভোট থাকে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের।) পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া গেলে তাহাকে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে-ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের প্রত্যেকের ভোটদানের সংখ্যা।*

যে-পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাহা একটি জটিল পদ্ধতি। সংবিধানে ইহাকে একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation by means of the Single Transferable Vote) বলা হইয়াছে। পদ্ধতিটি এইরূপ : রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যতজন নির্বাচনপ্রার্থী থাকিবেন প্রত্যেক ভোটাধিকারীর ততগুলি পছন্দ (preferences) থাকিবে। ভোটাধিকারী ব্যালট কাগজে নির্বাচনপ্রার্থীদের নামের পাশে তাঁহার পছন্দ অনুসারে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা বসাইবেন। ২য়, ৩য় এবং পরবর্তী পছন্দ তিনি নাও জানাইতে পারেন, কিন্তু প্রথম পছন্দ তাঁহাকে জানাইতেই হইবে। না জানাইলে তাঁহার ভোট বাতিল হইয়া যাইবে।

ভোটদান সমাপ্ত হইলে ব্যালট কাগজে প্রদত্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া তাহার সহিত এক যোগ করা হয়। ইহাতে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে 'কোটা' (Quota) বলে। প্রথমে ১ম পছন্দের ভোটগুলি গণনা করিয়া দেখা হয় যে, কেহ কোটা পাইয়াছেন কি না। কোটা পাইলেই তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কেহ কোটা না পাইলে সর্বনিম্নসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়া তাঁহার প্রাপ্ত ভোটগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। ইহাতেও যদি কেহ কোটা না পান তবে তৃতীয়বার এইরূপ করা হয়। এইভাবে যতক্ষণ-পর্যন্ত-না একজন প্রার্থী কোটা প্রাপ্ত হন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থীবাদ ও ভোট-হস্তান্তরকার্য চলিতে থাকে।

* বিষয়টিকে বুঝাইবার জন্য একটি কল্পিত উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, পশ্চিমবংগের জনসংখ্যা মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ এবং পশ্চিমবংগের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা ২৫২। এই জনসংখ্যাকে সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১ লক্ষ। এই ভাগফলকে আবার এক হাজার দ্বারা ভাগ করিলে (১,০০,০০০—১০০০) ভাগফল হয় ১০০। সুতরাং রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে পশ্চিমবংগের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ১০০ ভোট থাকিবে। নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৫২ হওয়ায় সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা হইবে ২৫,২০০। এইভাবে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি সকল রাজ্যের সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা বাহির করা যাইতে পারে। তারপর এই সকল মোট ভোটসংখ্যাকে যোগ দিলে যে-সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাই হইল পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোটসংখ্যা। উহাকে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে।

এইরূপ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ: রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে এইরূপ জটিল পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের তিনটি কারণ আছে।

কেন এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে

(ক) ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে বিপুল নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন বিশেষ অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার;

(খ) নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না করাই যুক্তিযুক্ত; করিলে তিনি প্রকৃত শাসনক্ষমতা দাবি করিতে পারেন। তাঁহাকে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা দিলে মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে না; এবং ফলে নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার (Parliamentary Government) স্বরূপও বজায় রাখা যায় না;

(গ) রাষ্ট্রপতি যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে—অর্থাৎ, মোট ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশী পাইয়া, নির্বাচিত হন সেই উদ্দেশ্যে 'সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে'র ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যদি সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত তবে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা বেশী থাকিলে রাষ্ট্রপতি সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোটেও নির্বাচিত হইতে পারিতেন। এইরূপ ঘটনা গণতন্ত্রের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি (Tenure and Removal of the President): রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্যকাল উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন। কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তিনি পদত্যাগও করিতে পারেন। শাসনকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আবার পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই বিচার করিতে পারে সংবিধানভংগের অভিযোগে। যে-কোন পরিষদ সংবিধানভংগের অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। অভিযোগ প্রস্তাবাকারে আনিতে হয়। এইরূপ প্রস্তাব আনয়ন করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-চতুর্থাংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত অন্তত চৌদ্দ দিনের এক লিখিত নোটিস দিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের অভিপ্রায় জানাইতে হইবে। ইহার পর প্রস্তাবটি ঐ পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাস হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে পার্লামেন্টের এক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অপর পরিষদ অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে বা অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী পরিষদ যদি উহার মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

কিভাবে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়

রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। লাভজনক কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট বা কোন রাজ্যের আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না। এরূপ কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে যে-দিন তিনি রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবেন সেই দিন হইতে তাঁহার পার্লামেন্টের বা রাজ্যের আইনসভার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

শাসনভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনুযায়ী শপথ বা স্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হয় যে তিনি বিশ্বস্ততার সহিত রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করিবেন, সাধ্যানুসারে সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন এবং নিজেকে ভারতীয় জনগণের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President) ঃ ইউনিয়ন সরকারের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য তিনি দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি অনুযায়ী মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইনত সকল ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির ; তাঁহার নামেই শাসনকার্য পরিচালিত এবং সরকারী আদেশসমূহ প্রচারিত হয়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হইল মন্ত্রি-পরিষদের। ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতিকে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার এই মৌলিক নীতিটি স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতি

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ ঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়—শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, আইনবিষয়ক ক্ষমতা, অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।

(ক) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাজ্যপালগণ, প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণ, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General), নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ, এ্যাটর্নী-জেনারেল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান 'সদর-ই-রিয়াসৎ' রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বীকৃত হন।

রাষ্ট্রপতি স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন রক্ষিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

দিল্লী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি—এই চারিটি কেন্দ্র-শাসিত বা ইউনিয়ন অঞ্চলের (Union Territories) শাসনকার্য রাষ্ট্রপতিরই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বাকী পাঁচটি

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে মন্ত্রি-পরিষদ ও আইনসভা গঠন করা হইলেও উহারা কিছুটা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন আছে।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা বিষয়ে সমতা ও সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি এক আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) নিযুক্ত করিতে পারেন। জরুরী অবস্থায় তিনি রাজ্যপালের শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিবার অথবা তাহার দণ্ডাদেশ হ্রাস করিবার অথবা দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

(খ) আইনবিষয়ক ক্ষমতা : পার্লামেণ্টীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগ বা পার্লামেণ্টের একটি অংগ। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিল (Bill) আইনে পরিণত হইতে পারে না। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়। তিনি সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, অথবা বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে ফেরত পাঠাইতে পারেন।*

কেন্দ্রের আইন ছাড়াও রাজ্যের আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হইতে পারে। রাজ্যের আইনসভা কোন বিল পাস করিলে তাহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল নিজে সম্মতি বা অসম্মতি কোনকিছুই জ্ঞাপন না করিয়া বিলটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সরাসরি তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারেন। এ-ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সম্মতি না দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

রাজ্যের আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভাতেও তাঁহার অনধিক দুইজন ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা আছে।

রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। সাধারণত পার্লামেণ্টের উদ্বোধনী সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় সরকারী কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং যে-যে কারণে অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে জ্ঞাত করানো হয়। পার্লামেণ্টের যে-কোন পরিষদে তিনি অন্য যে কোন সময় বক্তৃতা করিতে বা নির্দেশ পাঠাইতে পারেন।

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী রাখা এবং নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভাকে ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে।

পার্লামেণ্ট অধিবেশনে না থাকিলে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। এইরূপ আইন বা অর্ডিন্যান্স পার্লামেণ্ট অধিবেশনে বসার পরও ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত কার্যকর থাকিতে পারে।

* অর্থ-সম্বন্ধীয় কোন বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো যায় না।

(গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা : পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী ব্যয়বরাদ্দ করিবার এবং খরচের অনুমতি দিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকে আইনসভার হস্তে। কিন্তু শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদ্দের দাবি করা না হইলে এবং খরচের অনুমতি চাওয়া না হইলে আইনসভা ব্যয়বরাদ্দ করিতে বা খরচের অনুমতি দিতে পারে না। আবার নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার সুপারিশ ব্যতিরেকে শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদ্দের দাবি করা যায় না। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে ব্যয়-বরাদ্দের কোন দাবি করা যায় না। তাঁহার সুপারিশ ব্যতীত অর্থ-সম্বন্ধীয় কোন বিলই লোকসভায় আনয়ন করা যায় না।

পার্লামেন্টীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার রীতি

রাষ্ট্রপতি প্রতি 'আর্থিক বৎসরে'র (Financial Year)* প্রারম্ভে সেই বৎসরের জন্য ইউনিয়ন সরকারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব লইয়া একটি বিবৃতি মন্ত্রী মারফত পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে পেশ করান। এই বিবৃতিকেই কেন্দ্রীয় সরকারের 'বাজেট' (Budget) বলা হয়।

অনিশ্চিত ব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বাধীনে একটি তহবিল (Contingency Fund) আছে। ইহার পরিমাণ ১৫ কোটি টাকার মত। হঠাৎ কোন অনিশ্চিত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইলে পার্লামেন্টের অনুমোদন পাইবার পূর্বেই তিনি এই তহবিল হইতে ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারেন।

অনিশ্চিত ব্যয়ের জন্য তহবিল

রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বা তাহার পূর্বেই একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করেন।

(ঘ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা : ভারতের বর্তমান সংবিধান তিন ধরনের জরুরী অবস্থার কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তিন প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দিয়াছে। প্রথমত. রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা ভারতের বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তবে তিনি 'আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা' (Proclamation of Emergency) করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইনসভা—অর্থাৎ, পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ অনুমোদন করিলে এই ঘোষণা দুই মাসেরও অধিক বলবৎ থাকিতে পারে। ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারের এলাকাধীন আইন-বিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে। ইহা ছাড়া এইরূপ জরুরী অবস্থা বর্তমান থাকাকালীন রাষ্ট্রপতিও কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন।

তিন ধরনের জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

১। আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা

* আর্থিক বৎসর এপ্রিল মাস হইতে পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাস পর্যন্ত।

ভারতে এ-পর্যন্ত একবার এইরূপ আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণা করা হয় ১৯৬২ সালের ২৬শে অক্টোবর চীন কর্তৃক সীমান্ত আক্রমণের ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে, এবং ঘোষণা এখনও (এপ্রিল, ১৯৬৪ সাল) বলবৎ আছে।

এইরূপ ঘোষণার দৃষ্টান্ত

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্য কোন কারণে মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, তবে তিনি ঘোষণার দ্বারা ঐ রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারেন এবং আইনবিষয়ক সকল ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে প্রদান করিতে পারেন। রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের কোন ক্ষমতা অবশ্য তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না বা কাহাকেও প্রদান করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির এইরূপ ঘোষণাকে 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা'র (Failure of Constitutional Machinery) ঘোষণা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অনুমোদন পাইলে এইরূপ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সর্বাধিক তিন বৎসর পর্যন্ত বর্তমান থাকিতে পারে।

২। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণা

আপৎকালীন অবস্থা মাত্র একবার ঘোষণা করা হইলেও এ-পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে বেশ কয়েকবার। যে-সকল রাজ্যে ইহা ঘোষিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কেরল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সমগ্র দেশের বা দেশের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি এক 'আর্থিক সংকটাবস্থা' (Financial Emergency) ঘোষণা করিয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এইরূপ সংকটাবস্থায় সরকারী কর্মচারীর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যাইতে পারে। এ-পর্যন্ত এই আর্থিক সংকটাবস্থা একবারও ঘোষিত হয় নাই।

৩। আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা

উপরাষ্ট্রপতি (The Vice-President): ভারতের একজন উপ-রাষ্ট্রপতিও আছেন। তিনি পদাধিকারবলে পার্লামেণ্টের উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভার সভাপতি এবং পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ লইয়া গঠিত এক নির্বাচন-সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন।* নির্বাচন-পদ্ধতিকে এ-ক্ষেত্রেও 'একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' বলা হইয়াছে। আবার রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতিকেও কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পদচ্যুত করা যায়। তবে রাষ্ট্রপতির ন্যায় এই পদচ্যুতির ক্ষেত্রে ঠিক ইমপিচ্‌মেণ্ট পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদও পাঁচ বৎসর। রাজ্যসভায় মোট সদস্যসংখ্যার

* ১৯৬১ সালে সংবিধানের একাদশ সংশোধন দ্বারা এই নির্বাচন-সংস্থার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ব্যবস্থা ছিল যে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যগণ সংযুক্ত অধিবেশনে মিলিত হইয়া উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করিবেন।

অধিকাংশের দ্বারা পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং ঐ প্রস্তাবে লোকসভা সম্মতি প্রদান করিলেই উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে অথবা তিনি অসুস্থ বা পদচ্যুত হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন। মৃত্যু, পদচ্যুতি বা পদত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি অবশ্য রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন না—রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন মাত্র। রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের দ্বারাই পূরণ করা হয়।

মন্ত্রি-পরিষদ (Council of Ministers) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার স্বেচ্ছাধীন কোন ক্ষমতা থাকে না।

ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবার জন্য এবং তাঁহাকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রি-পরিষদ আছে। প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান মন্ত্রী হইলেন পার্লামেন্টের নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। সুতরাং মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর হইল যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করা।

মন্ত্রি-পরিষদ কিভাবে গঠিত হয়

সকল মন্ত্রীই অবশ্য মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য নহেন। যাঁহারা মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য তাঁহাদের 'পরিষদভুক্ত মন্ত্রী' (Cabinet Ministers) বলা হয়। তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers) আছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা পদমর্যাদায় পরিষদভুক্ত মন্ত্রিগণ অপেক্ষা নিম্ন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করিয়া দেন বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে পরিষদভুক্ত মন্ত্রী কে কে হইবেন। প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রীই প্রধান শাসনকর্তা।

প্রত্যেক মন্ত্রীকে পার্লামেন্টের দুইটি পরিষদের যে কোন একটির সদস্য হইতে হয়। যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন যিনি পার্লামেন্টের কোন পরিষদেরই সভ্য নহেন, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইবে। না হইতে পারিলে তাঁহার মন্ত্রিত্ব বজায় থাকিবে না। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল।

সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিগণের পদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও, মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী বলিয়া যতদিন লোকসভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদিনই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। লোকসভার আস্থাভাজন কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিমণ্ডলীকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করেন না। পদচ্যুত করিলে তাঁহাকে আর একটি মন্ত্রিমণ্ডলী

লোকসভার নিকট মন্ত্রি-পরিষদের যৌথ দায়িত্ব

গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পদচ্যুত মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি যদি লোকসভার আস্থা থাকে, তবে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা অর্থহীন, কারণ নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া লোকসভা উহাকে পদচ্যুত করিবে। তবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে মন্ত্রিমণ্ডলী সংবিধান ভংগ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া এবং সংগে সংগে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করা উচিত। এইজন্যই রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতিকে কেন মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে

প্রধান মন্ত্রী (The Prime Minister): ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার বিধি অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে প্রধান শাসন-কর্তা। ভারতীয় সংবিধান বা ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। প্রধান মন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভার নেতা (Leader) নহেন, তিনি পার্লামেণ্টের বা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণেরও নেতা। তিনি মন্ত্রি-পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরিষদভুক্ত মন্ত্রী কে কে হইবেন, কোন্ কোন্ মন্ত্রীর উপর কোন্ কোন্ দপ্তরের ভার থাকিবে—এই সকল বিষয় নির্ধারণ করেন তিনিই। তিনি যে-কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তিনি নিজে পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভাও ভাঙিয়া যায়। তিনিই রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন প্রভৃতি সম্পর্কে পরামর্শ দেন। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার বিধান অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভাঙিয়া দিবার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। যতদিন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার পদ অধিকার করিয়া থাকেন, ততদিনই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনিই প্রধানত রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এবং মন্ত্রি-পরিষদের আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাত করান। রাষ্ট্রপতি যে-বিষয়ে জ্ঞাত হইতে চাহিবেন সে-বিষয়ে তাঁহাকে জ্ঞাত করানো প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য। প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। উপমা দিয়া বলিতে গেলে বলা যায় যে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র যেমন সূর্য, মন্ত্রি-পরিষদের কেন্দ্র তেমনি প্রধান মন্ত্রী।

প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত প্রধান শাসনকর্তা

পদমর্যাদার দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা নিম্ন হইলেও প্রধান মন্ত্রীকেই প্রকৃত প্রধান জননায়ক বলিয়া অভিহিত করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

ইউনিয়ন সরকারের শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রি-পরিষদ লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। তিনি পরোক্ষভাবে এক বিশেষ নির্বাচন-সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৫ বৎসর। শাসনকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ সংবিধানভংগের

অভিযোগে তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক, ভারতীয় নাগরিক এবং লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা: নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি চারি প্রকারের ক্ষমতা ভোগ করেন—যথা, (ক) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) আইনবিষয়ক ক্ষমতা, (গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং (ঘ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা। জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা আবার তিন শ্রেণীর—১। আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা, ২। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণা, এবং ৩। আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা।

উপরাষ্ট্রপতি: উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি। রাষ্ট্রপতির পদ অস্থায়ীভাবে শূন্য হইলে তিনি রাষ্ট্রপতির কায পরিচালনা করেন

মন্ত্রি-পরিষদ: পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে মন্ত্রি পরিষদই প্রকৃত শাসক। মন্ত্রি-পরিষদ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় এবং লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য যে-কোন সময় মন্ত্রি-পরিষদকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

প্রধান মন্ত্রী: প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত প্রধান শাসনকর্তা। তিনি শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নহেন, পার্লামেন্টের বা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণেরও নেতা। আবার প্রধান মন্ত্রীকেই প্রকৃত প্রধান জননায়ক বলিয়া অভিহিত করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. How is the President of the Indian Union elected? How can he be removed?

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কিরূপে নির্বাচিত হন? কি প্রকারেই বা তাঁহাকে অপসারিত করা যায়?

2. Briefly describe the powers of the President of the Indian Union. How is he elected?

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বর্ণনা কর। তিনি কিভাবে নির্বাচিত হন?

3. Describe the position and powers of the President in the Indian Constitution.

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বর্ণনা কর।

4. Discuss the relation between: (*a*) the President and his Council of Ministers; (*b*) the Council of Ministers and Parliament.

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে এবং মন্ত্রি-পরিষদ ও পার্লামেন্টের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

5. Explain the position of the Prime Minister under the Indian Constitution.

ভারতীয় সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীর পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর।

6. Write a short note on the Union Executive in India.

ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ

(The Union Legislature)

ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ বা আইন বিভাগকে পার্লামেণ্ট বলা হয়।

পার্লামেণ্টের তিনটি অংশ

পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি পরিষদ বা কক্ষ লইয়া গঠিত। উচ্চতর পরিষদের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্নতর পরিষদের নাম লোকসভা।*

রাজ্যসভা: রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৫০ জনের অধিক হইতে পারিবে না। সদস্যগণের মধ্যে চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবা—এই চারিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্য সকল সময়েই থাকিবেন।

রাজ্যসভার গঠন

বাকী অনধিক ২৩৮ জন হইবেন রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধি (representatives)। সংবিধান অনুসারে প্রতিনিধি-সংখ্যা ২৩৮ অবধি হইতে পারিলেও বর্তমানে এই সংখ্যা হইল মাত্র ২২৫ জন। এই ২২৫ জন প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রপতি-মনোনীত ১২ জন সদস্য লইয়া বর্তমানে রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা হইল ২৩৭ জন।

রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ঐ রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে নির্বাচিত হন।** কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিগণ বিশেষভাবে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন। বর্তমানে রাজ্যসভায় রাজ্যসমূহের ২১৮ জন, এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের ৭ জন প্রতিনিধি আছেন। পশ্চিমবংগের প্রতিনিধি-সংখ্যা হইল ১৬ জন।

রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ

রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ—ইহাকে কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনরায় মনোনয়ন ও পুনর্নির্বাচন দ্বারা তাঁহাদের শূন্য আসন পূর্ণ করা হয়।

রাজ্যসভার সদস্য হইবার জন্য প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পদাধিকারবলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতিই হইলেন রাজ্যসভার সভাপতি (Chairman)। সভার একজন সহ-সভাপতিও (Deputy Chairman) আছেন। তিনি সদস্যগণের মধ্য হইতে সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হন।

---

* পূর্বে ইংরাজীতে ইহাদের যথাক্রমে Council of States' এবং 'House of the People' বলা হইত। এই দুইটির বাংলা প্রতিশব্দ ছিল 'রাজ্য-পরিষদ' ও 'লোকসভা'। বর্তমানে সরকারীভাবে ভারতীয় নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে রাজ্য পরিষদ না বলিয়া 'রাজ্যসভা' বলা হয়।

** রাজ্যের বিধানসভায় মনোনীত ইংগ ভারতীয় সদস্য থাকিতে পারেন। মনোনীত সদস্যদের ভোট দিবার অধিকার নাই।

লোকসভা: লোকসভা অংগরাজ্যসমূহ হইতে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত অনধিক ৫০০ জন এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২৫ জন —সর্বাধিক এই ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। অবশ্য অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ৬ জন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হন না। তাঁহারা পরোক্ষভাবে ঐ রাজ্যের আইনসভার সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলসমূহের সদস্যগণ কিভাবে লোকসভায় আসন গ্রহণ করিবেন তাহা পার্লামেন্ট আইন করিয়া স্থির করিয়া দেয়। এই আইন অনুসারে দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া আসেন এবং বাকী কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি হইতে সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে তপশীলী বর্ণ ও কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সংবিধান প্রবর্তনের পর ২০ বৎসর—অর্থাৎ, ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে।

ইহা ছাড়া শাসনতন্ত্রে এই বিধানও আছে যে, যদি রাষ্ট্রপতি ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় লোকসভায় উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি এই সম্প্রদায় হইতে সংবিধান প্রবর্তনের ঐ ২০ বৎসর পর্যন্ত অনধিক দুইজন সদস্য এই পরিষদে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই মনোনয়নের ফলে লোকসভার সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক ৫২৫-কে ছাড়াইয়া ৫২৭-এ পৌঁছিতে পারে।

বর্তমানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা উক্ত সর্বাধিক ৫২৫-এর পরিবর্তে (বা মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য ধরিয়া ৫২৭-এর পরিবর্তে) হইল ৫০৯ জন। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য হইলেন ৪৯৫ জন। বাকী ১৪ জন হইলেন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য, নাগাভূমি, পণ্ডিচেরি, দাদরা ও নগর হাভেলি, গোয়া দমন ও দিউ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, আসামের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। পূর্বে নাগাপাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চল হইতেও একজন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক লোকসভায় মনোনীত হইতেন। বর্তমানে ঐ অঞ্চল নাগাভূমি (Nagaland) নামে অন্যতম অংগরাজ্যে পরিণত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পশ্চিমবংগ হইতে ৩৬ জন সদস্য লোকসভায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

লোকসভার জীবনকাল পাঁচ বৎসর

লোকসভার জীবনকাল সাধারণত পাঁচ বৎসর। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রপতি এই পরিষদকে যে-কোন সময়ে ভাঙিয়া দিতে পারেন। আপৎকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ইহার কার্যকাল ১ বৎসরের জন্য বৃদ্ধিও করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন পরিষদপাল (Speaker) এবং একজন উপপরিষদপাল (Deputy Speaker) থাকেন।

অধিবেশন

সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্টের দুই অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয় না।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of Parliament) ঃ ইউনিয়ন এবং উভয় এলাকাধীন তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। যদি উভয় এলাকাধীন তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয়ে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন রাজ্যের আইনসভা-প্রণীত আইনের সংঘর্ষ বাধে, তবে রাজ্যের আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যাইবে এবং কেন্দ্রের আইনই বলবৎ থাকিবে। সাধারণ অবস্থায় রাজ্যগুলির অন্তর্গত অঞ্চলের জন্য রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা করেন, তবে পার্লামেণ্টকে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে সমগ্র ভারত বা ভারতের যে-কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়াও রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্য সম্পর্কে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে অর্পণ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া আরও তিনটি ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে—যথা, (১) যদি রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে স্থির করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই পার্লামেণ্টের পক্ষে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা উচিত। (২) যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য পার্লামেণ্টকে এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে এবং সম্মতি দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন মাত্র অনুরোধকারী রাজ্যগুলিতেই প্রযুক্ত হইবে, অপর রাজ্যগুলিতে নহে। (৩) আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদির সর্তাদি রক্ষার জন্য পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারত বা ভারত-রাষ্ট্রের যে-কোন অঞ্চলের জন্য যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

আইনবিষয়ক ক্ষমতা

প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী মারফত একটি 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে পেশ করান।* এই বিবৃতিতে 'কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়' (Charged on the Consolidated Fund of India), এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে অন্যান্য ব্যয় করিবার প্রস্তাবগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়। যে-ব্যয়গুলি কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ধার্য তাহা লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে। এই ধরনের ব্যয়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভার পরিষদপাল ও উপপরিষদপালের বেতন ও ভাতা, প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণের এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষকের বেতন ভাতা ও পেনসন, সরকারী ঋণজনিত ব্যয়, প্রভৃতিই প্রধান। এই ব্যয়গুলি ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যয় লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লোকসভার ব্যয় সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা নাই। কিন্তু কর-নির্ধারণ ও সরকারী ঋণ সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা লোকসভার আছে। লোকসভার

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

* ১০ পৃষ্ঠা দেখ।

অনুমোদন ব্যতীত করধার্য বা ঋণসংগ্রহ করা যায় না। করনীতি ও সরকারী ঋণ-পদ্ধতিতে যে-কোন পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত ব্যয়বরাদ্দের কোন অর্থ পার্লামেণ্টের নিকট দাবি করা যায় না বা কোন 'অর্থ বিল' লোকসভায় আনয়ন করা যায় না।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই হইবে যে পার্লামেণ্টের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বলিতে প্রধানত লোকসভার ক্ষমতাই বুঝায়। উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভার আইনবিষয়ক ক্ষমতা নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভার সমতুল্য হইলেও, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভার একচেটিয়া বলা যায়। অর্থ সংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। এইরূপ বিল লোকসভায় পাস হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু উহাকে বাতিল করিবার ক্ষমতা রাজ্যসভার নাই। এই পরিষদ এই প্রকার বিলের সংশোধনের জন্য সুপারিশ করিতে পারে মাত্র। লোকসভায় এইরূপ সুপারিশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেও বিল উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভার একচেটিয়া

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা পার্লামেণ্টের অন্যতম প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে সংবিধান মন্ত্রি-পরিষদকে যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল করিয়াছে। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে অথবা মন্ত্রি-পরিষদের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে মন্ত্রি-পরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। এইভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পাস অথবা মন্ত্রি-পরিষদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াও পার্লামেণ্ট অন্যভাবে মন্ত্রি-পরিষদকে সংযত রাখিতে সমর্থ হয়। শাসন বিভাগের উপর পার্লামেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটু পরেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

পার্লামেণ্টের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এককভাবে সংবিধান পরিবর্তনের আংশিক ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। কিন্তু সংবিধানের এমন কতকগুলি ধারা আছে যাহাদের পরিবর্তন পার্লামেণ্ট রাজ্যগুলির আইনসভার অর্ধেকের সম্মতি পাইলে তবেই করিতে পারে।

অন্যান্য ক্ষমতা

সংবিধান ভংগের জন্য সংবিধান-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিচার করিয়া পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।* প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও পার্লামেণ্টের আছে।

---

* ৭ এবং ১১-১২ পৃষ্ঠা দেখ।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ (Control of the Executive by Parliament): পার্লামেণ্ট কিভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে সে-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। প্রথমত, লোকসভা সাধারণভাবে সরকারী আয়-ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন ভোট-সাপেক্ষ ব্যয় নির্বাহ কর যায় না, করধার্য বা ঋণসংগ্রহও করা যায় না। ইহা ছাড়া সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা ঠিকমত পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য লোকসভার দুইটি কমিটি আছে।* মন্ত্রিগণ এই কমিটিদ্বয়ের সদস্য হইতে পারেন না। পার্লামেণ্টের নির্দেশ উপেক্ষা করা হইলে, অর্থ অপচয় করা হইলে, বেআইনীভাবে অর্থব্যয় করা হইলে ও ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা না করা হইলে কমিটিদ্বয় মন্ত্রি-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিভাবে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পার্লামেণ্ট অন্যান্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে তাহার মধ্যে খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর বিতর্ক, মুলতবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, বাজেটের সমালোচনা প্রভৃতিই প্রধান।

আয়-ব্যয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

পার্লামেণ্টের সদস্যগণ খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানের পর প্রত্যহ আধঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা হয়। কোন জরুরী ব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য যে-কোন সদস্য লোকসভায় বা রাজ্যসভায় মুলতবী প্রস্তাব (Adjournment Motion) আনয়ন করিতে পারেন—অর্থাৎ, প্রস্তাব করিতে পারেন যে সভার সাধারণ কর্মসূচী বন্ধ রাখিয়া এখন ঐ বিষয়ে আলোচনা করা হউক। বিষয়টি বিশেষ জরুরী না হইলে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ (Calling Attention) করা যাইতে পারে। ১৫ দিনের নোটিস দিয়া জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যের আছে। এরূপ প্রস্তাব পাস হইলে উহাকে কার্যকর করিবার জন্য পরিষদপাল (Speaker) উহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া সদস্যগণ সরকারী নীতি এবং কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বাজেট পেশ কালেও এই সুযোগ মিলে।

অন্যান্য পদ্ধতি

ইহা ছাড়া সরকারী প্রতিশ্রুতি ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য কিছুদিন পূর্বে লোকসভা একটি কমিটি গঠন করিয়াছে।** মন্ত্রিগণ-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হইলে অথবা ঠিকমত প্রতিপালিত না হইলে কমিটি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারকে নিয়ন্ত্রণের আর একটি কমিটি হইল অধস্তন বা অর্পিত আইন সংক্রান্ত

সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি

* Committees on Public Accounts and on Estimates

** Committee on Government Assurances

কমিটি।* বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্য দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। এই কারণে পার্লামেণ্ট শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু শাসন বিভাগ যাহাতে এই অর্পিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়।

অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি

চরম ক্ষেত্রে লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিয়া অথবা সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যে মন্ত্রি-পরিষদের পতন ঘটাইতে পারে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের উপরি-উক্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রি-পরিষদকে সর্বদা সতর্ক ও সংযত হইয়া চলিতে হয়। কারণ প্রথমত, লোকসভায় পরাজয় ঘটিলে মন্ত্রি-পরিষদকে সরাসরি পদত্যাগ করিতে হইতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত, নির্বাচকদের নিকট জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলে পরবর্তী নিবাচনে জয়লাভের আশা থাকে না।

পার্লামেণ্টের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা প্রধানত লোকসভারই ক্ষমতা। রাজ্যসভায় পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদ'কে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না।

পার্লামেণ্টের দুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses of Parliament):

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই পার্লামেণ্টের পরিষদদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা অতি সামান্যই; এ-বিষয়ে লোকসভাই একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ আইন পাসের ব্যাপারে কিন্তু উভয় পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন। এইরূপ আইনের জন্য বিল উভয় পরিষদে পাস হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে দুই পরিষদের মধ্যে যদি মতবিরোধ ঘটে তবে রাষ্ট্রপতি পরিষদদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বিলটিকে গ্রহণ করিলে উহা পাস হয়, প্রত্যাখ্যান করিলে উহা বাতিল হইয়া যায়।

১। অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভার একচেটিয়া

২। অন্যান্য আইন পাসের ব্যাপারে পরিষদ-দ্বয় সমক্ষমতাসম্পন্ন

তৃতীয়ত, সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আবার লোকসভা রাজ্যসভা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকটই দায়িত্বশীল, এবং রাজ্যসভার পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না বলিলেও চলে।

৩। মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকটই দায়িত্বশীল

* Committee on Subordinate Legislation

পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি (Legislative Procedure in Parliament) : পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। নিম্নে ইহাদের বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) : অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল পার্লামেণ্টের দুই পরিষদের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করা যায়। যে-সকল বিল মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন তাহাদিগকে সরকারী বিল (Government Bills) বলা হয়, আর যে-সকল বিল পার্লামেণ্টের সাধারণ সদস্যরা উত্থাপন করেন তাহাদিগকে বেসরকারী বিল (Private Members' Bills) বলা হয়। উভয় ধরনের বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে একপ্রকার। তবে কতকগুলি বিষয়ে বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, বেসরকারী বিল উত্থাপনের জন্য সাধারণত এক মাসের নোটিস দিতে হয় এবং বিলের গুরুত্ব ও প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য লোকসভায় বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি কমিটি (a Committee on Private Members' Bills and Resolutions) আছে। যাহা হউক, কোন বিল উত্থাপনের জন্য প্রথমে পরিষদের অনুমতি চাহিয়া প্রস্তাব করিতে হয়। অনুমতি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সদস্য বিলকে উত্থাপন করেন। উত্থাপনের পর বিলকে অবিলম্বে জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে প্রকাশিত করা হয়। বিল উত্থাপনের পূর্বেও বিলটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইতে পারে।

বিল উত্থাপনের পদ্ধতি

(২) বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading of a Bill) : বিল উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করিতে পারেন যে, (ক) পরিষদ বিলটির বিচারবিবেচনা করুক ; অথবা, (খ) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির (a Select Committee) নিকট প্রেরণ করা হউক ; অথবা, (গ) বিলটি সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য উহাকে প্রচার করা হউক ; অথবা, (ঘ) বিলটিকে দুই পরিষদের যুক্ত কমিটির (a Joint Committee of the two Houses) নিকট প্রেরণ করা হউক। ইহার পর বিলটির নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়া বিতর্ক চলে। যখন 'বিলটি বিচারবিবেচনা করা হউক' এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন বিলের সংশোধন এবং বিভিন্ন ধারার বিচারবিবেচনা চলে।

দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের নীতির আলোচনা

(৩) কমিটি পর্যায় (Committee Stage) : পরিষদে সরাসরি বিচার-বিবেচনার পরিবর্তে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইলে, কমিটিতে প্রথমে বিলটির সাধারণ ধারার আলোচনা করা হয় এবং পরে বিলের প্রত্যেকটি ধারার পুংখানুপুংখভাবে বিচারবিবেচনা চলে।

কমিটিতে বিলের বিচারবিবেচনা

(৪) রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage) : বিচারবিবেচনার পর কমিটি উহার রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান ঐ রিপোর্টকে সংশ্লিষ্ট পরিষদের নিকট উপস্থিত করেন।

(৫) বিচারবিবেচনা পর্যায় এবং বিলের ধারার আলোচনা (Consideration Stage and Clause by Clause Discussion) : কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কোন বিল সম্পর্কে বিচারবিবেচনার প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হওয়ার পর বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে পরিষদে আলোচনা চলে এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে সংশোধন প্রস্তাবও করা যায়।

(৬) বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading) : যখন বিলের সকল ধারা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা এবং ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয় তখন বিলের তৃতীয় পাঠ হয়। প্রস্তাব করা হয় যে বিলটিকে পাস করা হউক। এই পর্যায়ে বিলকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন লইয়া বিতর্ক চলে।

বিলটি এইভাবে এক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর অপর পরিষদের নিকট প্রেরিত হয়। বিলটি অপর পরিষদ কর্তৃক অনুরূপ পদ্ধতিতে গৃহীত হইলে উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু দুই পরিষদই যে সকল সময় বিলকে গ্রহণ করিবে এমন কোন কথা নাই। এক পরিষদে পাস হওয়ার পর অপর পরিষদ কোন বিলকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে অথবা ছয় মাস ধরিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া বিলকে ফেলিয়া রাখিতে পারে, অথবা এমনভাবে বিলের সংশোধন করিতে পারে যে, উহাতে উত্থাপনকারী পরিষদের সম্মতি থাকে না। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি দুই পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং এই যুক্ত অধিবেশনে সদস্যদের ভোটে বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দুই পরিষদের মধ্যে বিবাদ ও যুক্ত অধিবেশন

অর্থ বিল (Money Bills) : অর্থ বিল সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে উহা রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না, লোকসভাতেই উত্থাপন করিতে হয়। লোকসভায় অর্থ বিল পাস হওয়ার পর উহাকে রাজ্যসভার নিকট সুপারিশের (recommendations) জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে সুপারিশসহ উহাকে লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। লোকসভা ঐ সুপারিশসমূহ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আর যদি রাজ্যসভা ১৪ দিনের ভিতর বিলকে ফেরত না পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিষদেই পাস হইয়াছে ; এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্তির পর বিল আইনে পরিণত হয়।

অর্থ বিল সম্পর্কে লোকসভাই সর্বেসর্বা

সংক্ষিপ্তসার

ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগকে পার্লামেণ্ট বলা হয়। পার্লামেণ্ট (১) রাষ্ট্রপতি ; এবং (২) রাজ্যসভা ও লোকসভা—এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন এবং লোকসভা অনধিক ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। লোকসভার জীবনকাল ৫ বৎসর ; রাজ্যসভা কিন্তু চিরস্থায়ী পরিষদ।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা : পার্লামেন্ট নানা প্রকারের ক্ষমতা ভোগ করে—যথা, (ক) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, এবং (ঘ) সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতিকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি।

পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ : আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্বের দ্বারা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতবী প্রস্তাব আনয়ন, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতা ও বাজেট প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া সমালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে পার্লামেন্ট শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রধানত লোকসভারই ক্ষমতা, রাজ্যসভার নহে।

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক : পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মধ্যে নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভাই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। সাধারণ আইন পাসের ব্যাপারে উভয় পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভারই একচেটিয়া এবং কার্যক্ষেত্রে লোকসভাই শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতি : পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতি নিম্ন-বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত।

১। **বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ :** অর্থ বিল ছাড়া অন্যান্য বিল যে কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। মন্ত্রিগণ ছাড়া অন্যান্য সদস্যেরও বিল (অর্থ বিল ছাড়া) উত্থাপনের ক্ষমতা রহিয়াছে। তবে উভয় প্রকার বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটি একপ্রকার। উত্থাপনের পরে বা পূর্বে বিলটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২। **বিলের দ্বিতীয় পাঠ :** এই পর্যায়ে বিলের নীতিগুলির আলোচনা করা হয়।

৩। **কমিটি পর্যায় :** অনেক সময় বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটিতে বিলটির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়।

৪। **রিপোর্ট পর্যায় :** ইহার পর কমিটির রিপোর্ট পরিষদে উপস্থাপিত করা হয়।

৫। **বিচারবিবেচনা পর্যায় ও বিলের ধারার আলোচনা :** কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিলটির বিভিন্ন ধারার আলাপ-আলোচনা চলে এবং সংশোধন ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৬। **বিলের তৃতীয় পাঠ :** এই পর্যায়ে বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। এক পরিষদে বিলটি গৃহীত হইলে উহা অপর পরিষদে প্রেরিত হয়। সেখানেও অনুরূপ পদ্ধতিতে বিলটি পাস হইলে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। কিন্তু অপর পরিষদ বিলটিকে পাস না করিলে বা উহার বিশেষ সংশোধন করিলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত করিতে পারেন।

অর্থ বিল : অর্থ বিল পাস ব্যাপারে লোকসভাই সর্বেসর্বা। এ-বিষয়ে রাজ্যসভার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Describe the organisation and powers of the Union Legislature in India.**

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন ও ক্ষমতা বর্ণনা কর।

2. **Discuss the relation between the two Houses of the Union Parliament.**

কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা কর।

3. **How does the Union Legislature exercise its control over the Union Executive?**

কিভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা (পার্লামেন্ট) কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?

4. Describe the relation between the Union Executive and the Union Legislature in the present Constitution of India.

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ দুই অংশে বিভক্ত—রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রি-পরিষদ। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেন্টীয় বলিয়া এই দুই অংশের সহিত ব্যবস্থা বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বিভাগ বা পার্লামেন্টের একটি অংগ। মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হন এবং লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। ...এবং ১২-১৩, ১৫ এবং ১৮ পৃষ্ঠা]

5. Describe how the Union Parliament is formed in India and how it works.

ভারতে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট কিভাবে গঠিত হয় এবং কিভাবে কার্যসম্পাদন করে তাহা বর্ণনা কর।

[ইংগিত : পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া গঠিত। সুতরাং পার্লামেন্টের তিনটি অংগ এবং পার্লামেন্ট দ্বি-পরিষদসম্পন্ন। লোকসভা মোটামুটি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং রাজ্য-সভা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের লইয়া গঠিত। পার্লামেন্ট কর্তৃক কার্যসম্পাদন বলিতে বুঝায় আইন প্রণয়নের কায, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কায ও শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কার্য। আইন প্রণয়ন কার্যে উভয় পরিষদই সমভাবে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু আয়-ব্যয় ও শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কার্যে লোকসভাই সর্বেসর্বা।...... এবং ১৫ এবং ১৭-১৮ পৃষ্ঠা]

6. Give a brief account of the process of Legislation in Parliament.

পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা

(Administration of States)

রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থারই অনুরূপ। এখানেও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত।

রাজ্যপাল (Governor) : জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যের শীর্ষে আছেন একজন করিয়া রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সাধারণত তাঁহার কার্যকাল হইল ৫ বৎসর। তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারেন। রাজ্যপালকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ও ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধান, 'সদর-ই-রিয়াসৎ' (Sadar-I-Riyasat) বলিয়া অভিহিত। কাশ্মীরের সংবিধান অনুসারে তিনি ঐ রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে যিনিই

সদর-ই-রিয়াসৎ পদে নির্বাচিত হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধান হিসাবে স্বীকার করিয়া লইবেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা (Powers of the Governor): মন্ত্রি-পরিষদ সম্পর্কে রাজ্যপালের কতকগুলি ক্ষমতা আছে—যেমন, মন্ত্রিবর্গকে নিযুক্ত করা, মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইত্যাদি। এ-বিষয়ে পরে আলোচনার জন্য রাখিয়া দিয়া এখন রাজ্যপালের অন্যান্য ক্ষমতা বর্ণনা করা হইতেছে। রাজ্যপাল মন্ত্রিবর্গ ছাড়া রাজ্যের এ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন। কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা করিবার বা তাহার দণ্ডাদেশ লাঘব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

রাজ্যপাল ব্যবস্থা বিভাগের একটি অংগ

রাজ্যপাল রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগের একটি অংগ। এ-ক্ষেত্রেও তাঁহার পদের সহিত রাষ্ট্রপতির পদের মিল আছে। রাজ্যপাল রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে এবং নিম্নতর পরিষদ বা বিধানসভাকে ভাঙিয়া দিতে পারেন। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিলকে আইনে পরিণত করা যায় না। রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে তাঁহার সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়। তাঁহার সম্মতির জন্য বিলকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে, তাঁহাকে সম্মতি যে দিতেই হইবে এমন কোন কথা নেই। তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন,* অথবা নিজে কিছু না করিয়া বিলটিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

রাজ্যপাল আইনসভার এক বা উভয় পরিষদকে আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন। আইনসভার যে-কোন পরিষদে বাণী প্রেরণ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। আইনসভার প্রত্যেক অধিবেশনে তিনি সাধারণত উদ্বোধনী বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা

আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। আইনসভা অধিবেশনে বসার ছয় সপ্তাহ পরে এইরূপ আইন আর কার্যকর থাকে না।

রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতিরেকে খরচের জন্য একটি টাকাও বিধানসভার নিকট দাবি করা যায় না। মন্ত্রী মারফত তিনিই আইনসভার নিকট 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট পেশ করান।

যে রাজ্যের আইনসভার দুইটি কক্ষ বা পরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চতর কক্ষ বা বিধান পরিষদে চারুকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে মনোনীত করেন।

* অর্থ-সম্বন্ধীয় বিলকে অবশ্য ফেরত পাঠানো যায় না।

রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। প্রধানত মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই তিনি এই শাসনক্ষমতার ব্যবহার করেন।

মন্ত্রি-পরিষদ (Council of Ministers) : রাজ্যপালের কার্যসম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মন্ত্রি-পরিষদ থাকে। কেন্দ্রের মত এখানেও মন্ত্রি-পরিষদ মুখ্য মন্ত্রীর (Chief Minister) নেতৃত্বাধীনে কার্য করে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের শীর্ষ ব্যক্তিকে অবশ্য বলা হয় প্রধান মন্ত্রী (Premier)। রাজ্যপাল প্রথমে মুখ্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ; পরে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। মুখ্য মন্ত্রী হইলেন রাজ্যের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কেন্দ্রের মত রাজ্যসমূহেও মুখ্য মন্ত্রী রাজ্যপাল ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার পটভূমিকায় মুখ্য মন্ত্রীকে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

মুখ্য মন্ত্রীর ভূমিকা

ভারতীয় সংবিধান রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর উপর বিশেষ কয়েকটি দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। তাঁহাকে মন্ত্রি-পরিষদের আইন সংক্রান্ত ও শাসন সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব রাজ্যপালকে জানাইতে হয়। রাজ্যপাল যে যে বিষয়ে জ্ঞাত হইতে চাহেন, সেই সেই বিষয়ে জ্ঞাত করানোও মুখ্য মন্ত্রীর কর্তব্য। রাজ্যপাল আদেশ করিলে মুখ্য মন্ত্রীকে যে-বিষয় মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই, তাঁহা বিবেচনার জন্য মন্ত্রি-পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর এই সকল দায়িত্বের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাষ্ট্রপতির যে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রহিয়াছে রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাজ্যপালের।

মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল। তাঁহাদিগকে আইনসভার কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হয়। যদি এমন কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন, যিনি আইনসভার সভ্য নহেন, তবে তাঁহাকে হয় ছয় মাসের মধ্যে আইনসভা বা বিধানমণ্ডলের* সভ্য হইতে হয়, না-হয় পদত্যাগ করিতে হয়। আইনত রাজ্যপাল যে-কোন মন্ত্রীকে যে-কোন সময় পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও, মন্ত্রিগণ যতদিন বিধানসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন মন্ত্রীর পদেও আসীন থাকেন। তবে কেন্দ্রের ন্যায় সংবিধান ভংগ করার জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রি-পরিষদ ও বিধানসভা ভাঙিয়া পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আর যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য চলিতেছে না, তবে তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তখন ইচ্ছা করিলে 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা' ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

বিধানসভার নিকট যৌথ দায়িত্ব

---

* রাজ্যের আইনসভাকে বর্তমানে বাংলায় বিধানমণ্ডল বলা হইতেছে।

ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature) : প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া আইন-সভা বা বিধানমণ্ডল আছে। এই আইনসভা রাজ্যপাল (কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 'সদর-ই-রিয়াসৎ') এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের ১৬টি অংগরাজ্যের মধ্যে ৯টিতে—যথা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর, পশ্চিমবংগ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে দুইটি করিয়া এবং বাকী ৭টি রাজ্যে একটি করিয়া পরিষদ আছে।* দুই পরিষদ থাকিলে উচ্চতর পরিষদকে বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্নতর পরিষদকে বিধানসভা (Legislative Assembly) বলা হয়। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বিধানসভাই বলা হয়।

বিধান পরিষদ লোপ বা গঠনের ব্যবস্থা

যদি কোন রাজ্যের বিধানসভা মোট সদস্যগণের অধিকাংশের এবং উপস্থিত ভোটপ্রদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ লুপ্ত করিবার জন্য বা সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে পার্লামেণ্ট সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ লোপ বা গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

---
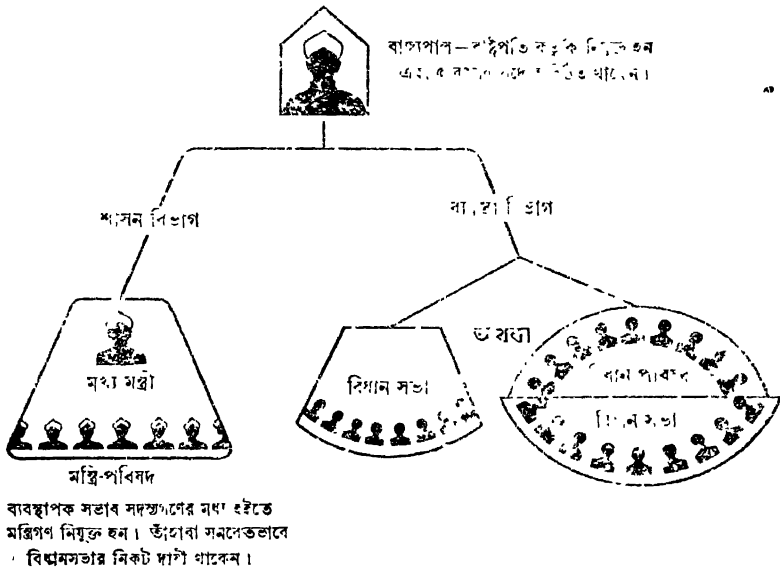
* সংবিধানের ৭ম সংশোধন অনুসারে মধ্যপ্রদেশের আইনসভাও দ্বি-পরিষদসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এখনও ঐ আইনসভা এক-পরিষদসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে।

বিধান পরিষদ ঃ বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম এবং বিধানসভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় না। সদস্যগণের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যদের দ্বারা, মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশের কাছাকাছি গ্রাজুয়েটদের দ্বারা এবং এক-দ্বাদশাংশের কাছাকাছি শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধানসভার কোন সদস্যকে অবশ্য বিধানসভা নির্বাচিত করিতে পারে না। বাকী সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। রাজ্যপাল চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা এবং সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। বিধান পরিষদের সদস্য হইবার জন্য অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

গঠন

রাজ্যের বিধান পরিষদের গঠন পদ্ধতি

বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা বিধান সভার সদস্যসংখ্যার
এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং ৪০-এর কম হয় না।

সদস্যগণের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নির্বাচিত।

মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিধান সভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত।

মোটামুটি এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত।

মোটামুটি এক-দ্বাদশাংশ গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত।

মোটামুটি এক-ষষ্ঠাংশ চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা ও সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত।
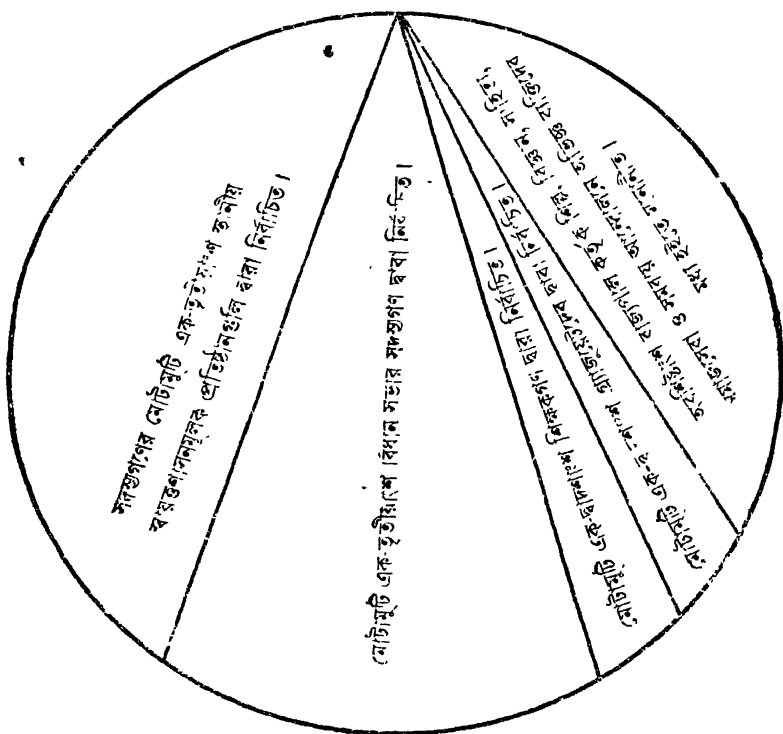
বিধান পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ সভাপতি (Deputy Chairman) থাকেন।

পশ্চিমবংগের বিধান পরিষদ

পশ্চিমবংগের বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৭৫ জন। ইহার মধ্যে ২৭ জন করিয়া যথাক্রমে বিধানসভা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত; ৬ জন করিয়া শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটগণ দ্বারা নির্বাচিত। বাকী ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত।

বিধান পরিষদ চিরস্থায়ী পরিষদ—ইহাকে কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন।

বিধানসভা গঠন

বিধানসভা : বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০-এর কম বা ৫০০-র বেশী হইতে পারে না। সদস্যবর্গ প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সভায় তপশীলী বর্ণ এবং কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ১৯৬০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তুলিয়া দেওয়ার কথা ছিল; সংবিধানের অষ্টম সংশোধন দ্বারা উহার মেয়াদ আরও দশ বৎসর বা ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালকেও সংবিধান প্রবর্তনের পর ১০ বৎসর পর্যন্ত—অর্থাৎ, ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস অবধি নিম্নতর পরিষদ বা বিধানসভায় ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে উহার মেয়াদ আরও ১০ বৎসর—অর্থাৎ, ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগের বিধানসভায় ৪ জন মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য আছেন। বিধানসভার সদস্য হইতে হইলে অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন পরিষদপাল (Speaker) ও একজন উপপরিষদপাল (Deputy Speaker) থাকেন।

সভার জীবনকাল ৫ বৎসর। তবে রাজ্যপাল ইহাকে ইহার কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে পারেন। অপরদিকে আবার আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট ইহার কার্যকাল ১ বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারে।

পশ্চিমবংগের বিধানসভা

পশ্চিমবংগের বিধানসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা ২৫৬ জন। ইহার মধ্যে ২৫২ জন প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচকগণ দ্বারা নির্বাচিত। বাকী ৪ জন হইলেন মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা (Powers of the State Legislature) : বিধানমণ্ডলের রাজ্য তালিকার অন্তর্গত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে। ইহা উভয় এলাকাধীন যে-কোন বিষয়েও আইন প্রণয়ন করিতে পারে; তবে উভয় এলাকাধীন কোন বিষয়ে যদি রাজ্যের আইনের সহিত কেন্দ্রীয় আইনের সংঘর্ষ বাধে তবে রাজ্যের আইন যতদূর বিরোধ ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

করধার্য ও ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতাও বিধানমণ্ডলের আছে। এ-ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডল বলিতে কার্যত একমাত্র বিধানসভাকেই বুঝায়। কারণ, অর্থ সংক্রান্ত বিশেষ কোন ক্ষমতাই বিধান পরিষদের নাই।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

বিধানসভার ব্যয়বরাদ্দ করিবার ক্ষমতা পূর্ণ ক্ষমতা নহে; কতকগুলি ব্যয় ইহার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে—যেমন, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, বিধানসভার পরিষদপাল ও উপপরিষদ-পালের বেতন ও ভাতা, মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন ভাতা ও পেনসন্, রাজ্যের ঋণজনিত ব্যয় প্রভৃতি। প্রধানত এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় বিধানসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। অনুমোদিত ব্যয় ঠিকভাবে করা হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য লোকসভার মতই বিধানসভাগুলির দুইটি করিয়া কমিটি আছে।* রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত বিধানসভার নিকট কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবি করা যায় না। করনীতি ও সরকারী ঋণপদ্ধতি সম্বন্ধে বিধানসভার ক্ষমতা অবশ্য পূর্ণ ক্ষমতা।

মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল। বিধানসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সমালোচনা, বিতর্ক, মুলতবী প্রস্তাব ইত্যাদির দ্বারা বিধানমণ্ডলের উভয় কক্ষই মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তবে এই বিষয়ে বিধানসভা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চতর পরিষদে পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে ততটা স্পর্শ করে না।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ

রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি (Legislative Procedure in the State Legislature): রাজ্যের আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে পূর্ব-বর্ণিত কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতির অনুরূপ।** তবে কয়েকটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। পশ্চিমবংগের মত কোন কোন রাজ্যের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত আবার আসামের মত কোন কোন রাজ্যের আইনসভা এক-পরিষদসম্পন্ন। যে-রাজ্যের আইনসভা এক-পরিষদসম্পন্ন সেখানে বিল মাত্র বিধানসভাতেই পাস হইয়া রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হয়।

এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভায় বিল পাস

যে-রাজ্যে আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন সেখানে পার্লামেন্টের ব্যবস্থার মত অর্থ বিল মাত্র বিধানসভাতেই উত্থাপন করা যায়; বিধান পরিষদে উহা উত্থাপিত হইতে পারে না। বিধানসভায় অর্থ বিল পাস হওয়ার পর উহাকে বিধান পরিষদের নিকট সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার ১৪ দিনের মধ্যে বিধান পরিষদকে সুপারিশসহ বিলটিকে বিধানসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। বিধানসভা ঐ সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আর যদি বিধান পরিষদ ১৪ দিনের ভিতর বিলকে ফেরত

অর্থ বিল সম্পর্কে বিধানসভার ক্ষমতা

* Committee on Public Accounts এবং Committee on Estimates

** ২১-২২ পৃষ্ঠা।

না পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিষদেই পাস হইয়াছে, এবং রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্তির পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। অবশ্য রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলকে ধরিয়া রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন।

অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল পাস সম্পর্কে পার্লামেন্টের দুই পরিষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে যেমন যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করা যায়, রাজ্যের আইনসভার ক্ষেত্রে সেইরূপ যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা নাই। রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত বিলকে বিধান পরিষদ যদি তিন মাসের মধ্যে ফেরত না পাঠায়, অথবা যদি প্রত্যাখ্যান করে, অথবা যদি এরূপভাবে সংশোধন করে যে, বিধানসভা ঐ পরিবর্তন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক থাকে—তবে বিধানসভা দ্বিতীয় বার বিলটিকে পাস করিয়া বিধান পরিষদে প্রেরণ করিলে এক মাস পরে উহা উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। বিধান পরিষদ উহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিলেও কোন ফল হইবে না।

অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল সম্পর্কে দুই পরিষদের ক্ষমতা

রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক এইভাবে পাস হইবার পর বিলকে রাজ্যপালের নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন অথবা নিজে কিছু না করিয়া বিলটিকে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অর্থ বিল ভিন্ন অন্য বিলকে রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন। দ্বিতীয় বার ঐ বিল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলে রাজ্যপাল উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। যে-বিল রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয় তাহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। যখন আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিল রাজ্যপাল কিংবা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় তখন ঐ বিল বিধিবদ্ধ আইনে (Act) পরিণত হয়।

রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলেই বিল আইনে পরিণত হয়

নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা (Administration of Nagaland) :

ভারতের নবতম রাজ্য নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা অন্যান্য অংগরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক। নাগাভূমি অন্যতম পূর্ণ অংগরাজ্য হইলেও ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের হস্তে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আইন ও জনশৃংখলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত রাখা হইয়াছে। এই ব্যাপারে রাজ্যপাল মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (individual judgment) অনুসারে কার্য করিবেন। অর্থাৎ, তাঁহাকে যে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মন্ত্রি-পরিষদের সহিত আলোচনা তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু আলোচনার পর তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শকে উপেক্ষাও করিতে পারেন।

কিছুটা পৃথক শাসন-ব্যবস্থা

রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দ্বিতীয়ত, নাগাভূমির তুয়েনসাং জিলার শাসনকার্য ১০ বৎসরের জন্য রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে। এই সময়ের মধ্যে এই জিলার অধিবাসীরা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

আইনসভা

নাগাভূমির জন্য এক-পরিষদসম্পন্ন বিধানমণ্ডল গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিধানমণ্ডল বা বিধানসভা প্রথম ১০ বৎসরের জন্য ৪৬ জন এবং পরে ৬০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই ৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য তুয়েনসাং জিলা হইতে উক্ত ১০ বৎসরের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) দ্বারা মনোনীত হইয়া আসিবেন: বাকী ৪০ জন সদস্য নাগাভূমির অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিধানসভা গঠনের জন্য নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হইয়া ঐ মাসেই নূতন নাগাভূমি মন্ত্রি পরিষদ গঠিত হয়।

তুয়েনসাং জিলার আঞ্চলিক পরিষদ

তুয়েনসাং জিলার উল্লিখিত আঞ্চলিক পরিষদ ঐ জিলার বিভিন্ন উপজাতির (tribes) নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই আঞ্চলিক পরিষদ বিভিন্ন গ্রাম-পরিষদ, এলাকা-পরিষদ প্রভৃতির কার্যের তত্ত্বাবধান করে এবং আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ ব্যতিরেকে নাগাভূমি বিধানমণ্ডলের (Nagaland Legislature) কোন আইন তুয়েনসাং জিলায় কার্যকর হয় না।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির শাসন-ব্যবস্থা (Administration of Union Territories): বর্তমানে ইউনিয়ন বা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল সংখ্যায় হইল ৯টি—যথা, (১) দিল্লী, (২) হিমাচলপ্রদেশ, (৩) মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৬) লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, (৭) ভূতপূর্ব পর্তুগীজ উপনিবেশ দাদরা ও নগর হাভেলি, (৮) গোয়া দমন ও দিউ, এবং (৯) সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূতপূর্ব ফরাসী উপনিবেশগুলিসহ পণ্ডিচেরি। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন পাস হইবার পূর্বে সকল কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলেরই শাসনকার্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইত। রাষ্ট্রপতি শান্তি, প্রগতি ও সুশাসনের জন্য উহাদের সকলের ক্ষেত্রেই নিয়মকানুন প্রণয়ন করিতে পারিতেন।

পাঁচটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন

উক্ত চতুর্দশ সংশোধন দ্বারা হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, পণ্ডিচেরি, এবং গোয়া দমন ও দিউ—এই পাঁচটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে নির্বাচিত আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের জন্য পার্লামেণ্টকে প্রয়োজনীয় আইন পাসের ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পার্লামেণ্ট যে-আইন পাস করে তাহাতে হিমাচলপ্রদেশের ক্ষেত্রে ৪০ জন এবং অপর কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে ৩০ জন করিয়া সদস্য লইয়া আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নির্বাচিত আইনসভা-সমূহ এখনও গঠিত হয় নাই। তবে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে পূর্বের আঞ্চলিক পরিষদগুলিই (Territorial Councils) আইনসভার কার্য করিতেছে। মন্ত্রি-পরিষদ অবশ্য ইতিমধ্যেই গঠিত

হইয়াছে। এই সকল মন্ত্রি-পরিষদ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল এবং শাসক বা প্রধান কর্মকর্তা (Administrator) মোটামুটি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

অপর চারিটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসনকার্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনেই পরিচালিত হইতেছে।*

পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া যে-কোন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য মহাধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে। আবার পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের এলাকাও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে সম্প্রসারিত করিতে পারে। শেষোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পণ্ডিচেরিকে মাদ্রাজ রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের এলাকাধীন করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত প্রত্যেক রাজ্যের শীর্ষে আছেন একজন করিয়া রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল: রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং সাধারণত ৫ বৎসরকাল পদে নিযুক্ত থাকেন।

মন্ত্রি-পরিষদ: কেন্দ্রের মত প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মন্ত্রি-পরিষদ আছে। মন্ত্রি-পরিষদ মুখ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে কায করে। মন্ত্রি-পরিষদ বিধানসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

রাজ্যপালের ক্ষমতা: রাজ্যপাল শাসন সংক্রান্ত, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মাত্র।

ব্যবস্থা বিভাগ: রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগকে বিধানমণ্ডল বলা হয়। বিধানমণ্ডল রাজ্যপাল এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ৯টিতে দুইটি করিয়া পরিষদ এবং বাকী ৭টিতে একটি করিয়া পরিষদ আছে। দুইটি পরিষদ থাকিলে উচ্চতর পরিষদকে বিধান পরিষদ এবং নিম্নতর পরিষদকে বিধানসভা বলা হয়। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বিধানসভাই বলা হয়।

বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম এবং বিধানসভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় না। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০-এর কম বা ৫০০-এর অধিক হইতে পারে না। বিধানসভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন; বিধান পরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, গ্রাজুয়েট প্রভৃতিদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা: বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা তিন প্রকারের—(ক) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, (খ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং (গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি: রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি কেন্দ্রে আইন পাসেরই অনুরূপ। তবে যেখানে বিধানমণ্ডল এক-পরিষদসম্পন্ন সেখানে বিধানসভায় বিল পাসের পর উহা স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিলে নিজে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন কোন কিছু না করিয়া উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা: নবগঠিত রাজ্য নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র। এখানে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজ্যপালের হস্তে আইন ও জনশৃংখলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ঐ রাজ্যের তুয়েনসাং জিলার শাসনকার্য ১০ বৎসরের জন্য রাজ্যপালের অধীনে পরিচালিত হইবে। তৃতীয়ত, আইসভায় বর্তমান মোট ৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন তুয়েনসাং জিলা হইতে পরোক্ষভাবে মনোনীত হইয়া আসিবেন।

---

* ৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা : কেন্দ্র-শাসিত বা ইউনিয়ন অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতির অধীনে একজন করিয়া শাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। বর্তমানে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির শাসন-ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Briefly describe the position and powers of the Governor of a State.**

সংক্ষেপে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বর্ণনা কর।

2. **Discuss the relation between (*a*) Governor and his Council of Ministers, and (*b*) Council of Ministers and State Legislature.**

রাজ্যপাল ও মন্ত্রি-পরিষদ এবং মন্ত্রি পরিষদ ও বিধানমণ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

3. **Describe the relation between the Governor and the Council of Ministers in a State under the present Indian Constitution. How is the Council of Ministers formed ?**

ভারতের বর্তমান সংবিধানে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল ও রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে সম্বন্ধ বর্ণনা কর। কিভাবে মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত হয় ?

[ইংগিত : রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই মন্ত্রি পরিষদ গঠন করা হয়। প্রথমে রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্য মন্ত্রী হইবার জন্য আহ্বান করেন এবং পরে তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। (২৫ এবং ২৬ পৃষ্ঠা)]

4. **What are the powers and functions of the Legislature of West Bengal ?**

পশ্চিমবংগের আইনসভার (বিধানমণ্ডলের) ক্ষমতা ও কার্যাবলী কি কি ?

5. **Briefly describe the composition of State Legislatures in India.**

সংক্ষেপে ভারতের রাজ্য বিধানমণ্ডলের গঠন বর্ণনা কর।

6. **Briefly describe the administration of the Union Territories.**

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের শাসন-ব্যবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

7. **Describe in brief the legislative procedure in a State Legislature.**

রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা

(System of Judicial Administration)

প্রধান ধর্মাধিকরণ (The Supreme Court): ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে একটি পিরামিডের সহিত তুলনা করা চলে। এই পিরামিডের শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। প্রধান ধর্মাধিকরণ একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদালত। সংবিধান অনুসারে এই আদালত ১ জন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ৭ জন সাধারণ বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। সংবিধানে ইহাও বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। শাসনতন্ত্রের এই বিধান বলে ১৯৫৬ সালে প্রণীত এক আইন দ্বারা পার্লামেণ্ট প্রধান বিচারপতি সমেত মোট বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অনধিক ১১-তে লইয়া যায়। পরে এই সংখ্যাও পর্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় ১৯৬০ সালে আবার একটি সংশোধনী আইন দ্বারা সাধারণ বিচারপতির (other judges) সংখ্যা অনধিক ১৩-তে এবং ফলে মোট বিচারপতির সংখ্যা অনধিক ১৪-তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।* ইহা ছাড়া প্রয়োজনবোধে অস্থায়ী বিচারপতিগণের (*ad hoc* Judges) নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে।

প্রধান ধর্মাধিকরণ একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদালত

প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতিও বলা হয়। তিনি এবং অন্যান্য বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের বিচারপতি, অভিজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ী ও প্রখ্যাত আইনাভিজ্ঞগণের (eminent jurists) মধ্য হইতে এই আদালতের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা হয়।

প্রত্যেক বিচারপতি ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য পদত্যাগ করিতে পারেন, অথবা প্রমাণিত অক্ষমতা বা অসদাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের আবেদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুতও হইতে পারেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, রাষ্ট্রপতি মাত্র পার্লামেণ্টের আবেদনক্রমেই পদচ্যুতির আদেশ দিতে পারেন—নিজ হইতে ইহা করিতে পারেন না। অতএব, অক্ষমতা বা অসদাচরণ প্রমাণিত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ধারণের ভার পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত—রাষ্ট্রপতির উপর নহে। একবার নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা, অধিকার ইত্যাদির পরিবর্তন করা যায় না। বিচারকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

---

* প্রথম আইনটি Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 এবং সংশোধনী আইনটি Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960 নামে অভিহিত।

এলাকা ঃ প্রধান ধর্মাধিকরণের চারি প্রকার এলাকা আছে—যথা, মূল এলাকা, আপিল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা এবং নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা।

(ক) মূল এলাকা (Original Jurisdiction): ইউনিয়ন সরকার এবং কোন রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে আইনগত অধিকার লইয়া বিবাদ বাধিলে তাহার বিচার একমাত্র প্রধান ধর্মাধিকরণেই হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দুই সরকারের মধ্যে বিবাদ সাধারণত সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়াই বাধে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপরই সংবিধানের ব্যাখ্যার ভার থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যা করিয়া আদালত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়।* ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলিয়া ইহা 'ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক' (Interpreter and Guardian of the Constitution of India) বলিয়া অভিহিত। প্রধান ধর্মাধিকরণের মূল এলাকায় অবশ্য পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সন্ধি বা চুক্তি সংক্রান্ত কোন মামলা করা যায় না।

(খ) আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction): প্রধান ধর্মাধিকরণের আপিল বিভাগে হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ হইতে আপিল করা চলে। এই আপিল তিন শ্রেণীর হইতে পারে—শাসনতান্ত্রিক, ফৌজদারী ও দেওয়ানী।

আপিল এলাকা তিন প্রকারের

কোন মামলায় মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে ইহাতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিলে প্রধান ধর্মাধিকরণ যদি নিশ্চিন্ত হয় যে সত্যই মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে উহা আপিল করিবার বিশেষ অনুমতি (special leave) দিতে পারে।

কোন দেওয়ানী মামলায় অন্যূন বিশ হাজার টাকার দাবিদাওয়া জড়িত আছে বলিয়া মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিলে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। ইহা ব্যতীত মহাধর্মাধিকরণ যদি সার্টিফিকেট দেয় যে, মামলাটি প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপিলযোগ্য তাহা হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপিল করা চলে।

ফৌজদারী মামলাতেও কয়েক ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। যথা, (ক) নিম্নতর আদালত হইতে মহাধর্মাধিকরণে আপিল হইবার পর, মহাধর্মাধিকরণ যদি আসামীর খালাসের আদেশ বাতিল করিয়া তাহাকে-

* পৌরবিজ্ঞানের ১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে ; অথবা (খ) মহাধর্মাধিকরণ যদি নিম্নতর কোন আদালত হইতে মামলা বিচারের জন্য নিজের নিকট উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিচারে আসামীকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে, অথবা (গ) মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে এই মামলার আপিল-বিচার প্রধান ধর্মাধিকরণে হওয়া উচিত।

পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া প্রধান ধর্মাধিকরণের আপিল এলাকা বাড়াইয়া দিতে পারে।

(গ) পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction): রাষ্ট্রপতি আইন বা ঘটনা সংক্রান্ত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান ধর্মাধিকরণের অভিমত জানিতে পারেন। পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত ভারত সরকারের চুক্তি বা সন্ধি সংক্রান্ত কোন মামলা ধর্মাধিকরণের মূল বিভাগে আনয়ন করা না গেলেও পরামর্শদান বিভাগে আনয়ন করা চলে। অর্থাৎ, এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধান ধর্মাধিকরণের মতামত জানিতে পারেন; কিন্তু এই সকল বিষয় লইয়া প্রধান ধর্মাধিকরণে মামলা রুজু করা যায় না।
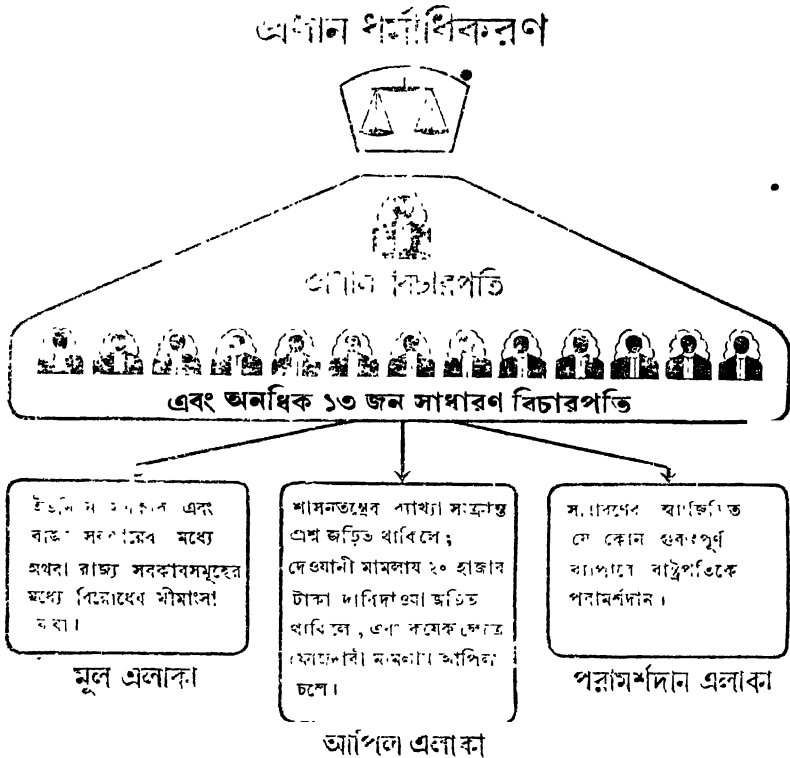
(ঘ) নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা (Jurisdiction to issue directions, orders or writs): মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) রক্ষা করার ভারও প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইহা নির্দেশ আদেশ বা লেখ (writs) জারি করিতে পারে।*

অন্যান্য ক্ষমতা

উপরি-উক্ত চারিটি এলাকা ছাড়া সকল বিচারালয়ের রায়ের সংশোধন করার ক্ষমতাও প্রধান ধর্মাধিকরণের আছে। কিন্তু কোন সামরিক আদালতের রায় সংশোধন করিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

প্রধান ধর্মাধিকরণ যাহাতে নিরপেক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে তাহার জন্য ইহাকে ইহার কর্মচারী নিযুক্ত করিবার এবং তাহাদের চাকরি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই আবার ইহার ব্যয় লোকসভার ভোট-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

মহাধর্মাধিকরণসমূহ (High Courts): প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ থাকিবে। বর্তমানে ভারতের ১৬টি অংগরাজ্যের মধ্যে ১৪টিতে একটি করিয়া এবং আসাম ও নাগাভূমি উভয়ের জন্য একটি (High Court of Assam and Nagaland)—এই মোট ১৫টি মহাধর্মাধিকরণ আছে।

সকল মহাধর্মাধিকরণে বিচারপতির সংখ্যা এক নহে। কোন্ মহাধর্মাধিকরণে কত জন বিচারপতি থাকিবেন তাহা রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। প্রধান বিচারপতি ও সাধারণ বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়াই মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। সাধারণ বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ঐ মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সহিতও পরামর্শ করিতে হয়। বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।** তবে এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে অকর্মণ্যতা অথবা অসদাচরণের জন্য প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের মত অপসারিত করা চলে।

কাহাদের মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা যায়

অন্তত ১০ বৎসর ভারতের বিচার বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথবা অন্তত ১০ বৎসর ধরিয়া কোন মহাধর্মাধিকরণে এ্যাডভোকেট হিসাবে কার্য করিতেছেন—এরূপ যে-কোন ভারতীয় নাগরিককেই মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা যায়।

---

* পৌরবিজ্ঞানের ৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

** পূর্বে বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন দ্বারা উহাকে ৬২ বৎসরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

রাজ্যের মধ্যে মহাধর্মাধিকরণই সর্বোচ্চ আপিল আদালত। নিম্নতর আদালতগুলি হইতে মহাধর্মাধিকরণে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার মামলারই আপিল করা চলে। কয়েকটি রাজ্যে মহাধর্মাধিকরণের মূল এলাকাও আছে। এই মূল এলাকায় বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় আসামী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দায়রা সোপরদ্দ হইলে মহাধর্মাধিকরণে এই দায়রা বিচার হয়।

মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা

উপরি-উক্ত ক্ষমতা ছাড়াও মহাধর্মাধিকরণের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আছে। মহাধর্মাধিকরণ রাজ্যের সকল নিম্নতর আদালতের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। নিম্নতর কোন আদালতের কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত থাকিলে, তাহা উঠাইয়া মহাধর্মাধিকরণ তাহার বিচার করিতে পারে।

মহাধর্মাধিকরণের উপরও মৌলিক অধিকার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মহাধর্মাধিকরণ শাসন বিভাগের উপর নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিতে পারে।

প্রধান ধর্মাধিকরণের মত মহাধর্মাধিকরণেরও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ও কর্মচারী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। মহাধর্মাধিকরণ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ও রাজ্যের বিধানসভার ভোট-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

নিম্নতর আদালতসমূহ (Subordinate Courts): মহাধর্মাধিকরণের পর ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া নিম্নতম আদালত হইতে আলোচনা সুরু করিলে বিচার-ব্যবস্থা সহজবোধ্য হয়।

দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থা: পূর্বে দেওয়ানী বিচারের নিম্নতম আদালত ছিল ইউনিয়ন কোর্ট। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এই কোর্টের স্থানাধিকার করিতেছে 'ন্যায় পঞ্চায়েত' বা পঞ্চায়েত আদালত। প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জন্য এইরূপ একটি আদালত থাকে। এই আদালতের কার্য হইল ছোট ছোট মামলার মীমাংসা করা। সাধারণত এইরূপ আদালতের রায়কে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল করিবার ব্যবস্থাও আছে। গ্রামীণ আদালতের সুবিধা হইল যে গ্রামবাসীদের ছোটখাট বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার জন্য নিজেদের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া অন্যত্র যাইতে হয় না।

বড় বড় সহরে এইরূপ ছোট ছোট মামলার বিচার করিবার জন্য ছোট আদালত আছে। মফস্বল অঞ্চলে যে-সকল মামলা ন্যায় পঞ্চায়েতের এলাকায় পড়ে না, তাহাদের বিচার হয় মুন্সেফের আদালতে। মহকুমা ও জিলা সহরে এবং কয়েক ক্ষেত্রে অন্যান্য সহরেও মুন্সেফের আদালত থাকে। মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে সব-জজের আদালতে আপিল করা চলে। মামলার দাবিদাওয়া বেশী হইলে মামলা রুজু করিতে হয় সব-জজের আদালতে। সব-জজের এবং কয়েক ক্ষেত্রে মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা জজের আদালতে আপিল করা চলে। জিলা জজের এবং কয়েক ক্ষেত্রে সব-জজের বিচারের বিরুদ্ধে মহাধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। জিলা জজ জিলার

দেওয়ানী আদালতসমূহের তত্ত্বাবধান করেন। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরে মাঝারি ধরনের দেওয়ানী মামলার বিচার হয় নগর-আদালতে (City Courts)।

ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থাঃ দেওয়ানী বিচারের মতই গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচার হইত ইউনিয়ন বেঞ্চে।* বর্তমানে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ন্যায় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত আদালতের হস্তে এই ভার অর্পণ করা হইয়াছে। সহরাঞ্চলে এই ধরনের মামলার বিচার করেন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের বিচার হয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে। বেতনভোগী ও অবৈতনিক উভয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটগণই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীর হন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা জজের নিকট আপিল করা চলে। অনেক সময় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটও নিম্নতর আদালতসমূহ হইতে ফৌজদারী মামলার আপিল শুনিয়া থাকেন। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে ফৌজদারী বিচার করিবার জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আছেন। অপরাধ গুরুতর হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দায়রা সোপরদ্দ করেন। দায়রা জজ অনেক রাজ্যে জুরির সাহায্যে বিচার করেন। জিলা জজই জিলার দায়রা জজ। কলিকাতা বোম্বাই
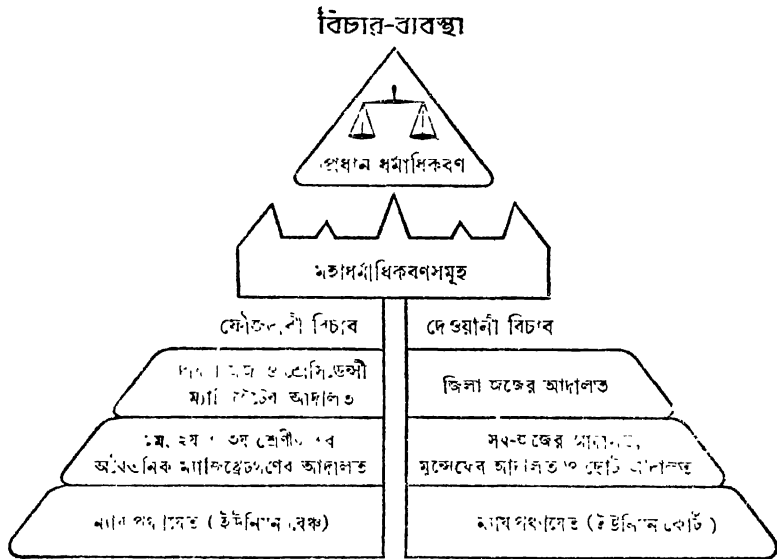
* ইউনিয়ন বোর্ডের দেওয়ানী বিচারের শাখাকে বলা হইত ইউনিয়ন কোর্ট এবং ফৌজদারী বিচারের শাখাকে বলা হইত ইউনিয়ন বেঞ্চ। সকল ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া না যাওয়ায় কিছু কিছু ইউনিয়ন কোর্ট ও ইউনিয়ন বেঞ্চ এখনও বর্তমান আছে।

প্রভৃতি মহানগরে দায়রা বিচার হয় নগর-আদালত ও মহাধর্মাধিকরণে। মহাধর্মাধিকরণে আবার দায়রা জজ ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী হয়। মহাধর্মাধিকরণ হইতে কয়েক ক্ষেত্রে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে।

সংক্ষিপ্তসার

প্রধান ধর্মাধিকরণ: ভারতের বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। সুপ্রীম কোর্ট একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদালত। ইহা ১ জন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ১৩ জন অপর বিচারপতি লইয়া গঠিত। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এলাকা: প্রধান ধর্মাধিকরণের এলাকা চারি প্রকারের—(১) মূল এলাকা, (২) আপিল এলাকা, (৩) পরামর্শদান এলাকা, এবং (৪) নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিচারালয়ের রায়ের সংশোধন করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে। মৌলিক অধিকার রক্ষার ভারও ইহার উপর অর্পিত।

মহাধর্মাধিকরণসমূহ: প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মহাধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্ট আছে। সকল মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতির সংখ্যা এক নহে। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ৬২ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

রাজ্যের মধ্যে মহাধর্মাধিকরণই সর্বোচ্চ আপিল আদালত; কয়েকটি রাজ্যে মহাধর্মাধিকরণের মূল এলাকাও আছে। ইহা রাজ্যের মধ্যে সকল নিম্নতর আদালতের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ইহা নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিতে পারে।

নিম্নতর আদালতসমূহ: প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের পর ভারতের বিচার-ব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) দেওয়ানী বিচার, এবং (খ) ফৌজদারী বিচার। দেওয়ানী বিচারের জন্য আছে যথাক্রমে (১) ন্যায় পঞ্চায়েত, (২) মুন্সেফের আদালত, (৩) সব-জজের আদালত, (৪) জিলা জজের আদালত, এবং (৫) নগর-আদালত।

ফৌজদারী বিচারের জন্য আছে যথাক্রমে (১) ন্যায় পঞ্চায়েত, (২) অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আদালত, (৩) বেতনভোগী ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আদালত, (৪) জিলা জজের আপিল ও দায়রা আদালত, এবং (৫) নগর-আদালত।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the organisation of the Judiciary in India. (H. S. (H) 1961,'62)
ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সংগঠন বর্ণনা কর।

2. Briefly describe the composition, jurisdiction and powers of the Supreme Court of India.
ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন, এলাকা ও ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

3. State the composition and functions of the Supreme Court of India.

ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্যাবলী বিবৃত কর।

4. Describe the organisation and functions of the Supreme Court of India.

ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা

(Local Self-Government)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সভ্য জগতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজধানীগুলি হইতে সকল অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ঠিকভাবে মিটানো সম্ভব হয় না বলিয়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন হয়। বর্দ্ধমানে মহামারী প্রতিরোধ বা জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা বর্দ্ধমান হইতেই করা সম্ভব—দিল্লী বা কলিকাতায় বসিয়া আদেশ নির্দেশ টেলিফোন বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে নহে। দ্বিতীয়ত, স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছাও মানুষের প্রকৃতিগত। এই কারণে সকল ব্যাপারে বহিঃনিয়ন্ত্রণ লোকে পছন্দ করে না। রাজধানী কলিকাতা হইতে নির্দেশ আসার পর বহরমপুরের পথঘাট সারানো হইবে এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহরমপুরবাসীর মন বিদ্রোহীই হইয়া উঠে। তৃতীয়ত, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনকার্যের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কার্য করে। অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ প্রথমে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষানবীসী করিয়া পরে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শাসনকার্যের উপযুক্ত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, যে-দেশে ভাল স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই সে-দেশে গণতন্ত্র কোনমতেই সফল হইতে পারে না। পরিশেষে, ন্যায় ও মিতব্যয়িতার দিক দিয়াও স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। কলিকাতার নাগরিক-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পল্লীবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করিলে অন্যায় কার্যই করা হয়। আবার কলিকাতার নাগরিক-জীবনের সুখসুবিধার জন্য নাগরিকগণ-প্রদত্ত অর্থের ব্যয়ের ভার কলিকাতার নাগরিকগণের উপরই দেওয়া উচিত। এরূপ ভারার্পণেই মিতব্যয়িতার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতের স্বায়ত্তশাসন ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে 'সভা', 'সমিতি', 'পঞ্চায়েত' প্রভৃতি বহু উন্নত ধরনের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের কথা জানিতে পারা যায়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের এই নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহার স্থানাধিকার করে পাশ্চাত্য ধরনের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা। বর্তমানে ভারতে যে-সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি প্রধানত ব্রিটিশ আমলেই সৃষ্ট।

ভারতে পাশ্চাত্য ধরনের সর্বপ্রথম স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হইল মাদ্রাজ পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন। ইহা ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা অন্যান্য কয়েকটি সহরে পৌর-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি

সহর পৌরসংঘ (Municipality) স্থাপনের অধিকার পায়। এই শতাব্দীতেই আরও দুইটি আইন পাস হওয়ার ফলে ভারতের পাশ্চাত্য ধরনের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বিশেষ প্রসারলাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের শাসন-সংস্কার ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলে ভারতের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা উন্নতি ও গণতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগঠন : ভারতে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদিগকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—গ্রামীণ ও পৌর। গ্রামীণ বলিতে গ্রামীণ বা পল্লী অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়। পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন বোর্ড এবং জিলা বোর্ড এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা কয়েকটি গ্রাম লইয়া এবং জিলা বোর্ডের এলাকা একটি জিলার সমগ্র পল্লী অঞ্চল লইয়া। ইহা ছাড়া সেদিন পর্যন্ত এক একটি মহকুমার পল্লী অঞ্চল লইয়া এক একটি স্থানীয় বা লোকাল বোর্ড ছিল। বর্তমানে উহাদিগকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের একটি শ্রেণীবিভাগ

সহর অঞ্চলে বড় বড় নগরের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন বলা হয়। ভারতে কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনা দিল্লী আমেদাবাদ প্রভৃতি মহানগরে এবং চন্দননগরের মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরে করপোরেশন আছে। অন্যান্য সহরের প্রতিষ্ঠানকে পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি বলা হয়। অনেক সময় যে-যে সহরে সেনানিবাস আছে, সেখানে সেনানিবাস সংঘ বা 'ক্যান্টন্‌মেণ্ট বোর্ড' থাকে। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান বা 'ইমপ্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট' থাকে। বড় বড় বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান বা 'পোর্ট ট্রাষ্ট' থাকে।

বর্তমান ভারতের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আর একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা চলে। এই শ্রেণীবিভাগ হইল ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলিতে একমাত্র গ্রাম-পঞ্চায়েতকেই বুঝায়; অপর কোন প্রতিষ্ঠান ভারতের নিজস্ব নহে।

আর একটি শ্রেণীবিভাগ

নিম্নে প্রধানত পশ্চিমবংগের পটভূমিকায় প্রধান প্রধান স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণিত হইল।

গ্রাম-পঞ্চায়েত (Village Panchayats) : ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, গ্রাম-পঞ্চায়েত সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে ভারতের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত সভা ছিল। ব্রিটিশ আমলে ইউনিয়ন বোর্ড, জিলা বোর্ড প্রভৃতি গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হওয়ায় এই গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই পঞ্চায়েতগুলির পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। ফলে, কয়েকটি প্রদেশে পঞ্চায়েত

আইন পাস হয় এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। ইহার পর ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ অনুসারে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে ভারতের পল্লী অঞ্চলের শতকরা ৯০ ভাগ পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার অধীনে আসে।

পঞ্চায়েতের কার্যের মধ্যে গ্রামের শান্তিশৃংখলা রক্ষা, গ্রামের জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যোন্নয়ন, ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতি মামুলী কর্তব্য ছাড়া সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, সর্বাংগীণ পল্লীসংস্কার, উন্নয়নমলক কার্য প্রভৃতিও আছে। মোটকথা, স্বাধীন ভারতের পল্লীগঠন কার্যে পঞ্চায়েতকে অন্যতম ভিত্তি করা হইয়াছে; এবং এই ভিত্তিতেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ বা পল্লী উন্নয়নের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েতের প্রাধান্য বা পঞ্চায়েতী রাজ (Panchayati Raj) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে পশ্চিমবংগের গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বর্ণনা হইতেই এ-ধারণা করা যাইবে।

কার্য

পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েত: পশ্চিমবংগ গ্রাম-পঞ্চায়েত আইন পাস হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ সাল হইতে এই আইনকে কার্যকর করা হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোর্ডের বিলোপসাধন করিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

পশ্চিমবংগ পঞ্চায়েত আইন কোন অঞ্চলে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইলে রাজ্য সরকার সেই অঞ্চলে এক বা ততোধিক গ্রাম-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। প্রত্যেক গ্রাম-সভা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিধানসভার নির্বাচকদের লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রাম-সভাকে একবার করিয়া বাৎসরিক সাধারণ সভা এবং একবার করিয়া ষাণ্মাসিক সভার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

গ্রাম-সভা

গ্রাম-সভার কার্যনির্বাহের ভার গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। এই গ্রাম-পঞ্চায়েত গ্রাম-সভার সদস্যবর্গ দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত অনধিক ১৫ জন এবং অন্যূন ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহা ছাড়াও সরকার কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারে। এই মনোনীত সদস্যদের ভোটাধিকার এবং অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইবার অধিকার নাই।

গ্রাম-পঞ্চায়েত

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হইলেন যথাক্রমে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহ-সভাপতি। পঞ্চায়েতের সভায় সভাপতিত্ব করা ছাড়াও তাঁহারা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য দায়ী। পঞ্চায়েতের, এবং ফলে সভাপতি ও সহ-সভাপতির, কার্যকাল ৪ বৎসর। পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কার্যের মধ্যে আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মহামারী প্রতিরোধ, পানীয় জল সরবরাহ, পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, সাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করিণী, পশুচারণভূমি শ্মশানঘাট কবরস্থান প্রভৃতির সংরক্ষণ, গ্রামোন্নয়নের জন্য শ্রমদান সংগঠন প্রভৃতিই প্রধান।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

ইহা ছাড়াও রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর নিম্নলিখিত কর্তব্যভার অর্পণ করিতে পারে—যথা, প্রাথমিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন; ফেরিঘাটের তত্ত্বাবধান; সেচকার্য; অধিক খাদ্য-ফলাও অভিযান পরিচালনা; পশুমড়ক নিবারণ ও গো-মহিষাদির জাত উন্নত করার ব্যবস্থা; পতিত জমির পুনরুদ্ধার; বৃক্ষরোপণ; সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন; ভূমি-প্রথার সংস্কারে সহায়তা; ইত্যাদি।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বাকী কার্যগুলি পরিচালনা করে অঞ্চল-পঞ্চায়েত।

অঞ্চল-পঞ্চায়েত

এক একটি অঞ্চল-পঞ্চায়েত পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম-সভা লইয়া গঠিত হয়। গ্রাম-সভার অনধিক ২৫০ জন সদস্যপিছু একজন করিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়। পঞ্চায়েতের ন্যায় অঞ্চল-পঞ্চায়েতের কার্যকাল ৪ বৎসর।

প্রধান ও উপপ্রধান

অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান নামে অভিহিত হন।

অঞ্চল-পঞ্চায়েতের কাযের বর্ণনায় প্রথমেই আঞ্চলিক শান্তিশৃংখলা রক্ষার উল্লেখ করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে অঞ্চল-পঞ্চায়েত চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করে এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ছাড়া করধার্য প্রভৃতি আয়ের ব্যবস্থা এবং ন্যায়-পঞ্চায়েত পরিচালনা করা হইল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

ন্যায়-পঞ্চায়েতের কার্য হইল ছোটখাট বিচারের ব্যবস্থা করা। ন্যায়-পঞ্চায়েতগুলি অঞ্চল-পঞ্চায়েত দ্বারা গঠিত এবং ইহারই মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ন্যায়-পঞ্চায়েত

ন্যায়-পঞ্চায়েতের বিচারকগণ নির্বাচিত হন। নির্বাচন গ্রাম-সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে করা হয়।

বলা হইয়াছে, করধার্য প্রভৃতি দ্বারা অর্থসংগ্রহের ভার অঞ্চল-পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত। এই সকল অর্থ 'অঞ্চল-পঞ্চায়েত ভাণ্ডার' নামে একটি তহবিলে সঞ্চিত হয় এবং তাহা হইতে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের নিজস্ব কার্য পরিচালনার জন্য এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত ও ন্যায়-পঞ্চায়েতের কায পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

১৯৫৯ সাল হইতে পশ্চিমবংগে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচন সুরু হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের মে মাসের মধ্যে (১৩৭১ সালের ১লা বৈশাখের পূর্বে) ঐ নির্বাচনকার্য শেষ হইয়া পুরাপুরি পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, উক্ত তারিখের মধ্যে পশ্চিমবংগের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানাধিকার করিবে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা। তখন এই রাজ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েত ও অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সংখ্যা দাঁড়াইবে যথাক্রমে ২০ হাজার ও ৩৩০০-তে।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board): ভারতের অন্যান্য রাজ্য পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রবর্তনকার্য একপ্রকার শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবংগে পল্লী অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ অংশে ইউনিয়ন বোর্ডের অস্তিত্ব এখনও বজায়

আছে। তবে এই রাজ্যেও ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠাকার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা হইল একটি ইউনিয়ন লইয়া। একটি ইউনিয়ন কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। পশ্চিমবংগের ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ১৯১৯ সালের বংগীয় স্বায়ত্তশাসন আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা হইল ৬ জন হইতে ৯ জন। সকল সভ্যই নির্বাচিত। নির্বাচন সাধারণত ৪ বৎসর অন্তর হয়। সুতরাং বোর্ডের কার্যকালও ৪ বৎসর।

গঠন

ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে ইউনিয়নের অধিবাসী সকল প্রাপ্তবয়স্কই ভোট দিতে পারে না। ভোটাধিকার পাইবার জন্য অধিবাসীর পক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়াও ন্যূনতম হারে 'ইউনিয়ন রেট' বা চৌকিদারী কর অথবা ন্যূনতম হারে সেস্ দেওয়া চাই, অথবা স্কুল ফাইন্যাল বা অনুরূপ কোন পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই।

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যনির্বাহের ভার বোর্ডের সভাপতির (President) উপর ন্যস্ত। তিনি সভ্যগণের মধ্য হইতে সভ্যগণ দ্বারা ঐ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সার্কেল অফিসার নামে সরকারী কর্মচারীর মাধ্যমে রাজ্য সরকার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির তদারক করে এবং উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এক একজন সার্কেল অফিসারের এলাকায় অনেকগুলি করিয়া ইউনিয়ন বোর্ড থাকে।

ইউনিয়নের মধ্যে যাহাতে শান্তিশৃংখলা বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই বোর্ডের প্রধান কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বোর্ড চৌকিদার ও দফাদার নিযুক্ত করে। গ্রামগুলির মধ্যে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করাও বোর্ডের অন্যতম কার্য। গ্রামগুলির রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, পশুমড়ক প্রতিরোধ করা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা, ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার মামলার বিচার করা, ইত্যাদি হইল বোর্ডের অন্যান্য কর্তব্য। ইহা ছাড়াও অনেক সময় ইউনিয়ন বোর্ডকে জিলা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কর্তব্যসমূহও পালন করিতে হয়।

কার্য

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস হইল 'ইউনিয়ন রেট' বা চৌকিদারী কর। এই উৎস হইতে বোর্ডের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ সংগৃহীত হইয়া থাকে। চৌকিদারী কর ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাধীন সম্পত্তির মালিকের উপর ধার্য করা হয়। ইহা ব্যতীত জিলা বোর্ড ও রাজ্য সরকার ইউনিয়ন বোর্ডকে সামান্য সামান্য সাহায্যও করিয়া থাকে।

আয়

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের অন্যান্য পন্থার মধ্যে আছে গ্রামের খোঁয়াড়, ফেরিঘাট, মামলার ফী, মামলার জরিমানা ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে বোর্ডের বাজার প্রভৃতি সম্পত্তিও থাকে ; এই উৎস হইতেও কিছু কিছু আয় হয়।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের যে-আয় হয় তাহা কোনমতেই পল্লী অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বোর্ডের আয়ের বেশীর ভাগ

ব্যয়িত হইয়া যায় চৌকিদার ও দফাদারের মাহিনা মিটাইতে। ফলে জনকল্যাণকর কার্যে অতি অল্প অর্থই ব্যয় করা সম্ভব হয়। ভারতের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার এক সমালোচকের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, যদি গ্রামীণ পুলিস—অর্থাৎ, চৌকিদার ও দফাদারগণই ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের সমগ্রটা খাইয়া ফেলে তবে জনকল্যাণ সাধিত হইবে কিরূপে?

ব্যয়

তবে ইউনিয়ন বোর্ড লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ বর্তমানে উহারা বিলুপ্তির পথে। শীঘ্রই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা উহাদের স্থানাধিকার করিয়া উহাদিগকে অতীতের বস্তু করিয়া তুলিবে।

জিলা বোর্ড (District Board): জিলা বোর্ডের এলাকা একটি জিলার সমগ্র পল্লী অঞ্চল লইয়া। পশ্চিমবংগে জিলা বোর্ডের সভ্যসংখ্যা ৯-এর কম হইতে পারে না এবং সাধারণত ৩৩-এরও অধিক হয় না। বর্তমানে সভ্যগণের সকলেই ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতৃগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। পূর্বে যে সভ্যগণের একাংশের মনোনয়ন-ব্যবস্থা ছিল তাহা এখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গঠন

ইউনিয়ন বোর্ডের মত জিলা বোর্ডের কার্যকালও ৪ বৎসর। বোর্ডের সভ্যগণের মধ্য হইতে সভ্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন সভাপতি এবং এক বা একাধিক সহ-সভাপতি থাকেন। সভাপতির উপরেই কার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য বোর্ড স্থায়ী বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্মসচিব (secretary), বাস্তুকার (engineer), স্বাস্থ্যাধিকারিক (health officer) প্রভৃতিই প্রধান।

কোন বোর্ড কর্তব্যপালনে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা স্বেচ্ছায় কার্য-সম্পাদনে অবহেলা করিলে রাজ্য সরকার উক্ত বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।

জিলা বোর্ডকে বিভিন্ন ধরনের কার্য করিতে হয়। তবে জিলা বোর্ডের উপর শান্তিশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নাই। বোর্ডের অন্যতম কার্য হইল জিলার রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করা। জনস্বাস্থ্যরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যোন্নতি করাও জিলা বোর্ডের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বোর্ডকে গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসাইতে হয়, পুষ্করিণী খনন এবং পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালগুলির তত্ত্বাবধান করিতে হয়, দরিদ্র জনসাধারণের ভিতর ঔষধ বিতরণ করিতে হয় এবং সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। টিকা দিবার ব্যবস্থা ও সমস্ত টিকাদারের নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পশুমড়ক নিবারণ ও পশুচিকিৎসার ব্যবস্থাও জিলা বোর্ডকে করিতে হয়। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলকে অর্থ, খাদ্য ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য করিতে হয়। জিলার অভ্যন্তরে শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্বও বোর্ডের উপর রহিয়াছে। বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলির দেখাশুনায়

কার্য

জিলা স্কুল বোর্ডকে সহায়তা করে। শিক্ষকদের নিয়োগ করা ও বেতন দিবার ব্যবস্থাও বোর্ড করে। কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের জন্য বোর্ড বৃত্তি দান করে। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য করিবার ক্ষমতাও বোর্ডের আছে।

জিলা বোর্ডের অন্যান্য কার্যের মধ্যে ডাকবাংলো, বিশ্রামাবাস, হাটবাজার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বোর্ড জিলায় পারাপারের সুবন্দোবস্ত করে এবং অনেক সময় ছোটখাট রেলপথ নির্মাণের জন্য রেল কোম্পানীকে অর্থসাহায্য করে।

আয়

জিলা বোর্ডের প্রধান আয় হইল রোড সেস্ বা পথকর হইতে। জিলায় জমির খাজনার উপর এই কর ধার্য করা হয়। রাস্তা ও পুলের উপর শুল্ক (toll) ধার্য করিয়া এবং ফেরিঘাট, খোঁয়াড় প্রভৃতি জমা দিয়াও বোর্ডের কিছু আয় হয়। জিলার মধ্যে ছোট রেলপথ থাকিলে উহা হইতে কিছু লভ্যাংশ জিলা বোর্ড পাইয়া থাকে। ব্যয় সংকুলানের জন্য বোর্ড ঋণগ্রহণ করিতে পারে।

ব্যয়

জিলা বোর্ডের আয়ের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ ব্যয় হয় কর্মচারিগণের বেতন বাবদ, প্রায় ২৫ ভাগ ব্যয় হয় জনস্বাস্থ্যের জন্য, প্রায় ১৭ ভাগ ব্যয় হয় রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য এবং শিক্ষাখাতে ব্যয় হয় শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র। বাকী অংশ ব্যয় হয় অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনে।

জিলার স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার নূতন রূপ

সম্প্রতি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্যে জিলার স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ' (democratic decentralisation) নামে অভিহিত। ইহাতে জিলা বোর্ড তুলিয়া দিয়া তিন-পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান (three-tier machinery) গঠন করা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে বা ভিত্তিস্থলে আছে গ্রাম-পঞ্চায়েত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে আছে ব্লক-পঞ্চায়েত সমিতি (Block Panchayat Samiti), এবং সর্বোপরি আছে জিলা পরিষদ। এই তিনটি পর্যায় পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত এবং উহাদের উপর জিলার সকল প্রকার পৌর ও উন্নয়ন কর্তব্যভার (civic and developmental activities) অর্পিত হইয়াছে। পশ্চিমবংগ সহ বাকী রাজ্যগুলিও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে। পশ্চিমবংগে জিলা পরিষদ আইন পাস হয় ১৯৬৩ সালে। এই আইনকে কার্যকর করা হইতেছে ১৯৬৪ সাল হইতে। সুতরাং ইউনিয়ন বোর্ডের ন্যায় জিলা বোর্ডেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নহে।

পশ্চিমবংগে জিলা পরিষদ-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে করা হইল :

পশ্চিমবংগে জিলা পরিষদ (Zilla Parishads in West Bengal): প্রত্যেক জিলার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নির্দিষ্ট তারিখ হইতে একটি জিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এই জিলা পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্য

(members) এবং সংযুক্ত সদস্য (associated members) লইয়া গঠিত হইবে। সদস্যগণের মধ্যে আছেন (ক) আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ (Presidents); ইঁহারা পদাধিকারবলে (ex-officio) সদস্য হন। (খ) প্রত্যেক মহকুমা হইতে অধ্যক্ষগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত দুইজন করিয়া অধ্যক্ষ। (গ) জিলা হইতে লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যগণ; তবে মন্ত্রীরা জিলা পরিষদের সদস্য হইতে পারেন না। (ঘ) মন্ত্রীরা ব্যতীত জিলায় যাঁহাদের আবাসস্থান এমন সকল রাজ্যসভা এবং রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্যগণ। (ঙ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জিলার অন্তর্ভুক্ত মিউনিসিপ্যালিটির একজন চেয়ারম্যান অথবা করপোরেশনের একজন মেয়র। (চ) পদাধিকারবলে জিলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি। (ছ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দুইজন স্ত্রীলোক; তবে অন্যভাবে দুইজন স্ত্রীলোক সদস্যপদ পাইয়া থাকিলে রাজ্য সরকার স্ত্রী সদস্য নিয়োগ করিবে না। এই সকল সদস্য ছাড়া জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহকুমার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (Sub-divisional Magistrate) এবং রাজ্য সরকার নিযুক্ত জিলা-পঞ্চায়েত কর্মচারী (the District Panchayat Officer) জিলা পরিষদের সংযুক্ত সদস্য হইবেন।

জিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও গঠন

জিলা পরিষদের একজন সভাপতি (Chairman) এবং একজন সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) থাকিবেন; ইঁহারা উপরি-উক্ত (ক), (খ) এবং (ছ) শ্রেণীর সদস্যগণের মধ্য হইতে জিলা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। ইঁহাদের কার্যকালের মেয়াদ হইল ৪ বৎসর। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার কতকগুলি কারণে ইঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারে। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য অন্যান্য কর্মচারী রহিয়াছেন। প্রথমেই রহিয়াছেন একজন কার্যনির্বাহক (an Executive Officer)। ইনি রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ইঁহার কায হইল অন্যান্য কর্মচারীকে নিয়ন্ত্রিত করা। ইহা ব্যতীত জিলা পরিষদ নিজে একজন কর্মসচিব (a Secretary) এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিবে।

জিলা পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি

জিলা পরিষদের হস্তে নানাবিধ কার্য ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। জিলা পরিষদ কৃষি, সমবায়, সেচ, কুটির শিল্প, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রবর্তন করিতে পারে; রাজ্য সরকার যে-সকল কার্য বা পরিকল্পনার দায়িত্ব জিলা পরিষদের উপর অর্পণ করে তাহা পরিষদকে সম্পাদন বা কার্যকর করিতে হয়। স্কুল, পাঠাগার, জনপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে অর্থসাহায্য, কলাকৌশলগত শিক্ষার প্রসারের জন্য স্কলারশিপ প্রদান, গ্রামীণ হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ, আঞ্চলিক পরিষদগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়-সাধন, আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থসাহায্য, আঞ্চলিক পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ও মঞ্জুর করা প্রভৃতি জিলা পরিষদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যতীত জিলার উন্নয়ন ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে।

জিলা পরিষদের ক্ষমতা ও কায

জিলা পরিষদের দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। জিলা পরিষদের নিম্নলিখিত কর ধার্য ও আদায় করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে: (১) যানবাহন জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির উপর কর, (২) খেয়ার উপর শুল্ক, (৩) যানবাহন বা নৌকা রেজিষ্ট্রিকরণের দরুন ফী, (৪) জলসরবরাহ ও রাস্তাঘাট আলোকিত করার দরুন কর বা রেট। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার জিলা পরিষদকে অর্থসাহায্য করিতে পারে অথবা ঋণপ্রদান করিতে পারে। আঞ্চলিক পরিষদগুলি জিলা পরিষদের তহবিলে অর্থপ্রদান করিতে পারে। জিলা পরিষদ নিজে রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ করিতে পারে।

আয়

আঞ্চলিক পরিষদ (Anchalik Parishad): রাজ্য সরকার আবার প্রত্যেক জিলাকে বিভিন্ন ব্লকে (Blocks) বিভক্ত করিবে। নির্দিষ্ট অঞ্চল লইয়া প্রত্যেকটি ব্লক গঠিত হইবে। প্রত্যেক ব্লকের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে। এই আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত হইবে: (১) অঞ্চল-পঞ্চায়েতের প্রধানগণ ও ব্লকের এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিগণ পদাধিকারবলে সদস্য হইবেন; (২) প্রত্যেক অঞ্চল-পঞ্চায়েতের এলাকা হইতে অধ্যক্ষগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ; (৩) মন্ত্রী ব্যতীত ব্লকের এলাকা হইতে লোকসভা বা রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যগণ; (৪) ব্লকের এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভা বা রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্যগণ; (৫) দুইজন স্ত্রীলোক; (৬) অনুন্নত শ্রেণীর দুইজন প্রতিনিধি; (৭) গ্রামীণ উন্নয়নকার্যে বা সমাজসেবার কার্যে অভিজ্ঞ দুইজন ব্যক্তি। ইহা ব্যতীত ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী (Block Development Officer) আঞ্চলিক পরিষদের সংযুক্ত সদস্য হইবেন। আঞ্চলিক পরিষদের একজন সভাপতি (President) এবং একজন সহ-সভাপতি (Vice-President) থাকিবেন এবং ইঁহাদের কার্যকালের মেয়াদ হইল ৮ বৎসর। ইহা ছাড়া দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী কর্মচারী রহিয়াছে। ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী পদাধিকারবলে আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যনির্বাহক (Chief Executive Officer) হন।

আঞ্চলিক পরিষদের গঠন

কৃষি, কুটির শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, হাসপাতাল, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও অর্থব্যয় আঞ্চলিক পরিষদ করিতে পারে। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার যে-সকল কার্য ইহার হস্তে ন্যস্ত করে তাহা উহাকে সম্পাদন করিতে হইবে। পরিষদ স্কুল, জনসাধারণের পাঠাগার ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করিতে পারে। ব্লকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল-পঞ্চায়েতগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়সাধন করার ক্ষমতাও আঞ্চলিক পরিষদের রহিয়াছে।

কার্য ও ক্ষমতা

আঞ্চলিক পরিষদের আয়ের উৎস হইল: (ক) যানবাহন ও জন্তুজানোয়ারের উপর নির্ধারিত শুল্ক (toll); (খ) যানবাহন রেজিষ্ট্রিকরণের দরুন ফী; (গ) ফেরি-

ঘাটের উপর ধার্য শুল্ক; (ঘ) হাটবাজারের লাইসেন্স হইতে ফী; (ঙ) জলসরবরাহ ও রাস্তাঘাট আলোকিত করিবার জন্য ধার্য রেট বা কর। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার অর্থসাহায্য ও ঋণপ্রদান করিতে পারে। জিলা পরিষদও আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থসাহায্য করিতে পারে। রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে আঞ্চলিক পরিষদ ঋণ করিতে পারে।

আয়

জিলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যাপক ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। যেমন, নির্দিষ্ট কারণে জিলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাবকে রাজ্য সরকার বাতিল করিয়া দিতে পারে। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার যদি মনে করে যে কোন জিলা পরিষদ বা কোন আঞ্চলিক পরিষদ কর্তব্যপালনে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে বা নিয়মিতভাবে কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করিয়া আসিতেছে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে তাহা হইলে রাজ্য সরকার ঐ জিলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য বাতিল করিয়া দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় রাজ্য সরকার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর (Administrator) নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারে।

রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality): কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনার ন্যায় মহানগরের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন বলা হয় এবং অন্যান্য সহরের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হয় পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি। সকল ক্ষেত্রে পৌরসংঘ যে একটি সহর লইয়া গঠিত হয় তাহা নহে। অনেক সময় পাশাপাশি কয়েকটি সহর লইয়াও একটি পৌরসংঘ গঠিত হয়।

পশ্চিমবংগের পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ সালের বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইন (Bengal Municipal Act, 1932) দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৩২ সালে পাস হওয়ার পর অবশ্য এই আইনের বহু পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে।

পৌরসংঘের কার্য পরিচালনার ভার সংঘের সভ্যদের উপর ন্যস্ত। সভ্যগণ পৌরাধ্যক্ষ বা কমিশনার নামে পরিচিত। পৌরাধ্যক্ষের সংখ্যা সকল ক্ষেত্রে এক নহে। কোন্ পৌরসংঘে কতজন পৌরাধ্যক্ষ থাকিবেন তাহা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তবে কোনও ক্ষেত্রে ৯-এর কম এবং ৩০-এর বেশী পৌরাধ্যক্ষ থাকেন না। সকল পৌরাধ্যক্ষই বর্তমানে নির্বাচিত। পূর্বে নির্বাচন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইত না। নির্বাচনে মাত্র রেট, লাইসেন্স ফী ইত্যাদি প্রদানকারী এবং অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক স্কুল ফাইন্যাল বা অনুরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণই ভোট দিতে পারিত। বর্তমানে কিন্তু ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। ফলে ভবিষ্যতে পৌরাধ্যক্ষগণ সার্বিক প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইবেন।

গঠন

পৌরাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচিত করেন। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক সহ-সভাপতিও থাকেন। সভাপতি পৌরাধ্যক্ষগণের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁহাদের নির্দেশানুসারে পৌরসংঘের কার্য পরিচালনা করেন। অধিকাংশ সময় তিনি সহ-সভাপতির হস্তে কয়েকটি কার্যের ভার ছাড়িয়া দেন। সভাপতি বা পৌরসংঘপাল এবং উপপৌরসংঘপালের পদ অবৈতনিক। পৌরাধ্যক্ষগণও কোন বেতন বা ভাতা পান না।

বেতনভোগী কর্মচারীর মধ্যে কর্মসচিব, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (Sanitary Inspectors), কার্য-পরিদর্শক (Overseer) প্রভৃতিই প্রধান। কোন কোন পৌরসংঘে আবার স্বাস্থ্যাধিকারিক (Health Officer), বাস্তুকার (Engineer) প্রভৃতির পদও থাকে। আয় ১ লক্ষ টাকার অধিক হইলে পৌরসংঘ একজন মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive Officer) নিযুক্ত করিতে পারে।

পৌরসংঘকে বহুবিধ কার্য করিতে হয়। এই কার্যগুলিকে অনেক সময় দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়--(১) অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য, এবং (২) স্বেচ্ছাধীন কার্য। অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য হইল সেগুলি যেগুলিকে নগরের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় কোনমতেই বর্জন করা যায় না। যেমন, নগরজীবনের পক্ষে রাজপথ অপরিহার্য বলিয়া রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ পৌরসংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক, স্বেচ্ছাধীন কার্য হইল সেগুলি যাহা আয় অধিক হইলেই পৌরসংঘগুলি সম্পাদন করে—যেমন, হাসপাতাল স্থাপন বা কলের জলের ব্যবস্থা করা সকল পৌরসংঘের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং এই দুইটি স্বেচ্ছাধীন কার্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে অন্তত নলকূপ বসাইয়া পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা পৌরসংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক। অপরিহার্য ও স্বেচ্ছাধীন কর্তব্যের সীমারেখা অবশ্য সকল সময় সুস্পষ্ট নহে। তাই এই শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ না করিয়া সাধারণত পৌরসংঘগুলি যে-সকল কার্য সম্পাদন করে তাহারই বর্ণনা করা হইতেছে।

কার্য

কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ

পৌরসংঘ তাহার এলাকার রাস্তাঘাট, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি নির্মাণ করে এবং ইহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, রাজপথগুলি আলোকিত ও জলসিঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করে।

পৌরসংঘ সহর হইতে ময়লা ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে ; সহরে বনজংগল ও অপরিষ্কার পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থা করে ; পুষ্করিণী খনন করিয়া, নলকূপ বসাইয়া, জলকল বসাইয়া পানীয় জল সরবরাহ করে। সংঘ মহামারীর প্রতিরোধকল্পে টিকা দেয় এবং চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, প্রসূতি-আগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে পৌরসংঘ জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। এই উদ্দেশ্যেই ইহাদের উপর ঔষধ ও খাদ্যাদির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

পৌরসংঘ সহরে গোরস্থান, শ্মশান প্রভৃতি স্থাপন ও তত্ত্বাবধান করে। অধিকাংশ স্থানে সংঘ গৃহাদি নির্মাণও নিয়ন্ত্রণ করে। এই সকল স্থানে পরিকল্পনা অনুসারে গৃহনির্মাণকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে পৌরসংঘের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সংঘ সহরে অগ্ন্যুৎপাত প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা এবং বিপজ্জনক গৃহাদি অপসারণ করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বন করে।

পৌরসংঘের অপর একটি কায হইল এলাকার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা। জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখাও পৌরসংঘের কার্য।

পরিশেষে, শিক্ষাবিস্তার পৌরসংঘের একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে সংঘ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় প্রভৃতিতে অর্থসাহায্য করে। অনেক ক্ষেত্রে পৌরসংঘ আবার জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে।

কার্যের মত পৌরসংঘের আয়ের উৎসও বহুবিধ। প্রধান উৎস হইল এলাকার জমি ও গৃহাদির আনুমানিক বাৎসরিক আয়ের উপর কর বসানো। ইহাকে হোল্ডিং রেট (Holding Rate) বলা হয়। ইহা ছাড়াও জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, পথঘাট আলোকিত করার জন্যও জমি ও গৃহাদির উপর কর ধার্য করা হয়।

আয়

জমি ও গৃহাদির উপর এইরূপে কর ধার্য করা ছাড়াও পৌরসংঘ এলাকার অন্তর্গত সকল ব্যবসায়, বৃত্তি প্রভৃতির উপর কর ধার্য করে। ফলে দোকানদার, অন্যান্য ব্যবসায়ী, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতিকে কর দিতে হয়। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী রিক্সা প্রভৃতির উপর কর বসাইয়া পৌরসংঘের আয় হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত বাজারের উপরও পৌরসংঘ কর ধার্য করিতে পারে। অনেক সময় গৃহপালিত পশুর জন্য মালিকদের নিকট হইতে অনুমতি বা লাইসেন্স বাবদ কিছু আয় হয়। কোন কোন রাজ্যে পৌরসংঘগুলির পুরঃশুল্ক বা চুংগি (Octroi) ধার্য করিবার ক্ষমতা আছে। পশ্চিমবংগের পৌরসংঘগুলির এই কর ধার্য করিবার ক্ষমতা নাই।

পৌরসংঘের এলাকায় খেয়া পারাপারের বন্দোবস্ত বা পুল থাকিলে এই উৎস হইতেও সংঘের আয় হয়।

সংঘ বাজার, ডাকবাংলো, বিশ্রামাবাস প্রভৃতি সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে; হইলে এই উৎস হইতেও সংঘের আয় হয়। অনেক ক্ষেত্রে মোটরযান হইতে সংগৃহীত করের একাংশ পৌরসংঘগুলি পাইয়া থাকে। সরকার সংঘের উপর কোন বিশেষ কর্তব্যভার অর্পণ করিলে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও প্রদান করিয়া থাকে।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পৌরসংঘগুলিকে ঋণপ্রদান করে। সরকারের অনুমতি লইয়া সংঘ জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণসংগ্রহও করিতে পারে।

উপরি-উক্ত উৎসগুলি হইতে যে আয় হয় তাহা বিবিধ কর্তব্য সম্পাদনে ও কর্মচারিগণের বেতন দিতে ব্যয় করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জল ও ময়লা নিষ্কাশন বাবদ এবং কর্মচারীদের বেতন দিতেই অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়; শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যয় করা সম্ভব হয় না।

ব্যয়

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন (Calcutta Corporation): কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনা আমেদাবাদ বাংগালোর পুণা প্রভৃতির ন্যায় মহানগরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন বলা হয়। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবংগের অন্তর্ভুক্ত পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরেও একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ১৯৫১ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। ১৯১২, ১৯৫৫, ১৯৬১, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা হইয়াছে।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার ভার বর্তমানে ৮০ জন নির্বাচিত কাউন্সিলার, জন পদাধিকারবলে কাউন্সিলার ও ৫ জন অল্ডারম্যান বা নগরপাল —এই ৮৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত।* সাধারণ সদস্যগণ কাউন্সিলার বলিয়া পরিচিত। পদাধিকারবলে যিনি কাউন্সিলার তিনি হইলেন কলিকাতা নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। কাউন্সিলারগণ ৫ জন অল্ডারম্যান বা নগরপাল নির্বাচিত করেন। পূর্বে কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানের নির্বাচন প্রতি ৩ বৎসর অন্তর হইত। কিন্তু ১৯৫৫ সালে এক আইন পাস করিয়া কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ৩ বৎসর হইতে ৪ বৎসর করা হইয়াছে। সুতরাং এখন নির্বাচন ৪ বৎসর অন্তর হয়। ইহার উপর রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে এই পৌর প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল আরও ১ বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে।

গঠন

পূর্বে কাউন্সিলার-নির্বাচন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইত না। ট্যাক্স, রেট, লাইসেন্স ফী ইত্যাদি প্রদানকারী এবং স্কুল ফাইন্যাল বা তদনুরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ ২১ বৎসর বয়স্ক হইলে তবেই ভোটাধিকার পাইত। কিন্তু উপরি-উক্ত ১৯৬২ সালের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। ফলে ভবিষ্যতে পৌরসংঘসমূহের ন্যায় কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

পৌর প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে মেয়র এবং সহ-সভাপতিকে ডেপুটি মেয়র বলা হয়। তাঁহারা ১ বৎসরের জন্য সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন।

কার্যনির্বাহের জন্য কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সভ্য লইয়া গঠিত কয়েকটি স্থায়ী কমিটি আছে। তন্মধ্যে কর, অর্থ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, নগরোন্নতি ও পরিকল্পনা কমিটি প্রধান।

* নির্বাচিত কাউন্সিলারদের সংখ্যা ৮০ হইতে ১০০-তে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিভিন্ন এলাকায় পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাহার জন্য অনেকগুলি এলাকা কমিটি (Borough Committees) গঠন করা হইয়াছে। এক একটি এলাকা কমিটি কয়েকটি পল্লী লইয়া গঠিত হয়।

নূতন আইন দ্বারা কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানে কমিশনার নামে একটি পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কমিশনার রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য হইল পৌর-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। তাঁহাকে মুখ্য কার্যনির্বাহক (chief executive) বলিয়া অভিহিত করা যায়। তাঁহার হস্তে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। আইনে সাধারণ সময়ে দুইজন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে চারজন পর্যন্ত সহকারী কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে।

পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা পৌরসংঘের কার্যেরই অনুরূপ। তবে আয় বেশী বলিয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান নগরজীবনের উন্নতিকল্পে অনেক বেশী কাজ করিতে পারে।

কার্য

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান নগরের রাস্তাঘাট, উদ্যান, চত্বর প্রভৃতি নির্মাণ করে এবং তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে; শ্মশানঘাট ও গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ করে, পথঘাট আলোকিত ও জলসিক্ত করে; নগরের জল ও ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে; পানীয় ও অশোধিত জল সরবরাহ করে; নগরবাসীদের সুবিধার জন্য বাজারের প্রতিষ্ঠা করে।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও রক্ষা কল্পে পৌর-প্রতিষ্ঠান অন্যান্য কতকগুলি কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে—যেমন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার জন্য টিকা দেওয়া, ঔষধ ও খাদ্যাদি বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা, পশুহত্যাশালা স্থাপন করা, হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়-গুলিকে অর্থসাহায্য করা, ইত্যাদি।

সহরের গৃহনির্মাণও ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন। কলিকাতায় গৃহনির্মাণ বা গৃহের রদবদল করিতে হইলে পরিকল্পনাটি পৌর প্রতিষ্ঠানকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়।

শিক্ষাবিস্তার পৌর-প্রতিষ্ঠানের একটি প্রাথমিক কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান অনেক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অনেক বিদ্যালয়কে ইহা অর্থসাহায্যও করে। ইহার পরিচালনাধীনে একটি বাণিজ্যিক জাদুঘরও আছে। এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইল কুটির শিল্পের প্রচার।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আয় ৯·৫ কোটি টাকার উপর। কিছুদিন পূর্বেও আয় মাত্র আড়াই কোটি টাকা ছিল। জমি ও বাড়ীর অনুমানিক বাৎসরিক

আয়

মূল্যের উপর ধার্য কর হইল আয়ের প্রধান উৎস। এই কর শতকরা ১৫ টাকা হইতে ২৩ টাকা হারে ধার্য করা হয়। দ্বিতীয় উৎস হইল ব্যবসায় ও বৃত্তির উপর ধার্য কর। তাহার পর আছে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতির উপর ধার্য কর। বাজার প্রভৃতি সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় হয়। মোটরযানের উপর ধার্য সরকারী করের একাংশও পৌর-প্রতিষ্ঠান পাইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত উপায়ে সংগৃহীত আয় বিবিধ কার্যসম্পাদনে ব্যয়িত হয়।

ব্যয়

কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা দিতেই আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয়িত হয়।

সেনানিবাস সংঘ (Cantonment Board): নগরের যে-সকল অঞ্চলে সেনানিবাস আছে সেখানে একটি করিয়া সেনানিবাস সংঘ থাকে। সংঘের কার্য প্রতিরক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়।

নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান (Improvement Trust): কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে একটি করিয়া নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান আছে। পশ্চিমবংগে কলিকাতা ছাড়া হাওড়াতেও একটি নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। নগরের উন্নতি করাই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্য। নগরের উন্নতি বলিতে অপরিষ্কার বস্তি পরিষ্কার ও অপসারণের ব্যবস্থা করা, নূতন বাসযোগ্য এলাকার সৃষ্টি করা, নূতন রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, উদ্যান চত্বর ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি স্থাপন করা বুঝায়। এইগুলি করিয়া নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান নগরের সুন্দর রূপ দিতে চেষ্টা করে। ইহারা পৌর-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পায়। নূতন বাসযোগ্য জমি বিক্রয় করিয়াও ইহাদের আয় হয়।

বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান (Port Trust): কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান আছে। বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ইহাদের কার্য। বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও ইহারা মালগুদাম, জেটি প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, ফেরি ষ্টীমার দ্বারা নদী পারাপারের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। বন্দরে যে-সকল জাহাজ আসে তাহাদের নিকট শুল্ক আদায় করাই আয়ের প্রধান উৎস।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান দিনের বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ভারতে যে-সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দৃষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশ ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট। ভারতের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা হইল গ্রাম-পঞ্চায়েত। সুতরাং ভারতে দুই ধরনের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) ভারতীয় ও (খ) পাশ্চাত্য ধরনের। (ক) গ্রামীণ ও (খ) পৌর—স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান হইল (১) গ্রাম-পঞ্চায়েত, (২) ইউনিয়ন বোর্ড, এবং (৩) জিলা বোর্ড—এই তিন প্রকারের। পৌর স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রধানত পাঁচ ধরনের—যথা, (১) পৌরসংঘ বা মিউনিসি-প্যালিটি, (২) পৌর প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন, (৩) সেনানিবাস সংঘ, (৪) নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান, এবং (৫) বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান।

গ্রাম-পঞ্চায়েত: সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে স্বাধীন ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হইতেছে। পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে আইন পাস করা হয়। পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েত-সমূহ ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোর্ডের বিলোপসাধন করিয়া উহাদের স্থানাধিকার করিতেছে।

পঞ্চায়েতের কার্যের মধ্যে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন, ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতিই প্রধান। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বের একাংশও পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ড: পশ্চিমবংগে ইউনিয়ন বোর্ড ১৯১৯ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা ৬ হইতে ৯ জন। দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের ভার সভাপতির হস্তে ন্যস্ত। কার্য মোটামুটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের মতই। ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী কর হইতে আয়ের তিন-চতুর্থাংশ সংগৃহীত হয়।

জিলা বোর্ড : জিলা বোর্ডের সভ্যসংখ্যা ৯ হইতে ৩৩ জন। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার ১ জন সভাপতি এবং ১ বা ২ জন সহ-সভাপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া, অনেক বেতনভোগী স্থায়ী কর্মচারীও থাকে। জিলার পথঘাট প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতি, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ, শিক্ষাবিস্তার, হাটবাজার, বিশ্রামাবাস স্থাপন প্রভৃতি জিলা বোর্ডের প্রধান কার্য।

রোড সেস্ বা পথকর আয়ের প্রধান সূত্র।

পৌরসংঘ : কলিকাতার ন্যায় মহানগরী ব্যতীত অন্যান্য সহরের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৌরসংঘ বলা হয়। পশ্চিমবংগে পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। সভ্যসংখ্যা ৯ হইতে ৩০-এর মধ্যে নির্দিষ্ট। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার সভাপতি ও সহ-সভাপতির হস্তে ন্যস্ত। অবস্থানুসারে সংঘের অনেক বেতনভোগী কর্মচারীও থাকে।

পৌরসংঘগুলি দুই প্রকারের কার্য সম্পাদন করে—(১) অপরিহার্য ও (২) ইচ্ছাধীন। অপরিহার্য কার্য হইল সেইগুলি যাহা নাগরিক জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক—যেমন, রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ। অপরদিকে ইচ্ছাধীন কর্তব্য তাহাদিগকেই বলা হয় যাহা পৌরসংঘ আয় অধিক হইলেই সম্পাদন করে —যেমন, হাসপাতাল স্থাপন ও কলের জলের ব্যবস্থা। এই দুই প্রকার কার্যের মধ্যে সীমারেখা অবশ্য সকল সময় সুস্পষ্ট নহে।

হোল্ডিং রেট, পেশা ও বৃত্তির উপর ধার্য কর এবং যানবাহনের উপর কর - এই কয়টিই আয়ের প্রধান সূত্র। ইহার উপর হাটবাজার প্রভৃতি হইতেও কিছু কিছু আয় হয়।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান : কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান সংশোধিত ১৯৫১ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। ইহা ৮১ জন কাউন্সিলার এবং ৫ জন অল্ডারম্যান বা নগরপাল লইয়া গঠিত। কার্যকাল ৪ বৎসর। সভাপতি মেয়র নামে অভিহিত। একজন ডেপুটি মেয়রও আছেন।

কার্য পৌরসংঘের কার্যের অনুরূপ। তবে আয় বেশী বলিয়া ইহা অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। বর্তমান আয় ৯.৫ কোটি টাকার উপর। হোল্ডিং রেট এবং ব্যবসায় বৃত্তি ও যানবাহনের উপর ধার্য করই আয়ের সূত্র।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান : সেনানিবাস অঞ্চলে একটি করিয়া সেনানিবাস সংঘ কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে একটি করিয়া নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান থাকে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the organisation and functions of the Village Union Boards in West Bengal.

পশ্চিমবংগে গ্রামীণ ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সংগঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা]

2. Describe the constitution and functions of the Zila Parishads in West Bengal.

পশ্চিমবংগে জিলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৪৮-৫০ পৃষ্ঠা]

3. Describe the system of village self-government in West Bengal.

পশ্চিমবংগের গ্রামসমূহে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বর্ণনা কর।

[ইংগিত : গ্রামসমূহে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা (Village Self-Government) গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা (Rural Self-Government) হইতে পৃথক। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বর্ণনায় জিলা বোর্ড এবং পরিষদ, পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন বোর্ড সকলেরই উল্লেখ করিতে হইবে, কিন্তু গ্রামসমূহে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বর্ণনায় জিলা বোর্ড ও পরিষদকে বাদ দিয়া অপর দুইটির আলোচনা করিতে হইবে।

পশ্চিমবংগের গ্রামসমূহে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা এতদিন ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। এখন গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানাধিকার করিতেছে।...(৪৩-৫০ পৃষ্ঠা)]

4. Give a brief idea of the organisation of Village Panchayats in West Bengal.

পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সংগঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা]

5. Give an outline of the Municipal Administration in West Bengal.

পশ্চিমবংগে পৌর শাসন-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[ইংগিত : 'পৌর শাসন-ব্যবস্থা' বলিলে পৌরসংঘ (Municipality) এবং কলিকাতা ও চন্দননগরের পৌর-প্রতিষ্ঠান (Municipal Corporations) উভয় সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে। ...(৫১-৫৪ পৃষ্ঠা)]

6. Indicate the functions and sources of revenue of the Municipalities in West Bengal.

পশ্চিমবংগে পৌরসংঘগুলির কার্যাবলী ও আয়ের উৎস নির্দেশ কর। [৫১-৫৪ পৃষ্ঠা]

7. Describe the composition and functions of the Calcutta Corporation.

কলিকাতা করপোরেশনের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৫৪ ৫৫ পৃষ্ঠা]

8. Explain the functions of (*a*) Improvement Trust, (*b*) Port Trust, and (*c*) Anchalik Parishad.

(ক) নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান, (খ) বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান, এবং (গ) আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৫৬ এবং ৫০ পৃষ্ঠা]

অর্থবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি

(Subject Matter and Scope of Economics)

ভূমিকা : অল্প কথায় বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা, বাঁচিয়া থাকার সমস্যা লইয়াই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। জীবনধারণের জন্য আমরা অনেক কিছুরই অভাববোধ করি। আমরা চাই খাদ্যবস্ত্র আশ্রয় ইত্যাদি। কিন্তু কেবলমাত্র জীবনধারণ করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা চাই ভালভাবে বাঁচিতে, উন্নততর জীবন উপভোগ করিতে। তাই আমরা সাধারণ খাদ্যবস্ত্র আশ্রয় ছাড়াও নানা প্রকার আরাম ও বিলাসের সামগ্রী কামনা করি কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে এই সকল কাম্য দ্রব্য সকলের অভাব মিটাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই অপ্রাচুর্যের দরুন দেখা দেয় নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থবিদ্যা অপ্রাচুর্যজনিত এই সকল অর্থনৈতিক সমস্যারই পর্যালোচনা করে।

অর্থবিদ্যা অপ্রাচুর্য সংক্রান্ত সমস্যার পর্যালোচনা করে

আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প আমরা প্রায় সকলেই জানি। আলাদিন প্রদীপটিকে একটু ঘষিলেই এক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। দৈত্যটিকে আলাদিন যাহা আদেশ করিত তাহাই সে সংগ্রহ করিয়া আনিত। ফলে আলাদিনের অভাব বলিয়া কিছু ছিল না।

এইরূপ আমাদের যদি প্রত্যেকের একটি করিয়া আশ্চর্য প্রদীপ থাকিত তবে আমাদের অভাবমোচনের কোন সমস্যাই থাকিত না, এবং ফলে আমাদের পক্ষে অর্থবিদ্যা চর্চারও কোন প্রয়োজন হইত না।

মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু। অভাববোধের ফলে মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাহার অভাব পরিতৃপ্ত হয়। পরিতৃপ্তির পর আবার দেখা দেয় অভাব। এইভাবে অভাব, কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে একটি বৃত্তাকার সম্বন্ধ রহিয়াছে :

মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু
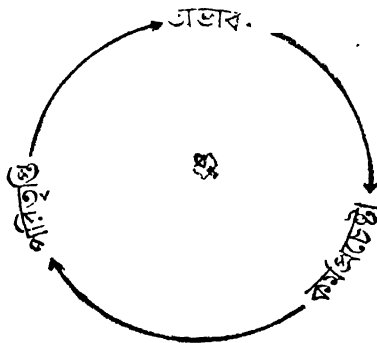
আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী মৎস্য শিকার করিয়া, স্বয়ং গৃহনির্মাণ করিয়া, জীবজন্তুর চামড়া হইতে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিয়া সরাসরি অভাবমোচন করিত। তখন তাহার অভাবও ছিল সংখ্যায় অত্যল্প এবং বিশেষ সরল প্রকৃতির। সামান্য খাদ্য, সামান্য পরিচ্ছদ এবং কোনমতে বসবাস করিবার একটু স্থান হইলেই তাহার চলিয়া যাইত।

কিন্তু ক্রমে তাহার অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে সে অভাব-মোচনের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল এবং সুরু হইল দ্রব্য-বিনিময় (barter)। যাহার বেশী ধান্য ছিল সে ধান্যের পরিবর্তে বস্ত্র লইতে লাগিল, ইত্যাদি। তারপর একদিন বিনিময়কার্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রবর্তন করা হইল টাকাকড়ির। এখন হইতে মানুষ আর সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল। যেমন, কৃষক অর্থের বিনিময়ে ধান্য বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থ দিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিল।

এইভাবে অর্থ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে যে বিনিময়কার্য সুরু হইল ক্রমশ তাহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিল বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক জীবন। এই জীবনে মানুষকে অভাবমোচনের জন্য সরাসরি দ্রব্যাদি সংগ্রহের পরিবর্তে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাতেই লিপ্ত থাকিতে হয় এবং অর্জিত অর্থ অধিকাংশ সময়ই সকল অভাব মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট হয় না বলিয়া বিচারবিবেচনার সহিত ব্যয় করিতে হয়।

‘অপ্রাচুর্য ও বিনিময় তত্ত্ব’ই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু

বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক জীবনে অর্থ বা টাকাকড়ির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও টাকাকড়ির মাধ্যমে অভাবমোচনের প্রচেষ্টা এবং পূর্বেকার সরাসরি দ্রব্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে অভাবমোচনের প্রচেষ্টার মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার প্রকৃতি এক এবং এই সমস্যাই বর্তমানে ‘অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বে’ (theory of scarcity and choice) পরিণত হইয়া অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিম্নে এই বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Analysis of the Subject Matter):

অপ্রাচুর্য মানুষের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এই অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি আমরা সকল সময় ঠিক অনুধাবন করিতে পারি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে আমরা শুধু টাকাকড়িরই অভাববোধ করিতাম। হাতে টাকা থাকিলে সব জিনিসই ইচ্ছামত ক্রয় করা যাইত। খাদ্যদ্রব্য

অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি

জামাকাপড় ঔষধপত্র গাড়ীঘোড়া কোন কিছুরই যোগান অপ্রচুর বলিয়া মনে হইত না। লোকে কথায় বলিত, পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়—অর্থাৎ সব জিনিসই যথেষ্ট পরিমাণে মিলে। এইভাবে যখন

আমাদের নিকট জিনিসপত্র প্রচুর বলিয়া মনে হইত তখনই অর্থবিদ্যাবিদগণ বলিতেন, উহাদের যোগান অপ্রচুর। ইহা দ্বারা তাঁহারা বলিতে চাহিতেন যে জিনিসপত্র চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর।

জিনিসপত্র যে চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর তাহা আমরাও ভালভাবে বুঝিতে পারি ঐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন হাতে টাকা থাকিলেও অনেক জিনিসপত্র ইচ্ছামত ক্রয় করিতে পারিতাম না। চাউল-গম-চিনির জন্য আমাদিগকে কণ্ট্রোলের দোকানে লাইন দিতে হইত, কুপনের বদলে কণ্ট্রোলের ধুতিশাড়ী যোগাড় করিতে হইত, ঔষধ যোগাড় করিতে নানা দোকান ঘুরিতে হইত, ইত্যাদি।

বর্তমানে আমরা এই অবস্থা হইতে অনেকটা মুক্ত হইলেও বেশ কিছুটা যে অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থবিদ্যাবিদগণ অবশ্য বলেন, আমরা পূর্বের মতই অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি এবং চিরকালই থাকিব; এই অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিনই মিটিবে না—মিটিতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিন মিটিতে পারে না। কারণ, মানুষের অভাব সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান, কিন্তু অভাবমোচনের উপকরণগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। কিভাবে এই সীমাবদ্ধ উপকরণগুলিকে কাজে লাগাইয়া সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তিসাধন করা যায়, তাহাই আমাদের সমস্যা—আমাদের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাই আধুনিক অর্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে।

অপ্রাচুর্যের সমস্যা চিরন্তন

অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে যথাসম্ভব সুপ্রচুর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি (make them less scarce)। অর্থবিদ্যায় ইহাকে ব্যয়সংক্ষেপ করা (economising) বলা হয়। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য আমরা যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করি তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল নির্বাচন (choice)।

বস্তুত, অপ্রাচুর্যের সমস্যা হইতেই যে নির্বাচনের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে তাহা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি করা যায় : বর্তমান দিনে আমরা অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের মাধ্যমেই অভাবমোচনের প্রচেষ্টা করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রয়োজনমত উপার্জন করিতে পারি না বলিয়া ব্যয় সম্বন্ধে আমাদিগকে পদে পদে বিচার বা নির্বাচন করিয়া চলিতে হয়। যেমন, যে দরিদ্র ছাত্রের পিতা একই মাসে পুস্তক ও পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিতে পারেন না, তাঁহাকে পুস্তক ও পরিচ্ছদের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়—দেখিতে হয় যে ঐ মাসে কোনটি অধিক প্রয়োজনীয়। মাত্র ব্যক্তি নহে, জাতিকেও সর্বদা ঐরূপ বিচার করিতে হয়। কারণ, ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও সংগতি বা অভাবমোচনের উপকরণগুলি সীমাবদ্ধ

এই সমস্যা হইতে নির্বাচন-সমস্যা

উদাহরণস্বরূপ, জাতির পক্ষে হয়ত একটি যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ ও একটি নূতন রেলপথ খোলা—উভয়ই প্রয়োজনীয়; কিন্তু অর্থে না কুলাইলে জাতিকে উভয়ের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়।

আবার অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে নহে, অর্থোপার্জনের বেলাতেও আমাদিগকে এইরূপ হিসাব করিয়া চলিতে হয়। আমাদের সময় ও সামর্থ্য অপ্রচুর বলিয়া উহাদিগকে এমনভাবে নিয়োগ করিতে হয় যাহাতে উপার্জন সর্বাধিক হয়। অনুরূপভাবে জাতিকেও দেখিতে হয় যে সীমাবদ্ধ উপকরণগুলিকে কিভাবে নিয়োগ করিলে সর্বাধিক জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

এইভাবে অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন' এবং উহাদের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাসমূহই আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত বিনিময় (exchange) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা যোগ না করিলে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর বর্ণনা পূর্ণাংগ হয় না। কারণ, বর্তমান দিনে আমরা বিনিময়ের মাধ্যমেই অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করিয়া থাকি, নির্বাচনকার্য সম্পাদন করিয়া থাকি।

অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন এবং উহাদের সম্পর্কিত সমস্যাসমূহই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু

অবশ্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এমন অনেক সেবামূলক কার্য (services) আছে যাহা আমাদের বিশেষ অভাবমোচন করিলেও বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত নহে। যেমন, পিতামাতা বা পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের স্নেহযত্ন, ইত্যাদি। অর্থবিদ্যায় অবশ্য এগুলিকে লইয়া আলোচনা করা হয় না। কারণ প্রথমত, এগুলির পরিমাপ করা যায় না এবং দ্বিতীয়ত, এগুলির ফলে কোন সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব ঘটে না। অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান পরিমেয় (measurable) বস্তু লইয়াই কারবার করে। অর্থবিদ্যায় এই পরিমাপ করা হয় টাকাকড়ির অংকে। পিতামাতার স্নেহযত্ন ইত্যাদির জন্য কোন অর্থমূল্য দেওয়া হয় না বলিয়া অর্থ-বিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে এগুলি অপরিমেয়, এবং ফলে আলোচনা-বহির্ভূত। উপরন্তু, আমার পিতামাতা আমাকে সেবাযত্ন করিলেন কি না, তাহাতে সমাজের কিছু যায় আসে না। যাহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি হয় না, সেরূপ কোন ব্যাপার অর্থবিদ্যার ন্যায় সামাজিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং এই কারণেও বিনিময়ের সহিত সম্পর্করহিত এই সকল সেবামূলক কার্যকে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর বহির্ভূত রাখা হয়।

ইহাদের সহিত আবার বিনিময় ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহও জড়িত

অতএব, সামাজিক শাস্ত্র অর্থবিদ্যায় মানুষের অভাবমোচনের সেই সকল প্রচেষ্টার আলোচনাই করা হয় যাহা প্রথমত নির্বাচন ও দ্বিতীয়ত বিনিময়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দিক দিয়া অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে: অপ্রচুর

অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা

উপকরণ দ্বারা সীমাহীন অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য মানুষ নির্বাচন ও বিনিময়ের মাধ্যমে যে-সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে, তাহাদের পর্যালোচনাকেই অর্থবিদ্যা বলে।

অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of Economics) : বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। দেখা যায় যে অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি বিভিন্ন দিক দিয়া সীমাবদ্ধ। প্রথমত, অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। সুতরাং, ইহা মাত্র সমাজভুক্ত লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে। সমাজের বাহিরে যাহারা বাস করে তাহাদের কাজকর্ম অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। কারণ, তাহাদের কাজকর্মের ফলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় না। সমাজে যদি কিছু লোক খাদ্য মজুত করে তবে খাদ্যের দাম চড়িয়া গিয়া খাদ্য-সমস্যার উদ্ভব হয়; বিপরীত দিকে সমাজভুক্ত কিছু কৃষক যদি অধিক উৎপাদন করে তবে যোগান বাড়িয়া খাদ্যশস্যের দাম কমিয়া যায়। কিন্তু রবিনসন ক্রুসোর মত কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যদি খাদ্য মজুত করে তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না; আবার রবিনসন ক্রুসো অধিক খাদ্য উৎপাদন করিলে সমাজের কোন লাভও হয় না। যে-সকল কাজকর্মের ফলাফল ব্যক্তি নিজেই ভোগ করে, যাহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি হয় না তাহা সামাজিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। এই কারণে সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির কাজকর্ম অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুভুক্ত হয় নাই।

পরিধির সীমাবদ্ধতা :

১। অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে

দ্বিতীয়ত, আবার সমাজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনের সকল প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে। আমাদের অনেক অভাব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সেবাযত্নের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। এগুলি অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে, কারণ ইহাদের পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। পরিমাপ করিবার উপায় নাই বলিয়া শৃংখলিতভাবে ইহাদের আলোচনা করা যায় না। শৃংখলিতভাবে যাহার আলোচনা করা যায় না, তাহা কোন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না।

২। অর্থবিদ্যা টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্মেরই আলোচনা করে

সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞান অর্থবিদ্যায় অভাবমোচনের প্রচেষ্টায় রত মানুষের সেই সকল কাজকর্মেরই আলোচনা করা হয় যাহা পরিমেয়। এই পরিমাপ করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। অতএব, যে-সকল কাজকর্মের সহিত টাকাকড়ির সম্পর্ক আছে অর্থবিদ্যায় মাত্র তাহাদেরই আলোচনা করা হয়।

৩। অর্থবিদ্যা অভাবমোচনের সমস্যার পর্যালোচনা করে

তৃতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে অর্থবিদ্যায় টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্মের আলোচনা করা হইলেও মূলত করা হয় সমস্যার পর্যালোচনা।

এই সমস্যা হইল অপ্রচুর উপকরণগুলির সাহায্যে সীমাহীন অভাবমোচনের সমস্যা। সংক্ষেপে ইহাকে অর্থনৈতিক সমস্যা (economic problem) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে অপ্রাচুর্য। অপ্রাচুর্য হইতেই নির্বাচন এবং বিনিময়ের প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহ আসিয়া পড়ে। অতএব বলা যাইতে পারে, অপ্রাচুর্য ও তৎপ্রসূত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।*

পরিধির বিস্তৃতি

অপরদিকে কিন্তু সমস্যার পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়; সমস্যার সমাধানকল্পেও অর্থবিদ্যার আলোচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যবহারিক শাস্ত্র (applied science) হিসাবে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু হইয়াছিল। এই প্রসংগে একজন লেখক বলিয়াছেন যে অর্থবিদ্যাবিদ শুধু রোগ নির্ণয় করেন না, রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থাও করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থবিদ্যাবিদ শুধু জিনিসপত্রের দাম কেন বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, কিভাবে দামবৃদ্ধি রোধ করা যায় তাহারও নির্দেশ দিয়া থাকেন। অতএব, অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক (light-bearing) ও ফলপ্রদায়ী (fruit-bearing) উভয় প্রকার শাস্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। উহা অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি কি তাহা ব্যাখ্যা করে, আবার কিভাবে ঐ সমস্যার সমাধান করা যায় তাহারও নির্দেশ দেয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের মতে, এই নির্দেশ প্রদানের কার্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থবিদ্যা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিয়া মানুষের কল্যাণবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। এইখানেই অর্থবিদ্যা আলোচনার সার্থকতা এবং এই কারণেই অর্থবিদ্যার আলোচনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

কল্যাণের পথনির্দেশই অর্থবিদ্যা আলোচনার উদ্দেশ্য

অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী (Economic System and its Functions) :

বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই রাষ্ট্রশক্তি মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এই দেশে আমরা ইচ্ছামত মদের দোকান খুলিয়া, বাস-ট্যাক্সি চালাইয়া, বিদেশ হইতে মালপত্র আমদানি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারি না। ইহাদের জন্য সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। উপরন্তু, সমাজবদ্ধ লোক সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। যেমন, কৃষক দেখে যে দেশে গম না চাউলের চাহিদা বেশী। যাহার চাহিদা বেশী সাধারণত সে সেই

অর্থ-ব্যবস্থা কাহাকে বলে

* "Economics is fundamentally a study of scarcity and of the problems to which scarcity gives rise."

শস্য উৎপাদনেই মনোযোগী হয়। এইভাবে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে একটা শৃংখলা দেখা যায়। এইরূপ শৃংখলিত কাজকর্মকেই সংক্ষেপে 'অর্থ-ব্যবস্থা' (economic system) বলা হয়।

অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী প্রধানত পাঁচটি :

অর্থ-ব্যবস্থার পাঁচটি কার্য

(১) অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রথমেই নির্ধারণ করিতে হয় যে, কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে।

(২) উহাকে দেখিতে হয় যে উৎপাদনের উপাদানগুলি কিভাবে বণ্টন করিলে সর্বাধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয়। যেমন, জমিতে গৃহনির্মাণ ও শস্য উৎপাদন উভয়ই করা যাইতে পারে। কোন্‌টি করা হইবে তাহা সমাজকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

(৩) কোন ভোগ্যদ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে সমাজকে উহার ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে দেশে খাদ্যে ঘাটতি পড়িলে রেশনিং প্রথা চালু করিতে হয়, ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলিতে হয়, ইত্যাদি।

(৪) ইহার পর আসে আয় (income) বণ্টনের সমস্যা। যে-কোন প্রকার উৎপাদনকার্যেই নানা শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করে। যেমন, কলকারখানায় উৎপাদনে ধনীরা যোগায় মূলধন এবং শ্রমিকরা যোগায় শ্রম। এখন কারখানায় যে আয় হইল তাহার মধ্যে মূলধন-মালিক কতটা পাইবে আর শ্রমিকরা কত পাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থ-ব্যবস্থার ইহাও অন্যতম কার্য।

(৫) ইহা ছাড়াও আর একটি সমস্যা আছে। ইহা হইল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সমস্যা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে (economic condition) বজায় রাখিতে হইবে এবং সকল সময় উহার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক কাজকর্মকে 'অল্পবিস্তর' নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা যদি 'অল্প' হয় তবে ঐ-রূপ অর্থ-ব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (unplanned economy) বলা যায়। অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্যকরূপে সম্পাদিত হয় না। দেখা যায়, অনেক অকাম্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, ঘাটতির সময় সকলে প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্য পাইতেছে না, শ্রমিক উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও দুইবেলা অন্ন জুটাইতে পারিতেছে না, অর্থনৈতিক অবস্থাও ঠিকমত বজায় থাকিতেছে না বা উন্নয়নের পথে চলিতেছে না। এইজন্য বর্তমান দিনে ঝোঁক দেখা দিয়াছে 'অধিক' নিয়ন্ত্রণের প্রতি। অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (planned economy) বলে। ইহাতে পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসারে লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্যকভাবে সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয়।

অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা

ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থা অন্যতম পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। শিল্পবাণিজ্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার পরিচালনাধীনে থাকে বলিয়া এই ধরনের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (mixed economy) বলা হয়। এ-সম্বন্ধে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রসংগে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

বিষয়বস্তু : আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা, বাঁচিয়া থাকার সমস্যা লইয়াই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। এই সমস্যার উদ্ভব হয় অপ্রাচুর্য হইতে এবং ইহার সহিত 'নির্বাচন' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং বলা হয়, 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ : অপ্রাচুর্য শুধু যে মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা তাহাই নহে, ইহা চিরন্তন সমস্যাও বটে—ইহা কোনদিনই মিটিতে পারে না, কারণ মানুষের অভাব সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান, কিন্তু অভাবমোচনের উপকরণগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ।

অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদিগকে পদে পদে নির্বাচন করিতে হয়। এইজন্যই 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব' অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু বর্তমান দিনে অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা ও নির্বাচন কার্য সম্পাদন—উভয়ই করা হয় বিনিময় বা অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের মাধ্যমে। সুতরাং 'বিনিময়'কেও অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ সংজ্ঞায় ইহাই করা হয়। এইরূপ পূর্ণাংগ সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে : অপ্রচুর উপকরণ দ্বারা সীমাহীন অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য মানুষ নির্বাচন ও বিনিময়ের মাধ্যমে যে-সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে, তাহাদের পর্যালোচনাকেই অর্থবিদ্যা বলে।

আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি : অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি নানা দিক দিয়া সীমাবদ্ধ—১। অর্থবিদ্যা মাত্র সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে; ২। ইহা টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে; এবং ৩। ইহা অভাবমোচনের অপ্রচুর উপকরণগুলি লইয়াই আলোচনা করে। সংক্ষেপে বলা যায়, অপ্রাচুর্যের দিক হইতে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অপরদিকে অর্থবিদ্যা শুধু সমস্যার পর্যালোচনাই করে না, সমস্যা সমাধানেরও ইংগিত দেয়। সুতরাং অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক ও ফলপ্রদায়ী উভয় শাস্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে এইরূপ ফলপ্রদায়ী শাস্ত্র হিসাবেই, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথনির্দেশক হিসাবেই অর্থবিদ্যার চর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী : রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া এবং সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজবদ্ধ লোক অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। এইরূপ শৃংখলিত কাজকর্মকে সংক্ষেপে অর্থ-ব্যবস্থা বলা হয়।

অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী প্রধানত পাঁচটি : ১। কোন কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ধারণ করা; ২। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করা; ৩। অপ্রচুর ভোগ্যদ্রব্যের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা; ৪। আয়ের বণ্টন করা; ৫। অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও উহার উন্নয়ন সাধন করা।

অর্থ-ব্যবস্থা (ক) অপরিকল্পিত ও (খ) পরিকল্পিত—এই দুই রকমের হয়। ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। এইরূপ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগে পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain clearly the subject matter of Economics.

সুস্পষ্টভাবে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা কর।

2. How would you define Economics? Give reasons for your answer.

কিভাবে অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত: 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব'ই আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া অভিহিত। কিন্তু ইহার সহিত বিনিময় যোগ না করিলে বিষয়বস্তুর বর্ণনা পূর্ণাংগ হয় না। অতএব, অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিময়—এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতেই অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা প্রদান করা প্রয়োজন।...(১-৫ পৃষ্ঠা)]

3. Discuss the scope of Economics.

অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

4. What is an Economic System? What are its functions?

অর্থ-ব্যবস্থা কাহাকে বলে? ইহার কার্যাবলী কি কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতকগুলি মৌলিক ধারণা

(Some Fundamental Concepts)

বর্ণপরিচয় না করিয়া যেমন কোন ভাষা শিক্ষা করা চলে না, তেমনি মৌলিক ধারণাগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে না বুঝিয়া কোন বিজ্ঞান বা শাস্ত্রও চর্চা করা যায় না। অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান বলিয়া আলোচনার সুরুতেই কতকগুলি মৌলিক ধারণার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্রব্য (Goods): মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, এবং অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের এই কর্মপ্রচেষ্টা। এখন প্রশ্ন, 'দ্রব্য' বলিতে কি বুঝায়?

দ্রব্য কাহাকে বলে

সংক্ষেপে বলা যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য। ইহা 'বস্তুগত' (material) এবং 'অ-বস্তুগত' (non-material) উভয়ই হইতে পারে। চালডাল, তরিতরকারি, ঘরবাড়ী, বইপত্র, আলোবাতাস প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ। অপরপক্ষে ব্যবসায়ীর দক্ষতা, ডাক্তার গায়ক মিস্ত্রী প্রভৃতির পেশাগত কর্মকুশলতা, ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill) ইত্যাদি হইল অ-বস্তুগত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার যখন চিকিৎসা করেন, শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করেন, গায়ক যখন সুকণ্ঠ সংগীতের দ্বারা লোককে আনন্দ দান করেন তখন ঐরূপ কার্যকে অর্থবিদ্যার ভাষায় 'সেবা' (service) বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য:
১। বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য

দ্রব্যাদিকে অন্যভাবে 'বাহ্যিক' (external) ও 'আভ্যন্তরীণ' (internal) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, আলোবাতাস, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি হইল মানুষের বাহিরের জিনিস; কিন্তু ব্যবসায়ীর দক্ষতা, গায়কের গান গাহিবার কুশলতা, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের দক্ষতা প্রভৃতি মানুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং ইহাদিগকে আভ্যন্তরীণ দ্রব্য বলা হয়।

২। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য

আবার দ্রব্যাদি 'হস্তান্তরযোগ্য' (transferable) অথবা 'হস্তান্তরযোগ্যতা-হীন' (non-transferable) হইতে পারে। ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার, ধানচাল, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যায়। ইহাদের বলা হয় হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য। কিন্তু কোন লোকের ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন, গায়কের সুকণ্ঠ, খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য, চিকিৎসকের দক্ষতা ইত্যাদি, একজন অপরকে দিতে অথবা বিক্রয় করিতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন স্থানের আলোবাতাস স্বাস্থ্যকে অন্য এক স্থানে লইয়া আসা যায় না।

৩। হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন দ্রব্য

'অবাধলভ্য' (free) ও 'অর্থনৈতিক' (economic) এইভাবেও দ্রব্যসমূহের আর এক শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবাধলভ্য দ্রব্য হইল সেইগুলি যেগুলি প্রকৃতি এত প্রচুর পরিমাণে দিয়াছে যে উহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারে কোন বাধা নাই। প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস, অরণ্যে কাষ্ঠ, মরুভূমিতে বালুকা, নদীতে জল প্রভৃতি অবাধলভ্য দ্রব্যের দৃষ্টান্ত। ইহাদের সম্পর্কে হিসাব করিয়া ব্যবহার করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই অবাধলভ্য নয়। অধিকাংশ দ্রব্যেরই সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল অপ্রচুর (scarce) দ্রব্যকেই অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic goods) বলা হয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্য অবাধলভ্য বা অর্থনৈতিক দ্রব্য কি না তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে। নদীতীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কারণ চাহিদার তুলনায় প্রচুর বলিয়া উহার জন্য কাহাকেও দাম দিতে হয় না; কিন্তু যখন কলিকাতার মত সহরাঞ্চলে নদী হইতে গৃহে গৃহে ঐ জল সরবরাহ করা হয় তখন উহা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্রব্য হিসাবে জলের এই পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের প্রচেষ্টা (human effort) বা পরিশ্রম। অর্থাৎ, পরিশ্রমই অবাধলভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্যে পরিণত করে।

৪। অবাধলভ্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য

অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সংক্ষেপে 'সম্পদ' (wealth) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সম্পদ

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আবার দ্রব্যসমূহকে 'ভোগ্যদ্রব্য' (consumers' or consumption goods) এবং 'মূলধন দ্রব্য' (producers' or production or

capital goods) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যে-সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাব বা আকাংক্ষা মিটায় তাহাদের বলা হয় ভোগ্যদ্রব্য। যেমন, চালডাল জামাকাপড় ঘরবাড়ী ইত্যাদি। মূলধন-দ্রব্য হইল সেগুলি যাহা অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের চাহিদা মিটায়। যেমন, কলকারখানা যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যক্ষ ভোগের দ্রব্য হইল ভোগ্যদ্রব্য আর উৎপাদনের জন্য উৎপাদকের হাতে যে-দ্রব্য থাকে তাহা হইল মূলধন-দ্রব্য। তবে একই দ্রব্য এক অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্য এবং অন্য অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য হইতে পারে। যখন আমরা বাড়ীর রান্নাবান্নার জন্য কয়লা ব্যবহার করি তখন কয়লা ভোগ্যদ্রব্য, কিন্তু কারখানায় যে-কয়লা ব্যবহার করা হয় তাহা মূলধন-দ্রব্য, কারণ উহাকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে। সুতরাং কোন দ্রব্য মূলধন-দ্রব্য না ভোগ্যদ্রব্য তাহা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

৫। ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন-দ্রব্য

স্থায়িত্ব অনুসারেও দ্রব্যাদিকে 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' (single-use goods) এবং 'স্থায়ী দ্রব্য' (durable goods) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে-সকল দ্রব্য একবার মাত্র ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাদিগকে একবার ব্যবহার্য দ্রব্য বলা হয়। যেমন, যে-কয়লা একবার পোড়ানো হইল তাহাকে দ্বিতীয়বার আর পোড়ানো চলে না, যে-লেবুটি একবার খাওয়া হইল তাহা আর দ্বিতীয়বার খাওয়া যায় না। অপরদিকে এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের একাধিকবার ব্যবহার করা চলে—যেমন, যে-কলমটি দিয়া আমি লিখিতেছি তাহা দিয়া একবার লিখিলেই তাহার ব্যবহার শেষ হয় না—একই কলম দ্বারা বেশ কিছুদিন লেখা চলে। কারখানায় যে-সকল যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদন করা হয় তাহা একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য। এই ধরনের একাধিকবার ব্যবহার্য দ্রব্যকে স্থায়ী দ্রব্য বলা হয়।

৬। 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' এবং 'স্থায়ী দ্রব্য'

উপযোগ (Utility) ঃ অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' বলিতে অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, উপযোগ হইল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন দ্রব্যের তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতাই উপযোগ, দ্রব্যটি উপযোগ নহে। যে-কলম দিয়া আমি লিখি সেই কলমটি উপযোগ নহে, আমার লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে-ক্ষমতা তাহাই উপযোগ। লেখায় সহায়তা করে বলিয়াই আমি কলমের আকাংক্ষা করি। এইজন্য উপযোগকে আকাংক্ষা বা কাম্যতা (desiredness) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অভাব মিটাইবার ক্ষমতাই উপযোগ

অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করিবার সময় দুইটি বিষয় মনে

রাখিতে হইবে। প্রথমত, উপযোগ শব্দটির সহিত কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। নীতির দিক দিয়া ভাল হউক বা মন্দ হউক, কোন দ্রব্যের জন্য মানুষের আকাংক্ষা থাকিলেই ঐ দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আকাংক্ষা উঁচুদরের বা নীচুদরের, অথবা দ্রব্যটি উপকারী না ক্ষতিকারক তাহা আমাদের দেখিবার কথা নয়। দুগ্ধ উপকারী এবং মদ্য ক্ষতিকারক। কিন্তু দুগ্ধের যেমন আমাদের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে, মদ্যপায়ীর নিকট মদেরও সে-ক্ষমতা আছে। সুতরাং উভয়েরই উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে।

উপযোগের সহিত নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই

দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) ও মানসিক (subjective) ধারণা। কোন দ্রব্য হয়ত একজনের আকাংক্ষা তৃপ্তি করিতে পারে, অপর একজনের পারে না। যেমন, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একজনের জল হইলেই চলিতে পারে, অপর একজনের কিন্তু লেমনেডের প্রয়োজন হয়; অথবা আহারের জন্য কেহ কেহ ভাত, আবার কেহ কেহ রুটি পছন্দ করে। এইভাবে একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির আকাংক্ষা সমানভাবে পূরণ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া সময়ের ব্যবধানে কোন জিনিসের জন্য একই ব্যক্তির আকাংক্ষার তারতম্য দেখা যায়। যেমন, তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা খুব তীব্র থাকে, কিন্তু জলপানের পর তৃষ্ণা মিটিলে সাময়িকভাবে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা আর থাকে না। সুতরাং দ্রব্যের উপযোগ বা পরিতৃপ্তি-দানের ক্ষমতা সকল সময় সকল অবস্থায় সকলের নিকট সমান নহে।

উপযোগ অন্যতম আপেক্ষিক ও মানসিক ধারণা

উপযোগের প্রকারভেদ (Different Kinds of Utility) : মোটামুটি-ভাবে উপযোগ পাঁচ প্রকারের হইতে পারে :

(১) স্বাভাবিক উপযোগ (Elementary or Natural Utility): প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের যে উপযোগ থাকে তাহাকে 'স্বাভাবিক' উপযোগ বলা হয়। যেমন, আমাদের কাছে প্রকৃতিদত্ত আলো-বাতাস-জলের যে উপযোগ আছে তাহা স্বাভাবিক উপযোগ।

(২) রূপগত উপযোগ (Form Utility): কোন দ্রব্যের রূপান্তর ঘটাইয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। এই প্রকারের উপযোগকে 'রূপগত' উপযোগ বলা হয়। কাঠ হইতে ছুতার-মিস্ত্রী যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি আসবাবপত্র তৈয়ারি করে তখন সে কাঠকে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার যখন তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারি করা হয় তখন তুলাকে নূতন রূপ দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে নূতন রূপ দেওয়ার ফলে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাহাই রূপগত উপযোগ।

(৩) স্থানগত উপযোগ (Place Utility): একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করিয়া কোন দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি করা যায়। যেমন, খনি হইতে কয়লা নগরাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করিয়া কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়; অথবা দার্জিলিং হইতে কমলালেবু কলিকাতায় চালান দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়।

(৪) সময়গত উপযোগ (Time Utility) : এক সময় হয়ত কোন জিনিসের জন্য মানুষের আকাংক্ষা কম, অন্য সময় উহার জন্য আকাংক্ষা অধিক। সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যের উপযোগ বাড়িয়া যাইতে পারে। পূজার সময় ছেলেমেয়েদের নূতন জামাকাপড়ের যে-আকাংক্ষা থাকে, অন্য সময় তাহা থাকে না। অর্থাৎ, পূজার সময় জামাকাপড়ের উপযোগ বাড়িয়া যায়। সুতরাং যে-সময় যে-দ্রব্য আকাংক্ষিত হয় সে-সময় সেই দ্রব্যের যোগান দিয়া সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

(৫) সেবাগত উপযোগ (Service Utility): কতকগুলি দ্রব্য বস্তুর আকার ধারণ না করিয়া সরাসরি আমাদের আকাংক্ষা পরিতৃপ্ত করে। ইহাদের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা বা উপযোগকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, চিকিৎসকের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষাদান, ভৃত্যের পরিচর্যা ইত্যাদি।

সম্পদ (Wealth): অর্থবিদ্যায় সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সম্পদ বলিতে সেই সকল বস্তুগত দ্রব্যকে বুঝায় যাহাদের বিনিময়-মূল্য আছে—অর্থাৎ, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়। এখন কোন বস্তুগত দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য থাকিতে হইলে উহাকে নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে:

সম্পদ কাহাকে বলে

(১) উহার উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিবে; (২) উহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর (scarce) হইবে; এবং (৩) উহা বিক্রয়যোগ্য (marketable) হইবে। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য:

প্রথমত, ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, উপযোগ না থাকিলে কোন জিনিসের বিনিময়-মূল্য থাকিতে পারে না। যাহার অভাবমোচন বা আকাংক্ষাপূরণের ক্ষমতা নাই তাহা কেহই চাহিবে না, টাকা দিয়া ক্রয় করা ত দূরের কথা। সুতরাং সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে প্রথমেই বস্তুটির পক্ষে উপযোগ থাকা প্রয়োজন।

১। উপযোগ

দ্বিতীয়ত, মাত্র উপযোগ থাকিলেই কোন জিনিস সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল দ্রব্য অবাধলভ্য, যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় তাহাদের বিনিময়ে কেহ কোন মূল্য দেয় না। আমরা নিত্য যে প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস ভোগ করি তাহা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের যোগান

২। অপ্রাচুর্য

এতই প্রচুর যে ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। বিনামূল্যেই ইহাদের আমরা ভোগ করিয়া থাকি। অনুরূপভাবে নদীতীরে চাহিদার তুলনায় জলের যোগান এতই প্রচুর যে জল বেচাকেনার কথা কেহ চিন্তাই করে না। সুতরাং অবাধলভ্য দ্রব্যাদি সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে যাহা এক অবস্থায় অবাধলভ্য তাহা অন্য অবস্থায় চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইতে পারে; ফলে উহার জন্য দাম দিতে হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নদীর তীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কিন্তু সহরে বাড়ীতে বাড়ীতে করপোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি যে-জল সরবরাহ করে তাহা অবাধলভ্য নয়; ইহার জন্য নগরবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। সুতরাং এই অবস্থায় জল সম্পদের পর্যায়ে পড়ে। বায়ুর ক্ষেত্রে অনুরূপ উক্তি খাটে। প্রকৃতিদত্ত বায়ু আমরা অবাধে ও বিনামূল্যে শ্বাসপ্রশ্বাসে লই; কিন্তু সিনেমাগৃহে যখন কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় তখন উহার জন্য সিনেমা-মালিককে অর্থব্যয় করিতে হয় এবং ঐ খরচ দর্শকদের নিকট হইতে সিনেমা-টিকিটের দামের মধ্য দিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। এ-ক্ষেত্রে বায়ুও অপ্রচুর সামগ্রী এবং সম্পদের পর্যাযভুক্ত। সুতরাং কোন দ্রব্য সম্পদ কি না তাহা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ কি না। সীমাবদ্ধ না হইলে উহা সম্পদের পর্যায়ে পড়িবে না।

এক অবস্থায় যে-দ্রব্য সুপ্রচুর অন্য অবস্থায় তাহা অপ্রচুর হইতে পারে

তৃতীয়ত, আবার উপযোগ থাকিলে এবং সীমাবদ্ধ হইলেই কোন দ্রব্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। উপযোগ ও সীমাবদ্ধতা ছাড়াও দ্রব্যটির আর একটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। দ্রব্যটিকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ, দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয়ের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

৩। বিক্রয়যোগ্যতা

বিক্রয়যোগ্য হইতে হইলে দ্রব্যের পক্ষে আবার হস্তান্তরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। যেমন, ঘরবাড়ী চালডাল পোশাকপরিচ্ছদ বইপত্র ইত্যাদি একজন আর একজনের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং ইহারা বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য। 'হস্তান্তর' শব্দটির দ্বারা মালিকানার হস্তান্তরই বুঝায়, স্থানান্তর বুঝায় না। যেমন, যখন জমি বা বাড়ী বিক্রয় করা হয় তখন উহা একস্থান হইতে অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত হয় না। জমি বা বাড়ীর মালিকানা একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র। হস্তান্তর করা যায় না বলিয়াই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাসের সার্টিফিকেট বা চিকিৎসকের পারদর্শিতা সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না।

বিক্রয়যোগ্য হওয়ার জন্য হস্তান্তরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন

হস্তান্তর বলিতে মালিকানার হস্তান্তর বুঝায়

অতএব, যে-সকল দ্রব্য হস্তান্তর করা যায় না এবং বিক্রয়যোগ্য নয় সে-সকল দ্রব্যকে সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয় না। যেমন, মানুষের স্বাস্থ্য, গায়ক-গায়িকার সংগীতনৈপুণ্য, চিকিৎসকের পারদর্শিতা, শিল্পীর শিল্পকৌশল প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপযোগ আছে এবং উহাদের যোগানও অপ্রচুর; কিন্তু এই জিনিসগুলি একজন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না বলিয়া উহারা সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, চলতি কথায় আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্যকে অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না; সুতরাং অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়

দেখা গেল, কোন দ্রব্য সম্পদ হইতে হইলে উহাকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে। কিন্তু বিক্রয়যোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে উহাকে বাস্তবিকপক্ষে বিক্রয় করিতে হইবে। সমাজের এমন সকল সাধারণ সম্পদ আছে—যথা, রাস্তাঘাট পুল রেলপথ উদ্যান স্কুলকলেজ চিড়িয়াখানা ইত্যাদি যাহা ক্রয়বিক্রয় করা হয় না। তবুও এগুলি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

পরিশেষে, 'সম্পদ' শব্দটি বস্তুগত দ্রব্যকে (material goods) বুঝাইতেই ব্যবহার করা হয়। অনেকে অবশ্য অ-বস্তুগত দ্রব্যকেও সম্পদ বলিয়া অভিহিত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু এইরূপ করায় অসুবিধা আছে।

সম্পদ বলিতে বস্তুগত দ্রব্যই বুঝায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সম্পদ হইতে গেলে দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে। অ-বস্তুগত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া উহারা সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না। উপরন্তু, অ-বস্তুগত দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করিলে সম্পদ পরিমাপ করিবার ব্যাপারেও অসুবিধা দেখা যায়। সম্পদ হইল কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে (at a certain point in time) অবস্থিত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টি (a stock of marketable goods)। ডাক্তারের সেবা, উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান, বাস-কণ্ডাক্টরের কার্য, অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় আমাদের অভাবপূরণ করে সত্য। ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং বাজারে ইহাদের বিনিময়-মূল্যও আছে। কিন্তু ইহাদের উৎপাদন ও ভোগ একই সময় সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করিতেছে না। অতএব, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহাদের পরিমাণ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। এই কারণে আমরা অ-বস্তুগত সেবাকে সম্পদের পর্যায়ে ফেলিব না; সম্পদ বলিতে মাত্র নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই বুঝিব।

নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wealth):

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে 'ব্যক্তিগত সম্পদ' (individually owned

wealth) এবং 'সমষ্টিগত সম্পদ' (collectively owned wealth) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যে-সকল সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব থাকে তাহাদিগকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলা হয়—যেমন, ব্যক্তিবিশেষের ঘরবাড়ী, ধনসম্পত্তি, আসবাবপত্র, বই, কাপড় ইত্যাদি। অপরদিকে সাধারণে যে-সকল সম্পদের মালিক তাহাদিগকে সমষ্টিগত সম্পদ বলা হয়—যেমন, রাস্তাঘাট, পার্ক, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, জাতীয় লাইব্রেরী, সরকারী ঘরবাড়ী ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বর্তমান সময়ে সরকার অনেক ব্যবসায় ও শিল্প নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে—যেমন, রেলপথ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, সরকারী পরিবহণ ইত্যাদি। এগুলিও সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ।

ব্যক্তিগত সম্পদ

সমষ্টিগত সম্পদ

আবার 'জাতীয়' (national) বা 'সামাজিক' সম্পদ কথাটিও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা কোন সমাজ বা দেশের সমগ্র সম্পদকে বুঝায়। সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ লইয়াই এই জাতীয় বা সামাজিক সম্পদ। উদাহরণস্বরূপ, সকল ভারতবাসীর ব্যক্তিগত সম্পদ ও ভারত-রাষ্ট্রের সমষ্টিগত সম্পদ—উভয়ে মিলিযাই হইল ভারতের জাতীয় সম্পদ।

জাতীয় বা সামাজিক সম্পদ

জাতীয় সম্পদ পরিমাপ করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যখন তাহার নিজস্ব সম্পদের হিসাব করে তখন সে তাহার ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, গহনা, বই ইত্যাদি ছাড়াও কোম্পানীর শেয়ার, বণ্ড, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস সার্টিফিকেট), টাকাকড়ি (নোট ও মুদ্রা), অপরকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদিও তাহার সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যক্তি যে শেয়ার বণ্ড ঋণপত্রকে তাহার সম্পদ বলিয়া মনে করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, এই সকল কাগজপত্র বিক্রয় করিয়া সে যে-কোন সময় অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে। সম্পদের যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই কাগজপত্রের আছে। অর্থাৎ, ইহাদের উপযোগ আছে, ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য ও বিক্রয়যোগ্য এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্য। কিন্তু এই সকল কাগজপত্রের নিজস্ব কোন মূল্য নাই—ইহারা 'প্রকৃত সম্পদে'র মালিকানার নির্দেশক বলিয়াই মানুষ ইহাদের আকাংক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) শেয়ার ক্রয় করে তখন তাহার ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির আংশিক মালিকানা জন্মায়। তাহার

জাতীয় সম্পদের হিসাব কিভাবে করিতে হইবে

শেয়ারপত্র ঐ কোম্পানীর উপর তাহার আংশিক মালিকানা নির্দেশ করে বলিয়াই ব্যক্তির নিকট উহা মূল্যবান। কিন্তু সমাজের নিকট উহার কোন মূল্য নাই; এই শেয়ারপত্রের পিছনে কোম্পানীর যে-সম্পত্তি থাকে তাহাই আসলে সম্পদ। এই কারণে সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার বণ্ড প্রভৃতি সম্পদ বলিয়া গণ্য নহে; সম্পদ হইল ঐ প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি মালমসলা ইত্যাদি দ্রব্য।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার ইত্যাদি সম্পদ নহে

অনুরূপভাবে ব্যক্তির দিক হইতে সরকারী ঋণপত্র সম্পদ বিবেচিত হইলেও সমাজের দিক হইতে উহা সম্পদ নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার কর সংগ্রহের দ্বারা ঋণ পরিশোধ বা ঋণের উপর সুদ প্রদান করে। ইহার অর্থ হইল দেশের একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট অর্থ হস্তান্তরিত করা। আবার এক ব্যক্তি যখন অপর আর এক ব্যক্তিকে ঋণদান করে তখন ঐ ঋণপত্র সামাজিক দিক হইতে সম্পদ নয়—তবে ঐ ঋণের সাহায্যে প্রকৃত সম্পত্তি সৃষ্ট হইলে ঐ সম্পত্তি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হয়।

টাকাকড়ির ক্ষেত্রেও একই রকম যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত টাকাকড়ির মধ্যে নোট ও ধাতব মুদ্রা আছে। এইগুলি যে উপযোগসম্পন্ন, অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য এবং বস্তুগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজস্ব মূল্যের জন্য ইহাদের কেহ চাহে না; চাহে উহাদের দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলিয়া। অতএব টাকাকড়ি সম্পদের প্রতীক মাত্র, সম্পদ নহে। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধাতুটুকু মাত্র সম্পদ, তাহার বেশী নহে। টাকাকড়ি যদি দেশের বা সমাজের সম্পদ হইত তাহা হইলে যে-কোন দেশ মাত্র নোট ছাপাইয়াই সম্পদশালী হইতে পারিত; খাদ্যের উৎপাদন, শিল্পের প্রসার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি কোন প্রয়োজনই হইত না।

সামাজিক দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ নহে

জাতীয় সম্পদের হিসাবের সময় আমাদের আর এক বিষয়ও মনে রাখিতে হইবে। কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। নানাভাবে দেনাপাওনার সূত্রে এক দেশ অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্কিত। জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় দেশের নিকট বিদেশের পাওনাকে সমগ্র সম্পদ হইতে বাদ দিতে হইবে, আবার বিদেশের নিকট দেশের কোন পাওনা থাকিলে উহাকে দেশের সম্পদের সংগে যোগ করিতে হইবে।

জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় বিদেশের নিকট দেনাপাওনার হিসাব ধরিতে হইবে

উৎপাদন (Production) : মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে তাহার অভাবমোচনের বা ভোগের তাগিদ। প্রকৃতি আমাদের অনেক জিনিস দিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাবপূরণ করে। যেমন, প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস আমরা সরাসরি ভোগ

করিয়া থাকি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দান সরাসরি আমাদের অভাবমোচন করিতে পারে না। আমাদের অন্নবস্ত্র আসবাবপত্র বাড়ীঘর যানবাহন বইপত্র প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্যের অভাব আছে। প্রকৃতি এইগুলি সরাসরি মানুষের হাতে তুলিয়া দেয় না। এইজন্যই প্রয়োজন হয় উৎপাদনের। মানুষ প্রকৃতির দানকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার অভাব-আকাংক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপযোগী করিয়া তুলে। যেমন, প্রকৃতি বনজংগলে গাছপালা দিয়াছে। মানুষ নিজে পরিশ্রম করিয়া গাছপালা কাটিয়া কাঠ হইতে আসবাবপত্র তৈয়ারি করে। আবার প্রকৃতি অসংখ্য নদনদী দিয়াছে। মানুষ তাহার পরিশ্রম ও কলাকৌশলের সাহায্যে নদনদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে। প্রকৃতি জমি দিয়াছে। মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় ঐ জমি হইতে খাদ্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎপাদনের অর্থ হইল তৃপ্তিদান-ক্ষমতা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ উপযোগ-সৃষ্টিকেই (the creation of utility) অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলা হয়।

তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা উপযোগ-সৃষ্টিকেই অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলে

অনেক সময় উৎপাদনকে পদার্থ-সৃষ্টির অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ-ধারণা কিন্তু ভুল। মানুষ কোন নূতন পদার্থ সৃজন করিতে পারে না। সে প্রকৃতি-দত্ত পদার্থের কাম্যতা সৃষ্টি করিয়া আকাংক্ষা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে। যেমন, গাছ কাটিয়া তাহার কাঠ হইতে মানুষ যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করে তখন সে গাছের ও কাঠের কাম্যতা বা তৃপ্তিদান-ক্ষমতাই বৃদ্ধি করে।

উৎপাদন বলিতে পদার্থ সৃষ্টি বুঝায় না

আবার অনেকে আছেন যাহাদের মতে, উপযোগ-সৃষ্টি বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ না করিলে তাহাকে উৎপাদন বলা যায় না। এই মতানুসারে যাহারা খাদ্যবস্ত্র ঘরবাড়ী প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের শ্রম উৎপাদনশীল; কিন্তু শিক্ষক গায়ক বাদক ডাক্তার উকিল বিচারক অভিনেতা প্রভৃতির কার্য অনুৎপাদনশীল। কারণ, ইহাদের শ্রমের ফল কোন বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করে না এবং উহা উৎপাদনের সংগে সংগেই ধ্বংস বা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি হারমোনিয়াম তৈয়ারি করে সে যেমন মানুষের আকাংক্ষা মিটায় তেমনি যে-গায়ক ঐ হারমোনিয়ামের সাহায্যে গান করিয়া অর্থোপার্জন করে সেও মানুষকে পরিতৃপ্তি দান করে। সুতরাং হারমোনিয়াম-বাদকের শ্রমও উৎপাদনশীল।

উৎপাদনশীল শ্রম ও অনুৎপাদনশীল শ্রম

মোটকথা উপযোগ-সৃষ্টি মাত্রই উৎপাদন—তাহা এই উপযোগ সেবা বা বস্তুগত দ্রব্য যে কোন আকারেই সৃষ্ট হউক না কেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করিতে পারে—যেমন, রূপগত উপযোগ, স্থানগত উপযোগ, সময়গত

উপযোগ-সৃষ্টি মাত্রই উৎপাদন

উপযোগ ও সেবাগত উপযোগ। ইহার যে-কোনটির সৃজনকেই আমরা উৎপাদন বলিব।

ভোগ (Consumption): উৎপাদন বলিতে যেমন উপযোগের সৃষ্টি বুঝায়, তেমনি আকাংক্ষার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করিয়া উপযোগকে নিঃশেষ করাই হইল ভোগ। আমরা যেমন কোন পদার্থ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারি না তেমনি পদার্থকে ধ্বংস করিতে পারি না ; যাহা পারি তাহা হইল কোন দ্রব্যকে ব্যবহার করিয়া তাহার অভাবমোচনের ক্ষমতাকে শেষ করিয়া ফেলিতে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। যখন আমরা চেয়ার ক্রয় করি বা তৈয়ারি করাই তখন উহা বসিবার সুবিধার জন্যই করি। তারপর উহাকে ব্যবহার করিতে থাকি। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এক সময়ে ঐ চেয়ার ভাঙিয়া গিয়া কতকগুলি পুরাতন কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হয়। তখন আর উহা আমাদের বসিবার প্রয়োজন মিটাইতে পারে না—অর্থাৎ, উহার উপযোগ ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তেমনি আবার জামাকাপড় ব্যবহার করিতে করিতে এক সময় উহা অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সকল জিনিসের উপযোগই ধীরে ধীরে শেষ হয় না। অনেক দ্রব্য আছে যাহার উপযোগ একবার ব্যবহারের ফলেই শেষ হইয়া যায়; উহা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহারযোগ্য থাকে না। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন একটি কমলালেবু খায়, তখন কমলালেবুটির উপযোগ একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সেবামূলক কার্যের উপযোগ উৎপাদনের সংগে সংগেই শেষ হইয়া যায়।

আকাংক্ষা তৃপ্তির জন্য উপযোগের ধ্বংসই ভোগ

মূল্য ও দাম (Value and Price): 'মূল্য' শব্দটি সাধারণত দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, কোন কোন সময় জিনিসের 'ব্যবহার-মূল্য' (value-in-use) বুঝাইবার জন্য মূল্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, আমরা বলিয়া থাকি যে জল মানুষের জীবনের পক্ষে অতি মূল্যবান। ইহার অর্থ হইল, জলের ব্যবহার-মূল্য বা অভাবপূরণের ক্ষমতা অপরিসীম।

ব্যবহার-মূল্য

দ্বিতীয়ত, মূল্য শব্দটি 'বিনিময়-মূল্য' (value-in-exchange) বুঝাইবার জন্যও ব্যবহার করা হয়। বিনিময়-মূল্য বলিতে এক দ্রব্যের পরিবর্তে যে-পরিমাণ অপর একটি দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা বুঝায়। যেমন, এক কুইণ্টাল চাউলের বদলে যদি দুই কুইণ্টাল আটা বিনিময় করা যায়, তাহা হইলে এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য হইল দুই কুইণ্টাল আটা, আর এক কুইণ্টাল আটার মূল্য হইল অর্ধ-কুইণ্টাল চাউল। আবার চারিটি কুমড়ার বদলে যদি এক

কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তাহা হইলে একটি কুমড়ার মূল্য হইল ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল, আর এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের মূল্য হইল চারিটি কুমড়া। দ্রব্যের সংগে দ্রব্যের বিনিময়-হারকেই বিনিময়-মূল্য বলা হয়। অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থেই ব্যবহার করা হয় এবং 'ব্যবহার-মূল্য' বা পরিতৃপ্তিদানের ক্ষমতা 'উপযোগ' শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বিনিময়-মূল্য

কোন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অধিক হইলেই যে উহার বিনিময়-মূল্য অধিক হইবে এমন কোন কথা নাই। জলের ব্যবহার-মূল্য অত্যধিক হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। বিনিময়-মূল্যের জন্য ব্যবহার-মূল্যের সহিত থাকা চাই অপ্রাচুর্য এবং হস্তান্তরযোগ্যতা।

বিনিময়-মূল্য একমাত্র ব্যবহার-মূল্যের উপর নির্ভর করে না

বিনিময়-মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (price) বলা হয়—যেমন, এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা। দামের সহিত মূল্যের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একসংগে বাড়িতে পারে না। মূল্য হইল বিনিময়-হার—যথা, কুমড়া ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময়-হার। পূর্বে চারিটি কুমড়ার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইত; এখন যদি তিনটি কুমড়ার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তবে কুমড়ার মূল্য বাড়িল এবং সরিষার তৈলের মূল্য কমিল। কিন্তু কুমড়া ও সরিষার তৈল উভয়েরই দাম একসংগে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দাম কাহাকে বলে

সকল দাম একই সংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য পারে না

চাহিদা ও যোগান (Demand and Supply): চাহিদা ও যোগান অর্থবিদ্যার আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণা। অভাববোধ বা ভোগের আকাংক্ষা হইতেই চাহিদার উদ্ভব হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় আকাংক্ষা বা পাইবার ইচ্ছাকেই চাহিদা বলিয়া গণ্য করা হয় না। আমি একখানি মোটরগাড়ীর আকাংক্ষা করিতে পারি; কিন্তু আমার মোটরগাড়ী ক্রয়ের ক্ষমতা বা ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় না যে আমার মোটরগাড়ীর চাহিদা রহিয়াছে। অতএব, চাহিদা আকাংক্ষা ছাড়াও অন্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) ক্রয়ের ক্ষমতা এবং (২) ক্রয়ের ইচ্ছা।

ক্রয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা আবার দামের উপর নির্ভরশীল। কোন দ্রব্যের দাম বেশী হইলে উহা লোকের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে যাইতে পারে। অথবা ক্রয়ের ইচ্ছা অন্তর্হিত হইতে পারে। এইজন্য চাহিদা বলিতে বিশেষ দামে চাহিদার

পরিমাণ বুঝায়। বস্তুত, দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিয়া কিছু নাই। 'বাজারে মাছের চাহিদা কত?'—এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন। মাছের চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। ২ টাকা কিলোগ্রাম হইলে লোকে হয়ত ১০ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৫ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৪০ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে, ইত্যাদি। সুতরাং বিশেষ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে অর্থবিদ্যার ধারণা অনুসারে তাহাই ঐ জিনিসের চাহিদা।

চাহিদা বলিতে বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায়

অনুরূপভাবে অর্থবিদ্যায় যোগান বলিতে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতারা যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাকে বুঝায়। সাধারণ ভাষায় অবশ্য যোগান বলিতে মোট উৎপন্ন দ্রব্য বা মোট মজুত মালের পরিমাণ যে-কোনটিকে বুঝাইতে পারে। যেমন, অনেক সময় বলা যায় যে এই বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে গমের যোগান এত, বা দেশে এই সময় চাউলের যোগান এত। মোট উৎপন্ন দ্রব্য বা মোট মজুত মালের মধ্যে কতটা বিক্রেতারা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা দামের উপর নির্ভরশীল। দাম বেশী হইলে বেশী পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনীত হইবে, আর দাম কম হইলে যোগানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। অতএব, চাহিদার মত যোগানও দামের সহিত সম্পর্কিত এবং দাম-নিরপেক্ষ যোগান বলিয়া কিছু নাই।

যোগান বলিতেও বিশেষ দামে যোগানের পরিমাণ বুঝায়

সংক্ষিপ্তসার

কোন ভাষা শিক্ষার জন্য যেরূপ বর্ণপরিচয় প্রয়োজন, তেমনি কোন শাস্ত্র চর্চা করিবার জন্যও কতকগুলি মৌলিক ধারণা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণাসমূহের মধ্যে দ্রব্য (goods), উপযোগ (utility), সম্পদ (wealth), উৎপাদন (production), ভোগ (consumption), মূল্য ও দাম (value and price), চাহিদা ও যোগান (demand and supply)—এই কয়টিই প্রধান।

দ্রব্য: যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হয়—যথা, (ক) বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য, (খ) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য, (গ) হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন দ্রব্য, (ঘ) অবাধলভ্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য, (ঙ) ভোগ্য ও মূলধন দ্রব্য, (চ) একবার ব্যবহার্য ও স্থায়ী দ্রব্য, ইত্যাদি।

উপযোগ: উপযোগ বলিতে বুঝায় মানুষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা; যাহাই অভাবমোচন করে তাহারই উপযোগ আছে ধরিতে হইবে। উপযোগের সহিত কোন নীতির প্রশ্ন জড়িত নাই। দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক ও মানসিক ধারণা। সুতরাং একই দ্রব্যের উপযোগ সকলের নিকট এক নহে।

উপযোগ মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়—(১) স্বাভাবিক উপযোগ, (২) রূপগত উপযোগ, (৩) স্থানগত উপযোগ, (৪) সময়গত উপযোগ এবং (৫) সেবাগত উপযোগ।

সম্পদ: বস্তুগত অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়। বস্তুগত হওয়া ছাড়া সম্পদের আরও তিনটি

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—(১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য এবং (৩) বিক্রয়যোগ্যতা। বিক্রয়যোগ্য হইবার জন্য দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে।

সম্পদের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়—যথা, (১) ব্যক্তিগত সম্পদ, (২) সমষ্টিগত সম্পদ এবং (৩) জাতীয় সম্পদ।

উৎপাদন : তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা উপযোগ-সৃষ্টিকেই অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলে।

ভোগ : অভাবমোচনের জন্য উপযোগের ধ্বংসই হইল ভোগ।

মূল্য ও দাম : মূল্য বলিতে ব্যবহার-মূল্য বা বিনিময়-মূল্য যে-কোনটি বুঝাইতে পারে। অর্থবিদ্যায় অবশ্য 'মূল্য' বলিতে বিনিময়-মূল্যই বুঝায় এবং ব্যবহার-মূল্য বুঝাইবার জন্য উপযোগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিনিময়-মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (price) বলে।

মূল্য ও দামের মধ্যে একটি পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে। সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একসংগে বাড়িতে পারে না।

চাহিদা ও যোগান : অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায় ; অনুরূপভাবে যোগান বলিতে বিশেষ দামে যোগানের পরিমাণ বুঝায়। সুতরাং চাহিদা ও যোগান উভয়ই দামের সহিত সম্পর্কিত ; দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বা দাম-নিরপেক্ষ যোগান বলিয়া কিছু নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you define Wealth ? Illustrate your answer with examples (C. U. 1943, '46)

কিভাবে সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? উদাহরণের সাহায্যে উত্তর দাও। [১৩-১৫ পৃষ্ঠা]

2. Explain the meaning of Production and Consumption and show their relation with each other. (H. S. (C) 1960)

উৎপাদন ও ভোগের অর্থ এবং উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : ভোগের জন্যই উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদনের পরিণতি হইল ভোগে।......এবং ১৭-১৮ পৃষ্ঠা]

3. Define National Wealth. How would you measure National Wealth ?

জাতীয় সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে জাতীয় সম্পদের পরিমাপ করিবে ? [১৬-১৭ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between (*a*) Value-in-use and Value-in-exchange ; and (*b*) Value and Price. (H. S. (C) 1960 ; H. S. Comp. (H) 1960)

(ক) ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য ; এবং (খ) মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[১৯-২০ পৃষ্ঠা]

5. Define Wealth. Are the following Wealth ?—(*a*) B. A. diploma, (*b*) the skill of a surgeon. (H. S. Comp. (C) Give reasons for your answer.

সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নিম্নলিখিতগুলি কি সম্পদ বলিয়া গণ্য ?—(ক) একখানি বি. এ. পাসের ডিপ্লোমা, (খ) একজন অস্ত্র-চিকিৎসকের পারদর্শিতা। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত : হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া বি. এ. পাসের ডিপ্লোমা ও অস্ত্র-চিকিৎসকের পারদর্শিতা কোনটাই সম্পদ নহে।...এবং ১৩-১৫ পৃষ্ঠা]

6. What do you understand by Utility ? Distinguish between different kinds of Utility.

উপযোগ বলিতে কি বুঝ ? বিভিন্ন প্রকারের উপযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [১১-১৩ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

অভাব ও উপযোগ

(Wants and Utility)

অভাব (Wants) : অভাব হইতেই যে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু তাহা আমরা দেখিয়াছি। অভাব আছে বলিয়াই মানুষকে অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয়। মানুষের এই অভাবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

অভাবের বৈশিষ্ট্য :

প্রথমত, সাধারণভাবে অভাবের কোন সীমা নাই (wants in general are unlimited)। একটি অভাব পরিতৃপ্ত হইলে আর একটি নূতন অভাব আসিয়া দেখা দেয়। যে-ব্যক্তির দুই বেলা দুই মুঠা ভাত জুটে না সে মনে করে অন্নকষ্ট দূর হইলেই তাহার সকল অভাব মিটিবে। যখন অন্নকষ্ট দূর হয়, তখন সে অভাব বোধ করে পোশাকপরিচ্ছদের। সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদের অভাব মিটিবার পর সে দামী পোশাকপরিচ্ছদের আকাংক্ষা করে। এইভাবে মানুষ সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে প্রতিনিয়ত ছুটিয়াই চলে।

১। সাধারণভাবে অভাব অসীম

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে অভাব অসীম হইলেও প্রতিটি অভাব কিন্তু সসীম (each want is limited)। একটি বিশেষ দ্রব্য যতই পাওয়া যায়, উহার জন্য আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি সরবৎ পান করিয়া চলে তবে প্রতিটি অতিরিক্ত গ্লাস সরবতের জন্য তাহার আকাংক্ষা ক্রমশ কমিয়া যাইবে এবং শেষে এমন এক সময় আসিবে যখন তাহার সরবৎ পানের কোন আগ্রহই থাকিবে না। যে-ব্যক্তির ১ জোড়াও জুতা নাই সে প্রথম জোড়া জুতার জন্য যতটা আকাংক্ষা বোধ করিবে, দ্বিতীয় জোড়া জুতার জন্য ততটা আকাংক্ষা বোধ করিবে না। তাহার জুতা জোড়ার সংখ্যা যদি ক্রমশ বাড়িয়া চলে তবে এমন এক সময় আসিবে যখন তাহার নূতন এক জোড়া জুতার জন্য কোন আগ্রহই থাকিবে না। অর্থাৎ, তাহার জুতার জন্য যে-অভাববোধ তাহা সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যাইবে।

২। প্রত্যেকটি অভাব কিন্তু সসীম

তৃতীয়ত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী (some wants are competitive)। গরম পানীয়ের অভাব চা বা কফি যে-কোন একটি হইতে, জামার অভাব পাঞ্জাবী বা সার্ট যে-কোন একটি হইতে, পরিবহণের অভাব বাস বা ট্রাম যে-কোন একটি হইতে মিটিতে পারে। সুতরাং চা কফির, পাঞ্জাবী সার্টের এবং বাস ট্রামের প্রতিযোগী।

৩। কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী

চতুর্থত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক (some wants are complementary)। চা-এর অভাব দুধ ও চিনির অভাব সৃষ্টি করে; মোটরগাড়ী চড়ার অভাব মিটানোর জন্য মোটরগাড়ী ও পেট্রল দুই-ই চাই, আলু বা পটলের তরকারি আলাদাভাবে রাঁধা গেলেও আলু-পটলের তরকারি রাঁধিতে হইলে আলু ও পটল উভয়ই প্রয়োজন।

৪। কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক

এইভাবে বৈশিষ্ট্য আলোচনা ছাড়াও মানুষের অভাবকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, প্রয়োজনীয় অভাব (necessaries), আরামপ্রদ দ্রব্যাদি (comforts) এবং বিলাস-দ্রব্যাদি (luxuries)। প্রয়োজনীয় অভাব বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে—যথা, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব, দক্ষতার জন্য অভাব, রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব, ইত্যাদি। যে-অভাবগুলি না মিটিলে জীবনধারণই সম্ভব নহে তাহাদিগকে জীবনধারণের জন্য অভাব (necessaries for life) বলে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যূনতম খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের উল্লেখ করা যায়। দক্ষতার জন্য অভাব (necessaries for efficiency) হইল সেইগুলি যেগুলি না মিটিলে দক্ষতা বজায় রাখা যায় না। সহরে যে-ডাক্তারের পসার আছে তাঁহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী রাখা প্রয়োজন, সাইকেলে চাপিয়া রোগী দেখিতে গেলে তাঁহার দক্ষতা বজায় থাকে না। রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব (conventional necessaries) বলিতে সেগুলিকে বুঝায় যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়। পাড়ায় যদি সকলেরই একটি করিয়া রেডিও থাকে তবে আমাকেও একটি রেডিও রাখিতে হয়, অফিসে সমপদস্থ লোকে সকলেই যদি স্যুট পরিয়া আসে তবে আমাকেও স্যুট পরিতে হয়, ইত্যাদি।

অভাবের শ্রেণী বিভাগ

১। প্রয়োজনীয়,
২। আরামপ্রদ এবং
৩। বিলাস-দ্রব্য

প্রয়োজনীয় অভাবের প্রকারভেদ

বিলাস-দ্রব্য সেগুলিকেই বলে যেগুলির অভাব মানুষ আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য বোধ করে। দামী দামী জামাকাপড় অলংকার গাড়ীবাড়ী আসবাবপত্র প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, দক্ষতা বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজনীয় নহে। তবুও মানুষ এগুলির আকাংক্ষা করে শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য।

প্রয়োজনীয় অভাব ও বিলাস-দ্রব্যের অভাবের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া থাকে আরামপ্রদ দ্রব্যগুলি। এগুলি হইতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, আড়ম্বর প্রদর্শনও সম্ভব হয় না। এগুলি হইতে কিছুটা আরাম, কিছুটা সুখ ভোগ করা যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই জিনিস ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস-দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-ডাক্তারের পসার ভাল তাঁহার পক্ষে

একই দ্রব্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার অভাব মিটাইতে পারে

একখানি মোটরগাড়ী বিশেষ প্রয়োজনীয়, একজন উচ্চ মাহিনার চাকরিয়ার পক্ষে একখানি গাড়ী হইলে বেশ ভাল হয়, কিন্তু সাধারণ চাকরিয়ার নিকট মোটরগাড়ীই বিলাস-দ্রব্য বলিয়া গণ্য।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (The Law of Diminishing Utility) : মানুষের প্রতিটি অভাব যে সসীম ইহা হইতে অর্থবিদ্যার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (The Law of Diminishing Utility) নামে অভিহিত। সূত্রটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে : কোন জিনিস যত বেশী পাইতে থাকি উহার জন্য আমাদের আকাংক্ষা বা কাম্যতা (desiredness) ততই কমিয়া যায়।* অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রতিটি অভাব সসীম বলিয়া যে-কোন দ্রব্যের অভাবপূরণের ক্ষমতা বা উপযোগ উহার পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা প্রমাণ করা যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট প্রথম এক গ্লাস সরবতের জন্য যেরূপ আকাংক্ষা থাকে, দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের জন্য সেরূপ আকাংক্ষা বা ইচ্ছা থাকে না। তৃতীয় গ্লাস সরবতের জন্য আকাংক্ষা আরও কম হয়। অর্থাৎ, সরবতের তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা ক্রমশ কমিয়া আসে বলিয়া উহার জন্য আকাংক্ষাও কমিয়া আসে। আকাংক্ষা কি পরিমাণ কমিতেছে তাহা বুঝা যায় লোকে কি দাম দিতে প্রস্তুত তাহা হইতে।

বিধিটির বিবৃতি

ব্যাখ্যা

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি প্রথম গ্লাস সরবতের জন্য ৫০ নয়া পয়সা, দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের জন্য ৩০ নয়া পয়সা এবং তৃতীয় গ্লাস সরবতের জন্য ১০ নয়া পয়সা দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে তাহার নিকট সরবতের উপযোগ ৫০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ৩০ নয়া পয়সা এবং ৩০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ১০ নয়া পয়সায় পরিণত হইতেছে। এখন যদি প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ৩০ নয়া পয়সা করিয়া হয় তবে ঐ ব্যক্তি দুই গ্লাস সরবৎ পান করিবে। এবং প্রথম গ্লাস হইতে ৫০ নয়া পয়সার মত এবং দ্বিতীয় গ্লাস হইতে ৩০ নয়া পয়সার মত উপযোগ লাভ করিবে। আবার সরবতের দাম যদি ১০ নয়া পয়সা করিয়া হয় তবে সে প্রথম গ্লাস হইতে ৫০ নয়া পয়সার, দ্বিতীয় গ্লাস হইতে ৩০ নয়া পয়সার এবং তৃতীয় গ্লাস হইতে ১০ নয়া পয়সার মত তৃপ্তি লাভ করিবে।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগ (Total and Marginal Utility) : ক্রীত সকল একক হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে মোট উপযোগ (Total Utility) এবং শেষ একক হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) বলা হয়। আমাদের উদাহরণে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি

মোট ও প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্য

* উপযোগকে 'আকাংক্ষা' বা 'কাম্যতা' বলিয়া অভিহিত করা হয়।...১১ পৃষ্ঠা দেখ।

তিন গ্লাস সরবৎ পান করিবে, তাহার মোট উপযোগ হইবে (৫০+৩০+১০=) ৯০ নয়া পয়সা, কিন্তু শেষ বা তৃতীয় একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ হইবে মাত্র ১০ নয়া পয়সা। এই শেষ এককক প্রান্তিক একক বলা হয় বলিয়াই উহা হইতে প্রাপ্ত উপযোগ 'প্রান্তিক উপযোগ' বলিয়া অভিহিত হয়।

প্রান্তিক বলা হয় কেন

প্রান্তিক একক বলা হয় কেন? ইহার কারণ হইল ঐ একক ভোগ বা প্রাপ্তির প্রান্তে অবস্থিত থাকে। ঐ এককের পর ক্রেতা আর ঐ দামে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করে না। প্রতিটি সরবতের গ্লাস যদি ১০ নয়া পয়সা করিয়া হয় তবে আমাদের কল্পিত ব্যক্তি তিন গ্লাসের অধিক সরবৎ ক্রয় করিবে না। দাম যদি ১০ নয়া পয়সা অপেক্ষা কম হয় তবেই সে চতুর্থ গ্লাস পান করিতে পারে।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্বন্ধের আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ক্রয় বা ভোগের পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে মোট উপযোগ ততই বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক উপযোগ ততই হ্রাস পাইতে থাকে। আমাদের কল্পিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি মাত্র দুই গ্লাস সরবৎ পান করিত তবে তাহার মোট উপযোগ হইত (৫০+৩০=) ৮০ নয়া পয়সা। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ হইত ৩০ নয়া পয়সা মাত্র। দুই গ্লাসের পরিবর্তে তিন গ্লাস সরবৎ পান করিলে মোট উপযোগ বাড়িয়া (৫০+৩০+১০=) ৯০ নয়া পয়সায় দাঁড়ায়, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইয়া ১০ নয়া পয়সায় পরিণত হয়। এইভাবে যেখানে প্রান্তিক উপযোগ সর্বাপেক্ষা কম হয় সেখানেই মোট উপযোগ হয় সর্বাধিক। আমাদের উদাহরণে সর্বাধিক মোট উপযোগ হইল ৯০ নয়া পয়সা; ঐ তৃতীয় এককেই প্রান্তিক উপযোগ হইল ন্যূনতম বা ১০ নয়া পয়সা।

উভয় প্রকার উপযোগের মধ্যে সম্বন্ধ

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ভোগ বা ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে একটা সীমা পর্যন্ত—অর্থাৎ, প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত* মোট উপযোগ বৃদ্ধিই পায়, মাত্র প্রান্তিক উপযোগই হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং বিধিটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Utility) না বলিয়া ক্রমহ্রাসমান 'প্রান্তিক' উপযোগ বিধিই (Law of Diminishing Marginal Utility) আখ্যা দেওয়া উচিত। বর্তমানে বিধিটিকে এইভাবেই অভিহিত করা হয়। মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মোট উপযোগ ক্রমশ বাড়িয়া চলে বলিয়া উহার গতি দামের বিপরীতমুখী, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ সকল সময়ই ব্যক্তি যে দাম দিতে ইচ্ছুক থাকে তাহার সমান হয়। উপরের উদাহরণে সরবতের

মোট ও প্রান্তিক উপযোগ এবং দাম

* ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে মোট উপযোগও হ্রাস পাইতে থাকিবে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি ক্রমাগত সরবৎ পান করিয়া চলে তবে তৃপ্তির পরিবর্তে দেখা দিবে অতৃপ্তি।

দাম প্রতি গ্লাস ৩০ নয়া পয়সা করিয়া হইলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দুই গ্লাস পান করিত। ঐ দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের যে-উপযোগ—অর্থাৎ, ৩০ নয়া পয়সা তাহাই তাহার প্রান্তিক উপযোগ। ইহাই দামের সমান। এ-ক্ষেত্রে তাহার মোট উপযোগ হইতেছে (৫০+৩০=) ৮০ নয়া পয়সা। ইহা বাজার-দাম হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। সরবতের দাম প্রতি গ্লাস ১০ নয়া পয়সা করিয়া হইলে সে তিন গ্লাস পান করিত ; ফলে তখনও দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হইত। এইভাবে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান না হওয়া পর্যন্ত লোকে জিনিস ক্রয় করিয়া চলে বলিয়াই দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় এবং মোট উপযোগ হইতে ক্রমাগত দূরে সরিয়া যায়। এ-সম্পর্কে দাম নির্ধারণ প্রসংগে আবার আলোচনা করা হইবে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the Law of Diminishing Utility) : ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অবশ্য সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে ; কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায় পুরাতন ডাক-টিকিট, মুদ্রা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রাহকের নিকট আরও ডাকটিকিট, আরও মুদ্রা প্রভৃতি প্রাপ্তির আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনেকে অবশ্য ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, বিভিন্ন প্রকারের ডাকটিকিট বা বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা একই দ্রব্যের বিভিন্ন একক নহে। তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দ্রব্য। বিভিন্ন প্রকার ডাকটিকিটের জন্য সংগ্রাহকের আকাংক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেও, একই ডাকটিকিটের দ্বিতীয়খানির জন্য আকাংক্ষা প্রথমখানি অপেক্ষা কম হয়। মহম্মদ তুঘলকের একটি তামার টাকা পাইবার পর অনুরূপ আর একটি টাকা সংগ্রাহক পূর্বের দামে ক্রয় করিতে রাজী হইবে না, যদিও বা সে অন্য কোন রাজার তামার টাকা বেশী দামে ক্রয় করিতে রাজী হইতে পারে। যাহা হউক, সাধারণত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে বিধিটি প্রযোজ্য নয় বলিয়াই মনে করা হয়।

> দুইটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয় :
>
> ১। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে

দ্বিতীয়ত, কৃপণের অর্থসঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও বিধিটি কার্যকর হয় না বলিয়া ধরা হয়। কৃপণের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহার অর্থ-প্রাপ্তির আকাংক্ষাও তত বাড়িয়া যায়। এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে কৃপণের আচরণ বিকৃত মনের পরিচায়ক। সুতরাং অর্থবিদ্যায় উহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সুস্থ মন ও মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট টাকাকড়ির উপযোগও ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। এরূপ ব্যক্তির নিকট প্রথম একশত টাকা যতটা কাম্য, দ্বিতীয় একশত টাকা ততটা কাম্য নহে। তবুও

> ২। কৃপণের অর্থসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির আলোচনা প্রসংগে কৃপণের অর্থসঞ্চয়ের উল্লেখ করা হয় এবং উহাকে বিধিটির ব্যতিক্রম হিসাবে দেখানো হয়।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির কোন ব্যতিক্রম আছে কি না সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও বিধিটি যে কয়েকটি সর্তাধীন সে-বিষয়ে মতদ্বৈধতা নাই। দুইটি প্রধান সর্ত হইল এইরূপ: (ক) ভোগের একক পর্যাপ্ত হওয়া চাই, (খ) ভোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হওয়া চাই। ভোগের একক পর্যাপ্ত না হইলে দ্বিতীয় একক প্রাপ্তির জন্য আকাংক্ষা হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেমন, অতি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামান্য এক মুঠা ভাতের পর দ্বিতীয় মুঠা ভাতের জন্য আকাংক্ষা তীব্রতর হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত না হইলেও আকাংক্ষা হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইতে পারে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি এক গ্লাস সরবৎ পানের পরই আর এক গ্লাস সরবৎ পানে বিশেষ ইচ্ছুক না হইলেও কয়েক ঘণ্টা পরে হইতে পারে।

উপসংহার: বিধিটি কয়েকটি সর্তাধীন

সংক্ষিপ্তসার

অভাব: অভাবের জন্যই মানুষ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মানুষের অভাবের চারিটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। সামগ্রিকভাবে অভাব অসীম, ২। প্রত্যেকটি অভাব কিন্তু সসীম, ৩। কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী, ৪। কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক।

মানুষের অভাবকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১। প্রয়োজনীয়, ২। আরাম-প্রদ, ৩। বিলাস-দ্রব্য। প্রয়োজনীয় অভাব আবার তিন ধরনের হয়—(ক) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয়, (গ) রীতিগত প্রয়োজনীয়।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি: মানুষের অভাব সামগ্রিকভাবে অসীম হইলেও প্রতিটি অভাব সসীম। প্রতিটি অভাব যে সসীম ইহা হইতে 'ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি' নামে অর্থবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে সূত্রটি হইল এইরূপ: কোন জিনিস আমরা যত বেশী পাইতে থাকি, উহার জন্য আমাদের আকাংক্ষা বা উহার উপযোগ তত কমিয়া যায়। আকাংক্ষা বা উপযোগ কি পরিমাণ কমিতেছে তাহা বুঝা যায় লোক কি পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত তাহা হইতে।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগ: ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে প্রান্তিক উপযোগই হ্রাস পায়, মোট উপযোগ নহে। মোট উপযোগ একটা সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মোট উপযোগ বলিতে বুঝায় সকল একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ, এবং প্রান্তিক উপযোগ বলিতে বুঝায় শেষ এককের উপযোগ। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায়: প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে পাইতে শূন্যে না পৌছানো পর্যন্ত মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং প্রান্তিক উপযোগ যেখানে সর্বাপেক্ষা কম হয়, মোট উপযোগ সেখানেই হয় সর্বাধিক। মোট উপযোগ দামের সহিত সম্পর্কহীন, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ সকল সময়ই দামের সমান হয়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ব্যতিক্রম: বিধিটির কয়েকটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়—যথা, বলা হয় যে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বা কৃপণের অর্থসঞ্চয়ের বেলায় বিধিটি প্রযোজ্য নহে। এক দল লেখক অবশ্য এই মতের বিরোধিতা করেন। যাহা হউক, সাধারণত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহ ও কৃপণের অর্থসঞ্চয়কে এই বিধির ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা হয়।

বিধিটি ব্যতিক্রমবিহীন কি না সে-সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকিলেও ইহা যে অন্তত দুইটি সর্তাধীন সে-সম্বন্ধে সকলেই একমত। সর্ত দুইটি হইল (১) ভোগের একক পর্যাপ্ত হওয়া চাই, এবং (২) ভোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হওয়া চাই।

প্রশ্নোত্তর

1. Define Wants and indicate its characteristics.

অভাবের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

2. What do you understand by the Law of Diminishing Utility? Illustrate your answer.

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি বলিতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

3. State and explain the Law of Diminishing Utility. Name at least two cases of exceptions to the Law.

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিটি বিবৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা কর। বিধিটির অন্তত দুইটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ কর।

4. Distinguish between total utility and marginal utility with the help of an example. Explain how they are related to price.

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে তাহারা দামের সহিত সম্পর্কিত তাহা দেখাও।

চতুর্থ অধ্যায়

চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা

(Law of Demand and Elasticity of Demand)

চাহিদার সূত্র (Law of Demand): আমরা দেখিয়াছি অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায়। চাহিদার এই প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে চাহিদা-সূচীর মধ্যে। চাহিদা-সূচী (Demand Schedule) বলিতে বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার তালিকাকে বুঝায়। নিম্নে একটি কাল্পনিক চাহিদা-সূচী দেওয়া হইল:

চাহিদা-সূচী

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ
৩ টাকা	৫ কুইন্টাল
২·৫০ "	৭ "
২ "	১০ "
১·৫০ "	১৫ "
১ "	২৫ "

উপরের সূচীটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ৩ টাকা, ২·৫০ টাকা, ২ টাকা ইত্যাদি বিভিন্ন দামে যথাক্রমে ৫ কুইন্টাল, ৭ কুইন্টাল, ১০ কুইন্টাল ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হইতেছে। এই সকল দামের প্রত্যেকটিকে চাহিদা-দাম (Demand Price) বলা হয়।*

চাহিদা-দাম

* ২০-২১ পৃষ্ঠা।
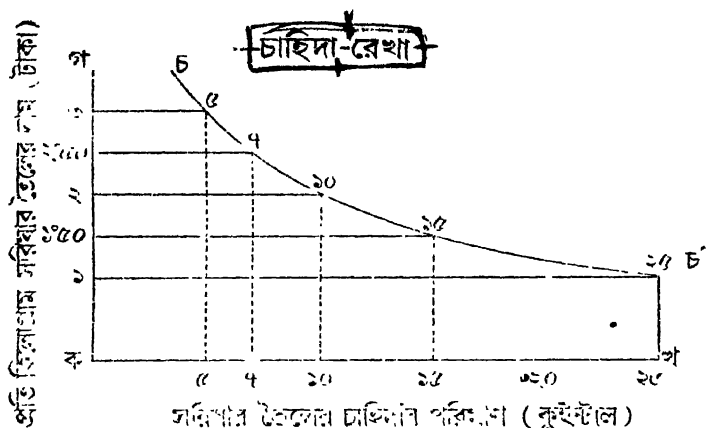
উপরের রেখাচিত্রটির সাহায্যে চাহিদা-সূচীটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে: ক গ অক্ষে সরিষার তৈলের দাম এবং ক খ অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরা যাচ্ছে। দাম যখন ৩ টাকা তখন ৫ কুইন্টাল চাহিদা হয়। দাম কমিয়া ২.৫০ টাকা, ২.৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ১.৫০ টাকা এবং ১.৫০ টাকা হইতে ১ টাকায় আসিলে চাহিদা যথাক্রমে বাড়িয়া ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ কুইন্টালে দাঁড়াইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক উপরের ৫, ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (চ চ') পাওয়া যায় তাহাকে চাহিদা-রেখা (Demand Curve) বলে। ইহার গতি নিম্নমুখী। ইহার দ্বারা বুঝানো হয় দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে।

চাহিদা-রেখা

দাম কমিলেই যে চাহিদা বাড়ে এবং পক্ষান্তরে দাম বাড়িলেই যে চাহিদা কমে এই সাধারণ নিয়মকেই চাহিদার সূত্র (Law of Demand) বলা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দাম ও চাহিদার মধ্যে যে সম্পর্ক তাহাই চাহিদার সূত্র নামে অভিহিত।

চাহিদার সূত্র

এখন প্রশ্ন চাহিদার এই সূত্রের মূলে কি কি কারণ আছে—অর্থাৎ, দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কেন?

প্রথমত, প্রত্যেক ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে কোন দ্রব্য পাইতে থাকে উহার জন্য তাহার আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। অর্থাৎ, তাহার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। অপরদিকে দাম দিতে হইলে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়—অর্থাৎ, টাকা-কড়ির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং লোকে ততটাই ত্যাগ স্বীকার করিতে, ততটা অসুবিধা ভোগ করিতে রাজী থাকে যতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ সে কোন দ্রব্য হইতে

১। প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস

ভোগ করিতে পারে। অতএব, দাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিস ক্রয় করিবে, আর দাম বেশী হইলে কম জিনিসপত্র ক্রয় করিবে।

দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইযাছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কারণ সে পূর্বের তুলনায় কম ব্যয় করিয়া জিনিসটির সেই পরিমাণই ক্রয় করিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক কোন ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিত। মাছের দাম কমিয়া ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে সে পূর্বের মত ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিলেও তাহার হাতে ১টি টাকা থাকিয়া যাইবে। এই অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে আরও মাছ কিনিতে ব্যয় করিতে পারে বলিয়া মাছের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপবপক্ষে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার আয় হ্রাস পাইয়াছে বলিযা ধরা হয় এবং ঐ জিনিসের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাকে আয়-প্রভাব (Income Effect) বলা হয়।

২। আয-প্রভাব

তৃতীয়ত, কোন জিনিসের দাম হ্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষাকৃত অধিক দামের অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে ঐ জিনিস অধিকমাত্রায় ক্রয় করিতে থাকে ; আবার কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের অন্য জিনিস অধিকমাত্রায় ক্রয় করে। যেমন, মাছের তুলনায় মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে, আবার মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেকে মাছের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ও বাড়িলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়িবে ও কমিবে। ইহাকে পরিবর্ত-প্রভাব (Substitution Effect) বলা হয়।

৩। পরিবর্ত-প্রভাব

আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবকে মিলাইয়া দাম-প্রভাব (Price Effect) বলা যায়।

চতুর্থত, কোন জিনিসের দাম কমিলে অনেক নূতন ক্রেতা আসিয়া জুটিবে। অর্থাৎ, যাহারা পূর্বের দামে জিনিসটি ক্রয় করিতে পারিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকে জিনিসটি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। এইভাবে ক্রেতার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অপরপক্ষে দাম বাড়িলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাসের ফলে চাহিদার পরিমাণও কমিবে।

৪। ক্রেতার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দামের পরিবর্তন ছাড়াও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, লোকের আযের পরিবর্তন রুচি-ফ্যাসানের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পারবর্তন প্রভৃতির ফলে চাহিদা পূর্বের তুলনায় কমবেশী হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার সূত্রের উল্লেখ করি তখন এইগুলি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লইয়া শুধু দামের সংগে চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারণ করি,

চাহিদার সূত্রের অনুমান

এবং দেখিতে পাই যে দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে আর দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand): দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে—ইহাই চাহিদার নিয়ম।

দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে

কিন্তু দাম বাড়াকমার ফলে সকল দ্রব্যের চাহিদার সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। দেখিতেপাওয়া যায়, দাম সামান্য কমিলে বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায় কিন্তু চাউল লবণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বিশেষ কমিলেও উহাদের চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পায় না। দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।*

অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হইলে যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার সামান্য মাত্র পরিবর্তন হয় তাহাদিগকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand) বলে। চাউল, লবণ, সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। অপরদিকে দামের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেই যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ পরিবর্তিত হয় তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand) বলে। মোটরগাড়ী, রেডিও-সেট, ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা এই শ্রেণীভুক্ত।

স্থিতিস্থাপক চাহিদা

উদাহরণ

কোন চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক তাহা বুঝা যায় বিভিন্ন দামে ঐ দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থ হইতে। চা ও কফির উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক বিভিন্ন বাজার-দামে উহাদের উপর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়:

চা

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৩ টাকা	১০০০ পাউণ্ড	৩০০০ টাকা
২ "	১২০০ "	২৪০০ "
১ "	১৫০০ "	১৫০০ "

কফি

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪ টাকা	১০০ পাউণ্ড	৪০০ টাকা
৩·৫০ "	২০০ "	৭০০ "
৩ "	৫০০ "	১৫০০ "

* Elasticity of demand may be defined as the degree of response to changes in price.

দেখা যাইতেছে, চা-এর দাম পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা কমিলেও চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং চা-এর উপর ব্যয়িত মোট টাকার পরিমাণ কমিতেছে। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই লক্ষণ। কিন্তু কফির দাম পাউণ্ড প্রতি ৫০ নয়া পয়সা কমিয়া যাওয়ার ফলেই চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ ও ততোধিক হইতেছে এবং কফির উপর ব্যয়িত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই বিশেষত্ব।*

অস্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

স্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদা তত অস্থিতিস্থাপক। চাউল তৈল লবণ প্রভৃতি আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই কারণে ইহাদের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। চা-ও আমাদের দেশে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে; সুতরাং ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। অপরপক্ষে বিলাস-দ্রব্য আমাদের অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। ফলে ইহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কয়লা রন্ধনকার্য, কলকারখানা, রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে রন্ধনকার্যে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিতে পারে, আবার দাম কমিলে যাহারা কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লার চাহিদা বাড়াইতে পারে।

তৃতীয়ত, ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে ঐ ভোগ্যদ্রব্য বা উহার উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে। বাড়ীঘর নির্মাণের দ্রব্যাদির দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে লোকে বাড়ীঘর নিমাণ স্থগিত রাখে; পরে আবার মালমসলার দাম কমিলে নির্মাণকার্য সুরু করে।

পরিশেষে, যে-সকল দ্রব্যের পরিবর্ত (substitute) আছে তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন, চা-এর দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে লোকে কফি পান সুরু করিতে পারে, বিদ্যুৎ সরবরাহের দাম বৃদ্ধি করিলে লোকে গ্যাসের বাতি জ্বালাইতে পারে, ইত্যাদি।

চাহিদার মূল্যানুগ এবং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-Elasticity and Income-Elasticity of Demand): দামের পরিবর্তনের ফলে

---

* চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক কিছুই না হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে 'একের সমান' (equal to unity or one) বলা হয়। ইহাতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পূর্বের মত থাকিয়া যায়। আমাদের উদাহরণে প্রতি পাউণ্ড চা-এর দাম ৩ টাকা হইতে ২ টাকায় কমার ফলে যদি চাহিদা বাড়িয়া ১৫০০ পাউণ্ড এবং ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩০০০ টাকা হইত, তখন চা-এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে একের সমান বলা হইত।

চাহিদার যে-পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহাকে 'চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Price-Elasticity of Demand) বলা হয়। দাম ছাড়া আরও অনেক কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল আয়ের পরিবর্তন। আয় বাড়িলে লোকে বেশী করিয়া জিনিসপত্র ক্রয় করিবে ; এবং আয় কমিলে ক্রয় করার পরিমাণও কমাইয়া দিবে। আয় কম থাকার জন্য যে ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চাপিত, সপ্তাহে মাত্র দুই-তিন দিন মাছ খাইত, জামাকাপড় নিজেই সাবান দিয়া কাচিয়া লইত—আয় বাড়িলে সে প্রথম শ্রেণীর ট্রামে চাপিবে, রোজই মাছ খাইবে এবং জামাকাপড় ধোপার বাড়ী দিবে। ফলে এই সমস্ত জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে। আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এইরূপ পরিবর্তনকে 'চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Income-Elasticity of Demand) বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তন (Change in Demand) : দামের পরিবর্তন না ঘটিয়াও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে চাহিদার পরিবর্তন (Change in Demand) বলা হয়। চাহিদার এই ধরনের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে পূর্বের দামেই জিনিসপত্র কম-বেশী বিক্রয় হয়। পূর্বোক্ত আয়ের পরিবর্তন ছাড়া নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়।

{ চাহিদার পরিবর্তন কাহাকে বলে এবং কি কি কারণে ইহা ঘটিতে পারে }

(১) লোকের রুচি, স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন : চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইলে চিনি ও দুগ্ধের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে ; মোটরগাড়ীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে ঘোড়ার গাড়ীর চাহিদা কমিবে ; মেয়েদের মধ্যে জরির জুতা পরার ফ্যাসান চালু হইলে জরির চাহিদা বাড়িবে ; ইত্যাদি।

(২) জনসংখ্যার পরিবর্তন : জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। পূর্ব-পাকিস্থান হইতে বহু লোকের আগমনের ফলে পশ্চিমবংগের বাড়ীঘর জমিজমার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; আবার ঐ কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে।

(৩) আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন : জাতীয় আয়ের বণ্টন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইলেও চাহিদা পরিবর্তিত হইবে। ধনীর তুলনায় দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে দরিদ্রের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে এবং ধনীর ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিবে।

(৪) ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা : বাজারের তেজীমন্দা অবস্থার দ্বারাও চাহিদা প্রভাবান্বিত হয়। তেজী বাজারের (boom market) সময় সকল জিনিসের চাহিদা বাড়ে আবার মন্দাবাজারের সময় সকল জিনিসের চাহিদা কমে।

(৫) পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন : কতকগুলি এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের দাম পরস্পর-সম্পর্কিত—যেমন, চা ও চিনি, মোটরগাড়ী ও পেট্রল,

ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে একটির দাম বাড়িলে অপরটির চাহিদাও হ্রাস পাইতে পারে—যেমন, পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে মোটরগাড়ী চড়া কমাইয়া দিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

চাহিদার সূত্র : অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায়। চাহিদার এই প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে চাহিদা-সূচীর মধ্যে। চাহিদা-সূচী বলিতে বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয় তাহার তালিকা বুঝায়। এই সকল দামের প্রত্যেকটিকে চাহিদা-দাম বলে। চাহিদা-সূচীর রেখাচিত্র অংকন করা হইলে তাহা হইতে চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। এই রেখার গতি নিম্নমুখী। ইহার দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে।

দাম কমিলেই যে চাহিদা বাড়ে এবং পক্ষান্তরে দাম বাড়িলেই যে চাহিদা কমে এই সাধারণ নিয়মই চাহিদার সূত্র নামে অভিহিত। চাহিদার নিয়মের পশ্চাতে এই কয়টি শক্তি কার্য করে : ১। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ, ২। আয়-প্রভাব, ৩। পরিবর্ত-প্রভাব, এবং ৪। ক্রেতার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি।

চাহিদার সূত্র কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল :

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা : দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটিলেও যে-চাহিদা সামান্য মাত্র পরিবর্তিত হয় তাহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং দাম সামান্য পরিবর্তিত হইলেই যে-চাহিদা বিশেষ পরিবর্তিত হয় তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না হ্রাস পাইতেছে—তাহার দ্বারাই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, নানাভাবে বা একককাযে ব্যবহার্য দ্রব্য, ইত্যাদি।

চাহিদার মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা : দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এবং আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তন : দামের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাকে চাহিদার পরিবর্তন বলা হয়। ১। লোকের রুচি ও স্বভাবের পরিবর্তন, ২। জনসংখ্যার পরিবর্তন, ৩। আয়ের পরিবর্তন, ৪। আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, ৫। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন, এবং ৬। পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন—এই কয়টি কারণের জন্য চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. State the Law of Demand. Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price to increase it.

চাহিদার সূত্র বিবৃত কর। দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। [২৯-৩২ পৃষ্ঠা]

2. State and explain the Law of Demand.

চাহিদার সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। [২৯-৩০ পৃষ্ঠা]

3. What do you understand by Elasticity of Demand? Distinguish between Elastic and Inelastic Demand.

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝায়? স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [৩২-৩৩ পৃষ্ঠা]

4. What do you mean by 'Elasticity of Demand'? Is the demand for the following commodities elastic or not? Give reasons for your answer.

(*a*) Salt, (*b*) Radio, (*c*) Tea.

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ? নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

(ক) লবণ, (খ) রেডিও-সেট, (গ) চা।

[ইংগিত: লবণের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, কারণ উহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং উহার কোন পরিবর্ত (substitute) নাই। রেডিও-সেটের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, কারণ উহা অন্যতম বিলাস-দ্রব্য। চা-এর চাহিদাও স্থিতিস্থাপক, কারণ উহার পরিবর্ত আছে।...(৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)]

5. Define Elasticity of Demand and indicate the factors upon which Elasticity of Demand depends.

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। যে যে বিষয়ের উপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে তাহা দেখাও। [৩২-৩৩ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদান

(Factors of Production)

উৎপাদন বলিতে যে প্রকৃতির দানকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষের অভাব মিটানোর উপযোগী করিয়া তোলা বুঝায়, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

উৎপাদনের উপাদান কাহাকে বলে

উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হইলে কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই উপকরণগুলিকেই অর্থবিদ্যায় 'উৎপাদনের উপাদান' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান (Different Factors of Production): কোন উৎপাদনই প্রকৃতির দান ব্যতীত হইতে পারে না।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান: ১। প্রকৃতির দান বা জমি

সুতরাং প্রকৃতির দানই হইল উৎপাদনের প্রথম উপাদান। অর্থবিদ্যাবিদ্গণ প্রকৃতির দানকে জমি (Land) বলিয়া অভিহিত করেন। জমি বলিতে কেবলমাত্র ভূখণ্ডকেই বুঝায় না; কৃষি ও ঘরবাড়ীর জন্য জমি ছাড়াও খনি, বন, মৎস্যধৃতকরণের উপযোগী নদী, সমুদ্র, জলবিদ্যুতের উৎস ইত্যাদি সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই বুঝায়।

কিন্তু উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দানই যথেষ্ট নহে। মানুষের শ্রম ব্যতীত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারোপযোগী হয় না। এমনকি সুদূর অতীতে মানুষ যখন বনজংগলে বসবাস করিত তখনও তাহাকে পরিশ্রম করিয়া ফলমূল আহরণ

করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত। বর্তমান যুগে মানুষ তাহার শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে আকাংক্ষা মিটাইবার নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শ্রম (Labour) হইল উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান। শ্রম বলিতে শুধু দৈহিক শ্রমই বুঝায় না, মানসিক শ্রমও বুঝায়।

২। শ্রম

কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন উপাদানের সাহায্য না লইয়া মাত্র জমি ও শ্রমের সহযোগে উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও সেই উৎপাদন অতি সাধারণ ও সামান্য হইতে বাধ্য। তাই মানুষ উৎপাদনের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখনও সে তীর-ধনুক বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে শিকার সংগ্রহ করিত। এই সকল অস্ত্রশস্ত্রই ছিল তখনকার দিনে মূলধন। বর্তমান যুগে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অসংখ্য রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা উৎপাদনকার্য চলিতেছে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন আশাতীতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে এবং মানুষের শ্রমেরও লাঘব হইয়াছে। বাটা কোম্পানীর ন্যায় জুতার কারখানায় গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যন্ত্রের সাহায্যে দৈনিক শত শত জুতা তৈয়ারি হইতেছে; কোন কাপড়ের কলে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রত্যহ শত শত মিটার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং দেখা যায় যে উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দান বা জমি ও শ্রম ব্যতীত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামেরও প্রয়োজন। অর্থবিদ্যায় এই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন (Capital) বলা হয়; ইহা উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। মূলধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা মানুষের অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কৃষক যে-লাঙল ব্যবহার করে তাহা অতীতে মানুষ তাহার শ্রমের দ্বারা তৈয়ারি করিয়া বর্তমানে শস্যাদি উৎপাদন করিবার জন্য উহাকে ব্যবহার করিতেছে। মূলধনের সহিত জমির পার্থক্য এইখানেই। জমি প্রকৃতির দান আর মূলধন মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা গড়িয়া তুলে।

৩। যন্ত্রপাতি বা মূলধন

জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

আবার জমি, শ্রম ও মূলধন থাকিলেই চলে না; ভালভাবে উৎপাদনের জন্য এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদন করে উদ্যোক্তা (Entrepreneur) বা সংগঠক (Organiser)। সংগঠক বা উদ্যোক্তার সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরই উৎপাদনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। বর্তমান যুগে এই কর্মকর্তা বা সংগঠকের গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ উৎপাদন পদ্ধতি ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। অনেক অর্থবিদ্যাবিদ উদ্যোক্তা বা সংগঠককে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে স্বীকার করিতে চাহেন না

৪। সংগঠন

ইঁহাদের মতে, সংগঠনকার্য একপ্রকার শ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু-না-কিছু সংগঠনমূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে, সংগঠক বা উদ্যোক্তার কার্য বিশেষ ধরনের এবং বর্তমানের জটিল উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে। এইজন্যই সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায়।

সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of the Entrepreneur or Business Organiser): উদ্যোক্তা বা সংগঠকের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ: (১) তাহাকে প্রথমেই স্থির করিতে হয় যে কোন্ শিল্প বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এই উৎপাদনের জন্য তাহাকে স্থান নির্বাচন করিতে এবং মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়।

সংগঠকের কার্যাবলী

১। উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(২) সবাপেক্ষা কম ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য কি হারে জমি, শ্রম ও মূলধন উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা হইবে সেই সম্পর্কেও উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি ও শ্রমবিভাগ নির্ধারণ করাও তাহার দায়িত্ব। (৩) যাহাতে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ-ভাবে কাজকর্ম চলে তাহাও তাহাকে দেখিতে হয়। অবশ্য এই কার্য মাহিনা-করা ম্যানেজারের হাতে কতকটা ছাড়িয়া দেওয়া যায়। (৪) উদ্যোক্তার প্রধান দায়িত্ব ঝুঁকি (risk) বহন করা। বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। কিন্তু বাজার বড় অনিশ্চিত এবং চাহিদাও অনবরত পরিবর্তিত হয়। কোন দ্রব্যের উৎপাদনের আরম্ভ হইতে (শে)দন সমাপ্ত হইয়া উহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করিবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে। উদ্যোক্তাকে এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করিয়াই উৎপাদন করিতে হয়।

২। অন্যান্য উপাদানকে যথোপযুক্ত নিযুক্ত করা

৩। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য পরিচালনা

৪। ঝুঁকি বহন করা

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে এই ঝুঁকি লইতে হয় না, কারণ চুক্তি অনুসারে শ্রমিক নির্দিষ্ট হারে মজুরি, জমির মালিক খাজনা এবং বিনিয়োগকারী সুদ পাইয়াই থাকে। এই সকল প্রাপ্য মিটাইয়া উদ্বৃত্ত কিছু থাকিলে তবে তাহাই উদ্যোক্তা মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। যে-সকল অর্থবিদ্যাবিদ উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে রাজী নহেন তাঁহারা অবশ্য বলেন যে, উদ্যোক্তার যেমন ঝুঁকি রহিয়াছে, অন্যান্য উপাদানেরও তেমন ঝুঁকি রহিয়াছে। যেমন, শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতে পারে, কলকারখানার মধ্যে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত

হইতে পারে। আবার জমির মালিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইয়া এক কাজ (use) হইতে জমিকে ছাড়াইয়া লইয়া অন্য কাজে ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি বহনের জন্য যদি মুনাফা পাওয়া যায় তাহা হইলে সুদ, খাজনা ও মজুরির একাংশকেও মুনাফা বলিয়াই ধরিতে হয়। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, অন্যান্য উপাদানের পক্ষে কিছুটা ঝুঁকি বহন করিতে হইলেও উদ্যোক্তার ঝুঁকির পরিমাণ অধিক এবং প্রকৃতিও ভিন্ন। যাহা হউক, উদ্যোক্তার কার্য বিশেষীকৃত (specialised) হওয়ায় আমরা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে ধরিয়াই আলোচনা করিব।

সংগঠক ঝুঁকি বহন করে বলিয়াই সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদনের উপাদান: উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি—যথা, (১) প্রকৃতির দান বা জমি, (২) শ্রম, (৩) যন্ত্রপাতি বা মূলধন, এবং (৪) সংগঠন। অনেক অর্থবিজ্ঞাবিদ সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু সংগঠকের কার্য শ্রমিকদের কায হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া ইহাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা উচিত।

সংগঠকের কার্যাবলী: সংগঠককে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হয়—১। উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ২। অন্যান্য উপাদানকে যথোপযুক্ত নিযুক্ত করা, ৩। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য পরিচালনা, এবং ৪। ঝুঁকি বহন করা।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Production? Describe the different factors of Production. (C. U. 1953)

উৎপাদন বলিতে কি বুঝায়? উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা কর। [১৭-১৯ এবং ৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা]

2. Explain the nature of services performed by the Entrepreneur in modern business organisation. (H. S. (II) Comp. 1960)

বর্তমান যুগে ব্যবসায় সংগঠনে সংগঠক যে যে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। [৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা]

ষষ্ঠ অধ্যায়

জমি
(Land)

জমির সংজ্ঞা (Definition of Land) : উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এখন এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে, জমি উৎপাদনের অন্যতম মৌলিক উপাদান (original factor)। সাধারণ ভাষায় জমি বলিতে ভূ ত্বক বা মৃত্তিকাকে বুঝায়—যেমন, চাষবাস ও কলকারখানার জমি। অর্থবিদ্যায় কিন্তু 'জমি' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা শুধু ভূখণ্ডের উপরিভাগটুকুই বুঝায় না—খনি, বন, জীবজন্তু, আলোবাতাস, নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকেই বুঝায়। প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ মার্শালের (Alfred Marshall) ভাষায় বলা যায়, "জমি হইল সেই সকল শক্তি ও সম্পদ যাহা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যার্থে জল স্থল বায়ু আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে।" অবশ্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায় নাই এরূপ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে 'জমি'র সংজ্ঞার মধ্যে ধরিতে চাহেন না। উদাহরণস্বরূপ সূর্যালোক বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জমি বলিতে কি বুঝায়

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land) : উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয় :

(১) জমির যোগান অপরিবর্তনশীল (Supply of land is fixed): প্রকৃতিদত্ত বলিয়া জমির যোগান বা পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য রহিয়াছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই বাড়াইয়া লইতে পারি না। তবে একথা বলা ঠিক নয় যে জমির পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল। উপকূল ভংগ অথবা জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর স্থলভাগ হ্রাস পাইতে পারে; আবার বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহের ফলে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে। অপরপক্ষে, মানুষ আবার বাঁধ দিয়া, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া জমির যোগান কতক পরিমাণে বাড়াইতে পারে। কিন্তু এইভাবে কৃষি-জমির কতকটা হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও আমরা জলবায়ু, আলোবাতাস, বৃষ্টিপাত, অবস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন করিতে পারি না। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় জমির সরবরাহ অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল।

১। জমির যোগান অপরিবর্তনশীল

(২) জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই (Land has no cost of production) : জমি প্রকৃতির দান। কেহ ব্যয় করিয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে নাই। বলিতে পারা যায়, উহা মানুষের কাজে নিয়োজিত হইবার জন্যই পড়িয়া আছে। শ্রম কিংবা মূলধনের বেলায় একথা খাটে না। লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া শ্রমিক কর্মক্ষম হইয়া উঠে; বিনা আয়াসে শ্রমিক তৈয়ারি হয় না। মূলধনও সম্পদের সঞ্চয় হইতে আসে; অতএব উহার জন্যও মানুষকে পরিশ্রম করিতে ও বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়; কিন্তু জমির প্রকৃতিদত্ত উর্বরতা, জলবায়ু, অবস্থান প্রভৃতির পিছনে মানুষের কোন ব্যয় বা শ্রম নাই।

২। জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই

(৩) জমি বিভিন্ন জাতীয় (Land is heterogeneous) : উর্বরতার দিক হইতে বিভিন্ন জমির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন জমি হয়ত অতি উর্বর আবার কোন জমির উর্বরাশক্তি অতি সামান্যই। আমাদের দেশে একদিকে যেমন অতি উর্বর সিন্ধু-গাংগেয় সমতলভূমি রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে রাজস্থানের অনুর্বর মরুভূমি অঞ্চল। কোন কোন জমির অবস্থান ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, আবার কোন জমি হয়ত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত, কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদনকার্য সকল সময়েই লাভজনক হয়, কারণ উহাতে উৎপাদন খুব বেশী হয়; অপরদিকে কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদন কোন সময়েই লাভজনক হয় না। সুতরাং উৎপাদনক্ষমতা অনুসারে আমরা জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। অবশ্য মূলধন ও শ্রমিকের বেলায়ও জমির এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। জমির মত শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনক্ষমতাতেও তারতম্য দেখা যায়।

৩। জমি একই প্রকারের হয় না

(৪) জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না (Land is immovable) : যতই উপযোগী হউক না কেন অথবা যতই উর্বর হউক না কেন জমিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান করা যায় না। এইজন্যই কলিকাতার ন্যায় সহরে জমির দাম এত বেশী এবং পল্লীগ্রামে জমির দাম এত কম।

৪। জমি স্থানান্তর-যোগ্য নহে

(৫) জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মাধীন (Production from Land is subject to the Law of Diminishing Returns) : পরিশেষে, বলা হয় যে জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে। ইহার অর্থ হইল, একই জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে উৎপাদনের হার ক্রমশ কমিতে থাকে। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে এই নিয়ম কৃষির ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায়, এই নিয়ম অর্থবিদ্যার অন্যতম সাধারণ নিয়ম এবং অবস্থা

৫। জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে হয়

বিশেষে ইহা শিল্পের ক্ষেত্রেও কার্যকর। সুতরাং এই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (The Law of Diminishing Productivity or Returns): ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উদ্ভূত হয় কৃষকের অভিজ্ঞতার ফলে।* অভিজ্ঞতা হইতে কৃষক দেখিয়াছে যে একই জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে ফসলের উৎপাদন সমপরিমাণ হারে বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াই সমহারে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশে খাদ্যাভাবের সমস্যাই থাকিত না—এক বিঘা জমিতে শত শত কৃষক নিযুক্ত করিয়াই দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাইত। ওয়েষ্ট ও রিকার্ডোর ন্যায় প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ কৃষকের এই অভিজ্ঞতাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি নাম দিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রে পরিণত করেন। কৃষির ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত সূত্রকে মার্শাল (Marshall) এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "জমিতে কৃষিকার্যের জন্য শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে 'সাধারণতঃ' উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ সমানুপাত অপেক্ষা কম হইবে—অবশ্য ইতিমধ্যে যদি না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।"

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির মূল বক্তব্য

বিধিটির সংজ্ঞা

উক্ত সংজ্ঞাটি সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইহাতে জমির মোট উৎপন্নের কথা বলা হইতেছে না, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের নিয়োগের ফলে যতটুকু অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অর্থ হইল—শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে। যেমন, যদি এক বিঘা জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনসহ ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে ৯ কুইণ্টাল ধান্য, ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে ১৩ কুইণ্টাল ধান্য এবং ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে ১৫ কুইণ্টাল ধান্য পাওয়া যায় তাহা হইলে ৩ জনের স্থলে ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ৪ কুইণ্টাল এবং ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ২ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য পাওয়া যাইতেছে। অতএব, অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ পূর্বের অনুপাতে হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে।

বিধিটির ব্যাখ্যা

অতিরিক্ত উৎপাদন হ্রাস পায়, মোট উৎপাদন নহে

অনেক সময় অবশ্য প্রথম প্রথম শ্রম ও মূলধনবৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন ফসলবৃদ্ধির

* ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে জেমস্ এণ্ডারসন নামে একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী কৃষি-খামারের মালিক এই তথ্যটি প্রথম প্রচার করেন বলিয়া কথিত আছে।

হার সমানুপাতের অধিকও হইতে পারে—অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন (Increasing Returns) দেখা দিতে পারে। ইহার কারণ, কৃষক হয়ত প্রথমদিকে জমিতে কম মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে এবং উপযুক্তভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দেখা দিলেও একসময় না একসময় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইবেই।

দুইটি কারণে প্রথম প্রথম অতিরিক্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে

সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি যে কার্য নাও করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্যই মার্শাল উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। আর একটি কারণেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিতে পারে। মার্শালের উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্যের পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর নাও হইতে পারে। উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পর ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে থাকিলে আবার ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে শুরু করিবে। সুতরাং সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি স্থগিত রাখা সম্ভব হইলেও স্থায়ীভাবে উহাকে বন্ধ করিয়া রাখা যায় না।

কিন্তু একসময় না একসময় ইহা কার্যকর হইবেই

উপরি-উক্ত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা নিম্নের ছকটির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, বিঘা প্রতি জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন (বীজ সার লাঙল প্রভৃতি) লইয়া কাজ করে। তাহা হইলে এই জমিতে ক্রমাগত মূলধনসহ শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে অতিরিক্ত উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত হারে হ্রাস পাইতে পারে:

উদাহরণ

বিঘা প্রতি শ্রমিকসংখ্যা (মূলধনসহ)	মোট উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ (কুইন্টাল হিসাবে)	অতিরিক্ত উৎপাদন বা প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন
১	১	১
২	৪	৩
৩	৯	৫
৪	১৩	৪
৫	১৫	২
৬	১৬	১
৭	১৪	−২

ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ১ জন শ্রমিকের স্থলে ২ জন এবং

২ জনের স্থলে ৩ জন নিয়োগ করা পর্যন্ত প্রান্তিক (marginal) বা অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১ জন শ্রমিক বাড়াইলে মোট উৎপাদনের যতটা বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন বা অতিরিক্ত উৎপাদন বলা হয়। প্রদত্ত হিসাবে ১ জনের স্থলে ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করার ফলে মোট উৎপাদন ১ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ৪ কুইণ্টাল হয়। সুতরাং, অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৩ কুইণ্টাল ধান্য। আবার শ্রমিকসংখ্যা ২ জন হইতে ৩ জন করা হইলে মোট উৎপাদন ৪ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ৯ কুইণ্টাল হয়; অতএব অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৫ কুইণ্টাল। ইহার পর শ্রমিকসংখ্যা যত বাড়ানো হইয়াছে প্রান্তিক উৎপাদন তত হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে; এবং যখন শ্রমিকসংখ্যা ৭ জন তখন অতিরিক্ত উৎপাদন ত কিছুই হয় নাই, বরং পূর্বের তুলনায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২ কুইণ্টাল কমিয়া গিয়াছে। যখন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে সুরু করে তখন হইতেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে ৪ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তর হইতেই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিয়াছে এবং ৩ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। মোট উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ৬ জন শ্রমিক নিয়োগ পর্যন্ত উহা বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রমাগত কার্য করিতে থাকায় সপ্তম শ্রমিকের নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনও কমিয়া গিয়াছে। নিম্নের চিত্রটি হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা সহজেই ধরা পড়িবে :
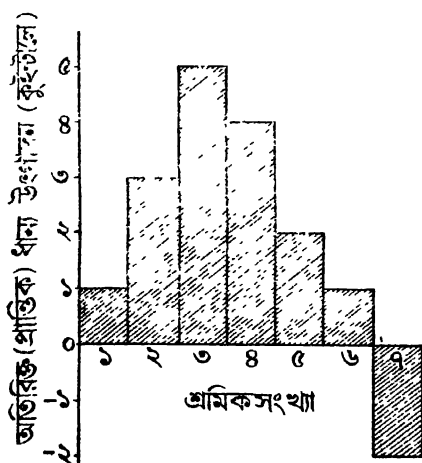
উপরের চিত্রে প্রত্যেক স্তম্ভের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে—১ জন করিয়া শ্রমিক

বাড়াইলে কত পরিমাণ অতিরিক্ত ধান্য পাওয়া যায়—অর্থাৎ, প্রত্যেকটি স্তম্ভ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাপ করিতেছে। সকল স্তম্ভ একসংগে যোগ করিলে মোট উৎপাদনের হিসাব পাওয়া যায়। সর্বশেষ স্তম্ভটি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে সপ্তম শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বাড়ে নাই, বরং কমিয়া গিয়াছে।

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা

এতক্ষণ আমরা একই জমিতে ক্রমাগত অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগের কথা বলিয়াছি। ইহাকে বলা হয় গভীর বা আত্যন্তিক চাষ (intensive cultivation)। আত্যন্তিক চাষ ছাড়া ব্যাপক চাষের extensive cultivation) ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যন্তিক চাষের দ্বারাও যখন অভাব পূরণ করা যায় না, তখন নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি চাষের অধীনে আনয়ন করিতে হয়। ইহাকে 'ব্যাপক চাষ' বলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে থাকিলে যেমন উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়, তেমনি যতই নিকৃষ্টতর জমিতে কৃষিকার্য প্রসারিত করা হয় ততই এই বিধি কার্যকর হইতে থাকে।

বিধিটি আত্যন্তিক ও ব্যাপক—উভয় প্রকার কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেই কার্যকর

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (Where does the Law of Diminishing Returns apply?): কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি প্রযোজ্য। গৃহনির্মাণের বেলায় দেখা যায় যে, বাড়ীর তলার পর তলা নির্মাণ করিয়া চলিলে এমন একসময় আসে যখন উচ্চতর তলা নির্মাণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বসবাসের অসুবিধা হয়। তাহা না হইলে কলিকাতার মত সহরে বাড়ীগুলির তলা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া বাসগৃহের অভাব সহজেই মিটানো যাইত। খনির ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য। খনি হইতে যত কয়লা তোলা হইবে খনি ততই গভীর হইবে। ফলে কয়লা তুলিবার ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, খাদ গভীর হইলে কয়লা উত্তোলনের জন্য উন্নত ধরনের সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতি টন কয়লা উত্তোলনে শ্রমিকদের অধিক সময় লাগিবে। মাছ ধরার ক্ষেত্রে বলা হয় যে, নদীতে মাছ ধরিবার জন্য যত বেশী শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় (অতিরিক্ত) মাছের পরিমাণ তত কমিতে থাকে এবং অধিক সময় ব্যয় করিয়া অনেক দূরে যাইয়া মাছ ধরিতে হয়। সুতরাং শ্রম ও মূলধন নিয়োগের তুলনায় ক্রমশ কম মাছ ধরা পড়িতে থাকে।

ইহা উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে ক্রমহ্রাসমান

উৎপন্নের বিধির জন্য সাধারণত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় (increasing cost of production) দেখা দেয়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ক্রমশ কম হারে উৎপাদন হইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলে। ধরা যাউক, চাষের জন্য মজুরি ও মূলধন বাবদ শ্রমিকপিছু খরচ হইল ৪০ টাকা। আমাদের পূর্বের ছকটিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চতুর্থ শ্রমিক নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত ৪ কুইণ্টাল ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ৪ কুইণ্টাল ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় হইল ৪০ টাকা। অর্থাৎ, প্রতি কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপাদন করিতে ১০ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে। পঞ্চম শ্রমিক নিয়োগের ফলে ২ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়। এই ২ কুইণ্টাল ধান্যের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪০ টাকা। অর্থাৎ, কুইণ্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ২০ টাকা। এইভাবে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ বাড়িয়াই চলে।

ক্রমহ্রাসমান বিধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা দেয়

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে কৃষি, খনি, গৃহনির্মাণ, মৎস্যভূমি প্রভৃতি যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতির দান বা জমির প্রাধান্য রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে প্রযোজ্য; অপরপক্ষে শিল্প-ক্ষেত্রে যেখানে মূলধনের প্রাধান্য অধিক সেখানে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কৃষি ও শিল্পে ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান—উভয় নিয়মই কার্যকর হইতে পারে। ইহাদের মতে, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়মের একটি বিশেষ দিক। কৃষি হউক আর শিল্পই হউক প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে-কোনরূপে এই উপাদানগুলির প্রযোগ করিলে কাম্যভাবে উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হয় না। উপযুক্ত অনুপাতে শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠন সংযুক্ত করা হইলে তবেই উৎপাদন সন্তোষজনক হয়।

বিবিধ কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা

উৎপাদন উপাদানের কাম্য অনুপাতই উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করে

বিভিন্ন উপাদানের সংযোগের উপযুক্ত অনুপাত কি হইবে তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কখনও বা শ্রম বাড়াইয়া, কখনও বা মূলধন বাড়াইয়া আবার কখনও বা জমি বাড়াইয়া সংগঠক 'কাম্য অনুপাত' (optimum proportion) ঠিক করিয়া লয়। যখন কোন একটি উপাদানের পরিমাণ কাম্য অনুপাতের তুলনায় কম থাকে তখন উক্ত উপাদান বৃদ্ধি করিয়া চলিলে যতক্ষণ-পর্যন্ত-না কাম্য অনুপাতে পৌছানো যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন হইতে থাকিবে। কিন্তু এই কাম্য অনুপাতে পৌছিবার পরও যদি ঐ উপাদানটি অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিক মাত্রায়

নিযোগ করা হইতে থাকে তখন উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে।

ধরা যাউক, কোন কারখানায় কাম্য উৎপাদনের জন্য ৪ কাঠা জমি, ৫০০ টাকার মূলধন, ২০ জন শ্রমিক ও ১ জন দক্ষ সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এখন অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। এই অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে। কারণ, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে দেখা যায় যে উৎপাদনের সকল উপাদানকে সমানভাবে বর্ধিত করা সম্ভব হয় না। যেমন, কোন দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে অধিক উৎপাদনের জন্য সংগে সংগেই কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন এবং সংগঠন বাড়ানো সম্ভব হয় না। তখন সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের সহিত অধিকমাত্রায় শ্রম জুড়িয়া দিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করে এবং উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কৃষির ক্ষেত্রেও শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের যে-কোনটিকে অন্যান্যগুলির অনুপাতে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কম হইবে। যেমন, শ্রম মূলধন ও সংগঠনের তুলনায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিতে থাকিবে। তবে অধিকাংশ দেশেই জমির যোগান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অপ্রচুর। অতএব, খাদ্য ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যখন সীমাবদ্ধ জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপন্ন ফসলের বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষি শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে এবং ইহা অর্থবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্র। সাধারণ সূত্র হিসাবে আমরা ইহার সংজ্ঞা এইরূপে দিতে পারি: উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে একটা সময়ের পর হইতে অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া চলিবে। অর্থাৎ, প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) ক্রমশ কমিতে থাকিবে।

উপসংহার: ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

উৎপন্নের বিধিসমূহ (Laws of Returns):

এ-পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি লইয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। অবশ্য ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিও যে অনেক সময় কার্যকর হইতে পারে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও সময় সময় সমহারে উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা দেখা যাইতে পারে। অতএব, উৎপন্নের বিধি সংখ্যায় তিনটি—(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি, (খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি, এবং (গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তিনটি উৎপন্নের বিধি

(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns): ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে ঘটিতে থাকে; এবং ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা দেয়। এই কারণে ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Increasing Cost) বলা হয়।* নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে:

ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও বলে

ধান্যের উৎপাদন	কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ কুইন্টাল	১০ টাকা
২০০ "	১২ "
৩০০ "	১৫ "
৪০০ "	২০ "

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিধিটি মাত্র কৃষি ও অনুরূপ কার্যের বেলাতেই ক্রিয়া করে না; উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার কার্যকারিতা দেখা যায়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থায় পৌছানোর পর যদি যে-কোন উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরগুলির পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া যাওয়া হয় তবে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ে উৎপাদন ঘটিতে থাকিবে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে জমি শ্রম ও মূলধন বাড়ানো সম্ভব হইলেও সংগঠক একই থাকে বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিকে ক্রিয়া করিতে দেখা যায়।

এক সময়-না-এক সময় ইহা উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই কায করে

(খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (Law of Increasing Returns): উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত যতক্ষণ কাম্য অবস্থায় না পৌছায় ততক্ষণ উহাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন ঘটে। ফলে এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এইজন্য এই সূত্রকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Decreasing Cost) বলা হয়। প্রধানত উৎপাদনের যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতির দানের প্রাধান্য নাই, সেখানেই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। তবে কৃষির বেলাতেও প্রথম প্রথম এই বিধি কার্য করিতে পারে। বিধিটিকে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া হইল:

ইহা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি নামেও পরিচিত

সিমেন্টের উৎপাদন	টন প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ টন	১০০ টাকা
২০০ "	৯০ "
৩০০ "	৮০ "
৪০০ "	৭০ "

* ৪৫ ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ততই সুবিধা পাওয়া যায়। অন্যান্যভাবেও ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে। ফলে একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ কমিয়া আসে। অবশ্য অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া এরূপ চলিতে পারে না। উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অবস্থা অতিক্রম করিলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ক্রিয়া সুরু করিবে।

বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে এরূপ ঘটিতে দেখা যায়

(গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি (Law of Constant Returns): অনেক সময় সমহারে উৎপাদন হইতে দেখা যায়। সুতরাং এককপিছু উৎপাদন-ব্যয়ও অপরিবর্তিত থাকে। ইহারও একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে:

কাপড়ের উৎপাদন	মিটার প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ মিটার	৫০ নয়া পয়সা
২০০ "	৫০ "
৩০০ "	৫০ "
৪০০ "	৫০ "

সমহারে উৎপন্নের বিধি ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির সমপ্রভাবের ফল। প্রকৃতির দানের অপ্রতুলতার জন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের দিকে যতটা ঝোঁক দেখা যায়—শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য ঠিক ততটাই ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। ফলে উৎপাদন ও উৎপাদন-ব্যয়ের হার একই থাকে।

ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান বিধির ফল সমান হইলে সমহারে উৎপাদন ঘটে

সাধারণত কৃষির ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া শুরু করিতে দেখা যায়। শিল্পক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা বহুদিন ভোগ করা যায় বলিয়া এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতে পৌঁছিতে দেরী হয় বলিয়া বেশ কিছুদিন হয় ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি না-হয় সমহারে উৎপন্নের বিধি কার্য করে। কৃষির সহিত অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের ইহাই একটি মূল পার্থক্য।

কৃষির সহিত অন্যান্য শিল্পের পার্থক্য

সংক্ষিপ্তসার

অর্থবিদ্যায় মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসিতে পারে এরূপ সকল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে সংক্ষেপে 'জমি' বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকার উর্বরতা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সকলই অর্থনৈতিক জীবনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে।

জমির বৈশিষ্ট্য: জমি বা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য উৎপাদনের অন্যতম অবদান। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান হইতে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। জমির যোগান অপরিবর্তনশীল, ২। জমির

উৎপাদন-ব্যয় নাই, ৩। জমি বিভিন্ন জাতীয়, ৪। জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না, এবং ৫। জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি: দেখা যায় যে একই জমিতে ক্রমাগত শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিয়া গেলে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বলা হয়। দুইটি কারণে অবশ্য প্রথম প্রথম অতিরিক্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধিও পাইতে পারে—যথা, (ক) যদি পূর্বে ঠিকমত কৃষিকার্য পরিচালনা করা না হইয়া থাকে, এবং (খ) যদি কৃষিকার্যে উন্নত ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তবে বলা যায় যে একসময়-না-একসময় বিধিটি কার্যকর হইবেই।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি গৃহনির্মাণ, খনিজ শিল্প, মৎস্য ধরার ব্যবসায় প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সাধারণত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় দেখা যায়। প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য নহে। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, ইহা কৃষি ও শিল্প উভয় ব্যাপারেই কার্যকর হইতে পারে। ইঁহারা বলেন যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাতই উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি নিবারণ করে। যতক্ষণ না কাম্য অনুপাতে পৌঁছানো যায় ততক্ষণ কোন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারেই উৎপাদন দেখা দিবে। কিন্তু কাম্য অনুপাতে পৌঁছিবার পরও যদি ঐ উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে শুরু করিবে।

সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অর্থবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্র। ইহা সকল প্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উৎপন্নের বিধিসংখ্যা: ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি সাধারণ নিয়ম হইলেও অনেক সময় আর দুইটি উৎপন্নের বিধিকে কার্য করিতে দেখা যায়—(১) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি, এবং (২) সমহারে উৎপন্নের বিধি। ইহাদের সহিত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি যোগ করিলে মোট উৎপন্নের বিধি সংখ্যায় তিনটি দাঁড়ায়।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Land in Economics? In what respects does it differ from other factors of production?

অর্থবিদ্যায় জমি বলিতে কি বুঝায়? কোন্ কোন্ দিক দিয়া উহা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক?

2. Explain the characteristics of Land as a factor of production.

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

3. State and explain the Law of Diminishing Returns. Is it applicable to manufacturing industries?

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিটি বিবৃত এবং ব্যাখ্যা কর। বিধিটি কি যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে কার্যকর?

4. State and explain the Law of Increasing Returns in Production.

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটি বিবৃত এবং ব্যাখ্যা কর।

5. Write a note on the Laws of Returns.

উৎপন্নের বিধিসমূহের উপর একটি টীকা রচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রম

(Labour)

মাত্র প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকিলেই চলে না, প্রকৃতির দানকে সম্পদে রূপান্তরিত করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা বা শ্রমের।

জনসংখ্যার গুরুত্ব

এই শ্রমের পরিমাণ ও দক্ষতাই হইল দেশের অগ্রগতির অন্যতম সর্ত। দেশের শ্রমিকসংখ্যা প্রধানত নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার উপর। মোট জনসংখ্যা অধিক হইলে শ্রমিকসংখ্যাও সাধারণত অধিক হইবে; জনসংখ্যা বাড়িতে কিংবা কমিতে থাকিলে শ্রমিক-সংখ্যাও বাড়িবার কিংবা কমিবার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

জনসংখ্যাতত্ত্ব (Theories of Population): দেশের পক্ষে জনসংখ্যার গুরুত্ব অনুভব করিয়া বহুদিন হইতেই পণ্ডিতদের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। দেড়শত বৎসরের উপর হইল টমাস রবার্ট ম্যালথাস (Malthus) নামক একজন ইংরাজ ধর্মযাজক 'জনসংখ্যা নীতির উপর রচনা' নামক পুস্তকে জনসংখ্যা সম্পর্কে এক তত্ত্ব প্রচার করেন।

জনসংখ্যা সম্বন্ধে ম্যালথাসের তত্ত্ব

সংক্ষেপে ম্যালথাসের বক্তব্য হইল এইরূপ: প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা এরূপ দ্রুতগতিতে বাড়ে যে ২৫-৩০ বৎসরের মধ্যেই উহা দ্বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometric progression)—অর্থাৎ, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, এই হারে বাড়িতে থাকে। অপরদিকে দেশের খাদ্যের উৎপাদন এতটা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় না। উহা বৃদ্ধি পায় পাটীগাণিতিক প্রগতিতে (arithmetical progression)—যথা, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি হারে। মন্থরগতিতে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবার হেতু হইল কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। সুতরাং দেখা যায় যে খাদ্যের

খাদ্য ও জনসংখ্যা—ম্যালথাসের তত্ত্ব
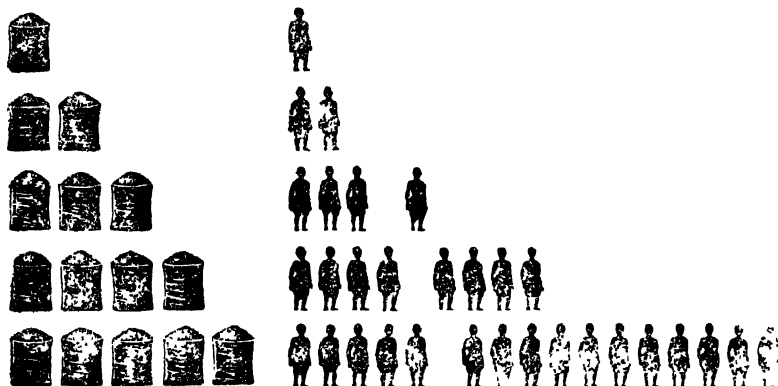
উৎপাদনবৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে না। ফলে জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য-সরবরাহ কম হইয়া পড়ে।

জনসংখ্যার পক্ষে খাদ্য কম হইয়া পড়িলে তাহাকে জনাধিক্যের অবস্থা (overpopulation) বলা হয়। খাদ্যাভাবের জন্য তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শিশুমৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং জনসংখ্যার একাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; মৃত্যুর ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এখন আবার খাদ্যের যোগান জনসংখ্যার কাছে পর্যাপ্ত হয়। কিন্তু এখানেই সমস্যার সমাধান হয় না। জনসংখ্যা আবার খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় অধিকমাত্রায় বাড়িয়া চলিতে থাকে এবং আবার রোগ, অনাহার, মহামারী প্রভৃতি আসিয়া জনসংখ্যা কমাইয়া উহাকে খাদ্য-সরবরাহের সমান করিয়া দেয়।

জনাধিক্যের অবস্থা

মহামারী, অনাহার, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে—অর্থাৎ, মহামারী, অনাহার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুঃখদুর্দশা এড়াইতে হইলে—মানুষকে স্বেচ্ছায় বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া, অবস্থা ভাল না হইলে বিবাহ একেবারে না করিয়া সন্তানসন্ততির সংখ্যা কম রাখিতে হইবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়

এই সকল স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ (preventive checks) বলা হয়। প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে মহামারী, অনাহার প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণকে রোধ করা সম্ভব। অন্যথায় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ নির্মমভাবে কার্য করিতে থাকিবে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ম্যালথাসের তত্ত্বকে একটি চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। এইরূপ চক্র ম্যালথুসীয় চক্র (Malthusian Cycle) নামে অভিহিত:

চক্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা

হইতে সুরু করা হইলেও শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহ কার্য করিতে থাকে। উহার দ্বারা বর্ধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসে। কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার জনাধিক্য দেখা যায়।

নানাভাবে ম্যালথাসের এই মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে। ম্যালথাস তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার পর দেখা যায় যে ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব, উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি, যানবাহনের উন্নতি ও নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলেই এই উন্নতি সাধিত হয়। অতএব বলা হয়, ম্যালথাস জনসংখ্যা সম্পর্কে যে হতাশাব্যঞ্জক অভিমত করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত।

ম্যালথাসের মতবাদের সমালোচনা

ম্যালথাসের মতবাদের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে কৃষিকার্যের কলাকৌশলে সুদূরপ্রসারী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল কলাকৌশল প্রয়োগের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে স্থগিত রাখিয়া খাদ্যোৎপাদন বহুগুণে বর্ধিত করা সম্ভব। অতএব, খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির সম্ভাবনা কম।

ম্যালথাস বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনার বিচার করেন নাই

(২) ম্যালথাস মাত্র খাদ্য-সরবরাহের সহিত তুলনা করিয়া জনসংখ্যার সমস্যাকে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু লোকের জীবনযাত্রার মান শুধু খাদ্য-দ্রব্যের যোগানের উপরই নির্ভর করে না। ভোগের অন্যান্য দ্রব্য—যথা, শিল্পজাত দ্রব্য, সেবা প্রভৃতির সরবরাহের উপরও নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত, সামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদন অধিক হইলে অন্যান্য দেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানি করিয়া দেশের খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। ইংলণ্ড প্রধানত তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিয়াই দেশের লোকের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে। সুতরাং, মোট জাতীয় উৎপাদন ও উহার বণ্টনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসংখ্যার সমস্যার বিচার করিতে হইবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় উৎপাদন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া উহাকে উপযুক্ত-ভাবে সকলের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে লোকের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবে।

তিনি মাত্র খাদ্য-সরবরাহের সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করিয়াছেন

জনসংখ্যার সমস্যা প্রধানত জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও বণ্টনের সমস্যা

(৩) মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে জন্মের হার কমিতে থাকে। মানুষ তখন জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য বেশী বয়সে বিবাহ

করিয়া সংসারকে ছোট রাখিতে চায়। আমাদের দেশে পূর্বে লোকে বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ করিত। এখন শিক্ষিত যুবকগণ সংসার প্রতিপালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিতে চাহে না। এই কারণে ইংলণ্ড ও অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা জনসংখ্যাহ্রাসের আশংকা দেখা দিয়াছে। অতএব, জনসংখ্যা সকল সময়েই জ্যামিতিক প্রগতিতে দ্রুত বাড়িয়া চলিবে—ম্যালথাসের এই মতবাদকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সংগে সংগে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারও কমিয়া যায়

ম্যালথাসের মতবাদের উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে খাদ্যাভাব দেখা দিতে বাধ্য। এমনকি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি-সংগঠন (FAO) ঘোষণা করিয়াছে যে সমগ্র পৃথিবীতে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্তমানে কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তর্কবিতর্কের ভিতর না যাইয়াও আমরা বলিতে পারি যে ভারতের ন্যায় অনেক স্বল্পোন্নত দেশেই জনাধিক্য রহিয়াছে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য-যোগানের ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-বিষয় সম্পর্কে একটু পরেই বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

তবুও বলা যায়, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যোৎপাদন কম বৃদ্ধি পায়

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় (Population and National Income):

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ জনসংখ্যার সমস্যাকে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে, কোন দেশের যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধনের সংগতি থাকে তাহা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইতে হইলে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। এই জনসংখ্যাকে ঐ দেশের পক্ষে 'কাম্য জনসংখ্যা' (optimum population) বলিয়া অভিহিত করা যায়। কারণ, ইহার ফলে দেশের উৎপাদনের হার ও মাথাপিছু জাতীয় আয় (per capita national income) সর্বাধিক হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধন যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে আবার জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অধিক হইলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যায়, কারণ উৎপাদন যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা অপেক্ষা অধিক হারে। একমাত্র জনসংখ্যা কাম্যাবস্থায় থাকিলেই দেশের উৎপাদন সর্বাধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে এবং মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন বা আয় সর্বাধিক হয়।

বর্তমানে জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় জনসংখ্যার বিচার করা হয়

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

বিষয়টিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে:
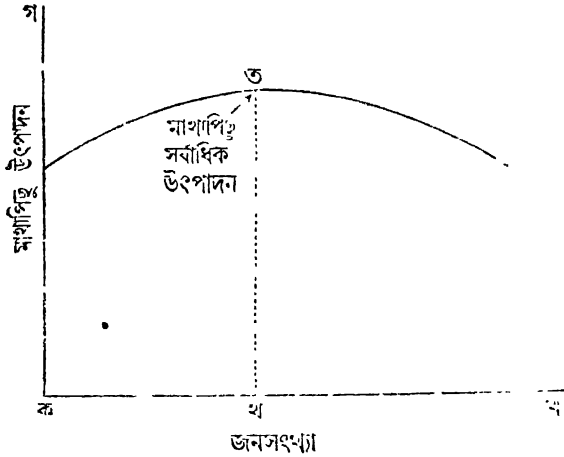
রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যা যে-পর্যন্ত-না ক খ পরিমাণ হয় সে-পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু উৎপাদন বাড়িয়াই চলে। অপরপক্ষে জনসংখ্যা ক খ পরিমাণের অধিক হইলে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। যখন জনসংখ্যা ক খ পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন বা আয় সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। অতএব, ক খ পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা।

এই মতবাদ অনুসারে যখন কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম থাকে তখন ঐ দেশটিকে জনবিরল (underpopulated) বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া। যে-পর্যন্ত-না জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে ততক্ষণ মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলেই মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে। তখন দেশে জনাধিক্য (overpopulated) ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।*

কাম্য জনসংখ্যার বিচারে জনাধিক্য ও জনবিরলতা

* একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কাম্য জনসংখ্যার এই ধারণাকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি নবাবিষ্কৃত দ্বীপে মাত্র ৫ জন লোক আছে, এবং ঐ দ্বীপের মোট উৎপাদন হইল ১০০ কুইন্টাল ধান্য। এখানে ধরা যাউক যে, ঐ ৫ জনই শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। সুতরাং দ্বীপটিতে মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় হইল ২০ কুইন্টাল ধান্য। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়া যদি ৬ জন হয় এবং মোট উৎপাদন যদি ১১৪ কুইন্টাল ধান্য হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় (১১৪ ÷ ৬ = ১৯ কুইন্টাল) হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং জনসংখ্যা কাম্য স্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ৫ হইতে কমিয়া যদি ৪-এ দাঁড়ায়, তবে মোট উৎপাদন কমিয়া ৭৬ কুইন্টালে পরিণত হইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক (২০ কুইন্টাল) অপেক্ষা কম (৭৬ ÷ ৪ = ১৯ কুইন্টাল) হইতেছে। মোট উৎপাদন ১০০ কুইন্টাল হইতে ৭৬ কুইন্টালে কমিবার কারণ হইল যে ৪ জন লোক ঐ দ্বীপের সমস্ত জমি ভালভাবে চাষ করিতে পারে না। ইহার জন্য ঠিক ৫ জন লোকই দরকার। সুতরাং ৫ জনই ঐ দ্বীপের কাম্য জনসংখ্যা। ইহাতেই মাথাপিছু আয় সর্বাধিক (আমাদের উদাহরণে ২০ কুইন্টাল) হয়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ইহা একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র, বাস্তবে ইহাকে প্রয়োগ করা কঠিন। কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যা কি, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। ইহা ছাড়া উৎপাদন-পদ্ধতি, মূলধন প্রভৃতিও পরিবর্তনশীল। এই সকল বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে কাম্য জনসংখ্যাও পরিবর্তিত হয়। যেমন, দেশের মধ্যে যদি নূতন খনির সন্ধান পাওয়া যায় তবে পূর্বের কাম্য জনসংখ্যা আর কাম্য থাকিবে না। কারণ, এখন জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়িবে।

সমালোচনা

তবে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব শিখাইয়াছে যে দেশের জনসংখ্যাকে সামগ্রিক উৎপাদনের সহিত তুলনা করিয়াই জনসংখ্যার সমস্যা বিচার করিতে হইবে। দেশের উৎপাদনের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ করিতে পারিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আশংকার কারণ থাকে না। উপরন্তু, দেশের উন্নতি হইতেছে কি না তাহা আমরা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে কতকটা বুঝিতে পারি।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের উপযোগিতা

শ্রমের যোগান (Supply of Labour): কোন দেশের শ্রমের যোগান তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—(১) জনসংখ্যা, (২) শ্রমিকের কার্যের সময়, এবং (৩) শ্রমিকের দক্ষতা।

শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

(১) জনসংখ্যা ঃ জনসংখ্যা যত অধিক হইবে শ্রমের যোগানের সম্ভাবনাও তত অধিক হইবে। জনসংখ্যা কম বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় নূতন দেশে শ্রমিকসংখ্যাও অল্প। অপরদিকে ভারতের জনসংখ্যা অধিক বলিয়া শ্রমের যোগানও অধিক। জনসংখ্যার আয়তন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার, এবং (খ) স্থানান্তরগমন (migration)। স্থানান্তরগমন বলিতে বুঝায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিদেশীদের প্রবেশ ও বসবাস সম্পর্কে নানা প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করে ; সুতরাং স্থানান্তরগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। অতএব বলা যায়, জনসংখ্যার আয়তন প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

১। জনসংখ্যার আয়তন

জনসংখ্যার আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

শ্রমের যোগান পরিমাপ করিবার সময় মোট জনসংখ্যাকে হিসাবের মধ্যে ধরিলে ভুল হইবে। জনসংখ্যার সমগ্রটাই উৎপাদনশীল কার্যে ব্যাপৃত থাকে না। একেবারে শিশু এবং অত্যধিক বৃদ্ধদের শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়া ধরা হয়। আমাদের দেশে ১৫ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্কদের শ্রমকারী জনসংখ্যা বলিয়া ধরা হয়। বিগত দুই জনগণনার হিসাব অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের কিছু বেশী লোক এই পর্যায়ে পড়িত। অবশ্য শ্রমের যোগান হিসাবের সময়

জনসংখ্যার সকলেই শ্রমের যোগান দেয় না

যে-সকল স্ত্রীলোক গৃহে পরিবারের সেবাযত্ন প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বাদ দেওয়া হয়।

(২) কার্যের সময়ঃ শ্রমশীল লোক সপ্তাহে বা দৈনিক কত ঘণ্টা খাটে তাহার উপরও শ্রমের যোগান নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা যদি এক হয় কিন্তু যদি প্রথম দেশে সাপ্তাহিক ৪০ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় দেশে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় দেশের শ্রমের মোট যোগান প্রথম দেশ অপেক্ষা অধিক হইবে। বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই শ্রমের সময় ও ছুটির দিন আইন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমের সময় অত্যধিক হইলে পরিশ্রান্ত শ্রমিকের কার্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। আমাদের দেশে কারখানায় প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের সপ্তাহে কার্য করিবার সময় ৪৮ ঘণ্টা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদের কারখানায় দৈনিক ৪½ ঘণ্টার বেশী খাটানো যায় না।

২। কার্যের সময়

(৩) শ্রমিকের দক্ষতাঃ শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে বুঝায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বা কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা। যেমন, বলা হয় যে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের কলে একজন শ্রমিক ভারতের কাপড়ের কলে নিযুক্ত ছয় জন শ্রমিকের সমান কাজ করিতে পারে। অর্থাৎ, ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের ছয় গুণ। আবার বলা হয়, একজন মার্কিন কয়লাখনি-শ্রমিক ভারতীয় কয়লাখনি-শ্রমিকের পাঁচ গুণ অধিক কয়লা উত্তোলন করিতে সমর্থ। অর্থাৎ, ঐ শ্রেণীর মার্কিন শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের পাঁচ গুণ। তবে এইভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে যন্ত্রপাতি, পরিচালনা ইত্যাদি একই প্রকারের কি না। যাহা হউক, ইহা সত্য যে কোন বিশেষ দেশে শ্রমের যোগান শ্রমিকের দক্ষতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা এক হইতে পারে, কিন্তু প্রথম দেশটির তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির শ্রমিকদের দক্ষতা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক হয় তবে দ্বিতীয় দেশটির শ্রমের যোগান অধিক হইবে। কারণ, দক্ষতা অধিক হওয়ায় দ্বিতীয় দেশে উৎপাদন অধিক হইবে।

শ্রমিকের দক্ষতা কাহাকে বলে

৩। শ্রমিকের দক্ষতা

শ্রমিকের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

শ্রমিকের দক্ষতা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(ক) জাতিগত বৈশিষ্ট্য (Racial Qualities): অনেক সময় বলা হয় যে দৈহিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষ হইল সম্পূর্ণভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এক জাতির লোক অপর এক জাতির লোক হইতে স্বাভাবিক কারণেই অধিক দক্ষ হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে সকল জাতির লোকই দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

(খ) জলবায়ু (Climate): শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতার উপর দেশের জলবায়ুরও বিশেষ প্রভাব থাকে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া শ্রম করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। অতিশয় গ্রীষ্মতাপ ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সহজেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া দেয়। এদিক হইতে ভারতের জলবায়ু শ্রমদক্ষতাকে অনেকটা ব্যাহত করে। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই অসুবিধা আর একেবারে দূরপনেয় নয়। যেমন, তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কলকারখানাগুলিতে গ্রীষ্মতাপের অসহনীয় অবস্থার অবসান করা যাইতে পারে।

জলবায়ুর প্রভাব দূরপনেয় নয়

(গ) আয় ও জীবনযাত্রার মান (Income and Standard of Living): শ্রমিকের দক্ষতার উপর তাহার আয়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আয়ের পরিমাণ দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়। অন্নবস্ত্র, আশ্রয় এবং কিছুটা আমোদপ্রমোদের জন্য আয় পর্যাপ্ত না হইলে মানুষের কর্মশক্তি ও উৎপাদন-ক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের আয় সুস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে সম্প্রতি এ-বিষয়ের প্রতি কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে এবং সমাজসেবামূলক কার্যাদি (social services) প্রসারের জন্য সরকার অধিক ব্যয় করিতেছে।

ভারতে শ্রমিকের আয়

(ঘ) কাজের সর্তাবলী (Working Conditions): যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ও সর্তাধীনে শ্রমিক কার্য করে তাহা দ্বারাও শ্রমিকের দক্ষতা প্রভাবান্বিত হয়। কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভাল হইলে, কাজের সময় অতিরিক্ত না হইলে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হইলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়। এইজন্যই কলকারখানায় প্রচুর আলোবাতাস, পানীয় জল, স্নানাগার, স্বল্প দামে পুষ্টিকর খাদ্য-সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সংগে সংগে শ্রমের সময় যাহাতে অত্যধিক না হয়, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যাহাতে বিরোধ লাগিয়াই না থাকে তাহার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতে এই সকল দিক হইতে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হইলেও অনেক কল-কারখানাতেই এখনও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শ্রমদক্ষতার পক্ষে অনুকূল নহে।

কাজের সর্তাবলী বলিতে কি বুঝায়

(ঙ) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা (General and Technical Education): শিক্ষার উপর শ্রমিকের দক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে। সাধারণ শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভংগি প্রসারিত হয়। এই সাধারণ শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কারিগরি দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। বস্তুত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পপ্রসারের অপরিহার্য সর্ত হইল কারিগরি শিক্ষার প্রসার।

সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব

(চ) উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎকর্ষ (Efficiency of Other Factors): উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান উৎকৃষ্ট ধরনের হইলেও শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃষির ক্ষেত্রে জমি যদি উর্বর হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন অধিক হইবে। অনুরূপভাবে, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উৎকৃষ্ট ধরনের
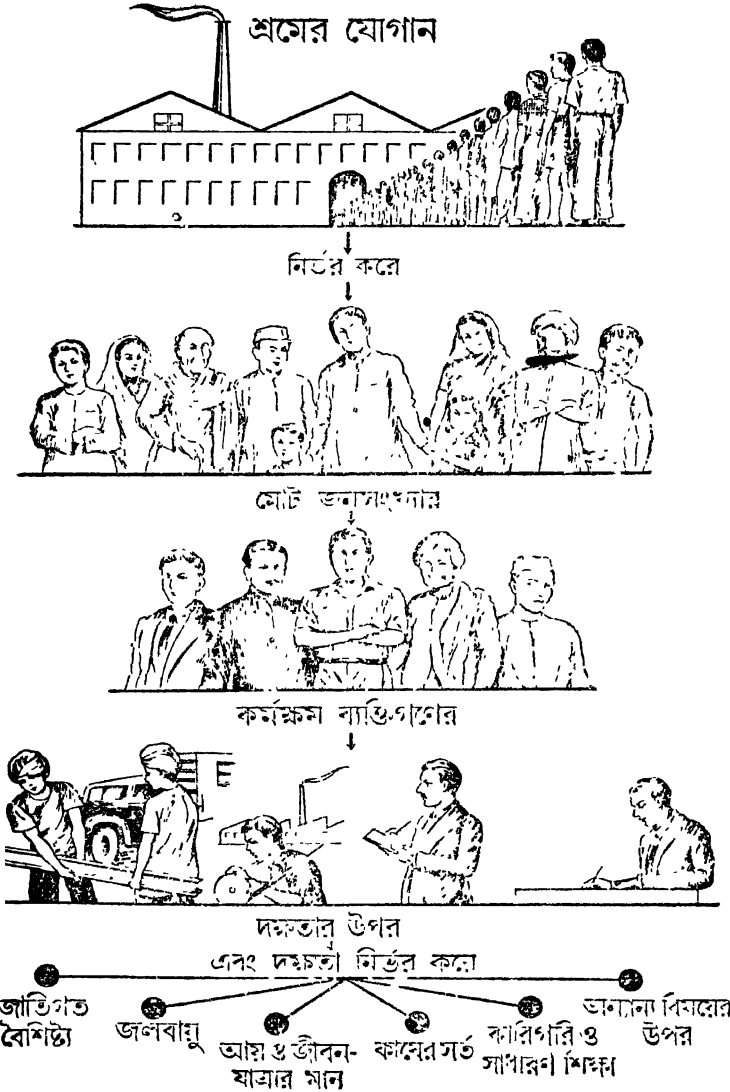
হইলে শ্রমিকের উৎপাদনও অধিক এবং উৎকৃষ্ট হইবে। এদিক হইতে ভারতীয় শ্রমিককে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পরিচালক বা কর্মকর্তার দক্ষতার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরশীল। পরিচালকের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও উদার দৃষ্টিভংগি থাকিলে শ্রমিকের উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে যে স্বল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন হয় তাহার মূলে রহিয়াছে এই সুদক্ষ পরিচালনা। আমাদের দেশে শিল্প-পরিচালনার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত শ্রমবিভাগের ফলেও শ্রমিকের দক্ষতা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানও শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ধারণ করে

(ছ) পরিশেষে, শ্রমিকের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণা যোগাইতে হইবে। ইহা করিতে হইলে কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

সম্পদ সৃষ্টি দ্বারা জাতীয় আয়বৃদ্ধি শ্রমিকসংখ্যার উপর নির্ভর করে, এবং শ্রমিকসংখ্যা নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর। সুতরাং যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব: জনসংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে—(ক) ম্যালথাসের তত্ত্ব, এবং (খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।

ম্যালথাসের তত্ত্বানুসারে যে-কোন দেশের জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদন অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিন দেশে খাদ্য-সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়ে। তখন মহামারী, অনাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য ম্যালথাসের মতে বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া, অবস্থা ভাল না হইলে আদৌ বিবাহ না করিয়া, ইত্যাদি পন্থার দ্বারা দেশের জনসংখ্যাকে কম রাখিতে হইবে।

নানাদিক দিয়া ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে—যথা, ১। তিনি বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনার কথা বিচার করেন নাই; ২। তিনি মাত্র খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করিয়াছেন; ৩। শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যে কমিয়া আসে সে-ধারণা তাঁহার ছিল না; ইত্যাদি।

তবুও বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যোৎপাদন কম বৃদ্ধি পায়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা হয়। ইহাতে যদি দেখা যায় যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতেছে তবে বুঝিতে হইবে দেশে জনাধিক্য ঘটে নাই। মাথাপিছু আয় যখন কমিতে আরম্ভ করিবে তখন হইতেই জনাধিক্যের অবস্থা সুরু হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

শ্রমের যোগান: শ্রমের যোগান নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার কর্মক্ষম ব্যক্তিগণের দক্ষতা ও কাযের সময়ের উপর। শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে বুঝায়—শ্রমিকের কার্য করিবার ক্ষমতা। এই শ্রমিকের দক্ষতা (১) জাতিগত বৈশিষ্ট্য, (২) জলবায়ু, (৩) শ্রমিকের আয় ও জীবনযাত্রার মান, (৪) কাযের সর্তাবলী, (৫) শিক্ষা, এবং (৬) উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎকর্ষ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নোত্তর

1. What did the oconomist Malthus say about population ? Do you think he was correct in his views ?

জনসংখ্যা সম্বন্ধে অর্থবিত্যাবিদ ম্যালথাস কি বলিয়াছিলেন ? তোমার কি মনে হয় তাঁহার ধারণা সত্য ?

2. Examine the connection between population and food supply.

জনসংখ্যা ও খাদ্য-সরবরাহের মধ্যে সম্পর্কের পর্যালোচনা কর।

3. What is Optimum Theory of Population ? What is the sign of over-population according to this theory ? Indicate the limitations and value of the theory.

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কাহাকে বলে ? এই তত্ত্বানুসারে জনাধিক্যের লক্ষণ কি ? তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা ও মূল্য কি তাহা দেখাও।

4. Analyse the factors that determine the supply of Labour

কোন দেশে যে যে বিষয় শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের ব্যাখ্যা কর।

5. What do you mean by efficiency of Labour ? What are the factors ...ich the efficiency of labour depends ?

শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে কি বুঝ ? কি কি বিষয়ের উপর উহা নির্ভর করে ?

•

অষ্টম অধ্যায়

মূলধন

(Capital)

আমরা দেখিয়াছি যে অর্থবিত্যায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন বলা হয়। ইহাও বলা হইয়াছে, মূলধন অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।* এইজন্য মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ('produced means of production') বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায়, যে-সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হয় তাহাকেই মূলধন বলে—যেমন, যন্ত্রপাতি, গরু-লাঙল, বীজ-সার ইত্যাদি।

মূলধন -উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একই দ্রব্য ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে মূলধন কিংবা ভোগ্যদ্রব্য হইতে পারে। যেমন, ডাক্তার যখন তাঁহার মোটরগাড়ী চড়িয়া রোগী দেখিবার জন্য বাহির হন তখন উহা মূলধন ; কিন্তু তিনি যখন ঐ গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হন তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য। কয়লা

তবে ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে

---

* ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

যখন কারখানায় ব্যবহৃত হয় তখন উহা মূলধন; কিন্তু বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য।*

তিন প্রকারের মূলধন

মূলধন তিন প্রকারের হইতে পারে—(১) বাস্তব মূলধন, (২) আর্থিক মূলধন, এবং (৩) ঋণ মূলধন।

বাস্তব মূলধন (Concrete or Real Capital): কারখানার বাড়ীঘর, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ব্যবসায়ীর মজুত মাল প্রভৃতি হইল বাস্তব মূলধন। ইহারা উৎপাদন বা ব্যবসায়ে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যবসায়ীর মূলধনও (Trade Capital) বলা হয়।

সমাজের দিক হইতে উপরি-উক্ত দ্রব্যাদি ছাড়া রাস্তাঘাট, দোকানপাট, যানবাহন, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতিকেও বাস্তব মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ ইহারাও সমাজের উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে।

আর্থিক মূলধন (Money Capital): টাকাকড়িকেই আর্থিক মূলধন বলা হয়। এই মূলধন ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন মাত্র, সমাজের দিক হইতে নহে। টাকাকড়ি যদি সমাজের দিক হইতে মূলধন হইত তবে মাত্র নোট ছাপাইয়াই যে-কোন দেশ ধনী হইতে পারিত, উৎপাদনবৃদ্ধির কোন প্রয়োজনই হইত না। জিনিসপত্রের উৎপাদন না বাড়াইয়া শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইয়া গেলে মাত্র দামই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আর্থিক মূলধন বা টাকাকড়িকে প্রকৃত মূলধনে পরিণত করিতে হইবে। ইহা করিতে পারা যায় বলিয়াই ব্যবসায়ী টাকাকড়িকে মূলধন বলিয়া গণ্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা থাকিলে সে ঐ টাকা দিয়া যে-কোন সময় যন্ত্রপাতি, কাঁচা-মাল প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারে।

ঋণ মূলধন (Loan Capital): শেয়ার, বণ্ড, সরকারী ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস সার্টিফিকেট) ইত্যাদিকে ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন বলিয়া গণ্য করা যায়, কারণ এগুলি হইতে তাহার আয় হয়। এগুলি বিক্রয় করিয়া সে প্রকৃত মূলধন-দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে পারে। সমাজের দিক হইতে এই সকল শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি কিন্তু মূলধন নহে, কারণ এগুলি দ্বারা সমাজের কোন উৎপাদনকার্য চলে না।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

অতএব, ব্যক্তির দিক হইতে প্রকৃত মূলধন, টাকাকড়ি এবং ঋণপত্র সকলই মূলধন বলিয়া গণ্য হইলেও, সমাজের দিক হইতে বাস্তব মূলধনই একমাত্র মূলধন।

সম্পদ ও মূলধন (Wealth and Capital): এখন আমরা সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই দুইটি দিক হইতে মূলধন ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করিতে পারি। সমাজের দিক হইতে সকল মূলধনই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদই মূলধন নয়। যখন কোন সম্পদ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন ঐ সম্পদ মূলধন নয়। যেমন, পূর্বের উদাহরণ অনুসারে বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন

* ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

কয়লা ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ 'সম্পদ' ভোগ্যদ্রব্য, মূলধন নয়; কিন্তু কারখানায় যখন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা মূলধন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন সম্পদ মূলধন পর্যায়ে পড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্যে ঐ সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর। সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হইলে ঐ সম্পদকে মূলধন বলিয়া ধরা হয় না; পুনরায় অন্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে তবেই ঐ সম্পদ মূলধন বলিয়া গণ্য হয়।

এখানে আরও বলা যাইতে পারে, ব্যক্তির দিক হইতে এরূপ সকল জিনিসই মূলধন যাহা দ্বারা কোন-না-কোন ভাবে তাহার আয় হয়। যেমন, টাকাকড়ি ধার দিয়া কোন ব্যক্তি আয় করিতে পারে। সুতরাং টাকাকড়ি তাহার নিকট সম্পদ এবং মূলধন উভয়ই; কিন্তু সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ কিংবা মূলধন কোনটাই নয়।*

মূলধন ও জমি (Capital and Land): মূলধন ও জমির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না তাহার আলোচনাও করা যাইতে পারে। মূলধনের সহিত জমির অনেক সাদৃশ্য আছে। মূলধন যেমন সম্পদ জমিও তেমনি সম্পদ; মূলধন যেমন অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় জমিও তেমনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা মূলধন সৃষ্টি করে। জমির বেলায় কিন্তু একথা খাটে না। জমি প্রকৃতির দান; মানুষের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহা ছাড়া জমির যোগানও অপরিবর্তনশীল—অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। অপরপক্ষে, মূলধনের পরিমাণ মানুষ নিজের চেষ্টায় বাড়াইয়া লইতে পারে। এই সকল পার্থক্যের জন্যই জমিকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করা না গেলেও উহার উৎপাদিকাশক্তিকে সেচ-ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা বাড়ানো যাইতে পারে। জমির এই বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তিকে মূলধন এবং উহার আয়কে সুদ বা মূলধনের আয় হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে।

জমির সহিত মূলধনের পার্থক্য

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital): দেখা গেল যে মূলধন—(ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আর্থিক মূলধন, এবং (গ) ঋণ মূলধন—এই তিন প্রকারের হইতে পারে। নিম্নলিখিত কয়েকভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়:

(১) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন (Private, Collective and National Capital): ব্যক্তিগত মালিকানায় যে-মূলধন থাকে এবং যাহা হইতে ব্যক্তি আয় ভোগ করে তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে; অপরদিকে সমাজের বা

১। ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন

* ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

জনসাধারণের যে-মূলধন থাকে তাহাকে সামগ্রিক মূলধন বলা হয়। সমগ্র ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক মূলধন মিলিয়া হইল জাতীয় মূলধন।

(২) স্থায়ী ও চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital) : যে-মূলধন উৎপাদনকার্যে একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় না তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে—যেমন, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অপরদিকে কাঁচামাল জ্বালানি বীজ সার প্রভৃতির ন্যায় যে-মূলধনের কার্য একবার ব্যবহারেই শেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধন পৌনঃপুনিক মূলধন (recurring capital) নামেও অভিহিত হয়, কারণ ইহা বারবার আবর্তন করিতে থাকে। যেমন, বীজ হইতে ধান্য উৎপাদন করা হইল; এখন এই উৎপন্ন ধান্য হইতে কিছু অংশ আবার বীজ বা মূলধন হিসাবে রাখিয়া দিতে হইবে। উৎপাদনকার্যে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া চলতি মূলধন একেবারেই ফেরত পাওয়া যায়; কিন্তু স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাঁতী কাপড় বুনিবার জন্য যখন সুতা ক্রয় করে তখন সে আশা করে যে একবার কাপড় বিক্রীত হইলেই উহার দাম ফেরত পাইবে। কিন্তু যে-অর্থ ব্যয় করিয়া সে তাঁত বসায় তাহা ফেরত পাইবার আশা করে কাপড় কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও বিক্রীত হইলে।

২। স্থায়ী ও চলতি মূলধন

(৩) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন (Sunk or Specific and Floating or Non-Specific Capital) : নিবদ্ধ মূলধন হইল তাহাই যাহা বিশেষ এক-প্রকার উৎপাদনকার্যেই নিবদ্ধ থাকে—যাহাকে অন্য কোনপ্রকার উৎপাদনকার্যে সহজে লাগানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, রেল-ইঞ্জিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহা মাত্র একপ্রকার উৎপাদন-কার্যেই ব্যবহার্য। আবার ক্যামেরা দিয়া শুধু ছবি তোলাই যায়। কিন্তু কয়লা বা আর্থিক মূলধন বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহারা হইল অনিবদ্ধ মূলধনের উদাহরণ।

৩। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital) :

মূলধনের প্রাথমিক কার্য হইল শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন করিলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদির উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, ২০ মাইল দূরে ১০০ কুইণ্টাল দ্রব্য লইয়া যাইতে হইবে। একজন মোটরলরী-চালক লরী চালাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু মোটরলরী ব্যবহার না করিয়া শুধু শ্রমিকের সাহায্যে এই কার্য করিতে গেলে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে এবং সময়ও অধিক লাগিবে। সুতরাং শ্রমের সহিত মূলধন—অর্থাৎ, মোটরলরী জুড়িয়া দেওয়ায় কাজ অতি দ্রুত ও অল্প পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতেছে। আবার একজন লোক

কার্যাবলী :
১। শ্রমিকের দক্ষতা-বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদন-বৃদ্ধি করা

সেলাই-এর কলের দ্বারা যত সেলাই করিতে পারে খালি হাতে তাহা পারে না। সুতরাং দেশে মূলধন যত বৃদ্ধি পাইবে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ও তত বাড়িয়া যাইবে। বর্তমানে ভারতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও যে উৎপাদন কম তাহার অন্যতম কারণ হইল মূলধনের অপ্রাচুর্য।

মোট উৎপাদন আর একটি কারণেও বৃদ্ধি পায়। ইহা হইল সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। বিভিন্ন অংশের কাজের জন্য যতই যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয় ততই উৎপাদনবৃদ্ধি হয় এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, বাটার কারখানায় জুতা তৈযারির কাজ অনেকগুলি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগের কাজের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়; ইহার ফলে স্বল্প ব্যয়ে জুতার উৎপাদনও অধিক হয়। মূলধনের ব্যবহার যতই বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ বা বিশেষিকরণ (specialisation) ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়।

২। শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধি করা

মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করে। কোন দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য মজুরি না দেওয়া হইলে উৎপাদনকার্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে না। উৎপাদক উৎপাদনের সময় মূলধনের সাহায্যে শ্রমিকদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং পরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উহা পূরণ করিয়া লয়।

৩। উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখা

পরিশেষে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহকেও মূলধনের অন্যতম কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল এই মূলধনের সাহায্যেই ক্রয় করা হইয়া থাকে।

৪। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করা

মূলধনবৃদ্ধির উপায় (Factors governing the Accumulation of Capital): আমরা দেখিয়াছি যে মূলধন প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যে-দেশে মূলধনের পরিমাণ অধিক সে-দেশের জাতীয় উৎপাদনও অধিক। আমাদের দেশ যে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনগ্রসর তাহার অন্যতম কারণ আমাদের মূলধনের সংগতি বিশেষ কম। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা, যান-বাহন প্রভৃতি বাস্তব মূলধন গড়িয়া না তুলিতে পারিলে দেশের উৎপাদন বাড়িবে না। এই সকল বাস্তব মূলধন সৃজনকেই 'মূলধন-গঠন' (capital formation) বলা হয়।

মূলধন-গঠন কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন হইল, মূলধন সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? প্রথমেই বলিতেহয় যে মূলধন সৃষ্টি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। মানুষ যখন ভবিষ্যতে অধিক ভোগের

আশায় বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখে তখনই সঞ্চয় সম্ভব হয়। অতএব বলা যায় যে, কোন দেশ মূলধনবৃদ্ধি করিতে চাহিলে ঐ দেশের অধিবাসীদিগকে বর্তমান ভোগকে সংকুচিত করিতে হইবে। বিষয়টিকে একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একটি দ্বীপে একদল লোক মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা দেখিল যে বেশী নৌকা তৈয়ারি করিতে না পারিলে অধিক পরিমাণে মাছ ধরা যাইতেছে না। সুতরাং ইহারা নৌকা তৈয়ারি করিবার সিদ্ধান্ত করিল। এখন তাহারা সকল সময় মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যয় না করিয়া কিছুটা সময় নৌকা তৈয়ারিতে নিয়োগ করিল। অথবা একদল লোক নৌকা তৈয়ারি করিতে থাকিল, আর অপর দল মৎস্য শিকারে নিযুক্ত রহিল। নৌকা তৈয়ারি না হওয়া পর্যন্ত সকল লোক মৎস্য ধরার কার্যে সকল সময়ই নিযুক্ত থাকিতে পারিতেছে না; ফলে ঐ সময় অল্প মৎস্যের দ্বারা তাহাদের জীবিকা-নির্বাহ করিতে হইতেছে। কিন্তু যখন নৌকা তৈয়ারি হইয়া গেল তখন অনেক বেশী মৎস্য ধরা পড়িতে লাগিল, ফলে পূর্বের তুলনায় ভোগের পরিমাণ অধিক হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্বীপের লোক সাময়িকভাবে ভোগ কমাইয়াছিল বলিয়াই তাহারা মূলধন হিসাবে নৌকা তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মূলধনবৃদ্ধি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর

সঞ্চয় বলিতে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকা বুঝায়

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোন কৃষক তাহার জমিতে উৎপন্ন সমস্ত শস্য খাইয়া ফেলিতে পারে অথবা সবটা না খাইয়া একাংশ জমাইয়া যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি মূলধন ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় করিতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা যে গ্রহণ করিবে ভবিষ্যতে তাহার উৎপাদন অধিক হইবে।

সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিতে দেখা যায়। দেশের উৎপাদনের উপকরণের সমস্তটাই যদি বর্তমান ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে মূলধন-দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না। বর্তমান ভোগ হইতে কতকটা বিরত থাকিলেই উৎপাদনের উপকরণের একাংশকে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়। বর্তমান সমাজে প্রায় সমস্ত কাজকারবারই টাকাকড়ি বা অর্থের মাধ্যমে চলে। কাজেই মূলধনবৃদ্ধির উপরি-উক্ত পদ্ধতিটি সহজে ধরা পড়ে না। তাহা না হইলেও মূলধন-গঠনের প্রণালী একই। লোকে যখন তাহাদের আয়ের একাংশ সঞ্চয় করে তখন তাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় হইতে বিরত থাকে। ইহার ফলে উৎপাদনের যে-সকল উপাদান ঐ সকল ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিত তাহাদের চাহিদা ও নিয়োগ কমিয়া যায়। অপরদিকে লোকে তাহাদের সঞ্চয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সরকারী ঋণপত্র, ব্যবসায় প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করে।

ব্যক্তির মত দেশকেও সঞ্চয় দ্বারা মূলধনবৃদ্ধি করিতে হয়

সঞ্চয় বিনিয়োজিত হইয়া মূলধনবৃদ্ধি করে

ইহারা লোকের সঞ্চয় লইয়া মূলধন বাড়াইবার কাজে লাগায়। ফলে উৎপাদনের যে-সকল উপাদান পূর্বে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিত তাহার একাংশ মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; এবং দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে:
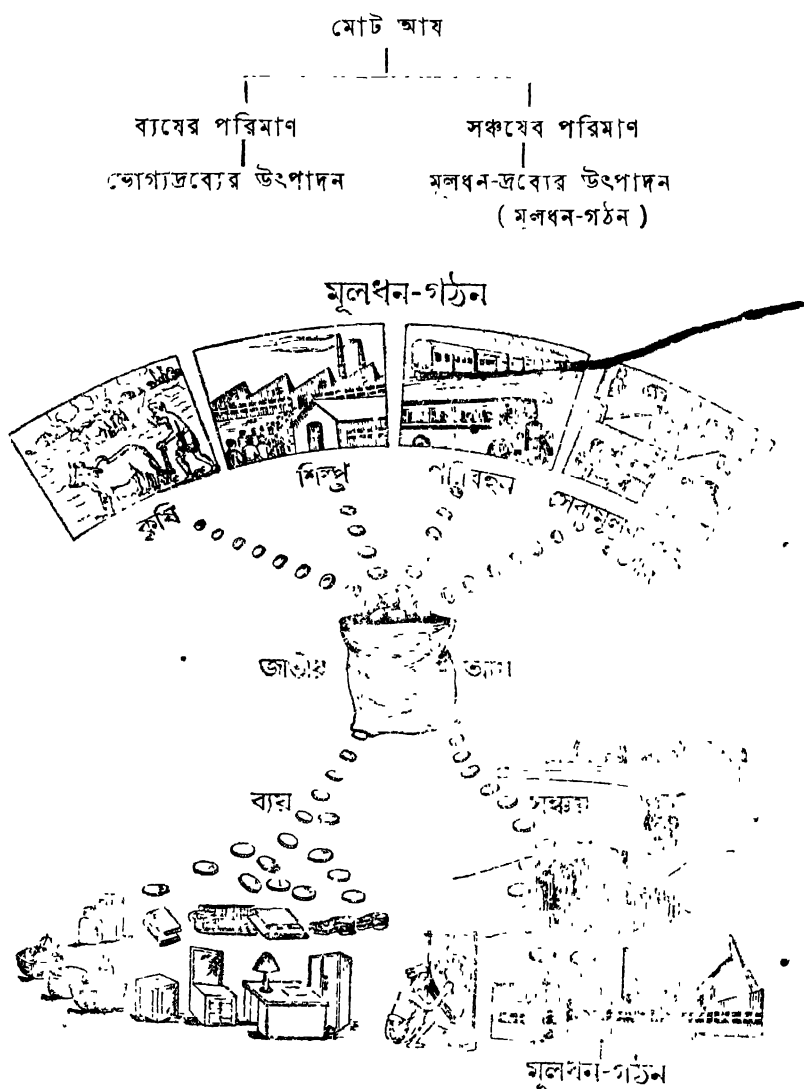
দেখা যাইতেছে, মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয় (savings) এবং ঐ সঞ্চয়ের বিনিয়োগের (investment) উপর নির্ভর করে।

সঞ্চয় দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :
১। সঞ্চয়ের ইচ্ছা,
২। সঞ্চয়ের ক্ষমতা

সঞ্চয় আবার নির্ভর করে লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (will to save) ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার (power to save) উপর।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা (Will to Save) : লোকে নানা কারণে বর্তমান ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হয়। ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা, পুত্রকন্যার শিক্ষাদীক্ষা, বিবাহাদির ব্যয়নির্বাহ, নিজের হঠাৎ মৃত্যু হইলে পরিবারের ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্য মানুষ দূরদৃষ্টিবশতঃ সঞ্চয় করে। আবার বসতবাটি নির্মাণ, মোটর-গাড়ী ক্রয় প্রভৃতি ভোগের ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অর্থশালী হইয়া সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অথবা ব্যবসায়ে সফলতালাভের উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয় করিতে মনোযোগী হয়। আবার কৃপণ ব্যক্তিরা স্বভাববশতই সঞ্চয় করিয়া চলে।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় :
১। ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি
২। সমাজে প্রতিপত্তি-লাভের ইচ্ছা

ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয়কার্য সম্পাদিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। সঞ্চয়ের এই সকল প্রেরণা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। দেশে শান্তিশৃংখলা বজায় এবং জীবন ও সম্পত্তির রক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে সঞ্চয় করিতে চাহে না। কারণ, ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন সঞ্চয় করা নিরর্থক মনে হয়।

৩। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

টাকাকড়ি বিনিয়োগ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলেও জনসাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হয়। এইজন্য দেশে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, ডাক-বিভাগের সেভিংস্ ব্যাংক প্রভৃতি যত গড়িয়া উঠে দেশের লোকের সঞ্চয়ও তত বাড়িয়া যায়।

৪। বিনিয়োগের সুব্যবস্থা

সঞ্চয় শিক্ষাবিস্তারের সহিত সম্পর্কিত। দেশে যতই শিক্ষার বিস্তার ঘটিবে লোকে ততই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হইবে; তাহাদের দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাইবে; এবং ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে।

৫। শিক্ষাবিস্তার

পরিশেষে বলা হয় যে, সুদের হারের উপরও সঞ্চয় নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে লোকে অধিক আয়ের আশায় বেশী সঞ্চয় করে।

৬। সুদের হার

সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Power to Save) : সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় করিবার জন্য লোকের আয়ের পরিমাণও যথেষ্ট

হওয়া চাই। যে-দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় সামান্য এবং অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় যোগানই কষ্টকর সেখানে লোকের সঞ্চয় করার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং আয় যত বাড়িবে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তত বাড়িবে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

উপরি-উক্ত স্বেচ্ছামূলক ব্যক্তিগত সঞ্চয় (voluntary personal savings) ছাড়া বর্তমানে সরকারও সঞ্চয় করিয়া মূলধন সৃষ্টি করিয়া থাকে। সরকার লোকের নিকট হইতে নানা প্রকারের কর আদায় করিয়া ও সরকারী কার্য পরিচালনার ব্যয় সংকুচিত করিয়া দেশের মূলধন-গঠনে সহায়তা করে।

সরকারী সঞ্চয়
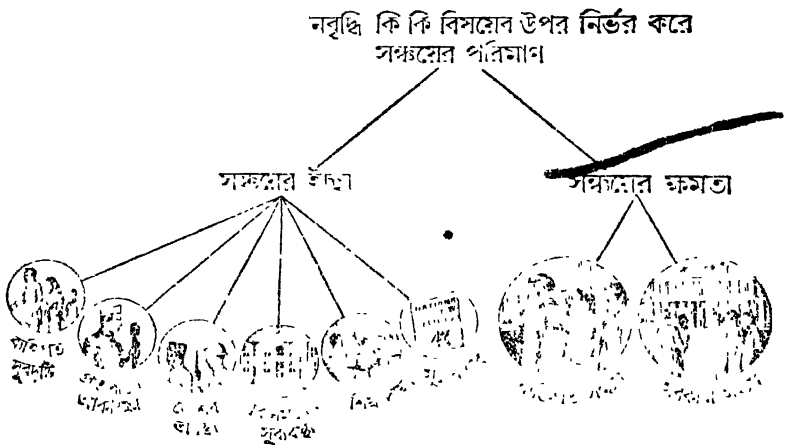
ভারতে মূলধনবৃদ্ধি (Capital Accumulation in India) : প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও জনবলে সমৃদ্ধ হইলেও ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠিত হয় নাই। কৃষির ক্ষেত্রে এখনও চাষীরা মান্ধাতা আমলের নিকৃষ্ট ধরনের বলদ ও লাঙল লইয়াই কোনরকমে চাষবাস করিয়া থাকে। বর্তমানে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও কৃষককে আকাশের দিকে বৃষ্টিপাতের জন্য চাহিয়া থাকিতে হয়। ভারত গ্রামময় হইলেও গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট অনুন্নত এবং বর্ষার সময় একপ্রকার অগম্য হইয়া পড়ে। রেল, ষ্টীমার, বিমান, মোটরবাস প্রভৃতি যানবাহনের উন্নতিবিধানের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখনও অনেক পিছাইয়া আছি। শিল্পক্ষেত্রেও আমরা যথেষ্ট বাস্তব মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। কলকারখানা যথেষ্ট পরিমাণে গড়িয়া উঠে নাই এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সত্ত্বেও মূলধন-গঠনে ভারত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে

প্রবর্তন করাও সম্ভব হয় নাই। বাসগৃহেরও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাস্তব মূলধনের সংগতি আমাদের অত্যল্প।

এখন প্রশ্ন হইল, মূলধন-গঠনের পথে প্রতিবন্ধক কি কি এবং কিভাবে ইহাদের দূর করা যায়? পূর্বেই বলিয়াছি যে মূলধন-গঠন দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। ভারতে লোকের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা অতি সামান্য; সঞ্চয় হইল আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য। অধিকাংশ লোকের আয় এতই সামান্য যে তাহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানের পক্ষেও পর্যাপ্ত নহে। যেখানে অন্নবস্ত্র ও বাসস্থান জোটানো অধিকাংশের পক্ষে কষ্টকর সেখানে কাম্য হারে সঞ্চয়ের আশা করিতে পারা যায় না।

কেন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে

১। প্রথম কারণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা

মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। শিল্পপতিগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষমতা থাকিলেও সরকার শীঘ্রই ব্যবসাবাণিজ্য কাড়িয়া লইবে এই ভয়ে তাহাদের বিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া গিয়াছে।* আবার ধনিক ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে সঞ্চয়যোগ্য অর্থের অপব্যয় ঘটিতেছে। সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবেও সাধারণ লোকের মধ্যে কতকটা অপচয়জনক ব্যয়বাহুল্য দেখা যায়। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় এইরূপ ব্যয় করা হইয়া থাকে। ইহার পর আছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। দেশের মোট আয় বৃদ্ধি পাইলেও বর্ধিত জনসংখ্যাকে খাওয়াইয়া-পরাইয়া রাখিতে ইহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। সুতরাং মূলধন-গঠনের জন্য বর্ধিত আয়ের প্রয়োগ বিশেষ সম্ভব হয় না।

সঞ্চয়ের স্বল্পতার বিভিন্ন কারণ—আয়ের স্বল্পতা-হ্রাস প্রভৃতি

ভারতে যে শুধু সঞ্চয়ের পরিমাণই অপ্রচুর তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের ব্যবহারও জাতীয় কল্যাণের অনুকূল নহে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যবসাদারেরা মালমজুত, চোরাকারবার, ফটকাবাজার প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতেছে। ইহা ব্যতীত সোনারূপা, গহনাপত্রাদিতে লোকের সঞ্চয় অকাম্যভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে।

২। দ্বিতীয় কারণ সঞ্চয়ের অপপ্রয়োগ

বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের দিকেও সেদিন পর্যন্ত এ-দেশে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই; শিল্পপতিগণ ভোগ্যদ্রব্যই উৎপাদন করিয়াছে। আর বিদেশী সরকার এ-বিষয়ে একপ্রকার উদাসীনই ছিল। সম্প্রতি অবশ্য জাতীয় সরকার পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলধন গড়িয়া তুলিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে।

বর্তমানে মূলধন-গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে

* এই ভয়কে জাতীয়করণের ভয় (fear of nationalisation) বলা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর হইতে এই ভয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, জীবনবীমা প্রভৃতির জাতীয়করণ এই ভয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার সঞ্চয়সংগ্রহ ও মূলধন-গঠনের নানা চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যে প্রথম হইল জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ। সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্ল্যান সার্টিফিকেট, প্রাইজ বণ্ড ইত্যাদিতে টাকা বিনিয়োগ করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে; গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক, ডাকঘর প্রভৃতির মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও সংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমাকে মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োগ করিতেছে; জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিয়া (nationalisation) এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্যে দেশের অর্থকে মূলধন-গঠনে নিয়োজিত করিতেছে; রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্প ও রেলপথের আয়কে পরিকল্পনার কার্যে বিনিয়োগ করিতেছে।

কিভাবে এই কার্য করা হইতেছে

১। ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহের প্রচেষ্টা

মূলধনের দ্বিতীয় সূত্র হইল কর। সম্প্রতি সরকার আয়কর, উৎপাদন-শুল্ক ছাড়াও মৃত্যুকর, মূলধন-লাভকর, ব্যয়কর, সম্পদকর, দানকর প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করিয়া শিল্পোন্নয়নকার্যে বিনিয়োগ করিতেছে। ইহা ব্যতীত বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ভোগ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়াও যাহাতে যন্ত্রপাতি অধিক আমদানি করা যায় সে-চেষ্টাও করা হইতেছে; বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য সংগ্রহ করিয়াও মূলধন-গঠনের চেষ্টা করা হইতেছে। অনেকের মতে, কৃষিতে যে অতিরিক্ত লোক আছে তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের মূলধন বাড়িয়া যাইবে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে ইহাদের পারস্পরিক সহায়তায় উৎপাদনশীল কার্যে উৎসাহিত করা হইতেছে। কিছু পরিমাণ নোট ছাপাইয়াও সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহ করিতেছে। ইহাকে 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয়' (forced savings) বলা হয়। কারণ, নোট ছাপানোর ফলে যে-মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় বলিয়া লোকে পূর্বের তুলনায় কম জিনিসপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। এইভাবে বর্তমান ভোগের হ্রাস সংঘটিত করিয়া সরকার মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে।

২। কর-পদ্ধতির সংস্কার

৩। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

৪। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য

৫। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

দেশে মূলধন-গঠনের হার কত তাহা মোটামুটি বিনিয়োগের হার হইতে নির্ধারণ করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতে বিনিয়োগের হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা শতকরা ১১ ভাগের মত দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা

১৪ ভাগ বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা সম্ভব করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮·৫ ভাগের মত সঞ্চয় সম্ভব হয়; উহাকে বাড়াইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১·৫ ভাগে লইয়া যাইতে হইবে। ইহা ছাড়াও অবশ্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। অনেকে এই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারকে অত্যধিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের ধারণা, ইহাতে লোকের দুর্দশা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে, জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ সঞ্চয় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এইরূপ ক্ষেত্রে বলা হয় যে বিনিয়োগের হার অপরিবর্তিত রাখা হউক, কিন্তু কর; মুদ্রাস্ফীতি, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে সঞ্চয়ের হার বিশেষ না বাড়াইয়া গহনাপত্র ইত্যাদিতে যে-সঞ্চয় অকাম্যভাবে আটকাইয়া আছে তাহা কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হউক এবং সংগে সংগে মালমজুত, চোরাকারবার, ফটকাবাজার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঐ টাকাও বিনিয়োগ করা হউক।

বিনিয়োগের হার মূলধন-গঠনের হারের নির্দেশক

ভারতে বিনিয়োগের হার

সংক্ষিপ্তসার

মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অর্থে জমি মূলধন নহে, কারণ উহা উৎপাদিত উপাদান (produced means) নহে; ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন নহে, কারণ উহা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেমন, কয়লা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইলে উহা ভোগ্যদ্রব্য কিন্তু কলকারখানায় ব্যবহৃত হইলে উহা মূলধন। এই কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিতে অনেকে আপত্তি করেন। ইঁহাদের মতে, যাহা কিছু উপযোগ সৃষ্টি করে—অর্থাৎ, যাহা কিছু উৎপাদনশীল, সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাই মূলধন। এইরূপ মূলধনকে বাস্তব মূলধন বলা হয়। সমাজের দিক হইতে ঘরবাড়ী, যানবাহন, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, গোলাঘর প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক হইতে বিচার করিলে তাহার কারখানাবাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হবে।

সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি মূলধন নহে; কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক হইতে টাকাকড়ি মূলধন বলিয়া গণ্য। ইহাকে আর্থিক মূলধন বলা হয়।

আর্থিক মূলধন ছাড়াও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে আর একপ্রকার মূলধনের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকে ঋণ মূলধন বলে। বণ্ড, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ।

সুতরাং, ব্যক্তিগত মূলধন তিন প্রকারের—(১) বাস্তব মূলধন, (২) আর্থিক মূলধন, এবং (৩) ঋণ মূলধন।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ: অন্যান্যভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এইরূপ অন্যতম শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধনের মধ্যে। ব্যক্তি যে-মূলধনের মালিক তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন সমাজের বা জনসাধারণের মূলধনকে সামগ্রিক মূলধন এবং সমগ্র ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মূলধনের সমষ্টিকে জাতীয় মূলধন বলা হয়।

(খ) মূলধন স্থায়ী ও চলতি—এই দুই প্রকারেরও হয়। যে মূলধন-দ্রব্য বার বার ব্যবহৃত হয় তাহাকে স্থায়ী মূলধন এবং যাহা একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে চলতি মূলধন বলে।

(গ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এইভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যে-মূলধন একটিমাত্র কার্যে নিবদ্ধ থাকে তাহাকে নিবদ্ধ মূলধন এবং যাহা বহুপ্রকার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে অনিবদ্ধ মূলধন আখ্যা দেওয়া হয়।

মূলধনের কার্যাবলী: (১) মূলধন শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, (২) ইহা শ্রমবিভাগকে সুসংহত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করে; (৩) ইহা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে; (৪) ইহা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করে।

মূলধনবৃদ্ধির উপায়: মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় হইতে মূলধন গঠিত হয়। সঞ্চয় বলিতে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকা বুঝায়। সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করিয়া তবেই মূলধন সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং মূলধন-গঠন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) সঞ্চয়, এবং (খ) বিনিয়োগ।

সঞ্চয় নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা, এবং (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা—১। ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি, ২। সমাজে প্রতিপত্তিলাভের ইচ্ছা, ৩। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, ৪। বিনিয়োগের সুব্যবস্থা, ৫। শিক্ষাবিস্তার, এবং ৬। সুদের হার—এই কয়টি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

(খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ভারতে মূলধনবৃদ্ধি: প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ভারত মূলধন-গঠনে অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার প্রথম কারণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা। সঞ্চয়-স্বল্পতার মূলে রহিয়াছে স্বল্পতা, সঞ্চয়ের ইচ্ছাহ্রাস ইত্যাদি। দ্বিতীয় কারণ সঞ্চয়ের অপপ্রয়োগ। বর্তমানে [illegible] মূলধন-গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে (১) অর্থসংগ্রহ করা হইতেছে, (২) কর-পদ্ধতির সংস্কার করা হইতেছে, (৩) অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে, (৪) বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণের প্রচেষ্টা করা হইতেছে, এবং (৫) বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

দেশে মূলধন-গঠনের হার মোটামুটি নির্ধারণ করিতে পারা যায় বিনিয়োগের হার হইতে। ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে বিনিয়োগের হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগের মত দাঁড়ায় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগে পৌঁছিবে আশা করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define Capital and state the functions of Capital as a Factor of Production. (S. F. 1959)

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের কার্যাবলী উল্লেখ কর।

[ইংগিত: মূলধন 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'। ব্যক্তির দিক হইতে যাহা আয় সৃষ্টি করে তাহাই মূলধন; সমাজের দিক হইতে যাহা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় তাহাই মূলধন।... ৬১-৬২ এবং ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা।]

2. How would you define Capital? Distinguish between (a) Concrete or Real Capital, (b) Money Capital, and (c) Loan Capital.

কিভাবে মূলধনের সংজ্ঞা প্রদান করিবে? (ক) বাস্তব মূলধন (খ) আর্থিক মূলধন, এবং (গ) ঋণ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [৬১-৬২ পৃষ্ঠা]

3. Define Capital and point out how it helps production. (C. U. 1954 ; H. S. (H) Comp. 1961)

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং মূলধন কিভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সাহায্য করে তাহা দেখাও।

[৬১-৬২ এবং ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা]

4. What is Capital? What are the factors upon which the accumulation of Capital depends? (H. S. (H) Comp. 1962)

মূলধন কাহাকে বলে? কি কি বিষয়ের উপর মূলধনবৃদ্ধি নির্ভর করে?

[ইংগিত: মূলধনবৃদ্ধি (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া যে যে বিষয় ইহাদের বৃদ্ধিসাধন করে তাহাই মূলধনবৃদ্ধির সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক

অবস্থা, বিনিয়োগের সুব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার, জাতীয় আয় প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।...৬১-৬২ এবং ৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা]

5. Explain the functions of Capital. What are the conditions favourable for the formation of Capital in a country?

মূলধনের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। কোন্ কোন্ বিষয় দেশে মূলধন-গঠনের (মূলধনবৃদ্ধির) সহায়ক?

6. Distinguish between (a) Fixed and Circulating Capital, (b) Sunk and Floating Capital.

(ক) স্থায়ী ও চলতি মূলধন, (খ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

7. What are the factors that hinder the growth of Capital in India? What measures have been adopted to remove these hindrances?

ভারতে মূলধনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকগুলি কি কি? ইহাদের দূরিকরণের জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে?

8. What is Capital? What measures would you adopt to increase the accumulation of Capital in India?

মূলধন কাহাকে বলে? ভারতে মূলধনবৃদ্ধির জন্য কোন কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বল?

9. Explain with an example how Capital results from saving. Mention some factors which encourage people to save.

সঞ্চয় হইতে কিভাবে মূলধনবৃদ্ধি ঘটে উদাহরণের সাহায্যে তাহা ব্যাখ্যা কর। লোককে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে এরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কর।

নবম অধ্যায়

বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

(Large and Small-scale Industries)

বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিল্পসমূহ বৃহদায়তনে সংগঠিত হইবার দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বৃহদায়তনেই সংগঠিত হইয়াছে। ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা, বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসাবাণিজ্য।

বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ

বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ—(ক) শ্রমবিভাগ, (খ) যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং (গ) বিক্রয়বাজারের প্রসার।

ইহার মূলে আছে
১। শ্রমবিভাগ,
২। যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং
৩। বিক্রয়বাজারের প্রসার

শ্রমবিভাগ (Division of Labour): শ্রমবিভাগ প্রথমে সুরু হয় পেশা বা কর্মবিভাগ হিসাবে। আদিমতম যুগে কর্মবিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠীর সকলে মিলিয়া পশুপক্ষী শিকার ও ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহার পর কৃষিকার্য সুরু ও গ্রাম-ব্যবস্থার

উদ্ভব হইলে ধীরে ধীরে কর্মবিভাগ দেখা দিল। কতক লোক মাত্র কৃষিকার্যেই নিযুক্ত রহিল, আবার কতক লোক সংগে সংগে অন্যান্য পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে কৃষিকার্য ছাড়িয়া তাহাদের বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিল। যেমন, যে-ব্যক্তি লাঙল তৈয়ারি করিত, সে শুধু লাঙল তৈয়ারিতেই নিযুক্ত রহিল। এইভাবে যে পেশাগত বিভিন্নতা বা কর্মবিভাগ সুরু হইল সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে তাহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। ফলে একদিন গড়িয়া উঠিল অসংখ্য পেশার ভিত্তিতে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা। বর্তমান দিনে কেহই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন করে না। ইহার পরিবর্তে সাধারণত একটিমাত্র পেশা অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনে নিযুক্ত থাকে, এবং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক মাত্র শিক্ষকতার কাজেই নিযুক্ত থাকেন এবং ইহার বিনিময়ে যে-অর্থ পান তাহা দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন।

শ্রমবিভাগের সূত্রপাত ও প্রসার

বর্তমান শ্রমবিভাগ ও বিনিময়-ব্যবস্থা

কিন্তু বিভিন্ন পেশায় উৎপাদনকার্যের বিভাগই শ্রমবিভাগের শেষ কথা নয়। শ্রমবিভাগ আরও অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি পেশাও আবার বিভিন্ন অংশ বা প্রক্রিয়ায় (process) বিভক্ত। পূর্বে চিকিৎসককে—যেমন, কবিরাজ বা হকিমকে—রোগনির্ণয়, ঔষধপত্র তৈয়ারি, ঔষধপত্র প্রদান সকল কার্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইত। বর্তমানে চিকিৎসক রোগনির্ণয় করিয়া ব্যবস্থাপত্র (prescription) লিখিয়া দিয়াই ক্ষান্ত। ঔষধ তৈয়ারি ও ঔষধ প্রদানের ভার হইল অন্যান্য শ্রেণীর লোকের উপর।* জুতা তৈয়ারির উদাহরণও লওয়া যাইতে পারে। পূর্বে জুতা তৈয়ারির জন্য চর্মকারকে চর্ম সংগ্রহ করিতে হইত। এখন চর্ম সংগ্রহ করে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করে দ্বিতীয় একদল লোক এবং প্রকৃত জুতা তৈয়ারি করে আর একদল লোক। আবার বাটা কোম্পানীর মত জুতার কারখানায় মাত্র জুতা তৈয়ারির কার্যই শতাধিক ক্ষুদ্রতর প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। কেহ শুধু গোড়ালি লাগায়, কেহ বা শুধু ফিতা পরায়, কেহ বা মাত্র চারিটি করিয়া পেরেক বসায়, ইত্যাদি। অর্থবিদ্যার জনক অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারির কার্য ১৮টি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। এই বিংশ

বর্তমান শ্রমবিভাগ—প্রত্যেক পেশা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত

উদাহরণ

* অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য চিকিৎসক এখনও নিজে ঔষধ দিয়া থাকেন, কবিরাজ বা হকিম নিজে ঔষধপত্র তৈয়ারিও করিয়া থাকেন। তবে গতি হইল চিকিৎসার কার্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হওয়ার দিকে।

শতাব্দীর এই সময় বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্যও আছে।

শ্রমবিভাগের কতকগুলি সুবিধা সহজেই অনুধাবন করা যায়। শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্পবাণিজ্যের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। উদাহরণ দিয়া একজন অর্থবিদ্যাবিদ বলিয়াছেন যে ইঞ্জিন-নির্মাতা, ইঞ্জিন-চালক, গার্ড, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে যদি শ্রমবিভাগ না থাকিত তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা কখনও রেলগাড়ী চালানো সম্ভব হইত না। আবার ইঞ্জিন নির্মাণের কার্যও যদি মাত্র একজনকে করিতে হইত তবে কখনই ইঞ্জিন নির্মিত হইত না। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি

শ্রমবিভাগের সুবিধা

করিয়া থাকে। অ্যাডাম স্মিথ দেখাইয়াছিলেন যে কোন লোকই সকল কার্যের জন্য সমান উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে। তৃতীয়ত, একই কার্যে মনোনিবেশ করার জন্য সে পারদর্শিতাও লাভ করে। চতুর্থত, শ্রমিককে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে হয় না বলিয়া সময়ও বাঁচে। পঞ্চমত, শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতে থাকে। পরিশেষে, এই সকল সুবিধার সমন্বয়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং শ্রমিককে অধিক মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়।

অবশ্য শ্রমবিভাগের অসুবিধাও আছে। প্রথমত, অতি সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে; তাহার অন্য কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। দৈনিক সহস্র সহস্র জুতার গোড়ালি লাগানো যাহার কাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ জুতা নির্মাণ করা আর সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্য-বিহীন একই ধরনের কাজ শ্রমিকের মনের উপর আঘাত করে বলিয়া তাহাকে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, শ্রমিক যে-দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহার চাহিদা কমিয়া গেলে শ্রমিকের পক্ষে বেকার হইয়া পড়িবার আশংকা থাকে। পরিশেষে, শ্রমবিভাগের জন্য অসংখ্য শ্রমিক অসংখ্য রকমের কাজ করে বলিয়া পরিচালকগণের পক্ষে তাহাদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা

যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Use of Machinery): শ্রমবিভাগের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতেছে। অপরদিকে আবার নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেছে। উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে যে-সকল সুবিধা হয় তাহাদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) শক্তি (power), এবং (খ) সূক্ষ্মতা (precision)।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমবিভাগের সহিত জড়িত

যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনকার্যে মানুষের শক্তি নানাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। জলস্রোত ও কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, অণু হইতে আণবিক শক্তির সৃষ্টি প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ নদী সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি সকল প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করিয়াছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে মানুষের পেশীর উপর চাপও কম পড়িতেছে। তাজমহল নির্মাণে মানুষকে পেশীর দ্বারা যত বড় পাথর তুলিতে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় পাথর আজ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা সূক্ষ্ম, নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ একই প্রকার জিনিসপত্রও তৈয়ারি করা

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা

সম্ভব হইতেছে। পরিশেষে, যন্ত্রপাতির দ্বারা অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও করা যায়।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অসুবিধা

যন্ত্রপাতির ব্যবহারের অবশ্য অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে শ্রমিকও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। তাহার পেশীর উপর চাপ কমিলেও মনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় শ্রমিক ইহা সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি আবার প্রথম প্রথম শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিয়া বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। অবশ্য পরে ঐ নূতন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা গড়িয়া উঠিলে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের অধিকাংশ পুনর্নিযুক্ত হয়। আরও বলা যায় যে কদর্য কারখানা-জীবন, বৈচিত্র্যবিহীন পরিশ্রম ইত্যাদি যেমন শ্রমবিভাগের ফল তেমনি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও ফল।

একদেশতা কাহাকে বলে।

শিল্পের একদেশতা (Localisation of Industries) ঃ শ্রমবিভাগ দুই প্রকারের হয়—(ক) ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ বা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রমবিভাগ (individual division of labour), এবং (খ) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমবিভাগ (territorial division of labour)। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগকে 'শিল্পের একদেশতা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একটি শিল্প যদি দেশের এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় তাহাকে শিল্পের একদেশতা বলে। পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প, বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কল শিল্প প্রভৃতি এই একদেশতার উদাহরণ। ভারতের পাটকলের অধিকাংশ পশ্চিমবংগেই অবস্থিত। কাপড়ের কলের বেশীর ভাগ বোম্বাই ও আমেদাবাদে অবস্থিত।

একদেশতার কারণ

একদেশতার প্রধান কারণ হইল ব্যয়সংক্ষেপের (economies) জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ। এই ব্যয়সংক্ষেপের জন্য তাহারা সুবিধাজনক স্থানে গিয়া ভিড় করে; ফলে শিল্পটি ঐ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। নানা কারণে কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর ধারে পাটকল স্থাপন করা সুবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে পাটকল শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

যে যে কারণে শিল্পের একদেশতা ঘটে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) কাঁচামালের সান্নিধ্য (Nearness to Raw Materials) : যে-অঞ্চলে কাঁচামাল পাওয়া যায় তাহার নিকটবর্তী স্থানেই শিল্পটি গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলাদেশে পাট পাওয়া যায় বলিয়াই কলিকাতার নিকট পাটকল শিল্পের একদেশতা ঘটিয়াছে; ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ভাল তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়াই বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(২) জলবায়ু (Climate): জলবায়ুও আর একটি কারণ। ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মূলে আছে ঐ অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু।

(৩) শক্তির সান্নিধ্য (Nearness to Power): শক্তিসম্পদের সুযোগ লাভ করিবার জন্যও শিল্পের একদেশতা ঘটে। লৌহ শিল্প কয়লাখনির নিকটেই গড়িয়া উঠে।

(৪) বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য (Nearness to Market): প্রাচীনকালে রাজদরবারের নিকটবর্তী স্থানেই বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যাইত। অন্যান্য সুবিধা না থাকিলেও একমাত্র বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যই শিল্পের একদেশতার কারণ হইত। ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক ও বাসনপত্র শিল্পের একদেশতার কারণ ছিল ইহাই। বর্তমানেও দেখা যায় যে বিক্রয়বাজারের সুবিধালাভ করিবার জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকট কেন্দ্রীভূত হইতেছে।

(৫) অন্যান্য কারণ (Other Reasons): অনেক সময় বন্দর, রেলপথ ও বাজারের সুবিধা লাভ করিবার জন্যও শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। মোটকথা শিল্পের একদেশতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইল বহন-ব্যয় (transport cost) জনিত সুবিধা।* যে-স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে কাঁচামাল ইত্যাদি লইয়া আসা ও নির্মিত দ্রব্য বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, শিল্পপতিগণ অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হয়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার।

একদেশতার ফলে শিল্পের নানা সুবিধা হয়। প্রথমত, অনেক দক্ষ শ্রমিক ঐ স্থানে আসিয়া কর্মপ্রার্থী হয় বলিয়া শ্রমিকসংগ্রহ করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান একসংগে গড়িয়া উঠে বলিয়া যানবাহন ইত্যাদির সুবিধা পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, নানা সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে।

একদেশতার সুবিধা

ইহাতে উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুবিধা হয়। চতুর্থত, শিল্পের একদেশতা ঘটিলে ঐ স্থানে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও গড়িয়া উঠে। পরিশেষে, ঐ স্থানের শিল্পের সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, মুর্শিদাবাদের শিল্কের শাড়ী ক্রয় করিবার সময় লোকে কোন্ কারখানায় বা কোন্ তাঁতীর তৈয়ারি তাহা খোঁজ করে না।

একদেশতার কিন্তু একটি বিশেষ বিপদ আছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প যে-দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার চাহিদা যদি বিশেষ কমিয়া যায় তবে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক বেকার-সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশবিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ হ্রাস পাইলে পশ্চিমবংগের পাটকল-

একদেশতার বিপদ

গুলির অধিকাংশ বন্ধ হইয়া পাটকল-শ্রমিকদের মধ্যে অনেক বেকারের সৃষ্টি করিবে।

* "The location of manufacturing industries may be influenced by many factors but often the dominant influence is transport costs."

বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industry) : শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অন্যতম অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বৃহদায়তন শিল্প যাহাকে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার অংগ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যন্ত্রপাতি ও শ্রমিককে যদি পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতেই হইবে। বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রপাতি নিয়োগের সুবিধা উপস্থিত হয়। ফলে শিল্প বৃহত্তর আকার ধারণ করে।

শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভবের কারণ

বৃহদায়তনে উৎপাদন বা বৃহদায়তন শিল্পের দিকে বর্তমানে যে-গতি লক্ষ্য করা যায় তাহার তৃতীয় কারণটিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার। বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামের বাজারের মত বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হয় নাই। কারণ, সংকীর্ণ বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বিক্রয়-বাজারের প্রসার—এই তিনটি বিষয়ই শিল্পকে বৃহদায়তনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয় কারণ বিক্রয়-বাজারের প্রসার

বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা : শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-সকল সুবিধা হয় তাহা সকলই বৃহদায়তন শিল্প ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থসংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়।

তিন প্রকারের সুবিধা :

(ক) উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা : উৎপাদন ব্যাপারে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক। উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা

(১) সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের জন্য যে-ব্যক্তি যে-কার্যের উপযুক্ত তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরও (specialised experts) নিয়োগ করা যাইতে পারে।

১। পূর্ণ নিয়োগ

(২) শিল্পের মোট উৎপাদন-ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—যথা, ধার্য ব্যয় (fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost)। কারখানার জন্য যে-জমি লওয়া হইয়াছে তাহার খাজনা, কারখানাগৃহ, অপরিহার্য যন্ত্রপাতি, ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি এই ধার্য ব্যয়ের মধ্যে পড়ে। অপরদিকে কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি হইল পরিবর্তনশীল ব্যয়। ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির সমানুপাতে ধার্য ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে না বলিয়া দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কম হয়।

২। ধার্য ব্যয় হ্রাস

(৩) একসংগে বহু পরিমাণে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা হয় বলিয়া দামের দিক দিয়া সুবিধা পাওয়া যায় এবং একসংগে অনেক মাল লইয়া আসিলে পরিবহণ-ব্যয়ও কম পড়ে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান মালপত্র কেনা ও পরিবহণ ব্যাপারে পাইকারী দরের যে সুবিধা পায় তাহা ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না।

৩। মাল কেনার সুবিধা

৪। যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ

(৪) নূতন নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া ক্রমাগত ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা করা যায়।

(৫) উপজাত দ্রব্য (by-products) হইতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছোট ছোট কারখানায় চিনি উৎপাদনের সময় অনেকটা রস নষ্ট হয়। বড় বড় কারখানায় এই রস হইতে জ্বালানির জন্য একরূপ স্পিরিট তৈয়ারি করা হয়।

৫। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার

৬। গবেষণা

(৬) বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহু অর্থব্যয়ও করিতে পারে।

(খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা : বিক্রয় ব্যাপারেও বৃহদায়তন শিল্পের অনুরূপ কয়েকটি সুবিধা দেখা যায়। ইহা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে মাল বহন করিয়া বাজারে দিতে পারে; অনেক দ্রব্য একসংগে বিক্রয় হয়
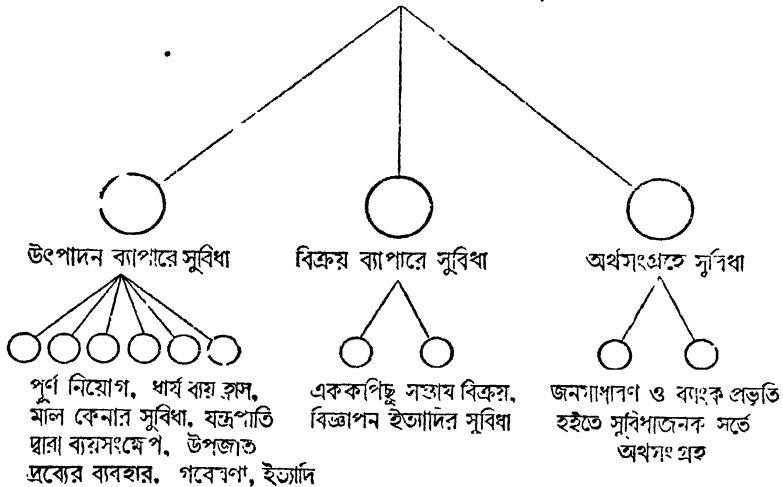
বলিয়া এককপিছু কিছু সুবিধা দিলেও মোট লাভ অধিক থাকে। ইহা ছাড়াও বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন, ক্যানভাসার নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে পারে। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে—যেমন, বাটার জুতা বাটার ছাতার বিজ্ঞাপনের কাজ করে।

খ। বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা

(গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা: বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক সর্তে অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, মহাজন প্রভৃতি যত অল্প সুদে এবং সহজ জামিনে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয় ছোট ছোট ব্যবসায়ীকে তাহা দেয় না।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (External and Internal Economies): বৃহদায়তনে উৎপাদনের উপরি-বর্ণিত সুবিধাসমূহকে সংক্ষেপে 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' (economies of scale) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মার্শাল ইহাদিগকে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (external economies) এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (internal economies)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

আয়তনজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ

বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের উদ্ভব হয় প্রধানত একদেশতার জন্য।* কোন শিল্প (industry) বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (firm) আয়তন সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, শিল্পের আয়তন সম্প্রসারণের ফলে এই ব্যয়সংক্ষেপ কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান এককভাবে ভোগ করে না, সংগে সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও উহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, পশ্চিমবংগে হুগলী নদীর দুই তীরে যে অসংখ্য পাটকল-শ্রমিক আসিয়া হাজির হয় তাহার সুবিধা কোন পাটকল এককভাবে ভোগ করে না, সকল পাটকলই ঐ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আবার কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও উহা অপরের আয়তনবৃদ্ধির দরুন ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। জামসেদপুরে টাটার কারখানা সম্প্রসারণের দরুন নূতন কোন রেললাইন পাতা হইলে ঐখানে যে টিন-পাত শিল্প আছে তাহারও পরিবহণজনিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে।

ক। বাহ্যিক ব্যয়-সংক্ষেপ

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা শিল্প-প্রতিষ্ঠান কিন্তু এককভাবে ভোগ করে। ইহা দেখা দেয় কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ঘটিলে উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে

* "External economies are those that arise from the localisation of industries."

কাঁচামাল কিনিতে পারে, অপেক্ষাকৃত কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে পারে, উপজাত দ্রব্য হইতে নূতন বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, দক্ষ ম্যানেজার ও কর্মী নিয়োগ করিতে পারে, ইত্যাদি।

খ। আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industry): বৃহদায়তন উৎপাদনের উপরি-উক্ত সুবিধা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে। শুধু টিকিয়া আছে বলিলে অবশ্য ভুল হইবে, অনেক ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। ইহার কারণ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ কতকগুলি অসুবিধা বা সীমাও আছে। এই অসুবিধাগুলিই ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধা হিসাবে দেখা দেয়।

প্রথমত, কতক প্রকারের জিনিসপত্র বহুল অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন করিলেই অধিক সফলতা লাভ করা যায়। যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল তাহাদিগকে বৃহদায়তন শিল্পে বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। এইজন্য দেখা যায় যে বাজারে 'রেডিমেড' পোশাকের প্রাচুর্য সত্ত্বেও দর্জির দোকানের সংখ্যা কমে নাই। অনেক দ্রব্য নির্মাণে আবার ব্যক্তিগত নিপুণতার প্রয়োজন হয়। ইহাদিগকেও বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরী শালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং বৃহদায়তনে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ব্যক্তিগত চাহিদার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাজার আবার ভৌগোলিক কারণেও সীমাবদ্ধ হয়। কাঁচা দুধ, মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি অধিকাংশ মাত্র স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করা চলে। এইজন্য এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অতি বৃহদায়তন হইতে পারে না। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তনই শ্রমবিভাগ বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে।*

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা:

১। সকল দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক সকলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে। ইহার ফলে কাঁচামাল সরবরাহকারী ঠকাইতে পারে না, শ্রমিক ঠিকমত কাজ করে, খরিদ্দারের যত্ন লওয়া সম্ভব হয়, ইত্যাদি।

২। ক্ষুদ্র শিল্পে মালিকের দৃষ্টি সর্বত্র থাকে

তৃতীয়ত, পরস্পরের নিকট থাকিয়া কাজ করার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়িয়া উঠে।

৩। মালিক-শ্রমিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক

---

* Division of labour is limited by the extent of the market.

চতুর্থত, পরিচালনার দিক দিয়াও ক্ষুদ্র শিল্পের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের পরিচালনা-ব্যবস্থা অতি জটিল। ইহা রুটিন-পদ্ধতিতেই চলে। ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা বিলম্ব হয়, নানারূপ অপচয় ঘটে এবং ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের এই অসুবিধা নাই। ইহাতে মালিক বা পরিচালক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

৪। পরিচালনার সুবিধা

পঞ্চমত, ব্যবসায়ের আয়তন একটা সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহা পরিচালনা করা দুষ্কর হইয়া পড়িতে পারে—কারণ, লোকের পরিচালনক্ষমতার একটা সীমা আছে। এইরূপ ঘটিলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইতে পারে।* পরিচালক প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে অথবা প্রয়োজনমত শ্রমিক নিয়োগ করিতে না পারিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। অনেক সময় এই মূলধন সংগ্রহ করার অসুবিধার জন্যই ব্যবসায়ের আয়তনকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

ক্ষুদ্র শিল্পে কিন্তু এই অসুবিধা নাই। অল্প লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার পক্ষে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাত নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ইহা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে এড়াইয়া চলিতে পারে।

৫। ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের বিধির ভয় নাই

পরিশেষে, বৃহদায়তনে উৎপাদন সর্বদা বাজারে চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। নচেৎ, উৎপন্ন দ্রব্য অবিক্রীত থাকার ফলে শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে এ-সমস্যা কিন্তু অতটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করে; সুতরাং চাহিদার সামান্য হ্রাসবৃদ্ধিতে তাহার বিশেষ কিছু যায় আসে না। কোন বৎসরে পূজার সময়ে জুতার চাহিদা পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গেলে বাটা কোম্পানীর যতটা ক্ষতি হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুতা নির্মাতাদের ততটা ক্ষতি হয় না।

৬। বাজারের সামান্য পরিবর্তনেও ইহার কিছু যায় আসে না

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এই সকল সুবিধা বা বৃহদায়তন শিল্পের এই সকল অসুবিধার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি অতি শিল্পোন্নত দেশেও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষুদ্রায়তন। জাপানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হইল শতকরা

এই সকল সুবিধার জন্যই ক্ষুদ্র শিল্প স্থানচ্যুত হয় নাই

* ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা দেখ। সেখানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে জমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের মধ্যে অনুপাত অকাম্য হইলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়।

৮০ ভাগ। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা শতকরা ৯৫-৯৮ ভাগের মত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নের সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৬০-৬১ সালে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ১৩০০ কোটি টাকার মত দ্রব্য উৎপাদন এবং ৩৬ লক্ষ লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ২০০ কোটি টাকার মত কম হইলেও উহাদের নিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ কোটি লোক। মাত্র তুলাতাঁত শিল্পেই (handloom industry) নিযুক্ত লোকের সংখ্যাই ছিল সকল বৃহদায়তন কলকারখানা খনি এবং চা কফি ইত্যাদির ন্যায় রোপণ শিল্পে (plantation industries) নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার সমান। অতএব, উৎপাদন ও নিয়োগ—উভয় দিক দিয়াই আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদন করে, কিন্তু কুটির শিল্পে পরিবারের লোকেরাই প্রধানত শ্রমের যোগান দেয়।

ভারতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Large and Small-scale Industries of India) :

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত সমগ্র পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই বিচার করা হইয়াছিল মোট উৎপাদন ও মোট শ্রমিক নিয়োগের দিক হইতে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে যে-পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইত এবং ভারতের কলকারখানাগুলিতে যত সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, মাত্র আর সাতটি দেশে তাহা অপেক্ষা অধিক উৎপাদন ও অধিক শ্রমিক নিয়োগ দেখা গিয়াছিল। তবুও ভারতের শিল্পোন্নয়ন যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। প্রথমত, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবলের তুলনায় শিল্পোৎপাদন ছিল সামান্যই। দ্বিতীয়ত, মাথাপিছু শ্রমিকের উৎপাদন-হারও ছিল অতি অল্প। তৃতীয়ত, উৎপাদন-ব্যয় ছিল অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক। চতুর্থত, শিল্প-ব্যবস্থা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্পগুলিই সম্প্রসারিত হইয়াছিল; লৌহ ও ইস্পাত, ভারী রসায়ন প্রভৃতি মূল শিল্পগুলি (basic industries) তেমন গড়িয়া উঠে নাই। ইহার উপর আবার শিল্পের স্থান-নির্বাচনও কাম্য হয় নাই। দেশের কোন কোন অঞ্চলে ঘটিয়াছিল অত্যধিক শিল্পপ্রসার; আবার কোন কোন অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ শিল্পবিহীন। পরিশেষে, বৃহদায়তন শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি মাথা তুলিতে পারিতেছিল না এবং কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হইতেছিল।

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার প্রকৃতি

শিল্প-ব্যবস্থার ত্রুটি

এই অবস্থার মূলে ছিল দুইটি প্রধান কারণ: (ক) বিদেশী শাসকের নীতি; (খ) স্বল্পোন্নত ভারতের (underdeveloped India) জনগণের দারিদ্র্য। ভারতে বিদেশী শাসক শিল্পপ্রসারের দিকে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করে নাই; বরং ভারতকে শিল্পে অনুন্নত রাখিতে সকল প্রচেষ্টাই করিয়াছিল। ভারত হইতে কাঁচামাল লইয়া গিয়া ইংলণ্ডে শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করিয়া ঐ শিল্পদ্রব্য আবার ভারতে বিক্রয় করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। দরিদ্র জনসাধারণের নিকট শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিশেষ মুনাফা করা যায় না বলিয়া ভারতীয় শিল্পপতিগণও শিল্প-বিস্তারের প্রতি বিশেষ উৎসাহী হন নাই।

ত্রুটির কারণ

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতে যে কিছুটা শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছিল তাহার মূলে ছিল পাট ও তুলার ন্যায় কাঁচামালের প্রাচুর্য, স্বদেশী আন্দোলন, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এবং শিল্প-সংরক্ষণ নীতি (Policy of Protection)।

তবুও কিভাবে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে

কাঁচা পাটের একচেটিয়া উৎপাদনের জন্য এবং কাঁচা তুলার প্রাচুর্যের জন্য এ-দেশে পাটকল শিল্প ও বস্ত্র শিল্প বিদেশী শাসকের উপেক্ষা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ একই কারণে কয়লাখনি শিল্প ও চা-বাগান শিল্পও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন বিলাতী দ্রব্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়া দেশীয় শিল্পপ্রসারে সহায়তা করিয়াছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানিহ্রাস এবং সামরিক প্রয়োজনে শিল্পদ্রব্যের অভাবনীয় চাহিদাবৃদ্ধি ভারতকে শিল্পপ্রসারের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। পরিশেষে, শিল্প-সংরক্ষণ নীতির ফলেও চিনি কাগজ দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আধুনিক যুগে উহা কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি সকল আধুনিক শিল্পোন্নত দেশেই সরকার সক্রিয়ভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করিয়াছে। জাপানে রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নয়নের ধর্মপিতা (godfather) বলিয়া গণ্য করা হয়। ভারতে কিন্তু বিদেশী সরকার সক্রিয় সহযোগিতার পরিবর্তে করিয়াছে হয় বিরোধিতা, না-হয় উপেক্ষা। ফলে শিল্পোন্নত হইয়াও ভারত ছিল শিল্পে অনগ্রসর। অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প-ব্যবস্থা, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির অভাব, উৎপাদন-ব্যয়ের আধিক্য ছিল ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা

ভারতে বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়ন (Development of Large-scale Industries in India): স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই দৃষ্টিভংগি পরিবর্তিত

হয় স্বাধীন ভারতে। দেশের শিল্পোন্নয়নে স্বাধীন ভারতের সরকার ঠিক কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহার প্রথম ব্যাখ্যা করা হয় ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায়। তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হইলেও বলা হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে (১) অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন, (২) আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) রেলপথ—এই তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সরকারী এলাকায় থাকিবে। ইহা ছাড়া কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতারের যন্ত্রপাতি, বিমানপোত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন একমাত্র সরকারই করিবে। বাকী সমস্ত শিল্পবাণিজ্য বেসরকারী উদ্যোগে থাকিবে।

পুরাতন শিল্পনীতি

এই শিল্পনীতি অনুসারেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির পরিবর্তে এক নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়।

নূতন শিল্পনীতি

এই নূতন শিল্পনীতি অনুসারে সমস্ত শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে আছে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ তৈল, রেলপথ ও বিমানপথ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি ১৭টি মূল শিল্প বা সেবামূলক কার্য। এগুলির উন্নয়নের ভার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হস্তেই থাকিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে ১২টি শিল্প—যথা, যন্ত্রপাতি, রসায়ন, কয়লা ও তৈল ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থ, মোটর চলাচল ইত্যাদি। এগুলি বর্তমানে বেসরকারী মালিকানায় থাকিলেও ক্রমশ ইহাদের রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বা অবশিষ্ট শিল্পগুলিকে বেসরকারী মালিকানাতেই রাখা হইবে। তবে এগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকাকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের নীতি অনুসারেই এরূপ করা হইয়াছে।

নূতন শিল্পনীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন

পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শিল্পবাণিজ্যই সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় থাকে। শিল্পবাণিজ্যের কিছু সরকারী ও কিছু বেসরকারী পরিচালনায় থাকিলে উহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাই ছিল আদর্শ। এখনও ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে; কিন্তু উহা আর এখন আদর্শ নহে। আদর্শ বা লক্ষ্য হইল সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন। এইজন্য ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতে সমাজতন্ত্রের পথে গতি

সম্প্রসারিত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হইয়াছে। এইভাবে ভবিষ্যতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ধীরে ধীরে আরও সম্প্রসারিত করিয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তখন পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ খাতে বরাদ্দ ছিল (কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা ধরিয়া) ১৭৯ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের শতকরা ৭·৬ ভাগ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐ খাতে ব্যয় করা হয় মোট ৭৪ কোটি টাকা বা মোট পরিকল্পনার ব্যয়ের মাত্র শতকরা ৪ ভাগ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প ও খনিজ খাতে ৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। বাকী ৬৯০ কোটি টাকার প্রায় সমস্তটাই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্প ও বিভিন্ন মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, শিল্প ও খনিজ খাতে ব্যয় হইয়াছিল ৯৫০ কোটি টাকা এবং উহার মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের অংশ ছিল ১৭৫ কোটি টাকার মত। শুধু বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়োগের (investment) কথা ধরিলে (খনিজ ক্ষেত্রের ব্যয় এবং চলতি ব্যয় বাদ দিয়া) দেখা যায় যে উহার পরিমাণ ছিল ৭৭০ কোটি টাকা, যদিও মূল পরিকল্পনায় ৫৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। অতএব, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ মূল পরিকল্পনার অনুমান অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

সরকারী উদ্যোগে যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান এ-পর্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উড়িষ্যার রুরকেলা, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই এবং পশ্চিমবংগের দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা তিনটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত এই তিনটি কারখানার মোট উৎপাদনক্ষমতা হইবে বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন।* ইহা ছাড়া মহীশূরের সরকারী ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারোতে আরও একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। তারপর আছে সিন্ধ্রি, নাংগল, রুরকেলা ও নিভেলির সার তৈয়ারির কারখানা। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ তৈয়ারির কারখানাও সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হইবে। চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত

* প্রথমে মোট উৎপাদনক্ষমতা ৩০ লক্ষ টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; বর্তমানে কারখানা তিনটির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদনক্ষমতা উপরি-উক্তভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান। ইহার উৎপাদন এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে বর্তমানে ভারত রেল-ইঞ্জিন নির্মাণে একপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে, এমনকি ভারত রেল-ইঞ্জিন রপ্তানি করার অবস্থাতেও পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে এই কারখানায় বৈদ্যুতিক রেল-ইঞ্জিনও নির্মিত হইতেছে।

অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে পেরাম্বুরের রেলকোচ নির্মাণের কারখানা, টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখানা, টেলিফোনের তারের কারখানা, বিমান নির্মাণের কারখানা, সাধারণ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, গৃহ নির্মাণের উপকরণের কারখানা. কয়েকটি পেনিসিলিন ও ডি. ডি. টি. কারখানা, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, সংবাদপত্র মুদ্রণ কাগজের কারখানা, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা, চশমার কাঁচের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, তৈল শোধনাগার, ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত বোকারোর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছাড়া অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্য নির্মাণ শিল্প, মূল রসায়ন শিল্প, ঔষধপত্রাদি উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি স্থাপন করা হইবে এবং পেট্রল পরিশোধনের (oil refining) ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ উন্নয়নের যে কার্যক্রম গঠন করা হইয়াছে তাহার অনুমিত ব্যয় হইল প্রায় ১৯০০ কোটি টাকা, কিন্তু পরিকল্পনায় বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৫২০ কোটি টাকা। সুতরাং আশংকা হয় যে পরিকল্পনাধীন সময়ে কার্যক্রমকে পুরাপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে আগামী ১৫ বৎসরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রম তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে শেষ না করিলেও বিশেষ অসুবিধা হইবে না। এই পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরও ১১০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইবে আশা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন (Development of Cottage and Small-scale Industries) : কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহিত বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সমন্বয় আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়নের অন্যতম ঘোষিত নীতি। অর্থাৎ, বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নই আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে; যাহাতে বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সংগে সংগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও কাম্যভাবে সম্প্রসারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও আমাদের উদ্দেশ্য।

ভারতের কুটির শিল্পসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) গ্রামীণ, এবং (খ) পৌর। গ্রামীণ কুটির শিল্পের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি তৈয়ারি, বেতের কার্য প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অবশ্য সুতাকাটা ও বয়ন শিল্পই অধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতের কুটির শিল্প

পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই-এর কাজ, সূচী শিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সকল দেশের শিল্প-ব্যবস্থাতেই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের এক নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনই সুবিধাজনক। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অন্যান্য দিক দিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয় বলিলেও চলে। ভারতে শুধু কুটির শিল্পসমূহে নিযুক্ত লোকের জন্য ২ কোটির মত এবং মাত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত আছে ৫০ লক্ষ লোক, যাহা বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার সমান। ইহার সহিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ধরিলে নিয়োগের পরিমাণ যে বহুগুণ অধিক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান:

১। নিয়োগের সংস্থা হিসাবে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয়

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে বেকারের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তখন কর্মসংস্থানের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২·৬ কোটির মত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৯০ লক্ষের নিয়োগের ব্যবস্থা মাত্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতেই হইতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মত সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ছদ্ম বেকারের পরিমাণও কমানো যাইতে পারে। ইহাতে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিবে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু, কোন বৎসর ফসল না হইলে কৃষককে অনাহারে মরিতে হইবে না।

২। ইহাদের মাধ্যমে ছদ্ম বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস সম্ভব

তৃতীয়ত, মূলধনের অপ্রাচুর্যের জন্যও আমাদিগকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সকল প্রকার বৃহদায়তন

শিল্প-গঠনের জন্য যে-পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা বর্তমানে আমাদের নাই। সুতরাং সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে সংগঠিত করিতে হইবে এবং বেশীর ভাগ মূলধন মূল শিল্প (basic industries) গঠনে নিয়োজিত করিতে হইবে। চতুর্থত, এইভাবে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে মুদ্রাস্ফীতিও বিশেষ প্রবল হইতে পারিবে না। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বর্তমান পর্যায়ে ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৩। বর্তমানে মূলধনের অসংগতির জন্য এই সকল শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন

৪। ইহাদের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান অনেকাংশে সম্ভব

পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ দ্রব্যের অংশবিশেষ ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাইসাইকেলের অংশ ক্ষুদ্র শিল্পে নির্মিত হইতে পারে। এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। পরিশেষে, শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাহিরেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিরাট বাজার রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

৫। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের স্থান এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহাদের সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা রহিয়াছে—যথা, (১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, (২) মূলধনের অভাব; (৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল, (৪) বিক্রয়-করণের অসুবিধা, এবং (৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা।

এই সকল শিল্পের সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকসমূহ

(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা: কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে কাঁচামাল সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের (middlemen) জন্য। ইহারা বেশ কিছু করিয়া মুনাফা করে বলিয়া কাঁচামালের দামও বাড়িয়া যায়। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া কাঁচামাল সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সময় কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ফলে অনেক সময় উৎপাদনও বন্ধ রাখিতে হয়।

(২) মূলধনের অভাব: ভারতীয় কৃষকদের মত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণও দরিদ্র। সম্বলহীন বলিয়া তাহাদিগকে যখন-তখন মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় আবার তাহাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে স্বল্প দামে মাল বিক্রয় করিবার সর্তেও ঋণ করিতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর ও মালিকরা তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

(৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল : এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধুনিক পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে।

(৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা : বিক্রয়ের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের আর একটি প্রধান অসুবিধা। কাঁচামাল সংগ্রহের ন্যায় এ-ব্যবসায়ে ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে শোষণ করিতে থাকে। ইহা ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মালও অনেক সময় নষ্ট হয়।

(৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা : অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। যেমন, অনেক প্রকার তাঁতবস্ত্রই মিলবস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহা যে কুটির শিল্পের স্বাভাবিক দুর্বলতা তাহা নহে; অনেকাংশে ইহা বহুদিনের অবহেলার ফল।

এই অসুবিধাগুলি দূর করিয়াই যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন কিভাবে অসুবিধাগুলিকে দূর করা সম্ভব তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধকগুলিকে কিভাবে দূর করা যায়

প্রথমত, কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা ও মূলধনের অভাব সমবায় সমিতির সাহায্যে অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণও সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাম্যভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। একই সমবায় সমিতি যদি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে কাঁচামাল ও মূলধন যোগাইয়া সাহায্য করে এবং তাহার পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, তবে শিল্পীর পক্ষে মহাজনের শরণাপন্ন হইবার বা ফড়িয়া, ব্যাপারী ইত্যাদির হাতে পড়িবার কোন দরকার হয় না।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের জন্যও মূলধনের প্রয়োজন। ইহা সমবায় সমিতির সামর্থ্যে না কুলাইলে সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারকে লইতে হইবে।

যাহাতে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ দাঁড়াইতে সমর্থ হয় তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে কিছু দিনের জন্য বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণকে বাঁধিয়া দিতে হইবে, বৃহদায়তন শিল্পের উপর কর বা সেস (cess) বসাইয়া সেই অর্থ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করিতে হইবে।

পরিশেষে, সকল প্রকার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা একপ্রকার নহে। যেমন, তাঁত শিল্পের সমস্যা রেশম শিল্পের সমস্যা হইতে পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন বোর্ড গঠন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়ন দায়িত্ব তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সরকার এই সকল বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্যই করিয়া যাইবে।

আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এইভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

অবলম্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থাসমূহ

১। কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, ২। সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থা, ৩। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং তজ্জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা, ৪। বিক্রয়বাজারের সংগঠন, ৫। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা, এবং ৬। বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ বোর্ড গঠন।

কাঁচামাল যোগানো এবং সুলভে ঋণ প্রদানের জন্য প্রধানত সমবায় সমিতি-গুলির উপরই নির্ভর করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India), রিজার্ভ ব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমেও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধনের জন্য কারিগরি শিক্ষা-প্রসারের ব্যবস্থার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বিক্রয়বাজারের সংগঠনের জন্য সমবায়িক বিক্রয়-সংগঠন (cooperative sales organisation) ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। সরকারও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাদের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন-কল্পে ব্যয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্রশিল্পের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ তাঁতশিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করা হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে-সকল বোর্ড গঠন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে তাঁতশিল্প বোর্ড, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, হস্তশিল্প বোর্ড, সিল্ক বোর্ড এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রথম পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যয় হয় ৪৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা; পরে উহাকে কমাইয়া ১৬০ কোটি টাকায় আনা হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় ১৭৫ কোটি টাকার মত। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৬৪ কোটি টাকা। এই বরাদ্দবৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হইল কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে আত্ম-

নির্ভরশীল করিয়া তোলা। অর্থাৎ, যাহাতে তাহারা আপনা হইতেই বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

সংক্ষিপ্তসার

বৃহদায়তন শিল্প: বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। ইহার মূলে আছে তিনটি কারণ—১। শ্রমবিভাগ, ২। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং ৩। বিক্রয়বাজারের প্রসার।

শ্রমবিভাগের সূত্রপাত হয় অতি সরলভাবে; কিন্তু বর্তমানে ইহা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। কিন্তু সুবিধাই অধিক।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমবিভাগের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে (১) শক্তি ও (২) সূক্ষ্মতার দিক দিয়া সুবিধা দেখা যায়। ইহার অবশ্য কয়েকটি অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি শ্রমিককে যন্ত্রে পরিণত করে, সাময়িকভাবে বেকার-সমস্যারও সৃষ্টি করে, ইত্যাদি।

শিল্পের একদেশতা: কোন শিল্প দেশের এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে উহাকে 'একদেশতা' বলা হয়। একদেশতার মূলে আছে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা। এই ব্যয়সংক্ষেপ কাঁচামাল সংগ্রহ, শ্রমিক সংগ্রহ, বাজারে নির্মিত দ্রব্য প্রেরণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া হইতে পারে। মোটকথা, যে-স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিলে পরিবহণজনিত সুবিধা ভোগ করা যায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেই স্থানেই ভিড় করিতে দেখা যায়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার। একদেশতার যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ অসুবিধা বা বিপদও আছে।

বৃহদায়তন শিল্প-ব্যবস্থার মূলে যে তৃতীয় কারণটি বর্তমান রহিয়াছে তাহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার; বিক্রয়বাজারের প্রসার না ঘটিলে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সত্ত্বেও বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব ঘটিত না।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা: বৃহদায়তন শিল্প তিন প্রকার সুবিধা ভোগ করে—(ক) উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা, (খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা, এবং (গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা।

উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা নিম্নলিখিত প্রকারের: ১। সকলকে পূর্ণভাবে নিযোগ করা যাইতে পারে; ২। ধায় ব্যয় হ্রাস পায়, ৩। মাল কেনার সুবিধা হয়; ৪। যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ করা যায়; ৫। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার করা যায়; ৬। গবেষণার জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়।

বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা: ১। স্বল্প ব্যয়ে বহু মাল বহন করিয়া লওয়া যায়, ২। প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়, ৩। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে।

অর্থসংগ্রহে সুবিধা: বৃহদায়তন শিল্প সহজে অর্থসংগ্রহ করিতে পারে।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ: বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাসমূহ 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' বলিয়া অভিহিত। ইহাদিগকে 'বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ' এবং 'আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ'—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারিত হইলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা ভোগ করে তাহাই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত, অপরদিকে কারখানার বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা এককভাবে ভোগ করে তাহাই আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া বর্ণিত।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প: বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকিয়া আছে। ইহার কারণ হইল, ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনেরও কয়েকটি সুবিধা আছে যাহা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে: ১। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে মালিক সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে; ২। খরিদ্দারের প্রতি যত্ন লইতে পারে; ৩। কতকগুলি দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না; ৪। মালিক-শ্রমিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক

দৃঢ় হয়; ৫। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের সমস্যা বিশেষ নাই; ৬। বিক্রয়বাজারের তেজী-মন্দা অবস্থা দ্বারা ইহা বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা কম প্রভাবান্বিত হয়।

এই সকলের ফলে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু টিকিয়া থাকে নাই, অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। শুধু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে নহে, শিল্পোন্নত দেশসমূহেও বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আছে।

ভারতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প: ভারত অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। কিন্তু ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহার মূল কারণ, বিদেশী ইংরাজ শাসক এ-দেশে শিল্পপ্রসারে দৃষ্টি দেয় নাই, ভারতীয় ব্যবসায়িগণও শিল্পবিস্তারে উৎসাহী হন নাই। তবুও কাঁচামালের প্রাচুর্য, স্বদেশী আন্দোলন, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, শিল্প-সংরক্ষণ নীতি প্রভৃতির ফলে কিছুটা শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছিল। মোটকথা, ভারত শিল্পোন্নত হইয়াও শিল্পে অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা ও উপেক্ষার ফলেই এরূপ ঘটিয়াছিল।

বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়ন: স্বাধীন ভারতে সরকারের এরূপ দৃষ্টিভংগি স্বভাবতই পরিবর্তিত হয়। সরকার শিল্পোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের নীতি ঘোষণা করে ১৯৪৮ সালে। ইহাতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তবে প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ভার প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগের উপরই ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই শিল্পনীতি অনুসারে কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া মালিকানা এবং আরও কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নূতন নূতন শিল্প গঠন এবং পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতেছে।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন: আমাদের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় নিয়োগের সমস্যা হিসাবে, ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের মাধ্যম হিসাবে, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান হিসাবে এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইহাদের সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ বাধাও রহিয়াছে—যথা, কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, মূলধনের অপ্রাচুর্য, সনাতন উৎপাদন-পদ্ধতি ও অনুন্নত কলাকৌশল, অসংগঠিত বিক্রয়বাজার এবং বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা। সুতরাং এই বাধাগুলিকে অপসারিত করিয়াই সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় তাহাই করা হইয়াছে। কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থা, উৎপাদন-পদ্ধতির উৎকর্ষসাধন এবং তজ্জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, বিক্রয়বাজারের সংগঠন এবং বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ—এই কয়টি ব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন বোর্ড স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নভার উহাদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss briefly the economies that generally result from production on a large scale.

বৃহদায়তনে উৎপাদন হইতে যে-সকল সুবিধার (ব্যয়সংক্ষেপের) উদ্ভব হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

2. Describe the advantages and limitations of Large-scale Industries.

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা ও সীমা বর্ণনা কর।

[ইংগিত: বৃহদায়তন শিল্পের সীমা বলিতে অসুবিধা বুঝায়। এই অসুবিধাগুলির জন্যই ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থা টিকিয়া আছে।...(৮০-৮২ এবং ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)]

3. Describe the relative advantages and disadvantages of large-scale and small-scale production.

বৃহদায়তনে ও ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির মধ্যে তুলনা কর।

4. Explain large-scale production and point out its advantages.

বৃহদায়তনে উৎপাদন বলিতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া উহার সুবিধাগুলি নির্দেশ কর।

5. What is meant by internal and external economies of large-scale production? Illustrate your answer by giving two concrete examples of each.

বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকটির অন্তত দুইটি করিয়া উদাহরণসহ প্রশ্নটির উত্তর দাও।

6. Describe the advantages and disadvantages of Division of Labour. Discuss the statement that Division of Labour is limited by the extent of the market.

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। 'শ্রমবিভাগের সীমা বাজারের আয়তন দ্বারা নির্দিষ্ট' —উক্তিটির আলোচনা কর।

[ইংগিত: শ্রমবিভাগের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হয়। কিন্তু শিল্প যতটা বৃহদায়তন হওয়া সম্ভব শ্রমবিভাগ ততটাই সম্প্রসারিত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া শিল্পও বিশেষ বৃহদায়তন হইতে পারে না, ফলে শ্রমবিভাগও বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।... (৭৪-৭৭ এবং ৮৩ পৃষ্ঠা)]

7. What do you mean by Division of Labour? Enumerate clearly the advantages of Division of Labour

শ্রমবিভাগ বলিতে কি বুঝায়? শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত কর।

8. Account for Localisation of Industries. What are its advantages and dangers?

শিল্পের একদেশিতার কারণ ব্যাখ্যা কর। ইহার সুবিধা-অসুবিধা কি কি?

9. Indicate the importance of the village and small-scale industries in our economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries?

আমাদের অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রামীণ (কুটির) ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর। কোন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উহারা বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের পাশাপাশি সম্প্রসারিত হইতে পারে?

10 Estimate the place of small-scale and cottage industries in the economy of India. How do you propose to plan the future development of such industries?

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের স্থান নির্দেশ কর। কিভাবে উহাদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবে তাহা ব্যাখ্যা কর।

11. Name some of the more important cottage industries of India and say what steps have been taken for their development under the Five Year Plans.

ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্পের নাম কর এবং উহাদের উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

12. Write short notes on · (a) Mixed Economy, tria' policy of the Government of India.

(ক) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা, এবং (খ) ভারত সরকারের শিল্পনীতি—এই দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।

দশম অধ্যায়

বাজার

(Market)

বর্তমানে অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে এবং চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে দাম নির্ধারিত হয়। সুদূর অতীতেই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ যখন পণ্যোৎপাদন (commodity production) এবং বিনিময়ের পথে পদসঞ্চার করে তখন হইতেই বাজার প্রবর্তনের পথ প্রস্তুত করা হয়। তারপর ক্রমশ ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হইলে উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নতিলাভ করে এবং শিল্পের বিস্তার হয়। সংগে সংগে বাজারও প্রসারিত হয়।

বাজার বলিতে কি বুঝায়? (What is a Market ?) : যে-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিলে তাহাকেই সাধারণ ভাষায় বাজার বলা হয়। এই অর্থে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল ক্রয়বিক্রয়ের জায়গা আছে তাহারা বাজার বলিয়া অভিহিত—যেমন, নূতন বাজার, কলেজ স্ট্রীট বাজার, বড়বাজার প্রভৃতি। আবার গ্রামাঞ্চলে যে-সকল নির্দিষ্ট জায়গায় হাট বসে বা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে তাহাদেরও বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট জায়গাকে বুঝায় না; কোন দ্রব্য বা উৎপাদন-উপাদানের ক্রেতাবিক্রেতাগণের মধ্যে লেনদেনের যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়। নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতারা নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে পারে—এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিতে পারে, এবং তাহাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত নাও হইতে পারে। টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রেতাবিক্রেতাদের লেনদেন সম্পাদিত হইতে পারে।

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে নির্দিষ্ট জায়গা বুঝায় না

বাজার বলিতে বুঝায় ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক

সুতরাং যদি কোন অঞ্চলে বিশেষ দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে আদানপ্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে উহাদের প্রদত্ত বিভিন্ন দাম একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক বা বিস্তৃত হউক উহাকে বাজার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

---

* পৌরবিজ্ঞানের ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বাজারের উপাদানের ইংগিত পাওয়া যায়। প্রথমত, বাজারের জন্য বিশেষ দ্রব্য থাকা চাই। বস্তুত, অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে পৃথক পৃথক জিনিসের জন্য পৃথক পৃথক বাজার বুঝায়—যেমন, গমের বাজার, পাটের বাজার, তুলার বাজার প্রভৃতি। এই সকল পণ্য (commodities) ব্যতীত অন্যান্য ধরনের বাজারও আছে—যেমন, বিদেশী মুদ্রার বাজার, শেয়ার-বাজার, শ্রমের বাজার। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতা থাকা চাই। যে-কোন দ্রব্যের দাম (price) থাকিলেই উহার বাজার থাকিবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

বাজারের উপাদান :
১। পৃথক পৃথক দ্রব্য
২। দাম
৩। ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets) : বিভিন্নভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। পরিধি অনুযায়ী বাজার স্থানীয় (Local), জাতীয় (National) ও আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলে—যেমন, তরিতরকারি, ইট প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় সাধারণত দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে; সুতরাং উহাদের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। অনেক জিনিস আছে যাহাদের ক্রয়বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ উহাদের চালান বিদেশে যায় না—দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল দ্রব্যের বাজার জাতীয় বাজার। বর্তমান জগতে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রসারের ফলে আবার অনেক দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে; ফলে উহাদের বাজার এখন জগদ্ব্যাপী—যেমন, পাট তুলা স্বর্ণ প্রভৃতির বাজার আন্তর্জাতিক।

১। পরিধি অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ
ক। স্থানীয় বাজার
খ। জাতীয় বাজার
গ। আন্তর্জাতিক বাজার

দ্বিতীয়ত, সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ করা যায়। মার্শাল (Marshall) সময়ের দিক হইতে চারি প্রকারের বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, অত্যল্পকালীন বাজার (very short-period market), স্বল্পকালীন বাজার (short-period market), দীর্ঘকালীন বাজার (long-period market), এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার (secular period or very long-period market)। এই চারি প্রকারের বাজারের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে হইল এইরূপ :

২। সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

অত্যল্পকালীন বাজার : এক দিনের বা কয়েক দিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্পকালীন বাজারের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। এইরূপ বাজারের মেয়াদ বা

সময় এতই অল্প যে যোগানের (supply) হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না ; অর্থাৎ যোগান মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এই অবস্থায় দামের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়িবে। চাহিদা অধিক হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে, আর চাহিদা হ্রাস পাইলে দামহ্রাসের ঝোঁক দেখা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, এক বিশেষ দিনে বাজারে মৎস্য যোগানের কথা ধরা যাউক। ঐ দিনের দামের তারতম্য অনুসারে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মৎস্য যোগানের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদা অধিক হইলে মৎস্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে, চাহিদা কম থাকিলে মৎস্যের দাম হ্রাস পাইবে। দাম অত্যল্প হইলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মৎস্যই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ মৎস্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পচনশীল দ্রব্য। তবে সকল দ্রব্যই মৎস্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যই কিছু সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় অত্যন্ত স্বল্প-কালীন বাজারেও কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

ক। অত্যল্পকালীন বাজার

দৃষ্টান্ত

স্বল্পকালীন বাজার : স্বল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার মত সময় হাতে থাকে। তবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের দ্বারা যতটা পরিমাণ পরিবর্তন সম্ভব যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ততটা পরিমাণই হইবে। অর্থাৎ, স্বল্পকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় যে উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের পক্ষে বিশেষীকৃত বা স্থায়ী সাজসরঞ্জামের বা মূলধনের (specialised or fixed equipment or capital) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত যোগান মাত্র আংশিকভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

খ। স্বল্পকালীন বাজার

দীর্ঘকালীন বাজার : দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী সমধিক পরিমাণে যোগানের পরিবর্তন সাধনের যথেষ্ট সময় থাকে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মূলধন, কুশলী শ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে পারে। ইহা ব্যতীত নূতন নূতন কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়া সংশ্লিষ্ট 'শিল্পের* কলেবর বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাইলে দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন কমানো যায়। দীর্ঘকালীন বাজারে সময়

গ। দীর্ঘকালীন বাজার

* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'শিল্প' (industry) বলিতে একই শ্রেণীভুক্ত সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (firm) সমষ্টিকে বুঝায়। যেমন, ভারতের সকল পাটকল (jute mills) লইয়া হইল পাটকল শিল্প (jute mill industry)।

অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

ঘ। অতি দীর্ঘকালীন বাজার

অতি দীর্ঘকালীন বাজার: মার্শাল দীর্ঘকালীন বাজার ব্যতীত অতি দীর্ঘকালীন বাজারের কথাও উল্লেখ করিযাছেন। এইরূপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ যে সাধারণ দীর্ঘকালীন বাজারে যে-সকল পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহা ছাড়াও আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। যেমন, এক যুগ হইতে অন্য যুগের মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন সরবরাহের অবস্থা, মানুষের রুচি অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবর্তিত হইতে পারে। এই সমস্তের প্রভাবের ফলে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে।

ব্যাপক পরিধির বাজারের জন্য দ্রব্যের যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন:

বাজারের পরিধি (Extent of a Market): সকল দ্রব্যের বাজারের আয়তন বা পরিধি এক প্রকারের নয়। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হইযাছে যে, কোন কোন দ্রব্যের বাজার জগদ্ব্যাপী, আবার কোন কোন দ্রব্যের বাজার অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রসার এবং পরিবহণ ও আদানপ্রদানের সুযোগসুবিধার উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের বাজারই সম্প্রসারিত হইতেছে, তবুও কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বিস্তৃত হইতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। সর্তগুলির মোটামুটি বর্ণনা এইভাবে করা যায়:

(১) স্থায়িত্ব (Durability): ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল দ্রব্যের বাজার স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হয়। ক্ষণস্থায়ী হইলে স্থানান্তরে প্রেরণে অসুবিধা হয় এবং প্রেরণের সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যাদি যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে অন্য কোন বাধা না থাকিলে উহাদের বাজার তত সম্প্রসারিত হইবে।

(২) সহজে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (Portability): সুপরিসর বাজারের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি সহজেই স্থানান্তরে প্রেরণযোগ্য হওয়া চাই। আয়তনের তুলনায় দাম যত অধিক হইবে দ্রব্যের প্রেরণযোগ্যতা তত বেশী সহজ হইবে। ইটের কথা যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইটের আয়তন বা ওজনের তুলনায় উহার দাম অতি সামান্য। ফলে উহাকে স্বল্প খরচে অল্প সময়ের মধ্যে স্থানান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইহার বাজার সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। অপরপক্ষে সোনার মত মূল্যবান ধাতুর বাজার বিস্তৃত হয়, কারণ আয়তনের তুলনায় উহার দাম অধিক।

(৩) সহজে চেনার যোগ্যতা (Cognizability): যে-সকল দ্রব্যের গুণাগুণ সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায় তাহাদের বাজারও বিস্তৃত হয়। এইজন্য

মূল্যবান ধাতু, সরকারী ঋণপত্র বা কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির বাজার ব্যাপক হয়।

(৪) ব্যাপক চাহিদা (Wide Demand): অন্যান্য সুযোগসুবিধা যতই থাকুক না কেন, কোন দ্রব্যের বাজার সুপরিসর হইতে হইলে ঐ দ্রব্যটির স্থায়ী ও ব্যাপক চাহিদা থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ, সোনারূপা প্রভৃতির চাহিদা জগদ্ব্যাপী বলিয়া উহাদের বাজারও সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত।

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Market and Competition):

বাজারের দুইটি পক্ষ আছে—ক্রেতা ও বিক্রেতা। ক্রেতাবিক্রেতাদের চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য থাকিতে পারে। এই তারতম্যের জন্যই বাজারে বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাজারের বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন; কারণ উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ বাজারের অবস্থার (conditions of market) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা যায়। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম-নির্ধারণে এক ধরনের শক্তি কার্য করিবে; আবার বাজারে যদি একচেটিয়া ব্যবসায় চালু থাকে তাহা হইলে দাম-নির্ধারণের সূত্র ভিন্ন আকার ধারণ করিবে।

বাজারের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশ

বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজনীয়তা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition):

অর্থবিদ্যাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন: (১) বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা (a large number of buyers and sellers), (২) পূর্ণাংগ বাজার (perfect market), (৩) সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ (free entry) এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদন-উপাদানের সম্পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility of productive resources)।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সর্ত:

বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ত। এখন প্রশ্ন হইল, 'বহুসংখ্যক' বলিতে কি বুঝায় এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উহার তাৎপর্যই বা কি? কত সংখ্যা হইলে বহুসংখ্যক হইবে সে সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতাদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া প্রয়োজন যে, যেন কোন ক্রেতা ও বিক্রেতা এককভাবে লেনদেন বা দ্রব্যমূল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। প্রত্যেক

১। বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থিতি

বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট যোগানের তুলনায় এত সামান্য যে একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, বাজারে ধান্যের মোট যোগানের পরিমাণ ২০০ লক্ষ কুইণ্টাল এবং কোন একজন কৃষকের সর্বাধিক উৎপাদন-ক্ষমতা হইল ২০০ কুইণ্টাল। এই অবস্থায় ঐ কৃষক বাজারে ২০০ কুইণ্টাল বিক্রয় করিল বা না করিল তাহার দ্বারা বাজারে ধান্যের দাম পরিবর্তিত হইবে না।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্ত হইল পূর্ণাংগ বাজার। পূর্ণাংগ বাজারের জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়: প্রথমত, ক্রয়বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য সমজাতীয় (homogeneous) হইবে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ, বাজারের বিভিন্ন অংশে ক্রয়বিক্রয় কিভাবে চলিতেছে সে-সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা সম্যকভাবে অবহিত থাকিবে। তৃতীয়ত, ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতারা কোন পৃথকাচরণ করিবে না। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দামে ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ লেনদেন চলিবে এবং কাহারও প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না।

২। পূর্ণাংগ বাজার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তৃতীয় সর্ত হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের সুযোগ এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতা। নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সুযোগ থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতার জন্যই বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের একই উপাদানের—যেমন, শ্রমের দাম সমান হয়।

৩। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ সুযোগ এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা

একচেটিয়া কারবার (Monopoly): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইল একচেটিয়া কারবার। একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশন একচেটিয়া কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একচেটিয়া কারবারে যোগানের ভার থাকে একের হাতে

একচেটিয়া কারবার যদি নিখুঁত (pure or absolute) হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের কোন প্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য (substitute) থাকিবে না এবং স্বাভাবিকভাবেই তাহাকে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। এইরূপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম চড়াইয়া দিলেও ক্রেতাগণ তাহার নিকট হইতে কম ক্রয় করিবে না বা অন্য দ্রব্যবিক্রেতার দিকে ঝুঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু একেবারে পরিবর্ত দ্রব্য (substitute) ও মোটেই প্রতিযোগিতা থাকিবে না এবং যতই দাম বৃদ্ধি করা হউক না কেন ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে থাকিবে এরূপ কল্পনা করা অতিমাত্রায় অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা থাকে না

এইজন্য সাধারণত একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী হইল একজন এবং বাজারে ঐ দ্রব্যের 'ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের অভাব' (absence of close substitutes) দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ পরিবর্তের অভাব বলিতে বুঝায় যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-দ্রব্য এতই দূরবর্তী (remote) বা এতই অপ্রচুর যে একচেটিয়া কারবারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিযোগিতার কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই আপন মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না।

বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা উভয়ই বিরল

বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় না তেমনি পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার সন্ধানও কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থাই বাজারে সচরাচর দেখা যায়। অর্থাৎ, বেশীর ভাগ শিল্পের বেলায় প্রতিযোগিতা হইল অপূর্ণাঙ্গ (imperfect competition)। প্রতিযোগিতা অপূর্ণাঙ্গ হয় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিক্রয় দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যখন দ্রব্য সমজাতীয় হয় এবং ক্রেতা বহুসংখ্যক হয় তখন প্রতিযোগিতা হয় নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ। এই দুইটির যে-কোনটির অভাবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাঙ্গ হইতে পারে।

কেন প্রতিযোগিতা অপূর্ণাঙ্গ হয়

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার একটি রূপ হইল 'একচেটিয়া প্রতিযোগিতা' (Monopolistic Competition)। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পৃথক্কীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute products) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (remote substitute products) নয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট প্রভৃতির দ্বারা পৃথক্‌করণের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য উৎকৃষ্টতর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার একটি রূপ

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি (Oligopoly)

বা কতিপয় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন বাজারে একজন বিক্রেতা বা বহুসংখ্যক বিক্রেতার স্থলে মাত্র কতিপয় বিক্রেতা প্রতিযোগিতা করে তখন তাহাকে অলিগোপলি বা কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার বলা হয়। অলিগোপলির একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বি-বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (Duopoly)। ডুয়োপলিতে দুইজন বিক্রেতা বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

আর দুইটি রূপ হইল অলিগোপলি ও ডুয়োপলি

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বাজার বলিতে কি বুঝায়? অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে হাটবাজার বসার জায়গা বুঝায় না; বুঝায় ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক। অর্থনৈতিক বাজারের উপাদান হইল তিনটি—১। পৃথক পৃথক দ্রব্য, ২। প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক দাম, এবং ৩। ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ: নানাভাবে অর্থনৈতিক বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। (ক) পরিধি অনুসারে বাজার—১। স্থানীয়, ২। দেশীয়, এবং ৩। আন্তর্জাতিক—এই তিন প্রকারের হয়। (খ) সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজার আবার—১। অত্যল্পকালীন, ২। স্বল্পকালীন, ৩। দীর্ঘকালীন, এবং ৪। অতি দীর্ঘকালীন—এই চারি রকমের হইতে পারে।

বাজারের পরিধি: ব্যাপক পরিধির বাজারের জন্য দ্রব্যের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন—১। উহা স্থায়ী হইবে, ২। উহাকে সহজ বহনযোগ্য হইতে হইবে, ৩। উহাকে সহজে চেনা যাইবে, এবং ৪। উহার ব্যাপক চাহিদা থাকিবে।

বাজার ও প্রতিযোগিতা: ক্রেতাবিক্রেতার সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য অনুসারে বাজারে বিভিন্ন কারবার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ অন্যতম অবস্থা হইল পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির কল্পনা করা হইয়াছে—১। বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি, ২। পূর্ণাঙ্গ বাজার, এবং ৩। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের সুযোগ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা। ইহাদের ফলে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজার-দাম সর্বত্র একই হয়।

একচেটিয়া কারবার: একচেটিয়া বাজারে যোগানের ভার থাকে একজন মাত্র ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হস্তে। সুতরাং বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না। বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার বা পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা উভয়ই বিরল। এই দুই এর মধ্যবর্তী অবস্থা—অর্থাৎ, অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা নানা রকমের হইতে পারে। ইহার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য রূপ হইল অলিগোপলি ও ডুয়োপলি। একচেটিয়া কারবার অবশ্য অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতারই চরম রূপ।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by 'Market' in Economics ? What are the conditions that govern the extent of a market ?

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কি বুঝায়? বাজারের আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়?

[ইঙ্গিত: বাজারের আয়তন দ্রব্যের স্থায়িত্ব, বহনযোগ্যতা, চাহিদার ব্যাপকতা প্রভৃতির দ্বারা

নির্ধারিত হয়। দ্রব্য পচনশীল না হইলে, সহজ বহনযোগ্য হইলে, উহার চাহিদা ব্যাপক হইলে বাজারের আয়তন ব্যাপক হইবে।...(৯৭-৯৮ এবং ১০০-১০১ পৃষ্ঠা)]

2. **Define a Market. What are the conditions for a wide market ?**

বাজারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ব্যাপক বাজারের সর্ত কি কি ? [৯৭-৯৮ এবং ১০০-১০১ পৃষ্ঠা]

3. **What is Perfect Competition ? What are its conditions ?**

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে ? ইহার সর্ত কি কি ? [১০১-১০২ পৃষ্ঠা]

4. **Write notes on :**

(*a*) **Local, National and International Markets.**

(*b*) **Very Short-period Market, Short-period Market, Long-period Market and Very Long period Market**

টীকা লেখ কর : (ক) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার।

(খ) অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন ও অতি দীর্ঘকালীন বাজার।

একাদশ অধ্যায়

দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা

(Introduction to Price Determination)

বিনিময় উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু

অভাবমোচনের সমস্যাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে ভোগীর নিকট গিয়া পৌঁছায়। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় বাজারে। সুতরাং বাজারে বিনিময় হইল উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু।

সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় ও ইহার সর্ত

বাজারে বিনিময়কার্য সম্পাদন বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথম প্রথম প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ই করা হইত। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় কয়েকটি সর্তের উপর নির্ভরশীল। অন্যতম সর্ত হইল যে বিনিময়কারী ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই মনে করিতে হইবে যে বিনিময় দ্বারা তাহার লাভ হইবে। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে সরিষার তৈল চায় এবং অপর এক ব্যক্তি সরিষার তৈলের পরিবর্তে চাউল চায়। অতএব, উভয়েরই অপরের দ্রব্য পাইবার জন্য আকাংক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু কতটা চাউলের পরিবর্তে কতটা সরিষার তৈল বিনিময় করা যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে উভয়ে একমত না হইলে বিনিময় সংঘটিত হইবে

না। যাহার চাউল আছে সে যদি মনে করে চাউল বিনিময় করিয়া তাহার যে 'ক্ষতি' হইবে সরিষার তৈল হইতে তাহা অপেক্ষা বেশী 'লাভ' পাওয়া যাইবে, এবং অনুরূপভাবে সরিষার তৈলের মালিক যদি মনে করে যে সরিষার তৈলের বিনিময়ে চাউল পাওয়ায় তাহার লাভ বাড়িবে—তবেই চাউল ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হইবে। এই যে 'লাভক্ষতি'র উল্লেখ করা হইল অর্থবিদ্যায় উহাকে 'উপযোগ' বলে। সুতরাং বিনিময় দ্বারা উভয় পক্ষেরই উপযোগ বর্ধিত হয়। উভয় পক্ষের উপযোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে বিনিময় সম্পাদিত হইবে না।

বিনিময়কারী উভয় পক্ষের উপযোগ বর্ধিত হইলে তবেই বিনিময় সম্পাদিত হয়

বর্তমানে পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের ব্যাপারেও ঐ একই সর্ত কার্য করে। টাকাকড়ির বিনিময়ে দ্রব্য সংগ্রহ করিলে এক দিক দিয়া উপযোগ বাড়ে, অন্য দিক দিয়া টাকাকড়ি কমিয়া যাওয়ার জন্য উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা কমে। বিক্রেতার পক্ষে দ্রব্যের বিনিময়ে টাকাকড়ি পাওয়ার জন্য উপযোগ বাড়ে, কিন্তু দ্রব্য হস্তান্তরিত হওয়ায় উপযোগ কমে।

টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পর্কে এ একই কথা প্রযোজ্য

সুতরাং ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েই যদি মনে করে তাহাদের উপযোগ বাড়িবে তবেই টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পাদিত হইতে পারে। এইজন্য দেখা যায় যে 'দামে না পোষানোর দরুন' অনেকে বাজারে জিনিস ক্রয় করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে, অথবা খরিদ্দার থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতা বিক্রয় করে নাই।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের যখনই 'দামে পোষায়' তখন টাকা ও জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। এই দামকে অর্থবিদ্যায় 'বাজার-দাম' (Market Price) বলা হয়। এই দামেই বাজারে জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয় হয়। এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

মূল্য ও দাম (Value and Price) : মূল্য ও দামের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করিলে উহাকে দাম বলা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম জানিতে পারিলে আমরা উহাদের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ করিয়া লইতে পারি। ধরা যাউক, এক কিলোগ্রাম চালের দাম ৫০ নয়া পয়সা এবং এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা; এ-ক্ষেত্রে উভয়ের বিনিময়-মূল্য হইবে ১ কিলোগ্রাম চাউল = ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল। চাউলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা এবং সরিষার তৈলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ৮ টাকা হয় তবে এখনও ১ কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণত

মূল্যের পরিবর্তে দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান হয় কেন

* ১০-১০ পৃষ্ঠা দেখ।

এরূপ ঘটে না—সকল জিনিসের দাম সমপরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য পরিবর্তিত হইতে পারে। এই পারস্পরিক মূল্য কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য কি?—এই সকল বিষয় অনুধাবনের সহজ উপায় হইল দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রথমেই আছে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখা।

দাম-নির্ধারণ (Price Determination): সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বাজারে দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান দ্বারা

সুতরাং দাম বা মূল্যের দুইটি দিক আছে—(ক) চাহিদার দিক, এবং (খ) যোগান দিক। চাহিদার সৃষ্টি করে ক্রেতারা এবং যোগান দেয় উৎপাদকগণ। চাহিদা ও যোগান যেখানে পরস্পরের সমান হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে দাম শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকে মনে করিতেন যে দাম বা মূল্য শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে কয়েকটি মূল্যতত্ত্বও (Theories of Value) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—যথা, শ্রমতত্ত্ব, উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, ইত্যাদি।

মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labour Theory of Value): এই তত্ত্ব অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহাই উহার মূল্য। একটি দ্রব্য তৈয়ারি করিতে যদি ১০ দিনের এবং অপর একটি তৈয়ারি করিতে যদি ৫ দিনের পরিশ্রম লাগিয়া থাকে তবে প্রথম দ্রব্যটির মূল্য দ্বিতীয় দ্রব্যটির মূল্যের দ্বিগুণ হইবে।

সংক্ষেপে শ্রমতত্ত্ব

নানা দিক দিয়া মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। শ্রম বিভিন্ন ধরনের হয় বলিয়া কতটা শ্রম নিয়োগ করিতে হইয়াছে তাহা মূল্যের মাপকাঠি হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শ্রমই যদি মূল্য নির্ধারক হইত তবে জিনিসপত্রের দাম সকল সময়েই অপরিবর্তিত থাকিত। কিন্তু দেখা যায় যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নহে; প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন এবং সংগঠন-নৈপুণ্যও উৎপাদনকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। পরিশেষে, শ্রম সম্পূর্ণ বিফল হইতে পারে। তখন মূল্য নির্ধারিত হইবে কিরূপে? এ-প্রশ্নের উত্তরও শ্রমতত্ত্বে পাওয়া যায় না।

সমালোচনা

মূল্যের উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Production Theory of Value): মূল্যের ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রমতত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব প্রচার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দ্রব্যের মূল্য উহার উৎপাদন-ব্যয়ের—অর্থাৎ, শ্রম কাঁচামাল মূলধন প্রভৃতি সকলের দরুন

ব্যয়েরই সমান হয়। এইভাবে শ্রমতত্ত্বের একটি ত্রুটি দূর করা হইলেও চাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত না করার জন্য ইহাতে অন্যান্য ত্রুটি থাকিয়া যায়। সুতরাং এই তত্ত্বও বর্জিত হইয়াছে।

এই তত্ত্বও বর্জিত হইয়াছে

পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Reproduction Theory): এই তত্ত্বের সমর্থকগণ বলেন, আদিতে দ্রব্য নির্মাণ করিতে যে-ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বারা উহার মূল্য নির্ধারিত হয় না, মূল্য নির্ধারিত হয় উহার পুনরুৎপাদন-ব্যয় দ্বারা—অর্থাৎ, ভবিষ্যতে উহা পুনরায় উৎপাদন করিতে কি ব্যয় হইবে তাহার দ্বারা। এই তত্ত্বও মূল্যের ব্যাখ্যা করে না। কোন দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করিতে বহু ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু উহার যদি কোন চাহিদা না থাকে তবে বাজারে উহার কোন দামই পাওয়া যাইবে না।

এই তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নহে

মূল্য-নির্ধারণের উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলিকে আংশিক (partial) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহারা মাত্র যোগানের দিক হইতে মূল্য-নির্ধারণের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। মূল্য বা দাম নির্ধারণের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাইতে হইলে আমাদিগকে শুধু যোগান নহে, চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মার্শালকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কাঁচির দ্বারা কোন কিছু কাটা হইলে যেমন উপরের এবং নীচের দুইটি ফলাই ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম বা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান উভয়ই ক্রিয়া করে। অথবা, ক্রিকেট খেলায় 'ন্যাটা' ব্যাটস্‌ম্যান যেমন শুধু বাঁ হাতেই ব্যাট করে না, তাহার ডান হাতটিও যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শুধু চাহিদা বা শুধু যোগান দ্বারা নহে।

দাম শুধু যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় না

চাহিদা ও যোগান (Demand and Supply): চাহিদা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, চাহিদা দামের সহিত সংশ্লিষ্ট। দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে।* ইহাকেই চাহিদার সূত্র বলা হয়।

চাহিদার মত যোগানের পরিমাণও দাম-পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। দাম কমিলে মুনাফা কমে; ফলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। আর দাম বাড়িলে মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চাহিদার সূত্রের (Law of Demand) মত যোগানেরও একটি সূত্র আছে। ইহাকে যোগানের সূত্র (Law of Supply) বলা হয়। যোগানের সূত্র হইতে যোগান-সূচী (Supply Schedule) প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় একটি যোগান-সূচী দেওয়া হইল :

দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানেরও পরিবর্তন হয়

যোগানের সূত্র

* ৩০ পৃষ্ঠা।

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১৫ কুইন্টাল
২.৫০ ,,	১৩ ,,
২ ,,	১০ ,,
১.৫০ ,,	৭ ,,
১ ,,	৪ ,,

যোগান-দাম ও যোগান-রেখা

সূত্রটি হইতে দেখা যাইবে যে দাম যত বাড়িতেছে যোগানের পরিমাণও তত বাড়িতেছে। এই দামকে যোগান-দাম (Supply Price) বলা হয়। যোগানের উপর দামের প্রভাব চাহিদার উপর দামের প্রভাবের ঠিক বিপরীত। এই কারণে যোগান-রেখা (Supply Curve) অংকন করা হইলে তাহার গতিও চাহিদা-রেখার বিপরীতমুখী অর্থাৎ উর্ধ্বমুখী হইবে।

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে যোগানের সূত্র ব্যাখ্যা করা হইল :
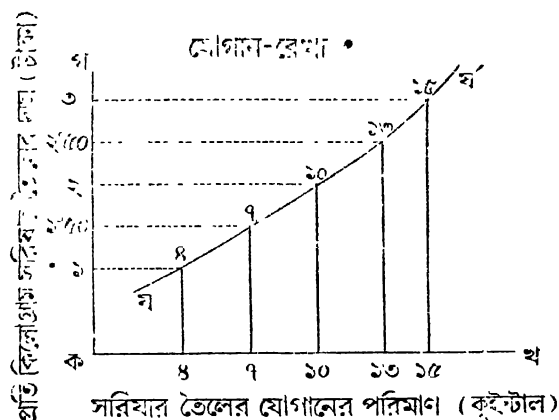
দাম যখন ১ টাকা তখন যোগান ৪ কুইন্টাল; দাম বাড়িয়া ১ টাকা হইতে ১.৫০ টাকা, ১.৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ২.৫০ টাকা এবং ২.৫০ টাকা হইতে ৩ টাকা হইলে যোগানের পরিমাণও বাড়িয়া যথাক্রমে ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ কুইন্টাল হইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ নির্দেশক উপরের দিকে ৪, ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (ঘ ঘ´) পাওয়া যায় তাহাই যোগান-রেখা। প্রতিবার দামবৃদ্ধির ফলে ইহা উপরের দিকে উঠিতেছে।

এখন প্রশ্ন হইল, বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান হয় কেন? অর্থাৎ, যোগানের পশ্চাতে কোন্ শক্তি কার্য করে? এই প্রশ্নের বিচারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন যোগানের বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

যোগানের পশ্চাতে কোন্ শক্তি কাযঁ করে

সংক্ষেপে বলা যায়, দীর্ঘকালীন বাজারে যোগান নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিলে উৎপাদন-ব্যয় (Cost of Production)* পোষায় উৎপাদকগণ সেই পরিমাণ দ্রব্যই যোগান দিয়া থাকে। আমাদের উদাহরণে ১ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৪ কুইন্টাল, ১·৫০ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৭ কুইন্টাল, ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১০ কুইন্টাল, ইত্যাদি পরিমাণ সরিষার তৈল যোগান দিলে উৎপাদকদের পোষায়—ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দাম উহা অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইবে না বলিয়া উৎপাদনও কমিবে; ফলে যোগানও হ্রাস পাইবে।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে একমাত্র কাযঁ করে উৎপাদন-ব্যয়

স্বল্পকালীন বাজারে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবার বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে মজুত মালের মধ্যে তাহারা কতটুকু পরিমাণ বাজারে ছাড়িবে। ইহা নির্ধারিত হয় সংরক্ষণ-দাম (Reservation Price) দ্বারা। সংরক্ষণ-দাম বলিতে সেই দামকেই বুঝায় যাহা না পাইলে বিক্রেতারা বাজারে মাল ছাড়িবে না। এই সংরক্ষণ-দাম নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, মজুত মালের পরিমাণ ও প্রকৃতি, ভবিষ্যতে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা, বিক্রেতাদের নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক হয় এবং দ্রব্যটি যদি মাছ-তারতরকারির মত পচনশীল হয় তবে বিক্রেতাদের যথাশীঘ্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতে হইবে। ফলে উহার সংরক্ষণ দামও কম হইবে। অপর-পক্ষে দ্রব্যটি যদি পচনশীল না হয় এবং মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক না হয় তবে দাম কম হইলে বিক্রেতারা দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টাই করিবে। এ-ক্ষেত্রে দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিবার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিবে। ভবিষ্যতে যদি চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তবেই তাহারা মাল ধরিয়া রাখিবে, নচেৎ নয়। আবার বিক্রেতাদের নিকট নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা যদি খুব বেশী হয় তবে ভবিষ্যতে চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাদের পক্ষে স্বল্প দামে বিক্রয় করিবার চাপ অধিক হইবে। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সংরক্ষণ-দাম নির্ধারিত হয়।

স্বল্পকালীন ভিত্তিতে কাযঁ করে সংরক্ষণ-দাম

সংরক্ষণ-দাম কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

*স্বাভাবিক বা সাধারণ মুনাফা (normal profit) উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সংরক্ষণ-দাম বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইলেও উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। কারণ, ব্যবসায়ীরা নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির প্রভাব যথাসম্ভব কাটাইয়া উঠিয়া যতক্ষণ-পর্যন্ত-না দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ মাল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। অবশ্য স্বল্পকালীন চাহিদা যদি বিশেষ হ্রাস পায় এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে তবে আর মাল ধরিয়া রাখে না—উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অল্প বাজার-দামেই উহা বিক্রয় করিয়া দেয়। অতএব, বলা যায় যে স্বল্পকালীন যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়।

স্বল্পকালীন ভিত্তিতেও যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা পুরাপুরিই প্রভাবান্বিত হয়—উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ, বহুদিন ধরিয়া লোকসান দিয়া কেহই উৎপাদন করিতে চাহে না।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়

উৎপাদন-ব্যয় এবং উৎপন্নের বিধিসমূহ (Cost of production and Laws of Returns): দেখা গেল, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় সকল ক্ষেত্রে এক থাকে না। উৎপাদন-ব্যয় কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপন্নের বিধির (Laws of Returns) উপর। উৎপন্নের বিধি যে সংখ্যায় তিনটি তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে—যথা, (ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি, (খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি, এবং (গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি। কোন দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়মাধীন হইলে যোগানের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগান-দামও বাড়িতে থাকিবে; উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সূত্রাধীন হইলে যোগান যত বাড়িবে যোগান-দাম তত কমিবে; এবং সমহারে উৎপন্নের বিধি কার্য করিলে যোগান-দাম কমিবেও না, বাড়িবেও না—একই থাকিবে।

উৎপন্নের বিধিও যোগানকে প্রভাবান্বিত করে

তিনটি উৎপন্নের বিধি

বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন-ব্যয়ের জন্য যোগান-দাম বিভিন্ন হয়

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (Equilibrium of Demand and Supply): চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাউক যে ইহাদের প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদার নিয়ম অনুসারে দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে; অপরদিকে যোগানের নিয়ম অনুসারে ঠিক বিপরীত ঘটে। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণের এই বিপরীতমুখী গতি

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে দাম ধার্য হয়

এক স্থানে আসিয়া পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। যে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে ভারসাম্য-দাম (Equilibrium Price) এবং ঐ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Amount) বলা হয়।

নিম্নে চাহিদা ও যোগান সূচী পাশাপাশি সাজাইয়া প্রতিযোগিতামূলক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করা হইল :

সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ	প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৫ কুইণ্টাল	৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
৭ „	২.৫০ „	১৩ „
১০ „	২ „	১০ „
১৫ „	১.৫০ „	৭ „
২৫ „	১ „	৪ „

উপরি-উক্ত চাহিদার তালিকা হইতে দেখা যায় যে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে, কিন্তু যোগানের তালিকা অনুসারে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা করিয়া তখন চাহিদা ও যোগান উভয়ই ১০ কুইণ্টাল। দাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হইতে ২.৫০ টাকা হইলে যোগান ১৩ কুইণ্টাল হইবে কিন্তু চাহিদা ৭ কুইণ্টালে নামিয়া আসিবে। ফলে বাধ্য হইয়া বিক্রেতাদের দাম কমাইতে হইবে। অপরদিকে দাম কমিয়া ১.৫০ টাকা হইলে চাহিদা বাড়িয়া ১৫ কুইণ্টাল হইবে, কিন্তু যোগান কমিয়া ৭ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। ফলে চাহিদার প্রভাবে দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী হইবে। এইভাবে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে চাহিদা ও যোগান ২ টাকা দামে পরস্পরের সহিত সমান হইবে। এই ২ টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থাই হইল ভারসাম্যের অবস্থা (Equilibrium Position) এবং এই ২ টাকা দামই ভারসাম্য-দাম (Equilibrium Price)। ভারসাম্য-দাম বলা হয় এই কারণে যে ঐ দামে চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের মধ্যে সমতার সৃষ্টি হয়।

ভারসাম্য-দাম

বিষয়টিকে চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে বুঝাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রটি অংকন করা হইল :

চ চ´ পূর্বোক্ত চাহিদা-রেখা ; উহার গতি নিম্নমুখী। য য´ যোগান-রেখা ; উহা ঊর্ধ্বগামী।* উহারা পরস্পরকে দ´ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। দ দ´ (অস্থায়ী) ভারসাম্য-দাম পরিমাপ করে। অর্থাৎ, দ দ´ দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান (ক দ পরিমাণ) হইবে। দাম যদি বাড়িয়া ছ ত´

* ৩০ এবং ১০৯ পৃষ্ঠা।
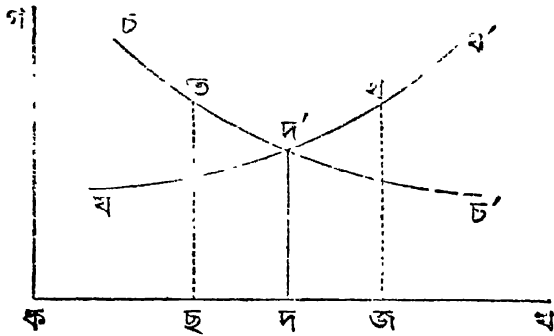
হয় তবে চাহিদা কমিয়া ক ছ-এ আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যোগান হইবে ক জ পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবার দামকে দ দ'-তে লইয়া আসিবে।
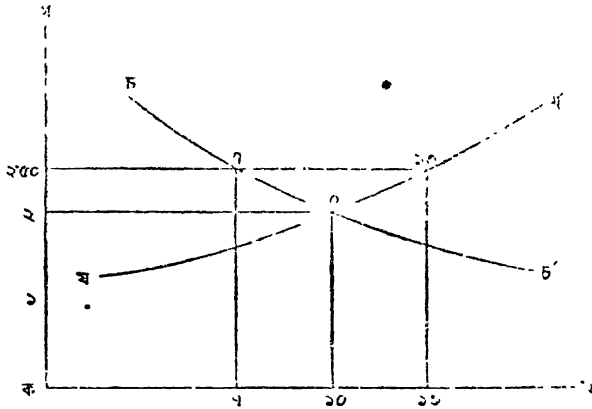
পাটীগাণিতিক হিসাব ধরিলে আমাদের উদাহরণে দ দ' (দাম) হইল ২ টাকা এবং ক দ (চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ) হইল ১০ কুইণ্টাল। দাম দ দ' (২ টাকা) হইতে বাড়িয়া ছ ত (২·৫০ টাকা) হইলে চাহিদা ক দ (১০ কুইণ্টাল) হইতে ক ছ-তে (৭ কুইণ্টাল) কমিয়া আসিবে; কিন্তু যোগান ক দ (১০ কুইণ্টাল) হইতে ক জ-তে (১৩ কুইণ্টাল) বৃদ্ধি পাইবে।

দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে এইভাবে বিবৃত করা যায়:

দাম-নির্ধারণের ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের তিনটি নীতি

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

(২) দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে; দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে।

(৩) এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়।

সংক্ষিপ্তসার

বিনিময় উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু। পূর্বে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় করিত। দ্রব্য-বিনিময় হউক আর টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ই হউক বিনিময়কারী উভয় পক্ষ লাভবান হইয়াছে মনে না করিলে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় না। উভয় পক্ষ তখনই লাভবান হয় যখন উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। আধুনিক বিনিময়ের উদাহরণ দিয়া বলিতে গেলে, টাকাকড়ি ও দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হইলে তবেই বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। যে-দামে ইহা হয় তাহাকে বাজার-দাম বলে।

মূল্য ও দাম: মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম বলে। দামের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা মূল্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি।

দাম-নির্ধারণ: দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান দ্বারা। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন যে দাম শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই দিক দিয়া কয়েকটি তত্ত্বও উদ্ভূত হইয়াছে—যথা, (ক) শ্রমতত্ত্ব, (খ) উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, (গ) পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্বের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া মার্শাল ধারণা করেন যে, কাঁচি দিয়া কোন কিছু কাটিতে হইলে যেমন কাঁচির দুইটি ফলাই ব্যবহার করিতে হয়, তেমনি দামও চাহিদা এবং যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়—একমাত্র চাহিদা বা একমাত্র যোগান দ্বারা নহে।

চাহিদা ও যোগান: চাহিদা ও যোগান দামের সহিত সম্পর্কিত, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগান উভয়ই পরিবর্তিত হয়। চাহিদার সূত্রের মত যোগানের সূত্র, চাহিদা দামের মত যোগান-দাম এবং চাহিদা-রেখার মত যোগান-রেখাও আছে।

স্বল্পকালীন যোগানের পশ্চাতে কাজ করে 'সংরক্ষণ-দাম' এবং দীর্ঘকালীন যোগানের পশ্চাতে কাজ করে উৎপাদন-ব্যয়। তবে স্বল্পকালীন স্থিতিশীল যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়, কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিক্রেতা যোগান দিবে কি না মোটামুটি তাহা ঠিক করে।

যোগান ও উৎপাদনের বিধি: দীর্ঘকালীন স্থিতিশীল যোগান উৎপাদন ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই উৎপাদন-ব্যয় কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদনের বিধির উপর।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য: প্রতিযোগিতামূলক দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে অবস্থায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া দাম নিরূপিত হয় তাহাকে 'ভারসাম্যের অবস্থা' এবং সে-দামে উহা নির্ধারিত হয় তাহাকে 'ভারসাম্য-দাম' বলা হয়।

দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে তিনটি সরল নীতিতে বিবৃত করা যায়

১। কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

২। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে; দাম বাড়িলে ইহার বিপরীত ঘটে।

৩। এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. State the Law of Supply. What are the forces that lie behind it?
যোগানের সূত্র বিবৃত কর। যোগানের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কাজ করে?

2. Explain how price is determined under conditions of competition.
কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণ

(Price Determination under Different Market Conditions)

মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক বাজারকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, এবং (খ) অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া কারবারের বাজার। ইহা ছাড়াও বাজার যে সময়ের তারতম্য বা পরিধি অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হইতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি।

পূর্ণাংগ এবং অপূর্ণাংগ বা একচেটিয়া বাজার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ (Price Determination in Perfectly Competitive Market): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়—(১) বাজার-দাম, এবং (২) স্বাভাবিক দাম। সংক্ষেপে, বাজার-দাম হইল স্বল্পকালীন দাম এবং স্বাভাবিক দাম হইল দীর্ঘকালীন দাম। বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে; কিন্তু স্বাভাবিক দাম একদিকে প্রান্তিক উপযোগ অপরদিকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। প্রথমে কিভাবে বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা যাউক।

বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতা অসংখ্য থাকে বলিয়া, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য একই মানের হয় বলিয়া, পৃথকভাবে ক্রেতাবিক্রেতাগণ মোট বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সামান্য সামান্য অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া এবং প্রত্যেকেই অপরে কি দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহা জানে বলিয়া বাজার-দাম এক হয়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা

বাজার-দাম এই এক হওয়ার মূলে কাজ করে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত। চাহিদা ও যোগান কিভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে সে-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।* এখন সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদা ও যোগান একসময় পরস্পারের সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা অবশ্য অস্থায়ী। এইজন্য ইহাকে অস্থায়ী ভারসাম্য (Temporary Equilibrium) এবং ঐ দামকে অস্থায়ী ভারসাম্য দাম (Temporary Equilibrium Price) বা বাজার-দাম (Market Price) বলা হয়।

বাজার-দাম হইল অস্থায়ী ভারসাম্য দাম

---

* ১১১-১১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব (Influence of Marginal Utility and Cost of Production on Market Price): বাজার-দাম হইল স্বল্পকালীন ভারসাম্য-দাম। অর্থাৎ, অল্প সময়ের মধ্যে যে-দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তাহাকেই বাজার-দাম বলে। অল্প সময়ের মধ্যে যোগান মোটামুটি স্থির থাকে। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় বাজার-দামের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। মাছ, তরি-তরকারি প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন ক্রেতারা যে-দাম দিতে চাহিবে বিক্রেতাগণকে তাহাতেই উহা বিক্রয় করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় বিক্রেতাদের প্রত্যাশিত বা সংরক্ষণ দাম (Reservation Price) থাকে। এই সংরক্ষণ-দামের জন্য বাজার-দামের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।*

বাজার-দামের উপর যোগানের কিছুটা প্রভাব দেখা যায়

কিন্তু ক্রেতার নিকট বাজার-দাম সর্বদাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। কোন দ্রব্য লোকে যত বেশী পরিমাণ ক্রয় করিতে থাকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে উহার প্রতি ক্রীত এককের উপযোগ ততই কমিতে থাকে। এইভাবে একসময় বাজার-দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। যে-ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ২ কিলোগ্রাম সরিষার তৈল ক্রয় করিল, সে ২ কিলোগ্রামের কম বা বেশী ক্রয় করিল না কেন? অথবা, যে-ব্যক্তি ২৫ নয়া পয়সা দামের দুই গ্লাস সরবৎ পান করিল, সে ১ বা ৩ গ্লাস সরবৎ পান করিল না কেন? ইহার উত্তর হইল, প্রথম ব্যক্তির নিকট সরিষার তৈলের দ্বিতীয় কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের উপযোগ ২৫ নয়া পয়সার সমান। স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় বিভিন্ন প্রকার হয়। একজন ২ টাকা দামে ৪ কিলোগ্রাম তৈলও ক্রয় করিতে পারে। তাহার নিকট ৪র্থ কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার সমান।** সুতরাং বাজার-দাম মোট বিক্রীত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মনে করিলে ভুল হইবে; উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মাত্র।

অবশ্য চাহিদা বা উপযোগের প্রভাবই অধিক

কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়? (How is Normal Price Determined?): দীর্ঘকালীন বাজারে শেষ পর্যন্ত যে-দাম

---

* ১১০-১১১ পৃষ্ঠা দেখ।

** এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে উপযোগ পরিমাপ করা হইয়া থাকে লোকে কি দাম দিতে প্রস্তুত তাহার দ্বারা।...২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

নির্ধারিত হওয়া সম্ভব তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলা হয়। স্বাভাবিক দাম বলিতে কোন বিশেষ দামকে বুঝায় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে যে-দাম নির্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক তাহাকেই বুঝায়। স্বাভাবিক দাম দীর্ঘকালীন গড়পড়তা দামও নহে। চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে ইহা ধরিয়া লইয়াই দীর্ঘকালীন গড়পড়তা দাম-নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক দাম-নির্ধারণের বেলায় চাহিদা ও যোগানের অবস্থার যে যে পরিবর্তন ঘটা সম্ভব তাহাদের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়।

স্বাভাবিক দাম বলিতে কি বুঝায়

স্বাভাবিক দাম আবার অতি দীর্ঘকালীন দাম নাও হইতে পারে। কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হওয়া সম্ভব; আবার কয়েকটির বেলায় বহুদিন সময় লাগিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, মোটামুটি যে দীর্ঘকালীন সময়ের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম।

স্বাভাবিক দাম সকল সময়েই উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। চাহিদার অবস্থা অনুসারে বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম বা বেশী হইতে পারে। দাম উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদক বা বিক্রেতাগণকে লোকসান দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে; এবং দাম বেশী হইলে তাহাদের মুনাফা 'স্বাভাবিক মুনাফা' অপেক্ষা অধিক হইবে। এই দুইটি অবস্থার কোনটিই বেশীদিন বর্তমান থাকিতে পারে না। কোন উৎপাদকই দীর্ঘকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিবে না, এবং মুনাফা স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হইতে থাকিলে সকলে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিবে, নূতন নূতন ব্যবসায়ী ঐ দ্রব্য উৎপাদন সুরু করিবে, ইত্যাদি। ফলে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সম্পূর্ণ সমান হইবে। এই দামকে 'স্বাভাবিক দাম' (Normal Price) এবং এই অবস্থাকে প্রকৃত ভারসাম্যের অবস্থা বলা হয়। এই দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সহিত সমান হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশীল বা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ, তাহাদের বাড়াকমার দিকে কোনও ঝোঁক দেখা যায় না। সুতরাং স্বাভাবিক দামে প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয়।

স্বাভাবিক দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়

এখন প্রশ্ন হইল, স্বাভাবিক দাম কোন্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে? আধুনিক লেখকগণের মতে, ইহা তাহারই সমান হইবে যাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় (average cost) পরস্পরের সহিত সমান। এইরূপ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে কাম্য প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm) বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় এবং কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Marginal and Average Cost of Production and Optimum Firm) : কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উহার বিপরীত ঘটে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তনের সংগে সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয়ও যে পরিবর্তিত হয় তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণটি হইতে বুঝা যাইবে :

মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	মোট উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	গড় উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)
১	১০	১০	১০
২	১৮	৮	৯
৩	২৭	৯	৯
৪	৩৮	১১	৯·৫

দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন যখন ৩ কুইন্টাল তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই ৯ টাকা হইতেছে। যে-পরিমাণ উৎপাদন হইলে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই এরূপ সমান হয় তাহাকে কাম্য উৎপাদন (Optimum Production) বলে। সুতরাং আমাদের উদাহরণে ৩ একক হইল কাম্য উৎপাদন এবং যে-প্রতিষ্ঠান ঐ পরিমাণ উৎপাদন করে এবং যাহার প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই ৯ টাকা হয় তাহাই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm)।

কাম্য উৎপাদন ও কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব (Time Element in Price Determination) : চাহিদা ও যোগানের প্রভাব দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই দুই প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সময়ের সংগে সংগে যে পরিবর্তিত হয়, বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের পার্থক্য হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। সংক্ষেপে বলা যায়, সময় যতই স্বল্প হইবে চাহিদার প্রভাব হইবে তত অধিক, এবং সময় যতই দীর্ঘ হইবে যোগানের প্রভাব হইবে তত বেশী।

সময় স্বল্প হইলে চাহিদা অধিক এবং সময় অধিক হইলে যোগান অধিক প্রভাব বিস্তার করে

সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বাজার চারি প্রকারের হয় বলিয়া* মার্শাল চারি প্রকারের দামের উল্লেখ করিয়াছেন : (ক) অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম

* ৯৮-১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(Very Short-period or Market Price), (খ) স্বল্পকালীন দাম (Short-period Price), (গ) দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম (Long-period or Normal Price), এবং (ঘ) অতি দীর্ঘকালীন দাম (Very Long-period or Secular Price)।

সময়ানুসারে বাজার-দামের প্রকারভেদ

অত্যল্পকালীন বাজারে দাম অনিয়মিত ও ক্ষণস্থায়ী কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই সময়ে চাহিদার প্রভাব হয় সর্বাধিক। বিক্রেতারা অবশ্য মাল বিক্রয় না করিয়া কিছুদিন বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বেশীদিন তাহাদের পক্ষে এই অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং মোটামুটি চাহিদার প্রভাব দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয়। বলা হইয়াছে যে, এই দামকে বাজার-দাম বলা হয়। ইহাতে বিক্রেতার লাভও হইতে পারে আবার ক্ষতিও হইতে পারে।

অত্যল্পকালীন বাজার-দাম

বাজার-দাম অধিক হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যোগান নির্ভর করে সাজসরঞ্জামের অবস্থা ও উৎপাদনের আয়তনের উপর। অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সাজ-সরঞ্জাম ও উৎপাদনের আয়তনে অধিক উৎপাদন করিতে গেলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের (increasing cost) সূত্র ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং উৎপাদকগণ সেই পর্যন্ত উৎপাদন করিবে যে পর্যন্ত-না প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় দামের সমান হয়। এই দামকে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Short-period Normal Price) বলা যাইতে পারে।

স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম

দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জাম—অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব। কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকে তবে উৎপাদকগণ অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া, উৎপাদনের আয়তন বৃহত্তর করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের (decreasing cost) সূত্র ক্রিয়া করে তবে দাম হ্রাস পাইবে, অপরদিকে যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র কার্যকর হয় তবে দাম বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকিলে দাম একই থাকিবে। দীর্ঘকালীন বাজারে এই দামকে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (Long-period Normal Price) বলা হয়।

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম

অতি দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জামেরও উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তিত হয়, দামের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এই সকলের ফলে দাম বাজার-দাম বা স্বাভাবিক দাম হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে পারে। এই অতি দীর্ঘকালীন দাম ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত।

অতি দীর্ঘকালীন দাম

উপসংহার : দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের উপসংহার হিসাবে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, দাম চাহিদা ও যোগানের অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার পশ্চাতে কার্য করে ক্রেতাদের উপযোগকে সর্বাধিক করিবার ইচ্ছা (desire to maximise utility) এবং যোগানের পশ্চাতে কার্য করে সংগঠকদের মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা (desire to maximise profit)। বিশেষ অবস্থায় যখন উভয়েরই প্রচেষ্টা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া তাহারা ক্রয়বিক্রয়ে অগ্রসর হয় তখনই ভারসাম্যের সৃষ্টি হইয়া দাম নির্ধারিত হয়।

পরিশিষ্ট* : একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম (Price under Monopoly) : যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয় মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তখন ঐ অবস্থাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রব্যের কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute) পাওয়া যায় না। এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশনই একচেটিয়া কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।**

একচেটিয়া কারবারের অর্থ

সকল প্রকার কারবারেই ব্যবসায়ী তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায়। একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক (maximisation of profit) করা। কিন্তু প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া কারবারের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে এবং প্রত্যেক বাজারে মোট দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্রাংশই যোগান দিয়া থাকে। কোন একজনের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাজারে ঐ দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয় না। প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া প্রত্যেক উৎপাদককে বাজারে প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। কেহ বাজারে প্রচলিত দাম অপেক্ষা অধিক চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতাদের নিকট চলিয়া যাইবে। এইজন্য প্রতিযোগী কারবারী উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া মুনাফা সর্বাধিক করিতে চেষ্টা করে। ফলে শেষ পর্যন্ত দাম (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হইতে পারে না।

মুনাফা সর্বাধিক করা ব্যবসায়ীর লক্ষ্য

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কিভাবে এই লক্ষ্য সাধন করে

একচেটিয়া কারবারে কিন্তু উৎপাদক বা ব্যবসায়ী দ্রব্যের যোগানের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ফলে তাহার দাম (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হইতে পারে।

* বাণিজ্য-ধারার সিলেবাসে একচেটিয়া কারবারে দামের উল্লেখ নাই। এইজন্যই ইহার আলোচনা পরিশিষ্ট আকারে করা হইল।

** ১০২ পৃষ্ঠা দেখ।

একচেটিয়া কারবারী মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা না করিয়া যোগানকেই নিয়ন্ত্রণ করে। যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost) এবং বিক্রয়লব্ধ প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue) সমান হয় তখনই তাহার মুনাফা হইয়া দাঁড়ায় সর্বাধিক। সুতরাং যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক আয়ের সমান দাঁড়াইবে ততটা পরিমাণ দ্রব্যই সে উৎপাদন করিবে বা যোগান দিবে, কারণ ইহা করিলেই তাহার লাভ সর্বাধিক হইবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিতে এক একক (unit) অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-ব্যয় পড়ে তাহাকে বুঝায়। যেমন, ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০০ টাকা ব্যয় হয় এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০৫ টাকা পড়ে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ, এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইল (১০৫ – ১০০ =) ৫ টাকা।*

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং বিক্রয়লব্ধ প্রান্তিক আয় সমান হইলেই একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক হয়

অপরদিকে এক একক অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন কারবারী বা প্রতিষ্ঠান যে অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। যেমন, প্রতি একক দ্রব্য ১১ টাকা করিয়া দামে ১০টি দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়ায় ১২০ টাকা। যখন সে ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করে তখন যদি প্রতি এককের দাম কমিয়া ১১.৫০ টাকা হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ১২৬.৫০ টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়—অর্থাৎ, এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত আয় হইবে (১২৬.৫০ – ১২০ =) ৬.৫০ টাকা। এই উদাহরণে দেখা যায় যে কারবারী যখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহার অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে ৫ টাকা। উহা যখন বিক্রয় করে তখন অতিরিক্ত আয় হয় ৬.৫০ টাকা। সুতরাং তাহার অতিরিক্ত মুনাফা হয় (৬.৫০ – ৫ =) ১.৫০ টাকা।

কিভাবে কারবারী ইহা করিতে চেষ্টা করে

এখন, যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন বাড়াইয়া চলিতে থাকে। কারণ, ইহাতে তাহার লাভের মোট অংক বাড়িয়াই যায়। অবশেষে যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়, তখন মুনাফার পরিমাণ হয় সর্বাধিক। ইহার পর সে উৎপাদন বৃদ্ধি করে না। কারণ, তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে লোকসান যাইবে। পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটি হইতে উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজে বুঝা যাইবে :

উদাহরণ

* এখানে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন ধরা হইয়াছে।

(হিসাব টাকা ও নয়া পয়সায়)

দ্রব্যের পরিমাণ	প্রতি এককের দাম (টাকা)	মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) বিক্রয়লব্ধ আয়	মোট উৎপাদন-ব্যয়	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) উৎপাদন ব্যয়	মোট মুনাফা (টাকা)
১০	১১	১১০	—	১০০	—	+১০
২০	৯	১৮০	৭	১৫০	৫	+৩০
৩০	৮	২৪০	৬	১৮৫	৩·৫০	+৫৫
৪০	৭	২৮০	৪	২২৪	৩·৯০	+৫৬
৫০	৬	৩০০	২	২৬৯	৪·৫০	+৩১
৬০	৫	৩০০	০	৩৩০	৬·১০	−৩০

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে একচেটিয়া কারবারী যখন ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ৭ টাকা দামে বাজারে বিক্রয় করে তখন তাহার মুনাফা (৫৬ টাকা) সর্বাধিক হয়। কারণ, ইহাতেই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (৩ টাকা ৯০ নয়া পয়সা) তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (৪ টাকা) প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। অন্য কোন উৎপাদন ও মূল্যের স্তরে তাহার এতটা মুনাফা করা সম্ভব নয়। ধরা যাউক যে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইয়া ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে ৪ টাকা ৫০ নয়া পয়সা কিন্তু প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ২ টাকা মাত্র। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে অধিক হওয়ার ফলে তাহার মোট মুনাফার পরিমাণ ৫৬ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১ টাকায় দাঁড়াইবে। সুতরাং একচেটিয়া উৎপাদনকারী ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া ৪০ একক দ্রব্যই উৎপাদন করিবে। অপরদিকে একচেটিয়া কারবারী যদি উৎপাদন কমাইয়া ৩০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৬ টাকা এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ৩ টাকা ৯০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সা হইবে, এবং মোট লাভের পরিমাণ হইবে ৫৫ টাকা। এই অবস্থায় উৎপাদন বাড়াইয়া ৪০ একক করিলে তাহার মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়াই যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, যখন প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয় তখনই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা হয় সর্বাধিক। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং উহা যে-দামে বিক্রয় করিলে প্রান্তিক

যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় একচেটিয়া কারবারী সেই দামে সেই পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করে

উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইবে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দামে উহা বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে।

একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের এই সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্য নিম্নে চিত্রটি দেওয়া হইল:
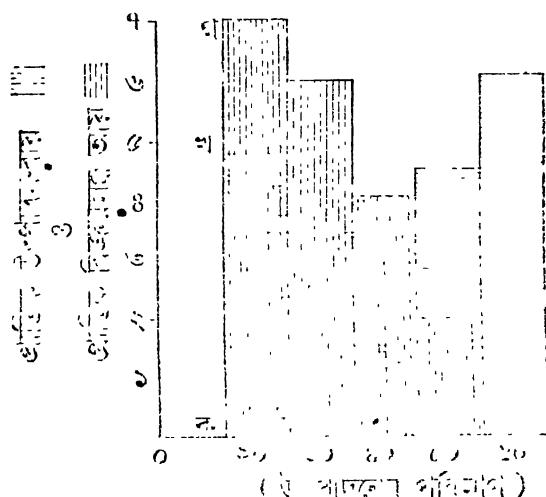
চিত্রটির প্রত্যেক স্তম্ভের লম্বালম্বি—অর্থাৎ, উপর-নীচের লাইনগুলির দ্বারা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে, আর পাশাপাশি লাইনগুলির দ্বারা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে ২০ একক উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে কখ (৫ টাকা) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে কগ (৭ টাকা); সুতরাং প্রান্তিক মুনাফা (marginal profit) হইল খগ (৭ − ৫ = ২ টাকা)। ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদনের বেলায় দেখা যায় যে ৩য় স্তম্ভটির প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশ এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ প্রায় পরস্পরের সমান হইয়াছে। অতএব ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলেই একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক মুনাফা হইবে। ইহার পর হইতে স্তম্ভের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক মুনাফা ত হইতেছেই না, বরং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্যের উৎপাদনে লোকসান যাইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়—(ক) বাজার-দাম, এবং (খ) স্বাভাবিক দাম।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতাবিক্রেতা থাকে বলিয়া, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মান একই হয় বলিয়া, ক্রেতাবিক্রেতাগণ মোট চাহিদা ও যোগানের সামান্য অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া এবং প্রত্যেকেই অপরে কি দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহা জানে বলিয়া বাজার-দাম একই হয়।

বাজার-দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে-অবস্থায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া বাজার-দাম নিরূপিত হয় তাহাকে 'অস্থায়ী ভারসাম্য অবস্থা' বলা হয়। ফলে বাজার দাম 'অস্থায়ী ভারসাম্য-দাম' নামেও অভিহিত হয়।

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব: বাজার-দামের বেলায় যোগান অপেক্ষা চাহিদারই অধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহা উৎপাদন ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে; কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়: যে মোটামুটি দীর্ঘকালীন সময়ে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম। স্বাভাবিক দাম সকল সময়েই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় এবং কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান: প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবর্তিত হইয়া কাম্য উৎপাদন ও কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে।

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব: সময় যত স্বল্প হয় দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত অধিক হইতে দেখা যায়; অনুরূপভাবে সময় যত দীর্ঘ হয় যোগানেরও তত অধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে চার প্রকার বাজারের জন্য চারি প্রকার দামের কথা মার্শাল উল্লেখ করিয়াছেন—১। অত্যল্পকালীন দাম, ২। স্বল্পকালীন দাম, ৩। দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম, এবং ৪। অতি দীর্ঘকালীন দাম। অত্যল্পকালীন দামকে বাজার-দাম বলা হয়। ইহা কেবলমাত্র চাহিদার প্রভাব দ্বারাই নির্ধারিত হয়। স্বল্পকালীন দাম স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম নামেও অভিহিত। ইহা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘকালীন দাম বা দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অতি দীর্ঘকালীন দাম রুচি ইত্যাদির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

উপসংহার: উপযোগ সর্বাধিক করা এবং মুনাফা সর্বাধিক করা যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতার লক্ষ্য বলিয়া যেখানে ইহাদের উভয়ই সর্বাধিক হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম: সকল প্রকার ব্যবসায়েই কারবারীর উদ্দেশ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একজন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। তাহাকে বাজারের প্রচলিত দামেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়াই মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। একচেটিয়া কারবারী সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া সে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

সে সেইভাবেই যোগান নিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। যেখানে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান হয় সেখানেই তাহার মুনাফা হয় সর্বাধিক এবং বাজারে দাম ঐ পরিমাণ উৎপাদন এবং উহার জন্য ক্রেতাদের চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Show how price is determined in a competitive market by the interaction of the forces of Demand and Supply.

কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় তাহা দেখাও।

2. What is meant by a perfectly competitive market ? Explain how the value of a commodity is determined in such a market.

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাহাকে বলে ? এরূপ বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় দেখাও।

3. Explain how price is determined in a market under perfect competition.

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।

4. What are Market Prices ? Why is demand more influential than supply in fixing market prices ?

বাজার-দাম কাহাকে বলে ? বাজার-দাম নির্ধারণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব অধিক হয় কেন ?

5. Distinguish between Market Price and Normal Price. Explain how Market Price of a commodity is determined.

বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কিভাবে বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

6. What is the distinction between Market Value and Normal Value in economic theory ? Explain how normal value of a thing is determined in a competitive market.

অর্থবিদ্যায় বাজার দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় ? প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

7. "The Normal Price of a commodity, under conditions of competition, tends to be equal to its marginal cost of production."—Discuss.

'প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় স্বাভাবিক দামের পক্ষে দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।'—আলোচনা কর।

8. Write short notes on Market Price and Normal Price.

বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।

9. "As a general rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on Value ; and the longer the period, the more important will be the influence of cost of production on Value." Explain the statement.

"সাধারণ নিয়ম অনুসারে সময় যত স্বল্প হইবে দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত অধিক দেখা যাইবে এবং সময় যত দীর্ঘ হইবে দামের উপর উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব তত গুরুত্বপূর্ণ হইবে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।

10. How far does value depend upon cost of production ?

দাম উৎপাদন-ব্যয়ের উপর কতটা নির্ভর করে ?

[উত্তরের কাঠামো: দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা। যোগানের পশ্চাতে কাষ করে উৎপাদন-ব্যয়। এই কারণে দাম ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতে বাধ্য। তবে সকল প্রকার দামের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় সমপরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে না। পচনশীল দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন, ক্রেতারা যে-দাম দিতে চাহিবে তাহাতেই বিক্রেতাদের বিক্রয় করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় কিন্তু বিক্রেতাদের সংরক্ষণ-দাম থাকে। এই সংরক্ষণ-দামও

কতকটা উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতএব, পচনশীল ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের বাজার-দামের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব থাকে। মোটামুটিভাবে, এই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার-দামের (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

স্বাভাবিক দাম অবশ্য সকল সময়ই (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। চাহিদার অবস্থা অনুসারে বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয়ের কম বা বেশী হইতে পারে। ইহার ফলে বিক্রেতাদের ক্ষতি বা অতিরিক্ত লাভ হইতে পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে কোন উৎপাদকই ক্ষতি সহ্য করিবে না, অথবা স্বাভাবিক মুনাফার বেশী লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং স্বাভাবিক দাম (স্বাভাবিক মুনাফা সহ) উৎপাদন-ব্যয়েরই সমান হইবে। মোটকথা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সময় যত দীর্ঘকালীন হইবে দামের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাবও তত অধিক হইবে। একচেটিয়া কারবারের বাজারে দাম অবশ্য সকল সময়ই (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।·· এবং (১১৬ এবং ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা)]

11. What is a monopoly? How is Monopoly Price determined?

(P. U. 1962; H. S. (H) Comp. 1961, '62)

একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে? কিভাবে একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম নির্ধারিত হয়?

[১২০-১২৩ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে? (What is International Trade?): বর্তমান দিনে অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কোন দেশই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না। চাহিলেও ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাই এক দেশ অন্যান্য দেশের সহিত নানাপ্রকার বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ হয়। প্রত্যেক দেশই তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের কতকগুলি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে এবং উহাদের পরিবর্তে আবার অন্যান্য দেশ হইতে কতকগুলি দ্রব্য আমদানি করে। যেমন, আমাদের দেশ অন্যান্য দেশে চা, পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতি রপ্তানি করে আবার খাদ্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্য অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করে। এক দেশের সহিত অন্য দেশের দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির এই বিনিময়কেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিতে আন্তর্জাতিক দ্রব্য-বিনিময় বুঝায়

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ (Territorial Division of Labour): মূলত এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতি হইতে

ভিন্ন নয়। যে কারণে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চলে সেই কারণেই এক দেশ অন্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। এই কারণটি হইল শ্রমবিভাগ। ব্যক্তির কথা ধরিলে দেখা যায় যে কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না। প্রত্যেকেই কোন এক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জন করে এবং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে অন্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহার অভাব পূরণ করে। যেমন, চিকিৎসক চিকিৎসাকার্যেই নিযুক্ত থাকেন, খাদ্যের জন্য মাঠে যাইয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন না, অথবা নিজে ইট কাটিয়া বাড়ী নির্মাণের চেষ্টা করেন না। এই সকল দ্রব্য তিনি চিকিৎসা হইতে অর্জিত অর্থের বিনিময়ে অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন। এমনকি কৃষিতে তাঁহার দক্ষতা অন্যান্য কৃষকের তুলনায় অধিক হইলেও তিনি চিকিৎসাই করিবেন, কারণ তাঁহার নিজের দক্ষতা কৃষি অপেক্ষা চিকিৎসাতেই অধিক। এইভাবে বিভিন্ন লোক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অভাবপূরণের জন্য নানা প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে তাহা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। চাষী চাষ করে, ডাক্তার ডাক্তারি করেন, উকিল ওকালতি করেন, শিক্ষক শিক্ষকতা করেন, শ্রমিক কারখানায় কাজ করে, রাজমিস্ত্রী বাড়ী নির্মাণ করে। কিন্তু সকলেই বিনিময়ের মাধ্যমে অন্নবস্ত্র আশ্রয় ও অন্যান্য দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

শ্রমবিভাগের ফলেই ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব হয়

শ্রমবিভাগের কারণ দক্ষতার বিভিন্নতা

এইরূপ শ্রমবিভাগের সুবিধা হইল যে, বিভিন্ন লোক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকায় একদিকে যেমন কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং উৎপাদন বেশী হয়, অপরদিকে তেমনি বহু রকমের জিনিসপত্রের উৎপাদন সম্ভব হয় এবং ফলে লোকের জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পায় ও ভোগে বৈচিত্র্য আসে।

শ্রমবিভাগের সুবিধা

ব্যক্তির মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও কর্মবিভাগ দেখা যায়। সকল অঞ্চলের সকল দ্রব্য উৎপাদনে সমান দক্ষতা বা সুযোগ-সুবিধা থাকে না। যে-অঞ্চলের যে-দ্রব্য উৎপাদনে অধিক সুবিধা থাকে সেই অঞ্চলের সেই দ্রব্য উৎপাদনে তাহার উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়োগ করে। যেমন, আমাদের দেশে বোম্বাই কাপড়, পশ্চিমবংগ পাট এবং উত্তরপ্রদেশ চিনি উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে বলিয়া এই সকল অঞ্চলে যথাক্রমে বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প এবং চিনিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ

ভারতের উদাহরণ

এই একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে উপাদানগুলি নিয়োগ করে এবং নিজ নিজ উৎপন্ন

দ্রব্য রপ্তানি করিয়া তাহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করে। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা দেশ যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয় তাহাকে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ (territorial division of labour) বলা হয়। আভ্যন্তরীণ শ্রমবিভাগের ফলে যেমন দেশের উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলেও তেমনি বিভিন্ন দেশের এবং সমগ্রভাবে পৃথিবীর উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করে। একটু পরেই আমরা এ-বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিব।

আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগেরই ব্যাপকতর রূপ

আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগকে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ বলা হয়

বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে দেখা যায়, কোন কোন দ্রব্য পৃথিবীর নানা দেশের সহযোগিতায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সার্টের উল্লেখ করা যায়। সার্টটির তুলা হয়ত মিশরে উৎপন্ন হইয়াছে, কাপড় বুনা হইয়াছে ইংলণ্ডে, এবং আমেরিকায় তৈয়ারি সেলাই-এর কলে সেলাই হইয়া উহা বাংলাদেশে কেহ পরিধান করিতেছে।
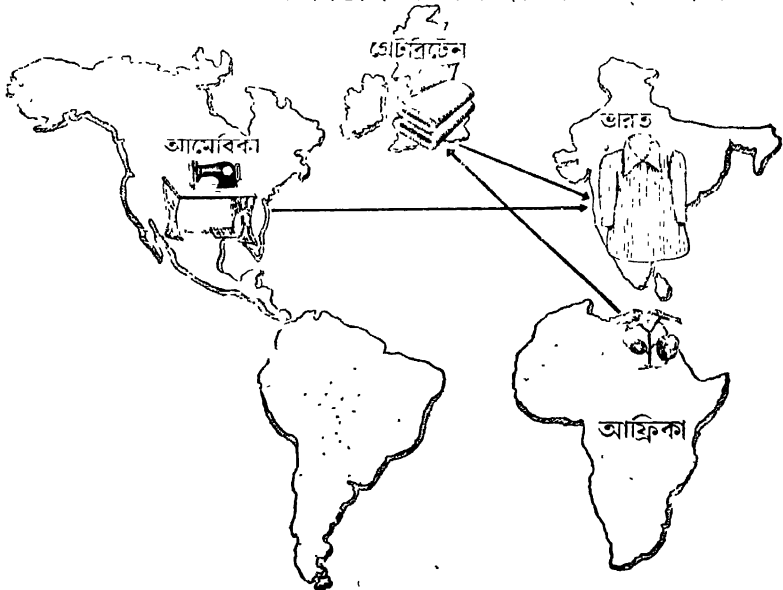
আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Domestic and International Trade) : এখন প্রশ্ন হইল, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি যদি একই হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনার সার্থকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মুখ্যত প্রকৃতি এক হইলেও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন মোটামুটি গতিশীল (mobile) থাকে। অর্থাৎ, যে-সকল শিল্পে আয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে সে-সকল শিল্পেই উহারা সরিয়া আসিয়া নিয়োজিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন অপেক্ষাকৃত গতিবিহীন (immobile)। যেমন, মার্কিন দেশে শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরি অধিক হইতে পারে; কিন্তু এই অধিক মজুরির জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যাইতে পারে না।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এক হইলেও উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে :

১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধন গতিশীল নহে

এই গতিহীনতার একাধিক কারণ আছে। যেমন, ভাষাগত পার্থক্য, দেশপ্রীতি, সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক সংগঠনের পার্থক্য, সরকারী বাধানিষেধ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিকদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। মূলধনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কারণ প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে, যদিও অবশ্য শ্রম অপেক্ষা মূলধন অধিক গতিশীল।

কেন গতিশীল নহে

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যাহা এক দেশ হইতে অন্য দেশে চালান দেওয়া যায় না—যেমন, জলবায়ুর অবস্থা, জমির উর্বরতা, ভূগর্ভস্থিত খনিজ সম্পদ প্রভৃতি।

২। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও রহিয়াছে

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকার আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বসাইয়া ও অন্যান্যভাবে বাধানিষেধের সৃষ্টি করে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সরকার সাধারণত এ-ধরনের বাধানিষেধ আরোপ করে না।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিতও হয়

চতুর্থত, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের। অতএব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার সমস্যা দেখা দেয়।

৪। মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যাও রহিয়াছে

উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাকে পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন হয়।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তত্ত্ব (Territorial Division of Labour and the Law of Comparative Cost) : দেখা গেল যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হইল দেশগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ। এখন এই শ্রমবিভাগ কিভাবে হয় এবং ইহার সুবিধা কি কি তাহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন। যে-ক্ষেত্রে এক দেশ কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এবং অন্য দেশ উহা পারে না, সে-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দেশটি তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে প্রথম দেশ হইতে ঐ দ্রব্য আমদানি করিলে লাভবানই হইবে। এইরূপ অবস্থায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু বুঝিবার অসুবিধা হয় তখনই যখন কোন দেশ কোন দ্রব্য নিজে উৎপাদন করিতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দেশ হইতে ঐ দ্রব্য আমদানি করে। কারণ, আমরা প্রশ্ন করিতে পারি, নিজেই যদি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে ঐ দেশ বিদেশ হইতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য আমদানি না করিয়া নিজে উৎপাদন করিলেই ত পারে? যেমন, ইংলণ্ড নিজেই মাখন উৎপাদন করিতে দক্ষ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংলণ্ড অন্য দেশ হইতে উহা আমদানি করে এবং বিনিময়ে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে: আপাতদৃষ্টিতে ইহা অদ্ভুত মনে হইলেও ইহার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই কারণের সন্ধান পাওয়া যায় আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতির (Principle of Comparative Advantage or Cost) মধ্যে। এই নীতি অনুসারে যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা (comparative advantage) অধিক সে-দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিলে এবং যে-দ্রব্য উৎপাদনে উহার আপেক্ষিক দক্ষতা সর্বাপেক্ষা কম সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আমদানি করিলেই লাভবান হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি :

১। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতা

২। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা

আপেক্ষিক সুবিধা কাহাকে বলে

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক এবং খ এই দুইটি দেশে যথাক্রমে কাপড় ও চা উৎপন্ন হইতে পারে। ক দেশে উৎপাদনের এক একক উপাদানের (নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম, মূলধন ও জমি) দ্বারা ১০০ পাউণ্ড চা কিংবা ১০০ গজ কাপড় উৎপাদন করা যায়; অপরদিকে খ দেশে উৎপাদনের ঐ এক একক উপাদানের সাহায্যে ৫০ পাউণ্ড চা অথবা ১০০ গজ কাপড় উৎপাদন করা যায়। এখন আমাদের ধারণা হইতে পারে ক দেশের পক্ষে খ দেশ হইতে চা বা কাপড় কোন কিছু আমদানি না করিয়া উভয় দ্রব্যই দেশের মধ্যে উৎপাদন করা লাভজনক। এ-ধারণা কিন্তু ভুল। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ক দেশ চা উৎপাদন করিয়া খ দেশ হইতে কাপড় আমদানি করিলে উভয়দেশই লাভবান

উদাহরণ

হইবে। কারণ, ক দেশের আপেক্ষিক দক্ষতা হইল চা উৎপাদনে এবং খ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল কাপড় উৎপাদনে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়।

ধরা যাউক, ক এবং খ দেশ প্রত্যেকের দুই 'একক' করিয়া উৎপাদনের উপাদান আছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না করিয়া উভয় দেশই উপাদানের এক 'একক' করিয়া চা এবং কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে। এই অবস্থায় দুই দেশের উৎপাদন এইরূপ দাঁড়াইবে :

ক দেশ :	১০০ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
খ দেশ :	৫০ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
দুই দেশের মোট :	১৫০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়

এখন যদি ধরা যায় যে ক দেশ তাহার উৎপাদনের দুই একক উপাদান দ্বারা মাত্র চা উৎপাদন করে, অপরদিকে খ দেশ তাহার উৎপাদনের দুই একক উপাদান দ্বারা শুধু কাপড় উৎপাদন করে তাহা হইলে উভয় দেশের উৎপাদনের অবস্থা হইবে এইরূপ :

ক দেশ :	২০০ পাউণ্ড চা	+	০০০ গজ কাপড়
খ দেশ :	০০০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়
দুই দেশের মোট :	২০০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়

এই হিসাব হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ক দেশ মাত্র চা উৎপাদনে এবং খ দেশ মাত্র কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকায় দুই দেশের মোট মিলিত উৎপাদন অধিক হইয়াছে। কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকিলেও চা-এর উৎপাদন ১৫০ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ২০০ পাউণ্ড হইয়াছে। অর্থাৎ, বিশেষিকরণ (specialisation) বা শ্রমবিভাগের ফলে পূর্বের তুলনায় ৫০ পাউণ্ড চা অধিক উৎপন্ন হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বিশেষিকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়

ইহার পর প্রশ্ন উঠে, পৃথকভাবে ক বা খ দেশের কি লাভ হইল? ইহার উত্তর দেওয়াও কঠিন নয়। ক দেশের অভ্যন্তরে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে এক পাউণ্ড চা-এর পরিবর্তে পাওয়া যায় ১ গজ কাপড়, অপরদিকে খ দেশে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে এক গজ কাপড়ের বদলে পাওয়া যায় ½ পাউণ্ড চা।

আন্তর্জাতিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে সকল দেশেরই লাভ হয়

এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক দেশ এক পাউণ্ড চা-এর বিনিময়ে এক গজ কাপড়ের কম লইতে রাজী হইবে না, কারণ ঐ দেশের ভিতরেই এক পাউণ্ড চা-এর পরিবর্তে এক গজ কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। অপর দিকে খ দেশ ১ পাউণ্ড চা-এর বিনিময়ে ২ গজের অধিক কাপড় দিতে প্রস্তুত থাকিবে না, কারণ ঐ দেশের অভ্যন্তরেই ২ গজ কাপড় দিলে ১ পাউণ্ড চা পাওয়া যাইতে

পারে। সুতরাং দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার হইবে এক পাউণ্ড চা-এর পরিবর্তে এক গজ হইতে দুই গজ কাপড়ের মধ্যে।

ঠিক কোথায় কাপড় ও চা-এর বিনিময় হার দাঁড়াইবে তাহা নির্ভর করিবে ক দেশের কাপড়ের জন্য চাহিদা এবং খ দেশের চা-এর জন্য চাহিদার তারতম্যের উপর। ধরা যাউক, দুই দেশের মধ্যে কাপড় ও চা-এর বিনিময় হার হইল ১ গজ কাপড = ·৭৫ পাউণ্ড চা। এখন যদি খ দেশ ১০০ গজ কাপড় ক দেশে রপ্তানি করিয়া ৭৫ পাউণ্ড চা ক দেশ হইতে আমদানি করে, তাহা হইলে দুই দেশের দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়াইবে এই প্রকার:

কিভাবে লাভবান হয় তাহার দৃষ্টান্ত

ক দেশ:	১২৫ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
খ দেশ:	৭৫ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
মোট:	২০০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উভয় দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে লাভবান হইতেছে। কারণ, প্রত্যেক দেশ যদি চা এবং কাপড় উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করিত তাহা হইলে ক দেশ ১২৫ পাউণ্ড চা-এর স্থলে মাত্র ১০০ পাউণ্ড চা ভোগ করিতে পারিত আর খ দেশ ৭৫ পাউণ্ড চা-এর স্থলে মাত্র ৫০ পাউণ্ড চা ভোগ করিত। শ্রমবিভাগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক এবং খ দেশ প্রত্যেকে ২৫ পাউণ্ড করিয়া অধিক চা ভোগ করিতে পারিতেছে।

এই উদাহরণ হইতে আমরা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। ইহা হইল যে-দেশের যে-জিনিস উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষতা থাকে সেই দেশ কেবল সেই জিনিস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেই ঐ দেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; এবং লোকেও অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারে। এই সাধারণ সত্যকে আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি (Principle of Comparative Advantage or Cost) বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে ক দেশের চা উৎপাদনে দক্ষতা অপেক্ষাকৃত অধিক, আর খ দেশের আপেক্ষিক দক্ষতা—অর্থাৎ, সর্বাপেক্ষা কম অসুবিধা রহিয়াছে কাপড় উৎপাদনে। সুতরাং ক দেশ চা উৎপাদন ও খ দেশ কাপড় উৎপাদন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিলে উভয় দেশেরই লাভ হইবে।

আপেক্ষিক সুবিধা-তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ভাল উকিল হয়ত নিজেই ভাল টাইপ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি নিজে টাইপ না করিয়া টাইপ করিবার জন্য লোক নিয়োগ করেন, কারণ তাঁহার দক্ষতা ওকালতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উহা হইতেই তাঁহার অধিক আয় হয়।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা নীতি

তাই নিজে টাইপ করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া মাহিনা দিয়া টাইপ করাইবার জন্য সহকারী (assistant) নিয়োগ করেন।

আমরা দুইটি দেশ ও দুইটি দ্রব্য লইয়া ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। বহু দ্রব্য ও বহু দেশের বাণিজ্যের বেলাতেও ঐ একই যুক্তি খাটে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of International Trade): আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের ভিত্তিতে বাধাবিহীনভাবে আন্তর্জাতিক বা ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ এবং বাণিজ্য সংগঠিত হইলে যে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করা যায় তাহার ইংগিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কোন দেশ যে-জিনিস উৎপাদন করিতে পারে না তাহা অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া ভোগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে সারা পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হয় এবং বিভিন্ন দেশের সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায়; ফলে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের ফলে এক দেশ অন্য দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয় এবং অপর দেশের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কতকটা সহায়তা করে।

> সুবিধা:
> ১। ইহাতে কোন দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদন না করিয়াও ভোগ করিতে পারে
> ২। মোট উৎপাদন অধিক হয়
> ৩। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়
> ৪। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নৈতিক মানের প্রসার ঘটে
> ৫। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়

অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কতকগুলি অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। প্রথমত, বর্তমান লাভের (immediate gain) জন্য অনেক সময় ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি করা হয়। যেমন, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া দেশের কয়লা লৌহ তৈল প্রভৃতি রপ্তানি করা হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ লইয়া এক দেশ অন্য দেশে স্বল্প মূল্যে মাল চালিয়া ঐ দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ অন্যায্য প্রতিযোগিতার চাপে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, অবাধ বাণিজ্য ও বিশেষিকরণের ফলে দেশের অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সুষম প্রসার (balanced development) ব্যাহত হইতে পারে। যেমন, কৃষি উন্নতিলাভ

> অসুবিধা:
> ১। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি ঘটিতে পারে
> ২। এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে পারে

করিয়া শিল্প অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবা শিল্প প্রসারলাভ করিয়া কৃষি অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবা মাত্র কয়েকটি শিল্পের প্রসার ঘটিলেও মোট শিল্প-ব্যবস্থা অনগ্রসর থাকিয়া যাইতে পারে। ইহাতে এক দেশ অন্য দেশের উপর অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতা যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় বিপদ টানিয়া আনিতে পারে, কারণ তখন অন্য দেশ হইতে দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৩। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে থাকে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াই সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়। এ-বিষয়ে নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে। এখানে ইহা বলা যাইতে পারে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ত্রুটিগুলিকে দূর করিবার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন থাকিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে যথাসম্ভব অব্যাহত রাখাই যুক্তি-যুক্ত, কারণ ইহার সুবিধাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection):

অবাধ বাণিজ্য বলিতে বুঝায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সকল প্রকার বাধানিষেধ রহিত অবস্থা। অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে বিনা শুল্কে ও বিনা বাধায় দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দেওয়া হয়। অবশ্য বলা হয় যে সরকার রাজস্ব (revenue) সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর কিছুটা শুল্ক বসাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা অবাধ বাণিজ্যের নীতি লংঘন করা হয় না। তবে যাহাতে বিদেশী উৎপাদক ও দেশী উৎপাদকের মধ্যে বিভেদকরণ না হয় সেজন্য যে-ধরনের বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক ধার্য করা হয় সেই ধরনের দেশীয় দ্রব্যের উপর উৎপাদন-শুল্ক (excise duty) বসানো হয়।

অবাধ বাণিজ্য কাহাকে বলে

অপরদিকে সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুযোগসুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা।

সংরক্ষণ কাহাকে বলে

এই বাধানিষেধ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। প্রথমত, বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক (protective tariff) বসানো যাইতে পারে। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায় এবং দেশের লোক বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে দেশী জিনিসপত্র ক্রয় করে। সুতরাং সংরক্ষণমূলক শুল্কের সাহায্যে দেশের উৎপাদকরা বিদেশী উৎপাদকের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, সরকার দেশীয় উৎপাদকদের অর্থসাহায্য (bounties and subsidies) করিতে পারে। ইহার দ্বারা দেশীয়

সংরক্ষণের পদ্ধতি :
১। সংরক্ষণমূলক শুল্ক
২। অর্থসাহায্য

উৎপাদকরা অপেক্ষাকৃত কম দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে এবং বিদেশী উৎপাদকদের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়ত, সরকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ (quota) বাঁধিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বিদেশী দ্রব্য আসিতে পারে না। লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়া আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজন এমন সকল কাঁচামালের বিদেশে রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইয়াও দেশীয় শিল্পের সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। কারণ, বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি না হইলে দেশীয় শিল্প অপেক্ষাকৃত কম দামে উহা পায়। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হয় এবং সুলভ মূল্যে বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয় করা সম্ভব হয়। তবে এরূপ করা হইলে কাঁচামালের উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩। আমদানি নিয়ন্ত্রণ

৪। কাঁচামালের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

পরিশেষে, পরোক্ষভাবেও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। যেমন, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের যুক্তিতে কতকগুলি দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে, সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বিদেশী জিনিসপত্রের পরিবর্তে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ পদ্ধতিকে অদৃশ্য সংরক্ষণ (invisible protection or tariff) বলা হয়।

৫। অদৃশ্য সংরক্ষণ

অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি (Arguments for Free Trade) : অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হইতে পারে। এই শ্রমবিভাগের ফলে যে-দেশ যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ভোগ করে সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে জমি, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে। ফলে সকল দেশে সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়, আর্থিক উন্নতি দেখা দেয় এবং সকল লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চ হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের যুক্তি

(২) অবাধ বাণিজ্যের ফলে জনসাধারণ স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কারণ অবাধ বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে জিনিসপত্রের দাম কম হয়।

স্বল্প দামের যুক্তি

(৩) অবাধ বাণিজ্যের ফলে শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠনের প্রকৃত আয় বাড়িয়া যায়, কারণ বিশেষীকরণের (specialisation) ফলে তাহাদের উৎপাদন অধিক হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের আয়বৃদ্ধির যুক্তি

এই সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও বর্তমান যুগে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক খুব কমই মিলে। ইহার কারণও আছে। দেখা গিয়াছে যে অবাধ বাণিজ্যের

ফলে অনুন্নত ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে। শিল্পোন্নত ও সাম্রাজ্যিক দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় এই সকল দেশ পারিয়া উঠে নাই। ইহা ছাড়াও কোন দেশই বিদেশ হইতে অকাম্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দিতে পারে না। অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লইয়া এক দেশ অন্য দেশের শিল্পাদি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিকভাবে মূল্য কমাইয়া ঐ দেশের বাজারে জিনিসপত্র ছাড়িয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।*

সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Protection): সংরক্ষণের পক্ষে অনেক প্রকারের যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সমর্থনযোগ্য, আর কতকগুলি একরূপ অসমর্থনীয়। যাহা হউক, সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি হইল এইরূপ:

(১) শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument): অনেক দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইহাদের শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশ বহুপূর্বে শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হওয়ায় উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পোন্নতি করা যায় নাই। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এরূপ দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যের নীতি ক্ষতিজনক। এইরূপ দেশে এমন অনেক শিশু-শিল্প থাকে যাহাদিগকে শিল্পোন্নত দেশের পুরাতন শিল্পগুলির সহিত সম্মুখ প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়া দিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে লালন করিতে হইবে, বাল্যাবস্থায় তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সংরক্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ভারত শিল্পে বিশেষ অনুন্নত। শিল্প-প্রসার করিতে হইলে প্রথমদিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

এই যুক্তির সংক্ষিপ্তসার

তবে শিশু-শিল্প সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি না থাকিলেও স্বার্থান্বেষী শিল্পপতিগণ সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে।

(২) শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি (Diversification of Industries Argument): প্রত্যেক দেশের শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনিতে পারিলে একদিকে যেমন অসামঞ্জস্য দূর হয়, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন শিল্পের মধ্য দিয়া লোকের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে। এইজন্য সংরক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রসার করা প্রয়োজন। কিন্তু এই

* এইরূপ করাকে ডাম্পিং (Dumping) বলা হয়।

নীতি প্রয়োগে বেশী দূর অগ্রসর হইলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

(৩) জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি (Argument for National Self-sufficiency): কতকগুলি ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হয়। খাদ্য, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য দেশের পক্ষে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল থাকা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল বিষয়ে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইলে যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় দেশ বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে কয়েকটি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণযোগ্য হইলেও সবক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করা মোটেই সম্ভব হয় না।

(৪) প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Defence Industries Argument): বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ ও বহিরাক্রমণের আশংকা সকল সময়েই রহিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের নিরাপত্তার জন্য কতকগুলি শিল্পকে সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন, অস্ত্রশস্ত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রভৃতি শিল্পকে সংরক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

(৫) অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের নীতি (Argument for Protection against Unfair Competition): অনেক সময় এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে অসাধু উপায়ে ধ্বংস করিবার জন্য অস্বাভাবিক স্বল্প মূল্যে ঐ দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে থাকে। এই প্রকারের অসাধু প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য যুক্তি—ইহাদের পর্যালোচনা

সংরক্ষণের সমর্থনে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ছাড়া অন্যান্য যুক্তিরও অবতারণা করা হয়। যেমন, অনেক সময় বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে দেশের শ্রমিকদের উচ্চ হারে মজুরি দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সংরক্ষণের দ্বারা উচ্চ রাখা সম্ভব হইলেও জনসাধারণ যেখানে স্বল্প মূল্যে বিদেশী দ্রব্য ভোগ করিতে পারিত সেখানে অধিক দাম দিয়া দেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে ভোগী হিসাবে দেশের লোকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহা ছাড়া জিনিসপত্রের দাম চড়া থাকিলে শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি উচ্চ হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয় না। আবার বলা হয় যে, সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করা হইলে দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যায়, বিদেশের হাতে যায় না। এ-যুক্তিরও সারবত্তা নাই। এক দেশ অন্য দেশের জিনিসপত্র ক্রয় না করিলে অন্য দেশও ঐ দেশের দ্রব্য ক্রয়

করিতে পারে না, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইল একপ্রকার দ্রব্য-বিনিময়। সুতরাং আমদানি হ্রাস করিলে রপ্তানিও হ্রাস পাইবে। ফলে দেশের ক্ষতিই হইবে। সংরক্ষণের আর একটি যুক্তি হইল যে, সংরক্ষণ নীতির দ্বারা দেশের নিয়োগ (employment) বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইহার বিরুদ্ধে প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত হইল যে দেশের আমদানি কমাইলে রপ্তানিও কমিবে। অতএব, দেশের সংরক্ষিত শিল্পে নূতন নিয়োগ হইলেও পুরাতন রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে নিয়োগ কমিয়া যাইবে। তবে বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশে অব্যবহৃত সম্পদকে কাজে লাগাইয়া সংরক্ষণের দ্বারা শিল্পোন্নত করিতে পারিলে নিয়োগ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

সংরক্ষণের ত্রুটি (Disadvantages of Protection): সংরক্ষণের বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি দেখানো হয় তাহা প্রধানত অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি। প্রথমত, সংরক্ষণের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যে-দিকে উৎপাদনের সর্বাধিক সুযোগ থাকে সে-দিকে উৎপাদনের উপাদান-সমূহ নিয়োজিত হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর উৎপাদন কম হয় এবং বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যাদির দাম অধিক হয় এবং ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, সংরক্ষণ নীতির ফলে দেশের উৎপাদকদের মধ্যে দক্ষতাবৃদ্ধি সম্পর্কে শিথিলতা আসে। চতুর্থত, সংরক্ষণ-শুল্ক যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে আমদানি বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং আমদানি-শুল্ক হইতে সরকারের আয়ও কমিয়া যায়। পঞ্চমত, সংরক্ষণ দ্বারা বৈদেশিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইলে দেশীয় শিল্পগুলি মিলিয়া শিল্পজোট (Trusts) সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে। ষষ্ঠত, একবার সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করা হইলে উহা প্রত্যাহার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, সংরক্ষণের সুবিধা-ভোগকারী শিল্পগুলি নানা অজুহাত দেখাইয়া উহাতে বাধা প্রদান করে।

সংরক্ষণের ত্রুটি সত্ত্বেও স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে ইহা অপরিহার্য

সংরক্ষণ নীতির এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে উহা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারতের সংরক্ষণ নীতি (India's Fiscal Policy): ভারতে ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) বিচারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection) নীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই প্রকার সংরক্ষণ নিম্নলিখিত তিনটি সর্ত পূরিত হইলেই প্রদান করা যাইত। প্রথমত, শিল্পটিকে স্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করিতে হইত—যথা, যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা-মালের সরবরাহ, সুলভ শক্তির যোগান, প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান, ব্যাপক আভ্যন্তরীণ বাজার ইত্যাদি সুবিধা থাকা প্রয়োজন

পুরাতন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি ও ইহার প্রকৃতি

ছিল। দ্বিতীয়ত, শিল্পটি এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল যে সংরক্ষণ ব্যতীত উহার উন্নয়ন মোটেই সম্ভব ছিল না, অথবা জাতীয় স্বার্থে যতটা দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন ততটা সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত, শিল্পটির পক্ষে শেষ পর্যন্ত বিনা সংরক্ষণেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ারও প্রয়োজন ছিল।

এই সংরক্ষণ নীতির ফল

এই নীতিগুলি অনুসারে কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে কি না তাহা নির্ধারণের ভার একটি শুল্ক বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের উপরি-উক্ত সর্তগুলি এতই কঠিন ছিল যে, ইহার দ্বারা ভারতের সামগ্রিক শিল্প-ব্যবস্থা (industrial system) সুসংগঠিত হয় নাই অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে গড়িয়াও উঠে নাই। যাহা হউক, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প (paper pulp industry) প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিল্প ঐ সংরক্ষণের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আবার প্রয়োজন হয় সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে একটি নূতন ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত নীতিই ভারতের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি। উহার উদ্দেশ্য ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়তা করা, বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র কয়েকটি শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে কোনরকমে রক্ষা করা নয়। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমান সংরক্ষণ নীতি হইল উন্নয়নমূলক (developmental type of protection); আর পূর্বেকার সংরক্ষণ নীতি ছিল প্রতিরক্ষামূলক (defensive type of protection)।

বর্তমান সংরক্ষণ নীতি

নূতন ফিসক্যাল কমিশন শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া সংরক্ষণের সুপারিশ করে। প্রথমত, প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পগুলিকে (all defence and strategic industries) সংরক্ষিত করিতে হইবে—তাহা এই সংরক্ষণের ব্যয়ভার যাহাই হউক না কেন। দ্বিতীয়ত, মূল শিল্পগুলির (basic industries) ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সংরক্ষণপ্রদানের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অপরাপর শিল্পের বেলায় জাতীয় স্বার্থ, স্বাভাবিক সুবিধা, উৎপাদন-ব্যয়, সংরক্ষণের ব্যয়ভার, সংরক্ষণের সময় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণপ্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। তবে সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় স্বার্থই হইল মূল লক্ষ্য। এই সকল নীতি অনুসারে সংরক্ষণপ্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশন (a permanent Tariff Commission)।

সংক্ষিপ্তসার

এক দেশের সহিত অন্য দেশের দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। শ্রমবিভাগের ফলেই ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ঐ একই—ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয়। শ্রমবিভাগের কারণ যেমন দক্ষতার বিভিন্নতা, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের কারণও তেমনি দেশগত দক্ষতার বিভিন্নতা। সংক্ষেপে বলা যায়, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ব্যাপকতর রূপ।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এইরূপ এক হইলেও উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে: ১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধন বিশেষ গতিশীল নহে; ২। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদও পরিলক্ষিত হয়; ৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়; ৪। এই প্রকার বাণিজ্যে মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যাও রহিয়াছে। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি: দুই কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হইতে পারে—(ক) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতা, এবং (খ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা (comparative advantage)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার কারণ হইল আন্তর্জাতিক বিশেষিকরণ (international specialisation)। ইহার ফলে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনবৃদ্ধি পায় এবং সকল দেশই লাভবান হয়।

আপেক্ষিক সুবিধাতত্ত্বের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায়: যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষতা বা সুবিধা রহিয়াছে সেই দেশ কেবল সেই দ্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত থাকিলে ঐ দেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে; এবং স্বাভাবিকভাবেই লোকের ভোগের পরিমাণ অধিক হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রহিয়াছে—১। ইহাতে কোন দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদন না করিয়াও উহা ভোগ করিতে পারে; ২। সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হয়; ৩। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়; ৪। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নৈতিক মানের প্রসার ঘটে; এবং ৫। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অসুবিধাগুলি হইল এইরূপ—১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি ঘটিতে পারে; ২। এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে পারে; এবং ৩। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে পারে।

অসুবিধা অপেক্ষা অবশ্য সুবিধাই অধিক; তবুও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনপ্রকার বাধানিষেধ না থাকিলে তাহাকে অবাধ বাণিজ্য, আর স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুযোগসুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইলে তাহাকে সংরক্ষণ বলে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রধানত চারিটি: ১। সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করা; ২। দেশীয় শিল্পকে অর্থ-সাহায্য করা; ৩। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা; ৪। কাঁচামাল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা; এবং ৫। অদৃশ্য সংরক্ষণ।

অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি হইল—১। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের যুক্তি, ২। স্বল্প দামের যুক্তি, এবং ৩। উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়বৃদ্ধির যুক্তি। অপরপক্ষে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি হইল—১। শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি; ২। শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি; ৩। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি; ৪। প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি; এবং ৫। অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের যুক্তি। মজুরিবৃদ্ধির যুক্তি প্রভৃতি অন্য কয়েকটি যুক্তিও আছে।

সংরক্ষণের অবশ্য কয়েকটি ত্রুটিও দেখা যায়। গুণাগুণের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিয়া বলা যায় যে স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে সংরক্ষণ সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

ভারতের সংরক্ষণ নীতি: ১৯২১ সালের ফিসকাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতের বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তিত হয়। ইহার ফলে কয়েকটি শিল্প সংগঠিত হইয়া উঠে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে ভারতের সংরক্ষণ নীতিকে চালিয়া সাজা হইয়াছে। এই সংরক্ষণ নীতিকে উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ বলিয়া অভিহিত করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. **Discuss the advantages and disadvantages of Foreign Trade.**

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা লইয়া আলোচনা কর। [১২৭-১২৮ এবং ১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা]

2. **Define International Trade and point out its advantages.**

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার সুবিধাগুলি বিবৃত কর।
[১২৬ ১২৮ এবং ১৩৩ পৃষ্ঠা]

3. **Explain the basis of International Trade. What are the advantages of International Trade?**

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা কর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা কি কি?
[১২৭-১২৮ এবং ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা]

4. **Give some reasons why nations find it advantageous to trade with one another.**

যে যে কারণে বিভিন্ন দেশ অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করা সুবিধাজনক মনে করে তাহাদের কতকগুলি বর্ণনা কর।

[ইংগিত: বিশেষ করিয়া আপেক্ষিক সুবিধাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে।]
[১২৭-১২৮ এবং ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা]

5. **Discuss the arguments that are advanced in favour of Protection.**

সংরক্ষণের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাদের আলোচনা কর। [১৩৩-১৩৮ পৃষ্ঠা]

6. **What is a tariff? In what conditions tariffs on imports are good for a country?**

শুল্ক কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক?
[১৩৪ এবং ১৩৬-১৩৮ পৃষ্ঠা]

7. **On what grounds would you justify the present policy of protection of industries of the Government of India?**

কি কি কারণে ভারত সরকারের বর্তমান শিল্প-সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করিতে পার? [১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠা]

8. **Explain the chief arguments in favour of Protection. Describe briefly the policy of protection adopted by Government of India at present.**

সংরক্ষণের সপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা কর। বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

টাকাকড়ি

(Money)

অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে। টাকাকড়ির মাধ্যমেই বর্তমানে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়; লোকে টাকাকড়ি উপার্জন এবং ব্যয় করিতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকে।* আমরা দেখিয়াছি যে চিরকালই এইরূপ ছিল না। প্রথমে মানুষকে স্বয়ং ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অভাব মিটাইতে হইত; এবং পরে অভাব বৃদ্ধি পাইলে ও শ্রমবিভাগ দেখা দিলে সে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (barter) করিত। দ্রব্য-বিনিময়ে নানারূপ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় টাকাকড়ির উদ্ভব হয়।

দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধার জন্য টাকাকড়ির উদ্ভব হয়

প্রথমত, দ্রব্য-বিনিময় ব্যাপারে বিনিময়কারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে অভাবের সংগতির (coincidence of wants) প্রয়োজন ছিল। যে-ব্যক্তির ধান্যের পরিবর্তে বস্ত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন ছিল তাহাকে এরূপ এক বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত যাহার ধান্যের অভাব আছে। ইহা না হইলে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্পাদিত হইত না।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় জিনিসপত্র ইচ্ছামত বিভক্ত করা যাইত না বলিয়া অসুবিধা দেখা দিত। একটি গরুর মূল্য ২০ কুইণ্টাল গম হইলে যাহার মাত্র ২ কুইণ্টাল গমের প্রয়োজন ছিল তাহাকে ২০ কুইণ্টাল গমই লইতে হইত। কারণ, গরুটিকে ত আর ১০ ভাগে ভাগ করিয়া মাত্র ১ ভাগ গম-বিক্রেতাকে দেওয়া যাইত না। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য-নির্ধারণ করাও কঠিন ছিল। ১ কুইণ্টাল গমের বিনিময়ে ১·৫ কুইণ্টাল ধান্য, ২ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে ৫ খানি বস্ত্র, ১৫ খানি বস্ত্রের বিনিময়ে ১ কুইণ্টাল ধান্য পাওয়া গেলে ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কতটা গম পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

টাকাকড়ির প্রচলন হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যায়। যে লোক ধান্যের বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে চায় তাহাকে আর ধান্যের অভাব আছে এইরূপ বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, গরু-বিক্রেতাকে বাধ্য হইয়া ২০ কুইণ্টাল গম লইতে হয় না এবং ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কি পরিমাণ গম পাওয়া যাইবে তাহার হিসাবের জন্য বিরাট অংক কষিতে হয় না।

---

* ২ পৃষ্ঠা দেখ।

টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। সকলেই টাকাকড়ির মাধ্যমে দ্রব্যাদি বিনিময় করে। একখানি ১০ টাকার নোটের বিনিময়ে ঐ পরিমাণ মূল্যের সকল জিনিসই পাওয়া যাইবে। এই নোটকে কাগজী মুদ্রা (paper money) বলা হয়। কাগজী মুদ্রা ছাড়াও ধাতব মুদ্রা আছে—যথা, পুরাতন টাকা আধুলি সিকি এবং ১, ২, ৫, ১০, ২৫, ৫০ নয়া পয়সা প্রভৃতি।* এই কাগজী ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে বহু পরে। প্রথম প্রথম কোন বিশেষ দ্রব্যকেই টাকাকড়ি বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গরু, ছাগল, চামড়া, শস্য, কড়ি এমনকি ক্রীতদাসও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সকল গরু ছাগল বা ক্রীতদাস একই রকমের নহে বলিয়া মূল্য-নির্ধারণের অসুবিধা দূরীভূত হয় নাই। ফলে মানুষকে ধাতব মুদ্রার দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে। ধাতুর মধ্যেও মানুষ তাম্র ব্রোঞ্জ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একসংগে বহু সোনা ও রূপার টাকা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধাজনক। প্রথমতঃ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়। বর্তমানে কাগজী মুদ্রাই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং টাকাকড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক হিসাবে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত রহিয়াছে।

টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার বিনিময়ের মাধ্যম

বর্তমানের মুদ্রা-ব্যবস্থা

টাকাকড়ির কার্যাবলী (Functions of Money): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যাইবে। টাকাকড়ি শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাষ করে না, ইহা মূল্যেরও পরিমাপ করে। বর্তমানে মূল্য (value) টাকাকড়ির অংকেই প্রকাশ করা হয়। এইভাবে প্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে।** আবার টাকাকড়ির অংকেই সঞ্চয় করা হয় এবং দেনা পাওনা মিটানো হয়। সুতরাং দেখা যায় যে টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানতঃ চারিটি: (ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্য পরিমাপের কার্য, (গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, এবং (ঘ) দেনাপাওনা মিটানোর মান হিসাবে কাষ।

চারিটি প্রধান কাষ

(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য (Function as a Medium of Exchange): ইহাই টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য এবং টাকাকড়ির প্রচলন হয় এই কার্য সম্পাদনের জন্যই। বর্তমানে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমেই করে।

---

* কিছুদিন পরে পুরাতন আধুলি সিকি প্রভৃতির প্রচলন থাকিবে না।

** ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য (Function as a Measure of Value): বর্তমানে আমরা দ্রব্যাদির বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ করি না, টাকাকড়ির অংকে উহাদের 'দাম' নির্ধারণ করি। যখন বলি যে ১ কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা, তখন ঐ পরিমাণ সরিষার তৈলের মূল্য পরিমাপের জন্য 'টাকাকড়ি' ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে টাকা (Rupee) মূল্য পরিমাপের একক। অন্যান্য দেশেরও এইরূপ নিজ নিজ একক আছে—যেমন, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার, সোবিয়েত ইউনিয়নের রুবল, পাকিস্তানের পাকিস্তানী টাকা ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক বিনিময়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের টাকাকড়ির 'একক'-এর মধ্যে বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, ভারতের একটি টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ডের ১ শিলিং ৬ পেনি পাওয়া যায়।

মূল্য পরিমাপের একক

(গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য (Function as a Store of Value): লোকের আয় একসংগে ব্যয়িত হয় না। যে ব্যক্তি মাস-মাহিনা পায় সে সারামাস ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যয় করে; যে কৃষক মাত্র একপ্রকার শস্য উৎপাদন করে তাহাকে উহার বিনিময়ে সারাবৎসর ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে চালাইতে হয়। পূর্বে এইরূপ বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যৎ জিনিসপত্র মজুত রাখা হইত; বর্তমানে টাকাকড়িই মজুত রাখা হয়। আবার লোকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পুত্রকন্যার শিক্ষা ইত্যাদির জন্য সঞ্চয়ও করে। বর্তমানে ইহাও টাকাকড়ির আকারে করা হয়। জিনিসপত্র মজুত রাখা বা স্বর্ণ-রৌপ্য ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখা অপেক্ষা টাকাকড়ির আকারে সঞ্চয় করা অনেক সুবিধাজনক ও নিরাপদ। টাকাকড়ি নষ্ট হয় না, মাটির তলায় লুকাইয়া রাখারও প্রয়োজন হয় না। ব্যাংকে, পোষ্ট অফিসে বা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা জমা রাখা যাইতে পারে। ব্যাংক ও সরকার জমা টাকাকড়িকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করে। এইভাবে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য সম্পাদনের দ্বারা টাকাকড়ি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

বর্তমানে জিনিসপত্রের পরিবর্তে টাকাকড়ি সঞ্চয় করা হয়

এইরূপ সঞ্চয়ের উপযোগিতা

(ঘ) দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য (Function as a Standard of Deferred Payments): বর্তমান সমাজে দেনাপাওনা মিটানোর কার্য সাধারণত টাকাকড়ির মাধ্যমে চালিয়া থাকে। পূর্বে জিনিসপত্র ঋণ করা হইত এবং ঐ জিনিসপত্রেই ঋণ পরিশোধ করা হইত। এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে জিনিসপত্র সকল সময় একই প্রকারের হয় না। একটি ছাগল ধার লইয়া পরে ছাগল ফেরত দিতে গেলে মহাজন ভালভাবে দেখিয়া লইবে যে ছাগলটি কিরূপ। মনঃপূত না হইলে সে অন্য একটি ছাগল লইয়া আসিতে বলিবে; কিন্তু খাতকের হয়ত আর ছাগল নাই। টাকাকড়ির

টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর সুবিধা

মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটাইলে এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে-ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার লইয়াছে সে ১০০ টাকাই শোধ দিবে; কিছু সুদ দেওয়ার কথা থাকিলে কিছু সুদও দিবে।

সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনাপাওনার মান হিসাবে কায করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, যাহারা সঞ্চয় করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ১০ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইয়া গেলে তাহার সঞ্চয়ের মূল্য ৫ হাজার টাকা হইয়া যাইবে, অথবা যে-ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার দিয়াছে সে ফেরত পাইবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক ফেরত পাইবে। সুতরাং, টাকাকড়ির মূল্য বিশেষ পরিবর্তনশীল হইলে চলিবে না। কিন্তু দেখা যায় যে আধুনিক সমাজে টাকাকড়ির মূল্য প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এ-পরিবর্তন যতটা কম হয় তাহা দেখাই সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য।

টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব প্রয়োজন

টাকাকড়ির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কায আছে। টাকাকড়িই বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিয়াছে। সংগঠক টাকাকড়ি দিয়াই কাঁচামাল ক্রয় করে, শ্রমিককে মজুরি প্রদান করে, জমির মালিকের খাজনা মিটায় এবং মূলধন সরবরাহকারীকে সুদ দেয়। টাকাকড়ি না থাকিলে ইহাদের সকলের জন্য তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে হইত, ফলে সে উৎপাদনকার্যে মনোনিবেশ করিবার অবকাশই পাইত না।

টাকাকড়ির আর একটি কায— উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু রাখা

টাকাকড়ি কি ? (What is Money ?): এখন প্রশ্ন করা যায়, টাকাকড়ি কি ? ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে যাহাই টাকাকড়ির কার্য সম্পাদন করে তাহাই টাকাকড়ি (money is what money does)। সুতরাং, যে-কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কার্য করিবে, তাহাকেই টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত করা যায়। কাগজী মুদ্রায় যদি এই সকল কায চলে তবে কাগজী মুদ্রাই টাকাকড়ি।

যাহাই টাকাকড়ির কায করে তাহাই টাকাকড়ি

এই সকল কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-বস্তু টাকাকড়ি হিসাবে প্রচলিত আছে তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ, বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কাজে সকলে ঐ বস্তুকে লইতে স্বীকার করিবে। বর্তমানে যে-প্রকার টাকাকড়ি সকলকেই লইতে হইবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আইন-নির্দিষ্ট টাকাকড়িকে বিহিত মুদ্রা (legal tender money) বলে।

টাকাকড়ি হইতে হইলে বস্তুকে সর্বজন-গ্রাহ্য হইতে হইবে

বর্তমানে আমাদের দেশে নয়া পয়সার মুদ্রা এবং পুরাতন সিকি আধুলি প্রভৃতি উভয়ই বিহিত মুদ্রা। কিন্তু কিছুদিন পরে পুরাতন সিকি আধুলি বিনিময় ও লেনদেনের কার্যে চলিবে না, কারণ উহারা আর বিহিত মুদ্রা থাকিবে না।

সংজ্ঞা : সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যমই টাকাকড়ি

অতএব, টাকাকড়ির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়: বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি। সঞ্চয় ও হিসাবনিকাশ ইহার অংকেই করা হয়।

ভারতে বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি (Kinds of Money in India): টাকাকড়ির মাধ্যমে হিসাবনিকাশ এবং বিনিময়কার্য সম্পাদন করা হয়। সুতরাং প্রথমত, টাকাকড়ি দুই প্রকারের হইতে পারে: (১) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (money of account), এবং (২) আসল টাকাকড়ি (actual money)। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি আসলে বর্তমান নাও থাকিতে পারে। ভারতে সেদিন পর্যন্ত পাই পয়সার অংকে হিসাব করা হইত; কিন্তু পাই পয়সার প্রচলন বহুদিন পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

১। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি এবং আসল টাকাকড়ি

ভারতে এই দুই প্রকারের টাকাকড়ি

সুতরাং আসল টাকাকড়ি হইল তাহাই যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে। বর্তমানে ভারতে হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি হইল টাকা ও নয়া পয়সা। কারণ, ইহাদের অংকেই হিসাবনিকাশ করা হয়। অপরদিকে আসল টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের কার্যে ব্যবহৃত সকল প্রকারের মুদ্রা—যথা, কাগজী নোট, বিভিন্ন মূল্যের নয়া পয়সা, পুরাতন আধুলি সিকি প্রভৃতি।

আসল টাকাকড়িকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—কাগজী টাকাকড়ি (paper money), এবং ধাতব টাকাকড়ি (metallic money)।

২। কাগজী ও ধাতব টাকাকড়ি

কাগজী টাকাকড়ি সরকার বা ব্যাংক প্রচলন করিয়া থাকে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইলে উহাকে কারেন্সী নোট এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হইলে উহাকে ব্যাংক-নোট বলা হয়। সরকার যে কারেন্সী নোট প্রচলন করে তাহা দুই প্রকারের হয়—(১) পরিবর্তনীয় (convertible), এবং (২) অপরিবর্তনীয় (inconvertible)। দাবি করা হইলে পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সরকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকে; কিন্তু অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ব্যাংক-নোট সকল সময়েই পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা। আমাদের দেশে সরকার যে ১ টাকার নোট প্রচলন করে উহা অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা; এবং অন্য সমস্ত নোট যাহা রিজার্ভ ব্যাংক প্রচলন করে তাহা পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা।

৩। কাগজী নোট দুই প্রকারের—পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়

ধাতব মুদ্রা প্রধানত দুই প্রকারের—(১) প্রামাণিক মুদ্রা (Standard Coin), এবং (২) নিদর্শক মুদ্রা (Token Coin)। প্রামাণিক মুদ্রাই দেশের প্রধান মুদ্রা। সাধারণত ইহা স্বর্ণে বা রৌপ্যে নির্মিত হয় এবং ইহার ধাতুমূল্য লিখিত মূল্যের (face value) সমান হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা (Sovereign) ছিল এই ধরনের প্রামাণিক মুদ্রা। ইহাকে গলাইয়া ফেলিলে ২০ শিলিং মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া যাইত।

৪। ধাতব মুদ্রা দুই প্রকারের—প্রামাণিক ও নিদর্শক

নিদর্শক মুদ্রা বলিতে নিকৃষ্টতর ধাতুনির্মিত মুদ্রাসমূহকেই বুঝায়। উহারা মূল্যের নিদর্শক (token of value) মাত্র। অর্থাৎ, উহাদের লিখিত মূল্য ও ধাতব মূল্য সমান হয় না। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নিকেলের টাকা, পুরাতন আধুলি সিকি, নয়া পয়সার মুদ্রা সকলই নিদর্শক মুদ্রা। উহাদের গলাইয়া বিক্রয় করিলে ঐ পরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় না।

মুদ্রার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল সসীম বিহিত মুদ্রা (limited legal tender) এবং অসীম বিহিত মুদ্রার (unlimited legal tender) মধ্যে। কতক প্রকারের মুদ্রা বিনিময় বা দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। অপরদিকে অসীম বিহিত মুদ্রা হইল তাহাই যাহা বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-কোন পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ভারতে সিকি নয়া পয়সার মুদ্রা প্রভৃতি সসীম বিহিত মুদ্রা। ইহাদিগকে ১ টাকার বেশী দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু ১ টাকার মুদ্রা বা নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। লোকে ইহাদিগকে যে-কোন পরিমাণে লইতে বাধ্য।

৫। সসীম ও অসীম বিহিত মুদ্রা

উপরি-উক্ত সকল প্রকারের টাকাকড়িই সরকার বা টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত। সামগ্রিকভাবে ইহাদিগকে কারেন্সী (Currency) বলা হয়। ইহা ছাড়া ব্যাংকের টাকাকড়ি (Bank Money) বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িও আছে। ব্যাংক-ব্যবস্থা টাকা-কড়ি সৃজন করে আমানত সৃজন করিয়া। কিভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা ইহা করে তাহার আলোচনা পরে করা হইবে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িও দেশের মোট টাকাকড়ির একাংশ এবং চেক, ড্রাফ্ট ইত্যাদির মাধ্যমে উহাও বিনিময়কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

সরকার-সৃষ্ট ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Paper Money): বর্তমানে যে কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রার উপর প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে কাগজী মুদ্রার বিশেষ কয়েকটি সুবিধা।

প্রথমত, কাগজী মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য। বহু টাকার নোট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যত সুবিধাজনক বহু টাকার মুদ্রা লইয়া যাওয়া তত সুবিধাজনক নহে। ধাতব মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া লইতে অনেক সময় নষ্ট হয়; কাগজী মুদ্রার পরীক্ষার কায অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হয়।

সুবিধা:
১। সহজ বহনযোগ্যতা

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট মুদ্রণের ব্যয়ও কম। সোনারূপা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া মুদ্রা প্রচলন করিতে যে বিরাট ব্যয় হয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে তাহা বাঁচিয়া যায়। ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে হস্তান্তরের ফলে অনেক সোনারূপা ক্ষয় হয়। ইহাকে জাতীয় ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাগজের নোটের বেলায় এই ক্ষতি হয় না।

২। ব্যয়সংক্ষেপ

তৃতীয়ত, কাগজী মুদ্রাকে সহজেই বদলানো যায়। নোট পুরাতন হইয়া গেলে তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্তে আর একখানি নোট সহজেই ছাপিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ধাতব মুদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বদলানো অপেক্ষাকৃত কঠিন।

৩। পরিবর্তনশীলতা

চতুর্থত, কাগজী মুদ্রার যোগান অতি দ্রুত বৃদ্ধি করা যায়। সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। জাতীয় আয়বৃদ্ধির দরুন দেশে যতই ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেনের কায সম্প্রসারিত হইবে টাকাকড়ির চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। সোনারূপার টাকার যোগান সোনারূপার উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহা সকল সময় প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। কিন্তু প্রয়োজনমত কাগজের নোট ছাপিয়া দিলেই হইল। অবশ্য নোট মুদ্রণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা রাখা হয়; তবে সাধারণত নোটের মূল্যের একটি অংশমাত্র এইভাবে জমা রাখা হয়। ফলে যত জমা হয় তাহার অনেক অধিক নোট ছাপাইয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকাকড়ি সরবরাহ করা চলে। বর্তমানে ভারতে যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপার জন্য ১১৫ কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ মজুত রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

৪। সম্প্রসারণশীলতা

এই যে যত খুশি তত নোট ছাপা চলে ইহাই কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। ইহার জন্য সরকার রাজস্বসংগ্রহে মনোযোগ না দিয়া নোট ছাপানোতেই আগ্রহশীল হইতে পারে। ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে ইহার বিরুদ্ধে জমার পরিমাণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে এবং একদিন কাগজী মুদ্রা 'আর পরিবর্তনীয় নয়' বলিয়া ঘোষিত হইবে। তখন উহার মূল্য দ্রুত পড়িয়া যাইবে এবং মর্যাদা নষ্ট হইবে। এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির (inflation) চরম অবস্থা বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মেনীতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাংগেরী, গ্রীস এবং চীন দেশে এইরূপ ঘটিয়াছিল। কাগজী নোটের দাম

অসুবিধা:
১। ন সারণশীলতার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে

এত পড়িয়া গিয়াছিল যে বহু লোক শেষ পর্যন্ত উহা লইতেই অস্বীকার করিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট বিদেশীরা গ্রহণ করিতে চায় না। বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কাগজী মুদ্রার বিনিময়-হার স্থির করিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে এই বিনিময়-হার বজায় রাখিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সকল বিদেশীই কাগজী নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে।

২। কাগজী নোট বিদেশীরা গ্রহণ করে না

তৃতীয়ত, অসাবধানবশত কাগজী মুদ্রা নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। এক তাড়া নোট কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারে।

৩। ইহা একেবারে নষ্ট হইতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধার জন্য টাকাকড়ির উদ্ভব হয়। টাকাকড়ি বর্তমান বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ দেখিয়াছে যে উচ্চ মূল্যের টাকাকড়ির জন্য কাগজী মুদ্রা এবং অল্প মূল্যের টাকাকড়ির জন্য ধাতব মুদ্রাই শ্রেষ্ঠ।

টাকাকড়ির কার্যাবলী: টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানত চারিটি—(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য, (গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, এবং (ঘ) দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব প্রয়োজন।

টাকাকড়ি উৎপাদন-ব্যবস্থাকেও চালু রাখে।

টাকাকড়ি কি?: বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কাজে যে-বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি; সঞ্চয় ও হিসাবনিকাশ ইহার অংশকেই প্রকাশ করা হয়।

ভারতে বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি: প্রথমত, টাকাকড়ি দুই প্রকারের হয়—(ক) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি, এবং (খ) আসল টাকাকড়ি। ভারতে হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি হইল টাকা ও নয়া পয়সা এবং আসল টাকাকড়ি হইল সকল প্রকারের মুদ্রা।

আসল টাকাকড়ি দুই প্রকারের—(১) কাগজী টাকাকড়ি, (২) ধাতব টাকাকড়ি।

কাগজী টাকাকড়ি বা নোট দুই প্রকারের—(১) পরিবর্তনীয়, (২) অপরিবর্তনীয়। ধাতব মুদ্রাও দুই প্রকারের—(১) প্রামাণিক ও (২) নিদর্শক।

মুদ্রার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) সসীম বিহিত মুদ্রা ও (খ) অসীম বিহিত মুদ্রার মধ্যে। ভারতে এক টাকার নীচে সকল মুদ্রাই সসীম বিহিত মুদ্রা।

উপরি-উক্ত সকল টাকাকড়িই সরকার সৃষ্ট। ইহাকে সংক্ষেপে 'কারেন্সী' বলা হয়। ইহা ছাড়াও ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি আছে।

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা: কাগজী মুদ্রার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—১। ইহা সহজে বহনযোগ্য, ২। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয়, ৩। ইহা পরিবর্তনশীল, এবং ৪। ইহা সম্প্রসারণশীল। ইহার অসুবিধাগুলি হইল—১। ইহার সম্প্রসারণের জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে; ২। ইহা বিদেশীরা গ্রহণ করে না, এবং ৩। ইহা একেবারে নষ্ট হইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the difficulties attending exchange by barter. Show how these difficulties are overcome by the introduction of money.

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর। টাকাকড়ির প্রচলনের ফলে এই অসুবিধাগুলি কিভাবে দূরীভূত হইয়াছে তাহা দেখাও। [১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা]

2. What are the difficulties of barter exchange? Explain how they can be removed by the introduction of money.

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাগুলি কি? টাকাকড়ির প্রচলনের ফলে তাহারা কিভাবে দূরীভূত হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা কর। [১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা]

টাকাকড়ির কার্যাবলী বিবৃত কর। টাকাকড়ির ব্যবহারের ফলে উৎপাদনকার্য কিভাবে সুপরিচালিত হয়? [১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠা]

4. Describe the merits and demerits of Paper Money.

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। [১৪৭-১৪৯ পৃষ্ঠা]

5. What is paper money? What are the advantages and disadvantages of paper money?

কাগজী মুদ্রা কাহাকে বলে? কাগজী মুদ্রার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? [১৪' এবং ১৪৭-১৪৯ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

টাকাকড়ির মূল্য

(Value of Money)

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর (Value of Money and Price Level): আমরা দেখিয়াছি, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশের কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইল, টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়।

অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং টাকা-কড়ির মূল্য বলিতেও উহার বিনিময়-মূল্য বুঝায়।* অর্থাৎ, এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যে-পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহাই টাকাকড়ির মূল্য। ইহাকে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি (purchasing power) বলা হয়।

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এক একক টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি বুঝায়

ভারতে টাকাকড়ির একক হইল 'টাকা' (Rupee)। সুতরাং এক টাকার যে-পরিমাণ ক্রয়শক্তি—অর্থাৎ, এক টাকায় যতখানি জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারা যায় তাহাই এ-দেশে টাকাকড়ির মূল্য। অনুরূপভাবে, ইংলণ্ডে এক পাউণ্ডের বিনিময়ে যতখানি জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তাহাই ঐ দেশে টাকাকড়ির মূল্য।

* অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য আছে; কিন্তু এক বিনিময় ছাড়া টাকাকড়ির কোন উপযোগিতা নাই। অতএব, টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এই বিনিময়-মূল্য ছাড়া আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের (Price Level) বিপরীত। মূল্যস্তর বলিতে বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর যদি হ্রাস পায় তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিতে হইবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের তুলনায় জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং টাকাকড়ির মূল্যও বহুগুণ কমিয়া গিয়াছে। সাধারণ কথাবার্তায় লোকে যে প্রায়ই বলে 'টাকার আর দাম নাই' তাহা এই জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি বা টাকার মূল্যহ্রাসের উল্লেখ মাত্র।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের বিপরীত

মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ (Reasons for Changes in the Price Level) : মূল্যস্তরের পরিবর্তন প্রধানত দুইটি কারণে ঘটে—(ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, (খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন। জিনিসপত্রের যোগান যদি পূর্বের মতই থাকে, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বাড়িয়া যায় তবে জিনিসের গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া জিনিসপত্রের যোগান বাড়িয়া গেলে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর হ্রাস পাইবে। আবার যদি এরূপ হয় যে টাকাকড়ির যোগান বাড়িল এবং সংগে সংগে জিনিসপত্রেরও যোগান কমিয়া গেল তবে মূল্যস্তর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। একদিকে ক্রমাগত নোট ছাপানোর দরুন টাকাকড়ির যোগান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল; অপরদিকে আমদানি কমিয়া যাওয়া, কলকারখানা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে জনসাধারণের জন্য ভোগ্যদ্রব্যের যোগান অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছিল। ফলে মূল্যস্তর চারি গুণের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

টাকাকড়ি ও জিনিসপত্রের যোগান পরিবর্তিত হইলেই মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয়

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) : দেখা গেল, মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে (ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, এবং (খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন—উভয়ের জন্যই। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন যে শুধু টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে, জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তনের জন্য নহে। আবার তাঁহারা এই বুঝিয়াছিলেন যে টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন ঘটে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের জন্যই, অন্য কোন কারণে নহে। ইহার ফলে যে-তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) বলা হয়। তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: টাকাকড়ির পরিমাণ যে-দিকে এবং যতটা পরিবর্তিত হইবে মূল্যস্তরও সেই

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

দিকে এবং ততটা পরিবর্তিত হইবে। টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ যদি দ্বিগুণ হয় তবে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে; টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হইয়া যায় মূল্যস্তরও অর্ধেক হইয়া যাইবে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money) মূল্যস্তরের (Price Level) ঠিক বিপরীত। সুতরাং মূল্যস্তর যতটা বৃদ্ধি পায় টাকাকড়ির মূল্যও ততটা কমে, এবং অপরদিকে মূল্যস্তর যতটা কমে টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি ততটা বৃদ্ধি পায়।

বিখ্যাত মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ফিসার (Fisher) টাকাকড়ির এই পরিমাণতত্ত্বকে প্রথমে নিম্নলিখিত সমীকরণের রূপে প্রকাশ করেন:

$$PT = MV$$

অথবা $$P = \frac{MV}{T}$$

সমীকরণটিতে PT হইল টাকাকড়ির চাহিদার এবং MV টাকাকড়ির যোগানের দিক। টাকাকড়ির চাহিদা সৃষ্ট হয় বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র হইতে। ইহার পরিমাণ T হইলে এবং গড়পড়তা জিনিসপত্রের মূল্য বা মূল্যস্তর P হইলে মোট PT পরিমাণ টাকাকড়ির চাহিদা হইবে। অপরদিকে M হইল নগদ বা সরকার সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ফিসারের সমীকরণ

কিন্তু একটি টাকা দ্বারা অনেকবার বিনিময়কার্য সম্পাদন করা চলে। আমি যে টাকাটি রামের নিকট হইতে জিনিস বিক্রয় করিয়া পাইলাম তাহা আবার শ্যামকে জিনিস ক্রয় করিবার জন্য দিতে পারি। সুতরাং ঐ টাকাটি দুইটি টাকার কায—অর্থাৎ, দুইবার বিনিময় সম্পাদনের কার্য করিতে পারে; অন্য একটি মুদ্রা আবার তিনবার বা চারিবার বিনিময় সম্পাদন করিতে পারে। এইভাবে দেশে যত সরকার-সৃষ্ট মুদ্রা আছে তাহাদের বিনিময় সম্পাদনের একটি গড় নির্ণয় করা যায়। এই গড়কেই V বা টাকাকড়ির প্রচলনগতি (velocity of circulation) বলা হয়। টাকাকড়ির পরিমাণকে টাকাকড়ির প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বে ইহাকে MV আকারে প্রকাশ করা হয়।

এখানে PT = MV হইলে, MV কে T দিয়া ভাগ করিলেই P কত তাহা জানা যাইবে। কোন কারণে হঠাৎ যদি M বা মোট টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে P বা মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া অর্ধেক হইবে। অপরদিকে কোন কারণে টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তবে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে।+

+ একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন এক দেশে মাত্র ১০০০টি ধাতব মুদ্রা (M) প্রচলিত আছে; এবং মোট জিনিসপত্রের সংখ্যা ৬০০০। ৬০০০

পরিবর্তিত সমীকরণ

অধ্যাপক ফিসারের উপরি-উক্ত পরিমাণতত্ত্বে শুধু সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়ির কথা ধরা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্রয়বিক্রয় চলে। এই কারণে ফিসার পরে নিম্নলিখিতভাবে টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বটির পরিবর্তনসাধন করেন :

$$PT = MV + M'V'$$

এখানে M′ বলিতে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং V′ বলিতে উহার প্রচলন-গতি বুঝাইতেছে। সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের একাংশ পাওয়া যাইবে; এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে টাকাকড়ির যোগানের অপরাংশ পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে অবশ্য সমীকরণটির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। ইহা এই প্রকার রূপ ধারণ করিবে মাত্র :

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখন P বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে শুধু M-এর পরিবর্তনের জন্য নহে, M′-এর পরিবর্তনের জন্যও বটে। অন্যভাবেই বলা যায় যে, দেশে নগদ ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি—উভয়ের পরিমাণ যতটা বাড়িবে মূল্যস্তরও ততটা বাড়িবে; এবং এই দুই প্রকার টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা হ্রাস পাইবে মূল্যস্তরও ততটা হ্রাস পাইবে।

সমালোচনা : টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের (T) এবং টাকাকড়ির প্রচলনগতির (V এবং V′) কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই

সংখ্যক জিনিসপত্রের মধ্যে ৪০০০টি বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় (T)। বাকী ২০০০ যাহারা উৎপাদন করে তাহারা নিজেরাই ভোগ করে। অতএব, ৪০০০টি সংখ্যক জিনিসপত্রের ক্রয়বিক্রয় ১০০০টি মুদ্রার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রত্যেকটি মুদ্রা গড়ে ৮ বার করিয়া হস্তান্তরিত হইলে—অর্থাৎ, মুদ্রার প্রচলনগতি ৮ হইলে পাটীগাণিতিক মূল্যে সমীকরণটি এইরূপ দাঁড়াইবে :

$$P = \frac{M(১০০০) \times V(৮)}{T(৪০০০)}$$

অথবা $P = \frac{৮০০০}{৪০০০}$

অথবা P = ২। অর্থাৎ, জিনিসপত্রের গড়মূল্য বা মূল্যস্তর হইবে ২ টাকা।

এখন ধরা যাউক, হঠাৎ কোন কারণে ঐ দেশে মোট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হইল। ফলে Pও দ্বিগুণ হইবে—যথা,

$$P = \frac{M(২০০০) \times V(৮)}{T(৪০০০)}$$

অথবা P = ৪।

অনুমান ঠিক নহে। দেখা যায় যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদনের পরিমাণেও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। দাম বাড়িলে মুনাফা বেশী হয় বলিয়া উৎপাদকগণ অধিক উৎপাদনে আগ্রহান্বিত হয়; অপরদিকে দাম কমিলে তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। আরও দেখা যায়, টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে উহার প্রচলনগতিও পরিবর্তিত হইয়াছে। ফলে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয় না।

৩ দুইটি ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভরশীল

মোটকথা, অন্যান্য জিনিসের ন্যায় টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে উহার চাহিদা ও যোগান—উভয়ের উপর। এই চাহিদা ও যোগান নানা বিষয়ের —যথা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ, দেশের লোকে কি-পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যবহার করে, এবং কি-পরিমাণ প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় (barter) করে, —ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালর দিকে যাইতে থাকে তবে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। ইহা ঘটিবে টাকাকড়ির প্রচলনগতি বাড়িয়া। অপরদিকে দেশে কাজকারবারে যদি মন্দার সূচনা হয় তবে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইলেও মূল্যস্তরে বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। কারণ, সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রচলনগতি কমিয়া যাইতে পারে।

একমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণই উহার মূল্য-নির্ধারক নহে

অতএব, একমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণই টাকাকড়ির মূল্য-নির্ধারণ করে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ (Measurement of Changes in the General Price Level): মূল্যস্তর বা জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম নানা প্রকারের হইতে পারে—যথা, বিলাস-দ্রব্যের মূল্যস্তর, শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যস্তর, ইত্যাদি। চালডাল, গমআটা, তৈল, লবণ, মসলাপাতি, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি - সকল জিনিসের গড়পড়তা দামকে 'সাধারণ মূল্যস্তর' বলা যাইতে পারে। এই সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনই দেশের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেইজন্য বিভিন্ন সময়ে ইহার পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয়; এবং সাধারণ মূল্যস্তরবৃদ্ধি বা টাকাকড়ির মূল্যহ্রাসের ফলে দরিদ্র চাকরিয়ারা যাহাতে দুর্দশায় পতিত না হয় তাহার জন্য মাগ্‌গি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, ইত্যাদি। মূল্যস্তর কমিয়া আসিলে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মাগ্‌গি ভাতা আবার কমাইয়া দেওয়া হয়, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা হয়।

সাধারণ মূল্যস্তর বলিতে কি বুঝায়

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের গুরুত্ব

কিন্তু এক সময়ের তুলনায় অন্য এক সময় মূল্যস্তর বাড়িল কি কমিল এবং কতটা পরিমাণ বাড়িল বা কমিল তাহা বুঝা যায় কিরূপে? ইহা বুঝিবার উপায় হইল সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া পরীক্ষা করা। এই পদ্ধতিকে সূচকসংখ্যা পদ্ধতি (Device of Index Numbers) বলা হয়। সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিয়া দ্রব্যমূল্য বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।

মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় সূচকসংখ্যার দ্বারা

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য (absolute value) পরিমাপ করিবার কোন উপায়ই নাই; যাহা করা যায় তাহা হইল উহার আপেক্ষিক মূল্য (relative value)—অর্থাৎ, অন্য এক সময়ের তুলনায় উহার পরিবর্তন নির্ধারণ করা। টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যত প্রকার দ্রব্য ও সেবা যে-পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাদের সকলেরই একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে এক টাকার মূল্য হইল ২ কিলোগ্রাম চাল, ৩ কিলোগ্রাম গম, ½ কিলোগ্রাম ডাল, ১ খানি সূক্ষ্ম শাড়ির এক-দশমাংশ, ১ খানি মোটা ধুতির এক-চতুর্থাংশ, বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-বেতনের এক-ষষ্ঠাংশ, ডাক্তারের ফী'র এক-পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে যে-তালিকা প্রস্তুত হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহা সীমাহীন হইবে। সুতরাং ইহা সম্ভব নয়।

টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য পরিমাপ করা যায় না, মাত্র আপেক্ষিক মূল্যই করা যায়

টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য বলিতে কি বুঝায়

সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন (Construction of Simple Index Number): সূচকসংখ্যায় বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া গড়পড়তা দাম বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন হিসাব করা হয়। সুতরাং সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি মূল্যস্তরের সংখ্যা (a series of price level)।

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে

মূল্যস্তর বিভিন্ন প্রকারের হয় বলিয়া সূচকসংখ্যাও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা যাইতে পারে—যথা, সাধারণ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, বিলাস-দ্রব্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে সূচকসংখ্যা প্রণয়ন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হইয়া থাকে।

সূচকসংখ্যা প্রণয়নের বিভিন্ন স্তর

(ক) ভিত্তি বৎসর নির্বাচন (Selection of the Base Year): প্রথমেই ভিত্তি বৎসর নির্বাচন করিতে হইবে—অর্থাৎ, যে-বৎসরের তুলনায় অন্যান্য

বৎসরের দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করা হইবে তাহাকে প্রথমে বাছিয়া লইতে হইবে।

(খ) দ্রব্যাদির নির্বাচন (Selection of Commodities): দ্বিতীয়ত, সূচকসংখ্যার উদ্দেশ্য অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে হইবে। যদি শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করা হয়, তবে শ্রমিকরা যে-যে দ্রব্য ও সেবা সচরাচর ভোগ করিয়া থাকে তাহাদিগকে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। যদি এরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করিবার জন্য সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিতে হয় তবে যত বেশী সংখ্যক দ্রব্য ও সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ততই ভাল।

দ্রব্যাদির নির্বাচন কিভাবে করিতে হইবে

(গ) দাম সংগ্রহ (Collection of Prices): দ্রব্যাদি নির্বাচনের পর সংশ্লিষ্ট সকল বৎসরে উহাদের দাম সংগ্রহ করা প্রয়োজন। খুচরা দাম (retail prices) সংগ্রহ করিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পাইকারী দামও (wholesale prices) চলিতে পারে।

(ঘ) ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের গড় দাম ১০০ করিয়া ধরিয়া তুলনার বৎসরে উহা শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা দেখানো প্রয়োজন।

(ঙ) এইবার সংশ্লিষ্ট বৎসরসমূহের দামের গড় লইয়া উহাদের মধ্যে তুলনা করিলেই মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যাইবে। ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের দাম ১০০ করিয়া ধরা হয় বলিয়া ঐ বৎসরের গড় ১০০ হইতে বাধ্য। তুলনার বৎসরের গড় ১০০ অপেক্ষা যতটা অধিক বা কম হইবে মূল্যস্তর ততটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

মনে করা যাউক, ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে প্রধান প্রধান খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যস্তরের পরিবর্তন নির্ধারণ করা প্রয়োজন।* দেশে চাউল গম তৈল দুগ্ধ ও মৎস্য এই পাঁচ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রধানত ব্যবহৃত হইলে সূচকসংখ্যাটি পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ছকটির মত হইবে।

এই কাল্পনিক সূচকসংখ্যা অনুসারে ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের দাম গড়পড়তা শতকরা ২৭ ভাগ বাড়িয়াছে। এইভাবে খাদ্যদ্রব্যের সূচকসংখ্যার পরিবর্তে সাধারণ সূচকসংখ্যা (General Index Number) প্রণয়ন করিয়া যদি দেখা যায় যে, সকল জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম শতকরা ঐ ২৭ ভাগ বাড়িয়াছে তবে টাকাকড়ির মূল্য ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ কমিয়াছে বুঝিতে হইবে।

* আমাদের দেশে ১৯৫৮ সাল হইতে মেট্রিক ওজন পদ্ধতি আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয়; দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা তাহার পূর্বেই চালু হইয়াছিল।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসরে (১৯৫৮ সাল) দাম	ভিত্তি বৎসরের গড়	১৯৬৪ সালের দাম	১৯৬৪ সালের গড় (১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি)
	প্রতি কুইন্টাল টা. ন.প.		প্রতি কুইন্টাল টা. ন.প.	
১। চাউল	৫০ ০০	১০০	৬০ ০০	১২০
২। গম	৬০ ০০	১০০	৭৫ ০০	১২৫
৩। তৈল	২০০ ০০	১০০	২৪০ ০০	১২০
৪। ঘৃত	১০০০ ০০	১০০	১২০০ ০০	১২০
৫। মৎস্য	৩০০ ০০	১০০	৪৫০ ০০	১৫০
		৫০০÷৫ =১০০		৬৩৫÷৫=১২৭

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation): মুদ্রাস্ফীতি বা ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ইনফ্লেশন (inflation) বর্তমানে একটি বিশেষ সুপরিচিত শব্দ হইলেও ইহার প্রকৃত অর্থ লইয়া বেশ কিছুটা মতবিরোধ রহিয়াছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞাও প্রচলিত আছে। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সাধারণ মূল্যস্তর যখন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য যখন অবিচ্ছিন্নভাবে কমিতে থাকে তখন যে-অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়। মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবার কারণ হইল জিনিসপত্রের যোগানের তুলনায় লোকের ক্রয়শক্তির (purchasing power) বৃদ্ধি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জিনিসপত্রের যতটা যোগান দেওয়া সম্ভব হয় লোকে তাহার তুলনায় অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

বৈশিষ্ট্য

অনেকের মতে অবশ্য মূল্যস্তর অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাইলেই উহাকে 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি' বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া শিল্পপতিরাও উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়। ইহাতে উৎপাদনের যে-সকল উপকরণ অলস অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহারা নিয়োজিত হয়। বেকার শ্রমিক কাজ পায়, জমি মূলধন-দ্রব্য প্রভৃতির যে যে অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহাদিগকে কাজে লাগানো হয়, ইত্যাদি। ফলে মূল্যস্তরবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনবৃদ্ধিও ঘটিতে থাকে। এইভাবে যতক্ষণ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে ততক্ষণ মূল্যস্তরবৃদ্ধিকে 'আংশিক মুদ্রাস্ফীতি' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আংশিক মুদ্রাস্ফীতি

প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি

কিন্তু আংশিক মুদ্রাস্ফীতি বেশীদিন চলিতে পারে না। একসময় উৎপাদনের সকল অলস উপকরণই নিয়োজিত হইয়া দেশে আসে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা (condition of full employment)। তখন আর উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয় না এবং শিল্পপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি সুদ প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানের মূল্যসমূহও (factor prices) ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই অবস্থায় লোকের ব্যয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে—অর্থাৎ, মূল্যবৃদ্ধি পুরাদমে চলিতে থাকে। আধুনিক লেখকগণ এইরূপ অবস্থাকেই 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি' (true inflation) আখ্যা দিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলিতে বুঝায় উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনারহিত অবিচ্ছিন্ন মূল্যবৃদ্ধি।

মুদ্রাসংকোচ (Deflation): মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা হইল মুদ্রাসংকোচ। এই অবস্থায় মোট আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় বলিয়া মোট টাকাকড়ির পরিমাণ এবং ফলে, মূল্যস্তরও কমিয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থাকেই মুদ্রাসংকোচের অবস্থা বলা হয়।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল (Effects of Changes in Prices): জিনিসপত্রের দাম বা উহার বিপরীত মুদ্রামূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফল সমাজের সকল শ্রেণীর উপর সমান নহে। এই কারণেই সরকারকে মুদ্রামূল্য যথাসম্ভব স্থায়িত্ব রক্ষা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বস্তুত, টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা বা দামের হ্রাসবৃদ্ধি নিবারণ সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত।

দামবৃদ্ধির ফলে কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়

দাম বৃদ্ধি পাইলে কিছু লোকের লাভ হয়। খাতক (debtor), শিল্পপতি, মালমজুতকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। খাতক সকল সময়ই পূর্বের চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধ করে; অথচ দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সুতরাং খাতক লাভবান এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পপতিদের লাভ হয় প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত, তাহারা যখন কাঁচামাল ক্রয় করে তখন উহার দাম কম থাকে, কিন্তু যখন তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করে তখন কাঁচামালের দাম বাড়িয়া যায়। তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করিবার সময় সেই সময়কার বর্ধিত দামেই কাঁচামালের হিসাব করে। উদাহরণস্বরূপ, শীতবস্ত্র-উৎপাদক ৮ টাকা পাউণ্ড দামে পশম ক্রয় করিল; কিন্তু তৈয়ারি আলোয়ান বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে পশমের দাম বৃদ্ধি পাইয়া ১০ টাকা পাউণ্ড হইয়াছে। সে এই ১০ টাকা দামে হিসাব করিয়াই আলোয়ানের দাম ঠিক করিবে। দ্বিতীয়ত, তৈয়ারি জিনিসের দাম যে-ভাবে বৃদ্ধি পায়, মজুরি সুদ ইত্যাদি সেই হারে বৃদ্ধি পায় না। যাহারা মালমজুতের ব্যবসায় করে তাহাদেরও লাভ হয়। কিন্তু যাহারা মাস-মাহিনা

অথবা দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিতে কার্য করে তাহাদের বেতন ও মজুরি দামবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে না বলিয়া দামবৃদ্ধির ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেনসন্‌ভোগী প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের আয় একেবারে ধরাবাঁধা তাহাদের আরও ক্ষতি হয়। শ্রমজীবীরা কিন্তু একদিক দিয়া লাভ করে, কারণ তাহাদের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। ভারতের ন্যায় দেশে কৃষকের দুই দিক দিয়া লাভ হয়। প্রথমত, ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঋণের ভার কমিয়া যায়; দ্বিতীয়ত, কৃষিজ উৎপন্নের দাম বাড়িলেও খাজনা বাড়ে না। পরিশেষে, বর্ধিত দামের ফলে সঞ্চয়ের মূল্য কমিয়া যায়। ইহাতেও অনেকের ক্ষতি হয়।

দাম হ্রাস পাইলে সকল দিক দিয়াই ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে—যথা, পাওনাদার লাভবান ও খাতক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পপতিদের মুনাফা কমে, মালমজুতকারীর লোকসান হয়, যাহারা বেতন ও মজুরি পায় তাহাদের অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠে, কিন্তু নিয়োগের পরিমাণ কমে। সুতরাং শ্রেণী হিসাবে তাহাদের ক্ষতিই হয়। কৃষকেরও ক্ষতি হয়। খাজনা, সুদ প্রভৃতির ভার একই থাকে অথচ পণ্যের দাম কমার জন্য তাহার আয় কমিয়া যায়। পেনসন্‌ভোগীর ন্যায় লোকের আয় নির্দিষ্ট থাকিলেও অবস্থা পূর্বাপেক্ষা সচ্ছল হইয়া উঠে। নির্দিষ্ট আয়ের বিনিময়ে তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। পূর্বে যাহারা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদেরও অনুরূপ সুবিধা হয়।

দাম হ্রাস পাইলে বিপরীত শ্রেণীর লাভক্ষতি হয়

ভারতে দ্রব্যমূল্য (Prices in India) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সুরু হইতেই ভারতে দ্রব্যমূল্য নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এমনকি স্বাধীনতার পর হইতে এ-পর্যন্ত (১৯৬২-৬৩ সাল) টাকার ক্রয়শক্তি (Purchasing Power of the Rupee) শতকরা ৩০ ভাগের অধিক হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে লোকের দুঃখদুর্দশা ত বৃদ্ধি পাইয়াছেই, উপরন্তু নানারূপ সমস্যারও উদ্ভব হইয়াছে। একসময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; বর্তমানে উহা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিতেছে। এই কারণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের (price stabilisation) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় হইতে নিয়মিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়: (ক) যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি, (খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যবৃদ্ধি, এবং (গ) পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তিনটি পর্যায়

এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগের উপর বর্ধিত মূল্যস্তর লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনা সুরু হয়। উপরন্তু, এই পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর। এই দুই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণকে পরিকল্পনার সাফল্যের অন্যতম সর্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই বৃহত্তর পরিকল্পনায় অধিক ব্যয়ের দরুন লোকের আয়বৃদ্ধি ঘটিবে বলিয়া চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ঠিক হইয়াছে যে অপরিহার্য ছাড়া সকল চাহিদাই নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। অর্থাৎ, যথাসম্ভব লোকের ভোগ কমাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্য ভোগহ্রাসই যথেষ্ট নয়; সংগে সংগে উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদনের লক্ষ্যসমূহ স্থির করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা

পরিকল্পনায় ভোগ-নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ যে কতকটা কার্যকর হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, দেখা যায় যে পরিকল্পনার প্রথম ১৮ মাসে দ্রব্যমূল্য আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের পর ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস হইতে চৈনিক আক্রমণের ফলে দ্রব্যমূল্য বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবার দিকে ঝোঁক দেখা দেয়। ফলে ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে আপৎকালীন মূল্য-নিয়ন্ত্রণের এক ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই কার্যক্রমে খাদ্যদ্রব্য, তুলাবস্ত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদি পণ্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে পাইকারী ভাণ্ডার (wholesale stores) এবং ভোগ্যপণ্যক্রেতার ভাণ্ডার (consumers' stores) খোলা হয়, দ্রব্য-মূল্যের গতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৬৩ সালের মধ্যভাগে দ্রব্যমূল্য আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার আরও কড়াকড়ি করা হয়। তবুও দ্রব্যমূল্য আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই। সুতরাং এ-ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিবার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর: টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এক একক টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি বুঝায়। টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের ঠিক বিপরীত। মূল্যস্তর বলিতে বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর যদি হ্রাস পায় তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ: দুইটি কারণে মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয় (ক) টাকাকড়ির চাহিদার বা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন, এবং (খ) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব: প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে একমাত্র টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের ফলেই মূল্যস্তর বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হয়। তাঁহাদের আরও ধারণা ছিল যে টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হইল টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন। এই

ধারণার ফলেই টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সংক্ষেপে তত্ত্বটি অনুসারে, টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা বাড়িবে বা কমিবে, মূল্যস্তরও সেই পরিমাণ বাড়িবে বা কমিবে। টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে, টাকাকড়ির পরিমাণ অর্ধেক হইলে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভরশীল। ইহা একটি আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ: নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা এবং কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি সকল জিনিসের গড়পড়তা দামকে সাধারণ মূল্যস্তর বলা হয়। মূল্যস্তরের পরিবর্তন বুঝা যায় সূচকসংখ্যা প্রণয়নের দ্বারা। সূচকসংখ্যা টাকাকড়ির আপেক্ষিক মূল্য—অর্থাৎ, অন্য এক সময়ের তুলনায় টাকাকড়ির মূল্য নির্দেশ করে।

সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন: সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি মূল্যস্তর। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ইহা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। প্রণয়ন করিবার বিভিন্ন স্তর হইল নিম্নলিখিতরূপ: (ক) প্রথমে ভিত্তি বৎসর নির্বাচন করিতে হইবে; (খ) তারপর উদ্দেশ্য অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে হইবে; (গ) তৃতীয় স্থলে দাম সংগ্রহ করিতে হইবে; (ঘ) চতুর্থতঃ, ভিত্তি বৎসরের তুলনায় গড় দাম শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে; (ঙ) পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট বৎসরসমূহের দামের গড় লইয়া তুলনা করিতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি: মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মূল্যস্তর যখন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য যখন নিয়মিত কমিতে থাকে তখনই মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অনেক লেখক অবশ্য 'আংশিক মুদ্রাস্ফীতি' ও 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি'র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। ইঁহাদের মতে, যতক্ষণ মূল্যস্তরবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনবৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ মুদ্রাস্ফীতিকে 'আংশিক' বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণনিয়োগের পর যখন আর উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না তখনই ঘটে 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি'।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল: দামবৃদ্ধির ফলে কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়। যাহাদের লাভ হয় তাহাদের মধ্যে দেনাদার, শিল্পপতি, কৃষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিই প্রধান। যাহাদের ক্ষতি হয় তাহাদের মধ্যে পাওনাদার, শ্রমিক, বাঁধা মাহিনার চাকুরিয়া প্রভৃতি আছে। নিয়োগ বৃদ্ধি হয় বলিয়া দলগতভাবে শ্রমিকরা অবশ্য লাভবান হয়। দাম হ্রাস পাইলে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে।

ভারতে দ্রব্যমূল্য: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সুরু হইতেই ভারতে দ্রব মূল্য নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে লোকের দুঃখদুদশা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

ভারতে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে আলোচনা করা যায়: (ক) যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি, (খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যবৃদ্ধি; এবং (গ) পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি। এই তিন যুগেই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা করা হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বর্তমান পর্যায়ে দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভোগ-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও উৎপাদনবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the term 'Value of Money'? How can you measure changes in the Value of Money?

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবে?

2. What are Index Numbers? Why and how are they constructed?

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে? কেন এবং কিভাবে তাহাদের প্রণয়ন করা হয়?

3. Construct a Simple Index Number showing change in the prices of foodstuff.

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে পরিবর্তন দেখাইয়া একটি সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন কর।

4. Write short notes on : (a) Index Numbers, and (b) Inflation.

(ক) সূচকসংখ্যা, এবং (খ) মুদ্রাস্ফীতির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।

5. Explain carefully the relationship between changes in the quantity of money and changes in the general price level.

টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন এবং সাধারণ মূল্যস্তরে পরিবর্তনের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা সঠিকভাবে বর্ণনা কর।

6. What is meant by the term Value of Money? How is the Value of Money related to the quantity of money?

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়? টাকাকড়ির মূল্য টাকাকড়ির পরিমাণের সহিত কিভাবে সম্পর্কিত?

7. Explain the Quantity Theory of the Value of Money.

টাকাকড়ির মূল্যের পরিমাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

8. What is 'Inflation'? How does inflation affect businessmen and wage-earners?

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে? ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল কি তাহা ব্যাখ্যা কর।

9. How will a period of rising prices affect the following groups in the population : (a) Farmers, (b) Wage-earners, and (c) Teachers?

উঠতি দাম জনসংখ্যার নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা কর: (ক) কৃষক, (খ) বেতনভোগী, এবং (গ) শিক্ষক।

10. Indicate the effects of a rise in the level of prices upon (a) wage-earners, (b) businessmen, and (c) persons with fixed incomes.

(ক) শ্রমিক, (খ) ব্যবসায়ী, এবং (গ) বাঁধা আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণের উপর মূল্যস্তরবৃদ্ধির কি ফল হয় তাহা দেখাও।

11. What is Inflation and what are its evils?

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে এবং ইহার কুফল কি কি?

12. Indicate the price trend in India during the plan period.

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতে দ্রব্যমূল্যের গতি বর্ণনা কর।

ষোড়শ অধ্যায়

ঋণ ও ব্যাংক-ব্যবস্থা

(Credit and Banking)

ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Credit) : আমরা দেখিয়াছি যে বিনিময় সম্পাদন করাই টাকাকড়ির (Money) প্রাথমিক কার্য। কিন্তু বিনিময় টাকাকড়ি ছাড়াও চেক, হুণ্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তবে ইহাদিগকে টাকাকড়ি না বলিয়া টাকাকড়ির পরিবর্ত (Money Substitutes) বা ঋণপত্র (Credit Instruments) নামে অভিহিত করা হয়। সভ্য জগতে লেন-দেনের কাজকারবারের একটা মোটা অংশ ক্রেডিট বা ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলিয়া বিনিময়-ব্যবস্থায় এই সকল ঋণপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে।

টাকাকড়ির পরিবর্ত বা ঋণপত্রও বিনিময়ের মাধ্যম

ক্রেডিট বলিতে ঋণ বা ঋণের কারবার বুঝায়। ক্রেডিটের বাংলা প্রতিশব্দ হইল বিশ্বাস। বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি। বিশ্বাস আছে বলিয়াই দোকানদার ধারে জিনিসপত্র দেয়, ব্যাংক ঋণপ্রদান করে, লোকে ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে, ইত্যাদি। এই সকল কাজকারবারের মূলে থাকে একটি করিয়া প্রতিশ্রুতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হইলে আইন-আদালতে তাহার প্রতিকার পাওয়া যায়। কিন্তু আইন-আদালত পাওনা আদায়ের নির্দেশ দিতে পারে মাত্র, পাওনা আদায় করিয়া দিতে পারে না। দেনাদারের যদি পাওনা মিটাইবার ক্ষমতা না থাকে, ইতিমধ্যে যদি সে দেউলিয়া হইয়া পড়ে অথবা আইনকে ফাঁকি দিয়া সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফেলে তবে পাওনাদারের পক্ষে আদালতের নির্দেশ বা ডিক্রী লইয়া বিশেষ কিছু করিবার থাকে না। সুতরাং আইন-আদালতে বলবৎযোগ্যতা নহে, পারস্পরিক বিশ্বাসই ঋণের মূলভিত্তি।

ঋণের অর্থ ও প্রকৃতি

ঋণের সহিত যে সময়ের প্রশ্নও জড়িত রহিয়াছে, এ-ধারণাও উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে করা যাইবে। আজ ঋণগ্রহীতা পাওনা মিটাইতে প্রতিশ্রুত হইল; কিন্তু পাওনা মিটাইবার সময় তাহার ইচ্ছা বা সংগতি অন্যরূপ হইতে পারে। সুতরাং ঋণ বা ঋণের কারবারের দুইটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে হয়—(ক) বিশ্বাস (confidence), (খ) সময় (time)।

ঋণের দুইটি বৈশিষ্ট্য

ঋণের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরিত হয়। ফলে যে-ব্যক্তি সম্পদের মালিক নয় সে স্বল্পকালের জন্য উহা ভোগ বা ব্যবহার করিবার অধিকারী হয়। ঋণ বলিতে সোজাসুজি দ্রব্যসামগ্রীর হস্তান্তর ও উহা ফেরত দিবার প্রতিশ্রুতিও বুঝাইতে পারে। যেমন, আমাদের দেশে কৃষকদের অনেকে ফসল বুনার সময় ধানচালের দাদন বা ঋণ লইয়া থাকে। ফসল উঠার পর তাহাদিগকে দাদন-লওয়া ধানচাল ফেরত দিতে হয়; সংগে সংগে সুদ হিসাবেও কিছু অতিরিক্ত ধানচাল প্রদান করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকাকড়িই ঋণ দেওয়া হয়। ফলে ঋণের কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে ভবিষ্যতে অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি।

বর্তমান ঋণের কারবার

ঋণপত্র (Credit Instruments): ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি মৌখিক এবং লিখিত উভয় প্রকারের হয়। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতিভংগের অভিযোগ লইয়া আদালতে উপস্থিত হওয়া যায় না; সংগে সংগে সাক্ষ্য-প্রমাণাদিও উপস্থিত করিতে হয়। লিখিত প্রতিশ্রুতি কিন্তু এককভাবেই আদালতে বলবৎযোগ্য; সাধারণ ক্ষেত্রে ইহার উপর সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন হয় না। লিখিত প্রতিশ্রুতি শুধু খাতায় লেখা থাকিতে পারে; আবার উহাকে ঋণপত্রেও নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। গৃহস্থের নিকট হইতে পাওনার হিসাব যদি শুধু মুদীর খাতায় লেখা না থাকিয়া হাতচিঠাতে উঠানো হয় এবং উহা যদি মুদীর নিকট জমা থাকে তবে ঐ হাতচিঠা হইল ঋণপত্র (credit instrument)। এই ঋণপত্র অবশ্য হস্তান্তরযোগ্য (negotiable) নয়। ইহাতে লিখিত পাওনা স্বয়ং মুদীকেই আদায় করিতে হইবে। প্রথম প্রথম এই ধরনের হস্তান্তরযোগ্যতা-হীন (non-negotiable) ঋণপত্রই ব্যবহৃত হইত; পরে হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্রের প্রচলন হয়। স্বর্ণকার, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির নিকট টাকাকড়ি জমা রাখিলে যে-রসিদ পাওয়া যাইত তাহা ক্রমে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। যেমন, জগৎ শেঠের নিকট টাকা জমা রাখিয়া রাম যে-রসিদ পাইল তাহা দিয়া সে শ্যামের নিকট হইতে মাল ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। ইহার ফলে রামের নহে, শ্যামেরই টাকা শেঠের নিকট জমা রহিল। এইভাবে হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্র ব্যবহারের যে সূচনা হয় তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমান দিনের ব্যবসাবাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু যে ব্যবসাবাণিজ্যে ঋণপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নহে, উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, দেখা দিয়াছে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন ঋণপত্র

বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র

(ক) প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory Notes): প্রতিশ্রুতিপত্র দ্বারা ঋণ-গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অথবা চাহিবামাত্র ঋণপরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান

করে। প্রতিশ্রুতিপত্র সাধারণত হস্তান্তরযোগ্য হয়; ঋণদাতা উহাকে অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। ভারতে ঋণ-ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিশ্রুতিপত্রের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে; এইরূপ প্রতিশ্রুতিপত্র সাধারণত 'হ্যাণ্ডনোট' বলিয়া পরিচিত।

(খ) চেক (Cheques): আমানত (deposit) হইতে নির্দিষ্ট অর্থ-প্রদান করিবার জন্য আমানতকারী ব্যাংকের উপর যে লিখিত আদেশ দেয় তাহাকেই চেক বলে। সাধারণত চেক হস্তান্তরযোগ্য প্রতিশ্রুতিপত্র। তবে নিরাপত্তার জন্য যাহার নামে চেক কাটা হইয়াছে তাহাকেই অর্থপ্রদানের নির্দেশ দিয়া উহাকে হস্তান্তরযোগ্যতাহীন করা যাইতে পারে। চেক আবার ক্রসড্ (crossed) হয়। এইরূপ চেক সোজাসুজি ব্যাংকে লইয়া গেলে নগদ টাকা পাওয়া যায় না। উহাকে প্রথমে ব্যাংকে জমা দিতে হয়; ব্যাংকে জমা দেওয়া হইলে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চেক কাটিয়াছে তাহার আমানত হইতে যাহার নামে চেক কাটা হইয়াছে তাহার আমানতে টাকা স্থানান্তরিত হয়। তখন সে ইচ্ছা করিলে নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারে। ধরা যাউক, রামবাবু অফিস হইতে চেকে মাহিনা পাইয়াছেন এবং এই চেক হইল ক্রসড্ চেক। রামবাবু ঐ চেক ব্যাংকে লইয়া গেলেই নগদ টাকা পাইবেন না। তাঁহাকে প্রথমে চেকখানি নিজের ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। তখন তাঁহার ব্যাংক যে-অফিস চেক প্রদান করিয়াছে তাহার ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া রামবাবুর আমানতের ঘরে জমা করিবে। জমা হইলে পর রামবাবু নিজে চেক কাটিয়া নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারিবেন, বা চেকের মাধ্যমে গত মাসের দেনাপত্র মিটাইতে পারিবেন। আর অফিসের ব্যাংক ও রামবাবুর ব্যাংক যদি একই ব্যাংক হয় তবে রামবাবু চেকখানি জমা দিলেই অফিসের হিসাব হইতে তাঁহার হিসাবে লিখিত পরিমাণ টাকা হস্তান্তরিত হইবে। সাধারণ হস্তান্তরযোগ্য চেক অপেক্ষা এইরূপ ক্রসড্ চেক নিরাপদ, কারণ ব্যাংকের মাধ্যমেই উহাকে ভাঙাইতে পারা যায়। একটি ব্যাংক অপর একটি ব্যাংকের উপর চেক কাটিলে উহাকে 'ব্যাংকার্স ড্রাফ্ট' (Banker's Draft) বলে।

বিভিন্ন ধরনের চেক

ব্যাংকার্স ড্রাফ্ট

প্রশ্ন উঠিতে পারে, চেককে টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য না করিয়া ঋণপত্র বলিয়া গণ্য করা হয় কেন? ইহার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, ব্যাংকে আমানত না থাকিলে চেকের কোন মূল্য নাই। দ্বিতীয়ত, চেকের মাধ্যমে লেনদেনের কার্য একবারেই সমাপ্ত হয় না; আমানত স্থানান্তরিত করিবার বা টাকা তুলিয়া লইবার কার্য তখনও বাকি থাকে। তৃতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে চেক একখণ্ড কাগজেরই সামিল হয়। চতুর্থত, সকল চেক হস্তান্তরযোগ্য নহে।

চেক টাকাকড়ি নহে কেন

অতএব, ব্যাংক-আমানতকেই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (Bank Money) এবং চেককে টাকাকড়ির পরিবর্ত বা ঋণপত্র বলিয়া গণ্য করা হয়।

(গ) হুণ্ডি (Bills of Exchange): 'বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ'কে বাংলায় হুণ্ডি বলিয়া অভিহিত করা হইলেও যাহাকে ঠিক হুণ্ডি বলে তাহার সহিত প্রকৃত বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের পার্থক্য আছে। হুণ্ডি লেখা হয় দেশী ভাষায়, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ লেখা হয় ইংরাজীতে। কতকগুলি হুণ্ডি প্রতিশ্রুতিপত্রেরই মত, আবার কতকগুলি বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের ধরনের। যাহা হউক, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের বাংলা প্রতিশব্দ 'হুণ্ডি'ই করিয়া ইহার প্রকৃতি বর্ণনা করা হইতেছে।

একদিক দিয়া হুণ্ডির প্রকৃতি প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রকৃতির বিপরীত। প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করে ঋণগ্রহীতা, হুণ্ডিতে অর্থপ্রদানের নির্দেশ দেয় মাল-বিক্রেতা। মালবিক্রেতার নির্দেশপত্রে ক্রেতা সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিলে তবেই উহা হুণ্ডিতে পরিণত হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীগণপতি বাজোরিয়া লণ্ডনের মিঃ ম্যাকেঞ্জীর নিকট ১ হাজার পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্রপাতি তিন মাস পরে দাম দিবার অংগীকার করিয়া ক্রয় করিলেন। এখন মিঃ ম্যাকেঞ্জী শ্রীবাজোরিয়ার নামে একটি বিল কাটিয়া পাঠাইবেন। শ্রীবাজোরিয়া উহাকে 'স্বীকার করিলাম' (accepted) বলিয়া সহি করিলে উহা হুণ্ডিতে পরিণত হইবে। এই হুণ্ডি তিন মাস পরে শ্রীবাজোরিয়ার নিকট প্রেরণ করিলে তিনি ১ হাজার পাউণ্ড দিতে আইনত বাধ্য থাকিবেন। এই তিন মাসের পূর্বেই যদি মিঃ ম্যাকেঞ্জীর টাকার দরকার হয় তবে কোন ব্যাংকের নিকট হইতে ঐ হুণ্ডি তিনি ডিস্কাউণ্ট (discount) করিয়া লইতে পারিবেন। সময়ান্তরে ব্যাংক শ্রীবাজোরিয়ার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবে। এইভাবে হুণ্ডির সাহায্যে ব্যবসায়ীরা ধারে মালপত্র ক্রয় করিয়াও আমদানি করিয়া থাকে। ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি সম্প্রসারিত হয়। ইহা ছাড়াও হুণ্ডির সাহায্যে আমদানি-রপ্তানির মূল্য সহজে মিটানো যায়। কিভাবে ইহা সম্ভব হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে করা হইতেছে।

হুণ্ডির প্রকৃতি

হুণ্ডির উপযোগিতা

উপরের উদাহরণে শ্রীবাজোরিয়া মিঃ ম্যাকেঞ্জীর নিকট হইতে ধারে মাল আমদানি করিয়াছেন। সুতরাং তিন মাস পরে শ্রীবাজোরিয়ার সমস্যা হইবে কি করিয়া ইংলণ্ডে মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে টাকা পাঠানো যায়। যদি ধরা যায়, ঐ একই সময় ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীবিশ্বনাথ দত্তের নিকট হইতে লণ্ডনের আমদানিকারক মিঃ টমাস ঐ ১ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি করিয়াছেন তবে সমস্যাটি সহজেই মিটিয়া যাইতে পারে। শ্রীবাজোরিয়া শ্রীদত্তের নিকট হইতে মিঃ টমাসের স্বীকার করা হুণ্ডিটি ক্রয় করিয়া লইয়া

মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে পাঠাইলে মিঃ ম্যাকেঞ্জী মিঃ টমাসের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। ফলে শ্রীদত্ত তাঁহার রপ্তানির মূল্য ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীবাজোরিয়ার নিকট হইতে এবং মিঃ ম্যাকেঞ্জী তাঁহার রপ্তানির মূল্য লণ্ডনেরই মিঃ টমাসের নিকট হইতে পাইবেন। সুতরাং কাহাকেও বিদেশ হইতে টাকা আদায়ের বা বিদেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে না। এইভাবে হুণ্ডি বা বিল ক্রয়বিক্রয়ের জন্য প্রায় প্রত্যেক উন্নত দেশেই বিলের বাজার (Bill Market) আছে এবং বর্তমানে হুণ্ডি অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) তমসুক (Bonds): অন্যান্য ধরনের ঋণপত্রের মধ্যে তমসুকই প্রধান। তমসুক মোটামুটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র। ডিবেঞ্চার (Debentures) তমসুকের অন্যতম উদাহরণ।

ব্যাংক (Banks): ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে—যথা, বণিকদের ব্যবসায় বা বাণিজ্য (trade), মহাজনদের ব্যবসায় (money lending) এবং স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। বর্তমান ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পূর্বপুরুষ বলিয়া এই তিনজনেরই নামোল্লেখ করিতে হয়। তবে ব্যাংক-ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয় বণিকদের ব্যবসায় হইতে।

ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ

প্রথম প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য ধাতব মুদ্রার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। ধাতব মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য হইলেও ইহা লুণ্ঠিত হইবার ভয় ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে বণিকরা আসল টাকাকড়ি বহন না করিয়া টাকাকড়ির মালিকানার নির্দেশক লিখিত পত্র বহন করিত। যে-নগরে বণিকের বাসস্থান ছিল সেখানকার কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বণিকের নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া এইরূপ লিখিত পত্র প্রদান করিত। অনেক সময় আবার বণিক নিজ নামেই ঐ পত্র বাহির করিত। যাহা হউক, ঐ প্রখ্যাত ব্যক্তি বা বণিকের উপর লোকের বিশ্বাস থাকায় তাহারা নগদ টাকাকড়ির পরিবর্তে ঐরূপ লিখিত পত্র লইতে আপত্তি করিত না। প্রয়োজনমত তাহারা পত্র-প্রচলনকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগদ টাকাও গ্রহণ করিতে পারিত ; অথবা দেনা মিটাইতে ঐ পত্র কাহাকেও সমর্পণ করিতে পারিত। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য নগদ টাকাকড়ির পরিবর্তে ঋণপত্রের ব্যবহার সুরু হইল। এই ঋণপত্রই পরে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডিতে পরিণত হয়।

১। বণিকদের ব্যবসায়

ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বংশের ইতিহাসে পরবর্তী পূর্বপুরুষ হইল মহাজন বা ঋণ-ব্যবসায়ী। ঋণের ব্যবসায় অতি প্রাচীন। ইহার উদ্ভব হয় টাকাকড়ির প্রচলনের সংগে সংগেই। অতীতে ঋণ-ব্যবসায়ীকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলেও তাহার যে উপযোগিতা আছে তাহা তাহারা

অস্বীকার করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থই ব্যবসায়ে খাটাইত। এইভাবে সে ঋণের ব্যবসায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাহীন সঞ্চিত অর্থের মালিকরা তাহাদের সঞ্চয় খাটাইবার জন্য উহা মহাজনদের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মহাজন কিছু কমিশন লইয়া এই টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করিত; ক্রমেই সে ইহা তাহার নিজের টাকাকড়ির সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া খাটাইতে লাগিল এবং যে তাহার নিকট টাকা খাটাইবার জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহাকে নির্দিষ্ট সুদ দিতে লাগিল। এইভাবে আমানত গ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য সুরু হইল এবং ব্যাংক-ব্যবসায় পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল।

২। মহাজনদের ব্যবসায়

চেকের ব্যবহার ব্যাংক-ব্যবসায়ের পরবর্তী অধ্যায়। এই কার্য সুরু করে ইংরাজ স্বর্ণকারগণ। প্রাচীন ইংলণ্ডে ধনী বণিকরা স্বর্ণকারদের নিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া রসিদ লইত এবং গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত লইবার সময় এই রসিদ প্রত্যর্পণ করিত। পরে এই রসিদ প্রত্যেকবারেই স্বর্ণকারের নিকট ফেরত না আসিয়া টাকাকড়ির মত দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যেকবারেই গচ্ছিত স্বর্ণ উঠাইয়া দেনা মিটানো ও পাওনাদারের পক্ষে ঐ স্বর্ণ আবার গচ্ছিত রাখার অসুবিধা দূর হইল। এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য স্বর্ণ আমানতের রসিদই পরবর্তী যুগে ব্যাংক-নোটে পরিণত হয়।

৩। স্বর্ণকারদের ব্যবসায়

আরও কিছুদিন পরে দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে সকল সময় আমানত-রসিদও ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। গচ্ছিতকারী তাহার গচ্ছিত স্বর্ণ হইতে কিছু পরিমাণ তাহার পাওনাদারকে প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ স্বর্ণকারকে দিতে পারিত। এইরূপ লিখিত নির্দেশ চেক ছাড়া আর কিছুই নয়। চেকের উদ্ভব হওয়ায় স্বর্ণকার পুরাপুরি ব্যাংক-ব্যবসায়ীতেই পরিণত হইল।

বর্তমানে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, সে হুণ্ডি বাট্টা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থসরবরাহ করে। এই কার্য উত্তরাধিকার সূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, মহাজনদের মত সে সঞ্চয়সংগ্রহ ও ঋণপ্রদান করে। তৃতীয়ত, সে স্বর্ণকারদের মত নগদ টাকাকড়ি ছাড়াও চেকের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর সুব্যবস্থা করিয়া দেয়।

ব্যাংক-ব্যবসায় কাহাকে বলে? (What is Banking?): ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনায় ব্যাংকের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন ধরনের কার্য করিয়া থাকে—যথা, বাণিজ্যে ঋণসরবরাহের

কার্য, ঋণগ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য এবং চেক বা ঋণপত্রের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর কার্য। এই তিন প্রকার কার্যই ঋণ সংক্রান্ত কার্য বলিয়া ব্যাংক-ব্যবসায়কে 'ঋণের ব্যবসায়' (business of dealing in credit) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ব্যাংক ঋণ লইয়া কারবার করে। একজন আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদের মতে, ব্যাংক অর্থসরবরাহ ব্যাপারে অন্যতম মধ্যস্থ; ইহা ঋণ আদানপ্রদানের কারবারী।* বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যাহারা অর্থ সঞ্চয় করে এবং যাহারা সেই অর্থ শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগ করে তাহারা দুই ভিন্ন শ্রেণীর লোক। ব্যাংকই উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বা মধ্যস্থতার কার্য করে। উহা সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ অর্থ আবার শিল্পপতি, বণিক প্রভৃতিকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এইভাবে ঋণের আদানপ্রদানের মাধ্যমে যে-প্রতিষ্ঠান মুনাফালাভের প্রচেষ্টা করে তাহাকেই ব্যাংক বলা যায়।

বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি। যে-ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে সে বিশ্বাস করে যে তাহার টাকা নষ্ট হইবে না। তেমনি ব্যাংকও যখন ঋণপ্রদান করে তখন বিশ্বাস করে যে ঐ টাকা আদায় করা যাইবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস না থাকিলে ব্যাংক ঋণপ্রদান করিবার সময় সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদির ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য সম্পদের (assets) জামিন দাবি করে। সুতরাং ব্যাংকের কারবার হইল বিশ্বাসের কারবার। ইংরাজীতে ইহাকেই বলা হয় 'ক্রেডিটে'র (credit) কারবার।

কিন্তু প্রত্যেক ঋণ বা বিশ্বাসের কারবারীই ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য নয়। অধিকাংশ সভ্য দেশেই কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এবং কোন্ কোন্ ঋণ-ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবসায়ী (banker) বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। আমাদের দেশে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) দ্বারা এইরূপ ব্যাংক-ব্যবসায় ও ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে চেক ব্যবহার না করিলে, চলতি আমানত (current account) বা চাহিবামাত্র জমা টাকা ফেরত দিবার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং অন্যান্য কাজকারবারে জড়িত থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বলিয়া গণ্য হইবে না। উপরন্তু, প্রত্যেক ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন ঋণের কারবার আইনের দৃষ্টিতে 'ব্যাংক' বলিয়া পরিগণিত হয় না।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা (Utility of Banking): বর্তমান অর্থনৈতিক জগতে ব্যাংক-ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে।

* A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts.

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সঞ্চয় শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া ব্যাংক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকের নিকট হইতে চলতি মূলধন সংগ্রহ করে। ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ; ইহাতে কিছু কিছু সুদও পাওয়া যায়। এইজন্য লোকে সঞ্চয়ে আগ্রহশীলও হয়। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু সঞ্চয়সংগ্রহ করে না, সঞ্চয়বৃদ্ধিও করে। অতএব, মূলধন-গঠনে (capital formation) দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যাংক দেশের সঞ্চয়-সংগ্রহ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে

ব্যাংকগুলি শুধু আমানতের মাধ্যমেই সঞ্চয়সংগ্রহ করে না; অনেক ক্ষেত্রে তাহারা শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। এই সূত্রে বহু পরিমাণে স্থায়ী মূলধন সংগৃহীত হয়।

ব্যাংক শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে

ব্যাংক-ব্যবস্থা ঋণ সৃজন করিয়া প্রয়োজনমত টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহার ফলে শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনমত টাকাকড়ি সরবরাহ করা না যাইত তবে সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা (developing economy) পদে পদে ব্যাহত হইত।

টাকাকড়ি সৃজন করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করে

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অনেকাংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লোকে দূরে বসিয়া যখন ক্রয়বিক্রয় করে তখন ব্যাংকের মাধ্যমেই টাকাকড়ির লেনদেন হয়। অনেক সময় আবার ধারে ক্রয়বিক্রয় চলে। ক্রেতা তখন নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল্য পরিশোধের জন্য এক অংগীকারপত্র বা হুণ্ডি (Bill of Exchange) প্রদান করে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই টাকাকড়ির প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা ঐ হুণ্ডি ব্যাংক হইতে কিছু ডিস্কাউণ্ট বাদ দিয়া ভাঙাইয়া লইতে পারে। এইভাবে ধারে বিক্রয় করিয়াও ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে পারে।* বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়ও ব্যাংকের মাধ্যমে হয়।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে

পরিশেষে, ব্যাংকগুলি অনেক সময় ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা এবং এজেন্ট হিসাবে কার্য করে। ইহাতেও ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষ উপকৃত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির মূল্য স্থায়িত্ব রক্ষার প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজকল্যাণে নিরত থাকে।

ব্যাংক অন্যান্যভাবেও ব্যবসাবাণিজ্যকে সাহায্য করে

ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Banks): ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা হইতেই ব্যাংকের নিম্নলিখিত কার্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

---

* ১৬৮ পৃষ্ঠা।

(ক) সঞ্চয়সংগ্রহ (Collection of Savings): সঞ্চয়সংগ্রহই ব্যাংকের প্রাথমিক কার্য। ব্যাংক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখে এবং ইহার দরুন সুদ প্রদান করে। আমানত প্রধানত দুই ধরনের—(ক) চলতি আমানত (demand deposit), এবং (খ) মেয়াদী আমানত (time deposit)। চলতি আমানত হইতে আমানতকারী ইচ্ছামত চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে; কিন্তু মেয়াদী আমানত হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা উঠানো যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তবেই আমানত ফেরত পাওয়া যায়। তবে মেয়াদী আমানত জামিন রাখিয়া টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে। ব্যাংক মেয়াদী আমানত বহুদিন ধরিয়া খাটাইতে পারে বলিয়া উহার সুদ চলতি আমানতের উপর সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক হয়। আমাদের দেশে আরও একপ্রকার আমানত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জমা আমানত (savings deposit) বলে ইহা হইতে সপ্তাহে একবার কি দুইবার নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেক কাটিয়া তোলা যায় এবং ইহার সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম কিন্তু চলতি আমানত অপেক্ষা বেশী হয়।

ব্যাংক আমানত দ্বারা দেশের সঞ্চয়সংগ্রহ করে

(খ) ঋণ ও বিনিয়োগ (Loans and Investments): সংগৃহীত সঞ্চয় হইতে ব্যক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্য। নানাভাবে ব্যাংক এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, উহা সরাসরি ঋণপ্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, হুণ্ডি ডিস্কাউণ্ট করিতে পারে। হুণ্ডি ভাঙানোও একপ্রকার ঋণপ্রদান কার্য। তৃতীয়ত, উহা শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার অথবা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া অর্থ বিনিয়োগ (invest) করিতে পারে।

(গ) টাকাকড়ির সৃজন (Creation of Money): টাকাকড়ি সৃজন করা ব্যাংকগুলির অন্যতম প্রধান কার্য। ব্যাংক-ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। পূর্বে অনেক ব্যাংকই নোট ছাপাইয়া টাকাকড়ির সৃষ্টি করিতে পারিত। বর্তমানে এ-ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের নাই।

কিভাবে আমানত সৃষ্টির দ্বারা ব্যাংকগুলি টাকাকড়ি সৃজন করে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণপ্রদান করে তখন সাধারণত তাহাকে নগদ টাকা প্রদান করে না, তাহার আমানতের ঘরে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ জমা দেখায় মাত্র। ধরা যাউক, ক তাহার ব্যাংকের নিকট হইতে ১০০০ টাকা ঋণগ্রহণ করিল। পূর্বে ক-এর হিসাবে ব্যাংকে মাত্র ১০০ টাকা আমানত থাকিলে এখন আমানতের পরিমাণ হইবে ১১০০ টাকা (১০০+১০০০)। ক এখন ১১০০ টাকার

উপরই চেক কাটিতে পারিবে। ঐ ১০০০ টাকা ক জমা দেয় নাই; ব্যাংক তাহাকে ঋণপ্রদান করিয়াই উহা সৃজন করিয়াছে। সুতরাং উহা হইল সৃষ্ট আমানত (created deposit)। এইজন্য ইংরাজীতে বলা হয় যে প্রত্যেকটি ঋণ একটি করিয়া আমানতের সৃষ্টি করিয়া থাকে (every loan creates a deposit)। ব্যাংক-আমানত টাকাকড়ি (Money) বলিয়া ব্যাংক আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে টাকাকড়িও সৃজন করিয়া থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ক-এর হিসাবে ১০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করা হইল, তাহার টাকা ক যখন আজ বা কাল চেক কাটিয়া তুলিয়া লইবে তখন ব্যাংক টাকা দিবে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে অর্থ-বিদ্যাবিদগণ বলেন, দেশে চেক ব্যবহারের বিশেষ প্রচলন থাকিলে ক চেক কাটিয়া দেনা মিটাইবে এবং যে-ব্যক্তি চেক পাইবে সে তাহার ব্যাংকে উহা জমা দিবে। ফলে ক-এর হিসাব হইতে আমানত আর একজনের হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র—সকল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ঠিকই থাকিয়া যাইবে। তবে দেশে মোট যত পরিমাণ ব্যাংক-আমানত থাকে তাহার একটা অংশ লোকে নগদ টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করে। এই অংশ দশভাগের একভাগ হইলে ১০০০ টাকার নূতন আমানত বা ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃষ্ট হইলে ব্যাংকগুলিকে এক শতকের মত নগদ টাকা রাখিয়া দিতে হইবে। সুতরাং ব্যাংকগুলির যদি নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ দশভাগের একভাগ অপেক্ষা ১০০ টাকা অধিক হয়, তবেই আমাদের উদাহরণে উহাদের পক্ষে ১০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নহে।*

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে এখানে দেশের ব্যাংক বা ব্যাংক-ব্যবস্থার (the entire banking system) আমানত সৃজনের কথা বলা হইয়াছে, একটিমাত্র ব্যাংকের নহে। বস্তুত, প্রাপ্ত আমানতের অধিক ঋণপ্রদানের ক্ষমতা এককভাবে কোন ব্যাংকের নাই, তবে সকল ব্যাংক একসংগে উপরের প্রাপ্ত আমানতের অধিক ঋণপ্রদান করিতে পারে এবং করিয়া থাকে আমানত সৃজন করিয়া।

(ঘ) অন্যান্য কার্য (Other Functions): ব্যাংক অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করে। ইহা মুদ্রা-বিনিময় (money-changing) করে; স্বর্ণ-রৌপ্য টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করে; স্বর্ণ-রৌপ্য ক্রয়বিক্রয় করে; শেয়ার-ডিবেঞ্চার ক্রয়বিক্রয়ে সহায়তা করে। উপরন্তু, ব্যাংক মক্কেলের এজেণ্ট বা হিসাবে বাড়ীভাড়া আদায় করে; উহা ডিভিডেণ্ড আদায়, চিঠিপত্র

* ধরা যাউক, দেশে সকল ব্যাংকে মোট আমানতের পরিমাণ হইল ১ কোটি টাকা এবং উহাদের হাতে ১০ লক্ষ ১ শত নগদ টাকাকড়ি বা কারেন্সী রহিযাছে। এ-ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি আরও ১ হাজার টাকার আমানত সৃজন করিতে পারে।

প্রদান, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি কার্যও করিয়া থাকে। পূর্বের স্বর্ণকারদের মত এখনও ব্যাংকগুলি মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক (Types of Bank): ব্যাংকের কার্যাবলীর আলোচনা হইতে এ-ধারণা করা অবশ্যই ভুল হইবে যে সকল কার্যই প্রত্যেক ব্যাংক সম্পাদন করিয়া থাকে। শিল্পজগতে বর্তমানে যেরূপ শ্রম-বিভাগ দেখা যায়, ব্যাংক-ব্যবস্থাতেও সেইরূপ বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) পরিদৃষ্ট হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানই যেরূপ সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না, তেমনি কোন ব্যাংকই ব্যাংকের সকল কার্য সম্পাদন করে না। ফলে-বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন কায সম্পাদন করে

এই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (ঙ) জামিবন্ধকী ব্যাংক, এবং (চ) সমবায় ব্যাংকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank): বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক-সমাজের সমাজপতি। দেশের অভ্যন্তরে সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ, দেশের কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা, দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে টাকা-কড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং নানাভাবে উন্নয়ন কার্যে সহায়তা করা ইহার দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব

প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকারী। আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ও সরকারী তত্ত্বাবধানে ইহা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী:
১। নোট প্রচলন

দ্বিতীয়ত, মুদ্রার ন্যায় ঋণের পরিমাণের উপরও টাকা-কড়ির যোগান নির্ভর করে বলিয়া দেশের ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। কি পরিমাণ টাকাকড়ির যোগান দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট থাকে। টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে উহা নোট ছাপা কমাইয়া দেয় এবং অন্যান্য ব্যাংককে ঋণদান হ্রাস করিতে নির্দেশ দেয় বা বাধ্য করে; অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা স্থির হইলে নোট ছাপা বাড়াইয়া দেয় এবং ব্যাংকগুলিকে ঋণদানে উৎসাহিত করে। এইভাবে টাকাকড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

২। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

টাকাকড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য সমস্ত ব্যাংকের ব্যাংক। এই সমস্ত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট একটি করিয়া হিসাব এবং তাহাদের গৃহীত আমানতের কিছু অংশ জমা রাখিতে হয়। ইহার পরিবর্তে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে কিছু সুবিধাও পাইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহাদের স্বল্পকালীন ঋণদান করে। প্রথম শ্রেণীর হুণ্ডি (first class bills of exchange) পুনর্বাট্টা (rediscount) করে ইত্যাদি।*

৩। ইহা অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। ইহা সরকারের টাকাকড়ি জমা রাখে, প্রয়োজন হইলে সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদান করে এবং সরকারী ঋণ (Public Debt) পরিচালনা করে।

৪। ইহা সরকারের ব্যাংক

পঞ্চমত, অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিত নির্দিষ্ট বিনিময় হার বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়।

৫। ইহা মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখে

পরিশেষে, দেশের শিল্পবাণিজ্য যাহাতে সুপরিচালিত হয়, ব্যাংক ফেল পড়িয়া লোকের আমানত যাহাতে নষ্ট না হয়, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তব্য। মোটকথা, ব্যাংক-ব্যবস্থা দেশের শিল্পবাণিজ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে; তাহার ভালমন্দ সমস্ত কিছুর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়ী।

৬। অন্যান্য কায

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বলা হইয়াছে যে, টাকাকড়ির যোগান মুদ্রার ন্যায় ঋণের উপরও নির্ভর করে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে টাকাকড়ির সৃজন করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে। ব্যাংকসমূহের এই ক্ষমতা যাহাতে সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি দেখে যে, অন্যান্য ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণদান করিতেছে বা যে-সময় ঋণদানের মাধ্যমে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সে-সময় ঋণদানে বিরত থাকিতেছে তখন উহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পন্থাসমূহ

* পুনর্বাট্টা বলিতে বুঝায় একবার ভাঙানো হুণ্ডিকে পুনরায় ভাঙানো। ১৬৮ পৃষ্ঠার উদাহরণে মিঃ ম্যাকেঞ্জী কোন ব্যাংকের নিকট হইতে হুণ্ডি ডিস্কাউন্ট করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের (৩ মাস) পূর্বে টাকা লইলেন। ঐ ব্যাংকের যদি আবার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হয় তবে উহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারিবে।

(ক) নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion): ইহা দ্বারা বুঝায় ব্যাংকগুলির বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন করা—তাহাদের বলা হয় যে, তাহারা দেশের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কার্য করিতেছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সংযত হওয়া কর্তব্য।

নৈতিক প্রণোদন বলিতে কি বুঝায়

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন (Changes in the Bank Rate): নৈতিক প্রণোদনে বিশেষ ফল না হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য যে-সকল পন্থা অনুসরণ করে, সুদের হারের পরিবর্তন তাহার অন্যতম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করিলে অন্যান্য ব্যাংকও উহা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে। কারণ, প্রয়োজনমত তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেই ঋণ লইতে হয়। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে লোকে কম ঋণ গ্রহণ করিবে। ফলে, শেষ পর্যন্ত মোট ঋণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

সুদের হারের পরিবর্তন কিভাবে কার্য করে

(গ) খোলা বাজারে কারবার (Open Market Operations): খোলা বাজারে কারবারের অর্থ হইল জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে তখন ক্রেতা আমানত হইতে টাকাকড়ি তুলিয়া লইয়া উহার মূল্য প্রদান করে। ফলে ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া ঋণদানের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করিলে ঐ টাকা ব্যাংকে আমানত পড়ে এবং ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

খোলা বাজারে কারবারের অর্থ

(ঘ) জমার অনুপাতে পরিবর্তন (Variation in the Reserve Ratio): অন্যান্য ব্যাংকের আমানতের যে-অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। নূতন আইন অনুসারে আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তপশীলী ব্যাংকগুলি (Scheduled Banks) তাহাদের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ আইনত জমা রাখিতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাংক এই জমার অনুপাতকে ৫ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলিকে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত জমা দিবার নির্দেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট অধিক টাকা জমা দিতে হইলে ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা কমিয়া যায়; আবার জমার পরিমাণ কম হইলে ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা

(ঙ) ঋণ-বরাদ্দ নীতি (Rationing of Credit): পরিশেষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-বরাদ্দ করিবার ক্ষমতাও থাকিতে পারে। এইরূপ হইলে ইহা নির্দেশ দিতে পারে যে, কোন্ ব্যাংক কত পরিমাণ ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks) : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আলোচনা প্রসংগে যে-সকল 'অন্যান্য ব্যাংকে'র কথা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয়সংগ্রহ, এইরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যক্তি ও শিল্পবাণিজ্যকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান করা, হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় দ্বারা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা, মক্কেলের পক্ষে এজেণ্ট ও ট্রাষ্টীর কার্য করা, মূল্যবান জিনিস ও দলিলপত্র গচ্ছিত রাখা, ইত্যাদিই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংককে যৌথ পুঁজি ব্যাংকও (Joint Stock Bank) বলা হয়। এরূপ বর্ণনার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। ইংলণ্ডে প্রথমে একমাত্র 'ব্যাংক অফ্ ইংলণ্ড'ই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্য পরিচালনা করিত এবং উহা যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককেই যৌথ পুঁজি ব্যাংক বলিয়া অভিহিত করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে না, কারণ যে-আমানতের মাধ্যমে উহা অর্থ সংগ্রহ করে তাহা স্বল্পমেয়াদী হয়। এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যবসায় হইতে বিরত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য, শিল্পবাণিজ্যের শেয়ার-ডিবেঞ্চার বিক্রয়কার্য, ইত্যাদি বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) বলিয়া ইহাও সম্পাদন করে না।

বাণিজ্যিক ব্যাংক যৌথ পুঁজি ব্যাংক নামেও পরিচিত

ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে না

বিনিময় ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংক (Exchange Banks, Industrial Banks and Land Mortgage Banks) : যে-সকল ব্যাংক প্রধানত বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য করিয়া থাকে তাহাদিগকে বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks), যে-সকল ব্যাংক প্রধানত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান বা উহাদের শেয়ার-ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ করে তাহাদিগকে শিল্প ব্যাংক (Industrial Banks) এবং যে-সকল ব্যাংক জমিবন্ধকী কার্য করে তাহাদিগকে জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Banks) বলা হয়।

বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা। কিন্তু অনেক সময় মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়াও ব্যাংক গড়িয়া উঠে। এই সকল ব্যাংক সমবায় ব্যাংক (Cooperative Bank) নামে অভিহিত। পারস্পরিক সহায়তায় স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা এইরূপ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

সমবায় ব্যাংক

ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থা (The Clearing House System): ক্রসড্ চেক ও আমানত সৃজনের বর্ণনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, একটি ব্যাংকের উপর কাটা চেক, ড্রাফ্ট ইত্যাদি অধিকাংশ সময় অপর ব্যাংকে জমা পড়ে।* ইহাতে ব্যাংকগুলির মধ্যে পারস্পরিক দেনাপাওনার উদ্ভব হয় এবং আমানত স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন হয়। নিউ ইয়র্ক লণ্ডন কলিকাতা বোম্বাই-এর ন্যায় বড় বড় সহরে ব্যাংকগুলির মধ্যে এইরূপ প্রাত্যহিক দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ ও আমানত স্থানান্তরকরণের সুবিধার জন্য একটি করিয়া সংগঠন থাকে। ইহাকে ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House) বলা হয়।

ক্লিয়ারিং হাউস কাহাকে বলে

ক্লিয়ারিং হাউস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিবর্গ অপরাপর ব্যাংকের উপর কাটা যে-সকল চেক তাহাদের আমানতকারীদের নিকট হইতে পাইয়াছে তাহা লইয়া ক্লিয়ারিং হাউসে হাজির হয়। তারপর প্রত্যেকে তাহার দাবি পেশ করে। সকলের দাবি পেশ হইলে পর দেখা হয় যে দেনাপাওনার কতটা কাটাকাটি হইয়াছে। দেনা-পাওনার সম্পূর্ণ কাটাকাটি না হওয়াই সম্ভব। যদি না হয় তবে যে-ব্যাংকের কিছু দেনা থাকিয়া যায় সেই ব্যাংক ক্লিয়ারিং হাউসের তত্ত্বাবধায়ক-হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে দেনার পরিমাণ একখানি চেক কাটে, অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট যে টাকা জমা থাকে তাহা হইতে ঐ দেনা মিটাইয়া দেয়। এইভাবে ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থার ফলে আমানত সহজেই এক ব্যাংক হইতে অপর ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়। নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হয় না।

ক্লিয়ারিং হাউসের কার্য পরিচালনা

ক্লিয়ারিং হাউসের কার্যপদ্ধতি হইতেই উহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। বড় বড় সহরে লেনদেন কার্যের একটা মোটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে ব্যাংকগুলিতে প্রত্যহ শত শত চেক জমা পড়ে। এই সকল চেকের দরুন পাওনা আদায় করার জন্য ব্যাংকগুলিকে যদি প্রত্যেকবারই লোক পাঠাইতে হইত তবে নানারূপ অসুবিধা হইত এবং কাজকারবারের গতিও মন্থর হইত। যে ব্যক্তি আজ চেক জমা দিয়া পরের দিন টাকা তুলিতে মনস্থ করিত তাহাকে হয়ত শুনিতে হইত যে, সময়মত লোক পাঠানো যায় নাই বলিয়া চেকের টাকা আদায় হয় নাই। আবার প্রতিবারেই অপর ব্যাংক হইতে লোক আসিলে খাতা খুলিতে হইত এবং ব্যাংকার্স ড্রাফ্ট প্রদান করিতে হইত। ক্লিয়ারিং হাউস থাকার ফলে এই অসুবিধার কোনটিই অনুভূত হয় না এবং কর্মব্যস্ত সহরে কাজকারবার ভালভাবেই চলে।

ক্লিয়ারিং হাউসের উপযোগিতা

---

* ১৬৭ এবং ১৭৪ পৃষ্ঠা।

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা (The Indian Banking System) : ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে ব্যাংক-ব্যবস্থা পাশ্চাত্য ও দেশীয় উভয় পদ্ধতিতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাংকগুলি হইল : (ক) রিজার্ভ ব্যাংক, (খ) ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, (গ) যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহ, এবং (ঘ) বিনিময় ব্যাংকসমূহ। দেশীয় পদ্ধতিতে যাহারা ব্যাংক-ব্যবসায় করে তাহারা দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers) নামে পরিচিত। ইহা ছাড়া সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাংক, পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাংক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ব্যাংক আছে।

ভারতীয় ব্যাংকগুলি দুইটি পদ্ধতিতে পরিচালিত

রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India) : 'রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইহা ১৯৩৪ সালের আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে ইহা অংশীদারগণের ব্যাংক ছিল; ১৯৪৯ সালে ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পূর্বে ইহার মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। এখন মূলধনের পরিমাণ ঐ একই আছে, তবে সমগ্রটার মালিক হইল রাষ্ট্র।

ইহাই ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

রিজার্ভ ব্যাংকের কার্য পরিচালনার ভার একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। বোর্ডের সভাপতিকে গভর্ণর বলা হয়। ব্যাংকের সদর কার্যালয় বা কেন্দ্রীয় বোর্ড বোম্বাই-এ অবস্থিত। কেন্দ্রীয় বোর্ড ছাড়াও কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নূতন দিল্লীতে চারিটি স্থানীয় বোর্ড আছে। ব্যাংকের নীতি-নির্ধারণ করে অবশ্য ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ডসমূহকে ভারত সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

পরিচালনা

রিজার্ভ ব্যাংক মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত—(ক) নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department), এবং (খ) ব্যাংকিং বিভাগ (Banking Department)। ব্যাংকিং বিভাগের কয়েকটি উপবিভাগ আছে—যথা, কৃষি-ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department), বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Department of Exchange Control), ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ (Department of Banking Operations), ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ (Department of Banking Development), পরিদর্শন বিভাগ (Inspection Department) এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ (Industrial Finance Department)। ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ এবং পরিদর্শন বিভাগ অন্যান্য ব্যাংকের পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

গঠন

রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলিয়া ইহা স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকে।

কার্যাবলীও অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই অনুরূপ

(১) নোট প্রচলন : রিজার্ভ ব্যাংক নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকারী ; ইহা এক টাকার নোট ছাড়া অন্য সমস্ত নোটই প্রচলন করিয়া থাকে। বর্তমানের আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার মত স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিয়া যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে পারে।

(২) সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের ব্যাংক সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদিত হয় রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে। এই সকল সরকারের টাকাকড়ি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক সরকারী ঋণ পরিচালনা করে, প্রয়োজনমত সরকারের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে, সরকারকে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদান করে এবং বিদেশে ভারত সরকারের এজেন্ট হিসাবে কার্য করে।

(৩) টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষা : টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষার ভার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পিত। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে নির্দিষ্ট হারে পাউণ্ড, ডলার প্রভৃতি বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়।

(৪) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কার্য : রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সকল তপশীলী বাণিজ্যিক ও বিনিময় ব্যাংককে তাহাদের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। ইচ্ছা করিলে রিজার্ভ ব্যাংক যে এই জমার পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ৫ গুণ বা শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।* তপশীলী ব্যাংকগুলিকে (Scheduled Banks) আবার রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ প্রদান করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে ঐ সকল ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ, পুনর্বাট্টা** প্রভৃতির সুবিধাও ভোগ করে।

(৫) কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত কার্য : রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ বিভাগের কার্য হইল কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায় সমিতির প্রসার ও সুসংগঠন, তাহাদের ঋণ প্রদান করা ইত্যাদির মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্যসাধন করিবার প্রচেষ্টা করে।

(৬) ঋণ ও ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ : ইহাই রিজার্ভ ব্যাংকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ইহা সুদের হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে কারবার, জমার অনুপাতের পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহা যে-কোন ব্যাংককে উপদেশ, নির্দেশ ও আদেশ প্রদান করিতে পারে। ইহার এই নির্দেশ ও আদেশ প্রদানের ক্ষমতা বিভিন্ন সংশোধনসহ ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) হইতে প্রাপ্ত।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ রিজার্ভ ব্যাংকের এলাকাধীন নহে

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের এলাকাধীন নহে। ফলে ভারতের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে নাই।

---

* ১৭৭ পৃষ্ঠা। ** ১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India)ঃ পূর্বে এই ব্যাংকের নাম ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাংক (Imperial Bank of India)। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ছিল ভারতের বৃহত্তম যৌথ পুঁজি ব্যাংক। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক।

পূর্বে ইহা ইম্পিরিয়াল ব্যাংক নামে অভিহিত ছিল

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পূর্বের ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বাণিজ্যিক কার্যই সম্পাদন করে। উপরন্তু, ইহার উপর গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা (rural credit system) সুসংগঠিত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইহা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন শাখা খুলিতেছে, অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (remittance facilities) দান করিতেছে এবং গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা করিতেছে।

কার্যাবলী

অনেক স্থলে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবেও কার্য করে।

যৌথ পুঁজি ব্যাংক (Joint Stock Banks)ঃ ভারতের কোম্পানী আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত এই সকল ব্যাংক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সকল প্রকার বাণিজ্যিক কার্যই সম্পাদন করে। এইজন্য ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বলিয়াও অভিহিত। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) তপশীলভুক্ত বা তপশীলী (scheduled), এবং (খ) তপশীল-বহির্ভূত (non-scheduled)। রিজার্ভ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংকগুলির একটি তালিকা বা তপশীল রক্ষা করে; এবং এই তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিই তপশীলী ব্যাংক নামে পরিচিত।

ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংক নামেও অভিহিত

তপশীলী ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক

তপশীলভুক্ত হইবার জন্য ব্যাংকের মলধন (আমানত নহে) ৫ লক্ষ টাকা হইবার প্রয়োজন হয়। তপশীলী ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে কয়েকটি সুবিধা পায়। ইহার পরিবর্তে তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে তাহাদের আমানতের অনুরূপ অংশ হয় নিজেদের নিকট নগদ টাকাকড়িতে না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।

বর্তমানে ভারতে ৩৪৫-এর মত উল্লেখযোগ্য যৌথ পুঁজি ব্যাংক আছে। ইহার মধ্যে তপশীলী ব্যাংকের (বিনিময় ব্যাংক বাদ দিয়া) সংখ্যা হইল ৬৮।* সেণ্ট্রাল ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ ব্যাংক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া—এই কয়টিই বড় বড় যৌথ পুঁজি ব্যাংক।

কয়েকটি যৌথ পুঁজি ব্যাংক

---

* পূর্বে সংখ্যা আরও অনেক বেশী ছিল। এখন সংযুক্তিকরণের (amalgamation) ফলে সংখ্যা কমিয়া ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে।

বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks): বিনিময় ব্যাংকগুলিও তপশীলী যৌথ পুঁজি ব্যাংক। তবে দুইটি কারণে ইহাদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়: (১) ইহাদের মালিকানা সম্পূর্ণ বিদেশী; (২) বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসাহায্য এবং মুদ্রা বিনিময় ইহাদের কার্য। মালিকানা বিদেশী বলিয়া ইহাদিগকে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকও (Foreign Exchange Banks) বলা হয়।

বিনিময় ব্যাংক ও যৌথ পুঁজি ব্যাংক

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) যাহাদের ব্যবসায়ের বৃহত্তর অংশ ভারতে সীমাবদ্ধ; এবং (খ) যাহারা বৃহৎ বৈদেশিক ব্যাংকের ভারতীয় শাখামাত্র। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক (National Bank of India), মারক্যান্‌টাইল ব্যাংক (Mercantile Bank of India), চার্টার্ড ব্যাংক (Chartered

দুই শ্রেণীর বিনিময় ব্যাংক

ভারতের বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক
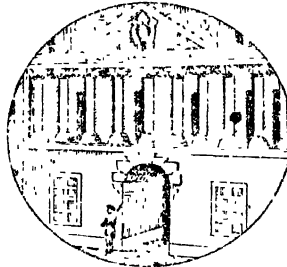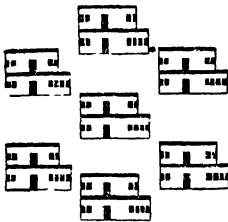
রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
রিজার্ভ ব্যাংক
পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক
বিনিময় ব্যাংক
দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী
যৌথ পুঁজি ব্যাংক
সমবায় ব্যাংক
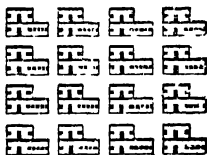
Bank) ইত্যাদিই প্রধান। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে আছে লয়েডস্ ব্যাংক (Lloyds Bank), ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক অফ্ নিউ ইয়র্ক (National City Bank of New York), ইত্যাদি।

বহির্বাণিজ্যে অর্থসাহায্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় বিনিময় ব্যাংকগুলির প্রধান কার্য হইলেও ইহারা উত্তরোত্তর অন্তর্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতেছে।

কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্য—যথা, আমানত গ্রহণ ঋণপ্রদান ইত্যাদিও সম্পাদন করিতেছে। ১৯৬৩ সালের মধ্যভাগে উহাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৫।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ (Indigenous Bankers): মহাজন, সাউকর, শ্রেষ্ঠী, স্রফ্ প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ এই পর্যায়ভুক্ত। ইংরাজদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই ইহারা সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। ঋণপ্রদান, হুণ্ডি লইয়া কারবার, আমানত গ্রহণ, সোনারূপার ব্যবসায়, মালমজুত প্রভৃতি দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ের অংগীভূত।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী কাহাদের বলে

ইহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃতি

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সকল ব্যাংক-ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবসায়ের বহির্ভূত কাজকারবারও করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহারা রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীন নহে।

সংক্ষিপ্তসার

ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য: সভ্য জগতে কাজকারবারের একটা মোটা অংশ ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঋণ বলিতে মোটামুটি বিশ্বাস এবং ঋণের কারবার বলিতে বিশ্বাসের কারবার বুঝায়। পারস্পরিক বিশ্বাসই ঋণের মূলভিত্তি। ইহা ছাড়াও প্রত্যেকটি ঋণের সহিত সময়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। অতএব, ঋণ বা ঋণের কারবারের দুইটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে পারা যায়—(ক) বিশ্বাস, এবং (খ) সময়।

ঋণপত্র: ঋণপরিশোধের প্রতিশ্রুতি লিখিত ও মৌখিক উভয়ই হইতে পারে। লিখিত প্রতিশ্রুতি পত্রাকারে আবদ্ধ হইলে উহাকে ঋণপত্র বলা হয়। ঋণপত্র হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন উভয়ই হইতে পারে। তবে বর্তমানে হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্রেরই প্রচলন অধিক। ইহাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল: (ক) প্রতিশ্রুতিপত্র, (খ) চেক, (গ) হুণ্ডি, এবং (ঘ) তমসুক। চেক বিভিন্ন রকমের হয় এবং হুণ্ডি অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় বিশেষ উপযোগী।

ব্যাংক: ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে: (ক) বণিকদের ব্যবসায়, (খ) মহাজনদের ব্যবসায়, এবং (গ) স্বর্ণকারদের ব্যবসায়।

ব্যাংক-ব্যবসায়কে ঋণের ব্যবসায় বলা হয়। বিশ্বাসই এই কারবারের ভিত্তি; ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করিয়া ঐ অর্থ ব্যক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্যকে ঋণ দেয়।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা: ব্যাংক দেশের সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করে; শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে; টাকাকড়ির সৃষ্টি করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করে; আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে; এবং অন্যান্যভাবেও ইহা দেশের শিল্পবাণিজ্যে সহায়তা করে।

ব্যাংকের কার্যাবলী : বলা যায়, ব্যাংকের কার্যাবলী চারি প্রকারের—১। সঞ্চয়সংগ্রহ, ২। ঋণ ও বিনিয়োগ, ৩। টাকাকড়ির সৃজন, এবং ৪। অন্যান্য কার্য। ব্যাংক সঞ্চয়সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার আমানতের মাধ্যমে এবং টাকাকড়ি সৃজন করে আমানত সৃজন করিয়া। দেশের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা তাহাদের প্রাপ্ত আমানতের কয়েক গুণ পর্যন্ত আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক : বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (ঙ) জমিবন্ধকী ব্যাংক, এবং (চ) সমবায় ব্যাংকই প্রধান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক সমাজের সমাজপতি। ইহার কার্যাবলীর মধ্যে ১। নোট প্রচলন, ২। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, ৩। টাকাকড়ির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা, ৪। অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, ৫। সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, এবং ৬। মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখা—এই কয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থ-ব্যবস্থার ভালমন্দের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকাংশে দায়ী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রিত করে। ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহা পাঁচটি পন্থা অবলম্বন করিতে পারে—১। নৈতিক প্রণোদন, ২। সুদের হারে পরিবর্তন, ৩। খোলা বাজারে কারবার, ৪। জমার অনুপাতে পরিবর্তন, এবং ৫। ঋণ-বরাদ্দ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া ব্যক্তি ও শিল্পবাণিজ্যকে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক যৌথ মূলধনী ব্যাংক নামেও পরিচিত।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের জন্য বিনিময় ব্যাংক, শিল্পবাণিজ্যকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য শিল্প ব্যাংক, জমিবন্ধকী কাযের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় ঋণপ্রদানের জন্য সমবায় ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ক্লিয়ারিং হাউস : প্রত্যেক বড় বড় সহরে ব্যাংকগুলির পারস্পরিক প্রাত্যহিক দেনাপাওনা মিটানোর জন্য একটি করিয়া সংগঠন থাকে। ইহাকে 'ক্লিয়ারিং হাউস' বলা হয়। এই ক্লিয়ারিং হাউসের জন্য কর্মব্যস্ত সহরে লেনদেনের কাজকারবার সুশৃংখলভাবে চলে।

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা : ভারতে উপরি-উক্ত ধরনের অধিকাংশ ব্যাংকই আছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইল রিজার্ভ ব্যাংক। রিজার্ভ ব্যাংকের পর আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। পূর্বে ইহা ইম্পিরিয়াল ব্যাংক নামে পরিচিত ছিল। যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি দুই শ্রেণীভুক্ত—তপশীলী ও তপশীল-বহির্ভূত। ভারতের বিনিময় ব্যাংকগুলি বিদেশী মালিকানাধীন। ইহা ছাড়াও গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনাকারী দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ আছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define Credit. Indicate its characteristics.

ঋণের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও।

2. What are Credit Instruments? Describe them and indicate their utility.

ঋণপত্র কাহাকে বলে? উহাদের বর্ণনা কর এবং উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর।

3. What is a Bank? What are its services to society for which you consider it useful?

ব্যাংক কাহাকে বলে? যে-সকল উপায়ে ব্যাংক সমাজের উপকার করে তাহাদের ব্যাখ্যা কর।

4. What are the functions of Banking? Carefully explain their importance in modern business.

ব্যাংক-ব্যবসায়ের কার্যাবলী কি কি? বর্তমান ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে উহাদের গুরুত্ব কতটা তাহা দেখাও।

5. Describe the functions of a bank. What are the advantages of a good banking system ?

কোন ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর। সুসংগঠিত ব্যাংক-ব্যবস্থার সুবিধা কি কি ?

6. What are the functions of banks ? How are these functions beneficial to the people in a country ?

ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি ? এই সকল কার্যে দেশের লোকের কিভাবে উপকার হয় ?

7. What are the functions of banks ? Do banks create Money ?

ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি ? ব্যাংকগুলি কি টাকাকড়ি সৃজন করে ?

8. In what ways is a bank useful to us ? Why do we require a Central Bank ?

কিভাবে ব্যাংক আমাদের উপকার সাধন করে ? দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন হয় কেন ?

9. Explain the functions of Central Banks.

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।

10. State and explain the functions of a Central Bank in a modern banking organisation.

বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

11. State the functions of Commercial Banks in India.

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কার্যাবলী বর্ণনা কর।

12. Give a brief description of the Indian Banking System.

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

13. Write a note on the Clearing House System.

ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থার উপর একটি টীকা রচনা কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়

(Different Types of Factor Incomes)

আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি—(ক) জমি, (খ) শ্রম, (গ) মূলধন, এবং (ঘ) সংগঠন। ইহারাই পারস্পরিক সহযোগিতায় জাতীয় আয় সৃষ্টি করে; এবং নীট জাতীয় আয় ইহাদের মধ্যে খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয়। এই কর্মগত বণ্টনই অর্থবিদ্যায় বণ্টন (Distribution) বলিয়া অভিহিত; এবং খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (Factor Incomes) বলা হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন
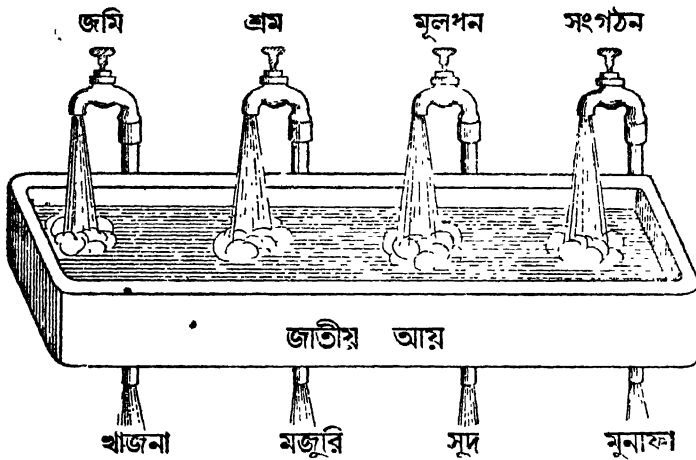
কিভাবে নীট জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়? (How is Net National Income distributed among the Factors of Production?): নীট জাতীয় আয়কে লভ্যাংশ বা বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয় (National Dividend) বলা হয়। নীট জাতীয় আয়ের যে যে অংশ উৎপাদনের উপাদানসমূহ পাইয়া থাকে তাহা উহাদের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য দাম ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য জমির দাম হইল খাজনা, শ্রমের দাম মজুরি, মূলধনের দাম সুদ এবং সংগঠন-নৈপুণ্যের দাম মুনাফা। সুতরাং সাধারণ দাম যেভাবে নির্ধারিত হয়, ইহারাও সেইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা সৃষ্টি করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দেয় উহার মালিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত উৎপাদনের উপাদানসমূহের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান কতকটা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, চাহিদা কমিলে জমির যোগানের হ্রাসও ঘটে না এবং শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে যোগানবৃদ্ধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহার উপর সরবরাহকারীর বিশেষ হাত থাকে না। মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আয়, দেশের শান্তিশৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা ও যোগান

তবুও বলা যায়, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প (Industry) ও বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের (Firm)* মধ্যে পরিবর্তনশীল। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা বিদ্যুৎ সরবরাহ বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে চাহিদামত যোগান দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প যদি কয়লার দাম কম দেয় তবে উহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই যোগান দেওয়া হইবে। আবার বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেশী দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই কয়লা যোগান দেওয়া হইবে।

উৎপাদনের উপাদানের দাম প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

চাহিদার দিক হইতে অবশ্য সাধারণ দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার-দামের সমান না হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলে, উৎপাদকও তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Product) উহার দামের সমান না হওয়া পর্যন্ত উহা নিয়োগ করিয়া চলে।

ধরা যাউক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই ১০০ জন শ্রমিকের জন্য যে মোট উৎপাদন হয় তাহা হইতে ৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ইহা ৫০ টাকা হইলে ১০০ জন শ্রমিককেই যদি নিযুক্ত রাখিতে হয় তবে নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৫০ টাকার বেশী মজুরি দিতে পারে না। ১০০-এর উপর যদি আরও ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদন (ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইলে) ৫০ টাকারও কম হইবে। সুতরাং সকল শ্রমিকেরই মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রমিক কম মজুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি না হইবে তাহা নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার উপর। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক যদি ৫০ টাকা পায় তবে সে ৫০ টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না। তেমনি মূলধন-মালিকও যে-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সুদ দিতে চাহিবে তাহাকে মূলধন যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে না। এইভাবে নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরস্পরের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি যন্ত্রের পরিবর্তে দুইজন শ্রমিক নিয়োগ অথবা দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যন্ত্র বসানো যাইতে পারে। এই কারণে মূলধনের যোগান-দাম (Supply Price) অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে সংগঠক অধিক শ্রমিক নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম অনুরূপ

* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশেষ বিশেষ শিল্পের এক একটি প্রতিষ্ঠানকে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বলা হয়—যেমন, একটি পাটকল একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু সকল পাটকল মিলাইয়া হইল পাটকল শিল্প।

হইলে সংগঠক যন্ত্র বসাইতে (মূলধন নিয়োগ) আগ্রহান্বিত হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপাদানেরই প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে।

এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিবে। ভারসাম্য অবস্থায় (১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের (employment) ক্ষেত্রেই এক হইবে; (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে; এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার দামের সমান হইবে। ইহাই কর্মগত বণ্টনের তত্ত্ব। ইহা চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের চাহিদা ও যোগান সমান হইয়া ভারসাম্য সৃষ্টি করে

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টিত হয়। এই বণ্টিত জাতীয় আয়ই 'উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়' এবং এইরূপ বণ্টন 'কর্মগত বণ্টন' বলিয়া অভিহিত।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় উপাদানের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার দিক দিয়া ইহা উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়। আবার বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনও পরস্পরের সমান হয়। ভারসাম্য অবস্থায়—যেখানে উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়—(১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে এক হয়, (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়, এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার আয় বা দামের সমান হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. **What are the general principles for determining the rate of remuneration of a factor of production ?**

কি নীতি অনুসারে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় নির্ধারিত হয়?

2. **What is meant by Functional Distribution ? Briefly describe the general Theory of Distribution.**

কর্মগত বণ্টন বলিতে কি বুঝায়? সাধারণ বণ্টনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[ইংগিত: সাধারণ বণ্টনতত্ত্ব বলিতে 'কর্মগত বণ্টন' বুঝায়।...১৮৬-১৮৯ পৃষ্ঠা]

3. **What are Factor Incomes ? Briefly discuss the principles according to which Factor Incomes are determined.**

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বলিতে কি বুঝায়? যে নীতি অনুসারে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

খাজনা

(Rent)

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনা (Contract Rent and Economic Rent) : জমিজায়গা ব্যবহারের জন্য বৎসরান্তে জমির মালিককে যে অর্থ বা ভাড়া দেওয়া হয় সাধারণ ভাষায় তাহাকেই খাজনা বলে। অর্থবিদ্যায় এই খাজনা 'চুক্তি অনুযায়ী খাজনা' (Contract Rent) নামে অভিহিত। চুক্তি অনুযায়ী খাজনা লইয়া অর্থবিদ্যায় আলোচনা করা হয় না। অর্থবিদ্যার আলোচ্য খাজনাকে 'অর্থনৈতিক খাজনা' (Economic Rent) বলা হয়। অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন যে-আয় হয় তাহাকে বুঝায়। জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং শুধু জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে-আয় হয় তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা।* জমির উপর ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ থাকিলে উহাদের জন্য দেয় অর্থ অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সকল ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ মূলধন ব্যতীত কিছুই নয় ; সুতরাং উহাদের দরুন যে অর্থ প্রদান করা হয় তাহাকে সুদ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে, খাজনা হিসাবে নহে। দ্বিতীয়ত, জমি ভাড়া দিয়াও মালিক কিছু কিছু তদারককার্য করিতে পারে এবং ইহার দরুনও সে কিছু অর্থ আদায় করিতে পারে। ইহাও অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ ইহা পারিশ্রমিক বা মজুরি হিসাবে গণ্য। এইভাবে চুক্তি অনুযায়ী বা মোট (gross) খাজনা হইতে সুদ, মজুরি প্রভৃতি বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা।

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা কাহাকে বলে

অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক খাজনা লইয়া আলোচনা করা হয়

অর্থনৈতিক খাজনা কাহাকে বলে

অর্থনৈতিক খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' (Producers' Surplus) এই আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের (স্বাভাবিক মুনাফা ধরিয়া) অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। কোন জমি হইতে যদি ১০০ টাকার ফসল পাওয়া যায় এবং ঐ জমি চাষ করার দরুন মোট ৯০ টাকা ব্যয় হয় তবে ১০ টাকা হইল অর্থনৈতিক খাজনা। বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ঐ জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে কৃষকের বীজ সার গরু-লাঙল প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হইয়াছে ৫০ টাকা, সে নিজের পরিশ্রমের

অর্থনৈতিক খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত

* প্রতিভাবান শ্রমিক বা সংগঠকের যোগানও সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রতিভার দরুন যদি কোন শ্রমিক বা সংগঠক অন্যান্য শ্রমিক বা সংগঠক অপেক্ষা কিছু বেশী পায় তবে ঐ অতিরিক্ত প্রাপ্তিকে অর্থনৈতিক খাজনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দাম ধরিয়াছে ৩০ টাকা এবং মুনাফা* বাবদ ধরিয়াছে ১০ টাকা। তাহা হইলে মোট উৎপাদন-ব্যয় দাঁড়ায় (৫০+৩০+১০=) ৯০ টাকা; কিন্তু ফসল বিক্রয় হইয়াছে ১০০ টাকার। এই (১০০−৯০=) ১০ টাকা হইল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। কৃষক ইহা মজুরি হিসাবে লইতে পারে না, মুনাফা বলিয়াও দাবি করিতে পারে না। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ জমিরই দান; ফলে ইহা জমির মালিকের নিকটই যাইবে। কৃষক যদি নিজে জমির মালিক হয় তবে সে নিজেই ইহা গ্রহণ করিবে; অপর কেহ মালিক হইলে তাহাকে দিতে হইবে। কৃষক জমির মালিককে উদ্বৃত্ত টাকা দিতে রাজী না হইলে মালিক হয় নিজেই চাষের ব্যবস্থা করিবে, না-হয় ঐ জমি অপর একজনকে বন্দোবস্ত দিবে।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব (Ricardo's Theory of Rent): অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় কেন, এ-সম্বন্ধে প্রথম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন বিখ্যাত অর্থবিত্তাবিদ ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর তত্ত্বের সংশোধিত রূপই বর্তমানের স্বীকৃত খাজনাতত্ত্ব (Theory of Rent)।

রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দেয় অর্থই খাজনা। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে—(ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য, এবং (গ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য একটিমাত্র জমি হইতে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না; সুতরাং প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জমি চাষ করিবার। কিন্তু সকল জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নহে বলিয়া একই ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের পরিমাণই হইল অধিক উর্বর জমির খাজনা।

রিকার্ডোর তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বর্তমানে দণ্ডকারণ্যে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চলিতেছে। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে গিয়া বসবাস করিতে বিশেষ চাহিতেছে না। যাহা হউক, দণ্ডকারণ্য পরিষ্কার করিয়া বহু পরিমাণ জমিকে চাষযোগ্য করা হইল এবং কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং প্রথম প্রথম তাহাদের বিনা খাজনায় জমি চাষ করিতে দেওয়া হইল। এই সকল উদ্বাস্তু গিয়া প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য সুরু করিবে। ভাল জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হওয়ার জন্য কেহই কোন খাজনা দিবে না; এবং ঐ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্প-সংখ্যক উদ্বাস্তুর জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

* স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।...১১০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ।

এই প্রথম দল উদ্বাস্তু যদি দণ্ডকারণ্যে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকে তবে আরও উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিবে। প্রথম দল উদ্বাস্তুর মধ্যে জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে ক্রমে এমন একদিন আসিবে যখন প্রথম শ্রেণীর বা সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আর পড়িয়া থাকিবে না। তখন লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলেও উৎপাদন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হইবে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি বিঘা প্রতি ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ২৫ কুইণ্টাল শস্য উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে বিঘা প্রতি ঐ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত ২০ কুইণ্টাল শস্য উৎপন্ন হইবে। এ-ক্ষেত্রে (২৫ কুইণ্টাল − ২০ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল শস্য হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা। সরকার সুযোগ বুঝিয়া প্রথম শ্রেণীর জমির মালিকদের নিকট হইতে এ-খাজনা আদায় করিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কিন্তু এই সময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না। কারণ, উহা হইতে উৎপন্ন ফসলের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হয়—কোনই উদ্বৃত্ত থাকে না। আমাদের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১০০ টাকা করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রতি কুইণ্টাল ফসলের দাম যদি ৫ টাকা করিয়া হয় তবে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে ১২৫ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১০০ টাকা করিয়া পাওয়া যাইবে। ১০০ টাকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কৃষক খাজনা হিসাবে কিছুই দিতে পারিবে না। জোর করিয়া কিছু আদায় করা হইলে সে ঐ শ্রেণীর জমি চাষ করা ছাড়িয়া দিবে; এবং প্রয়োজন হইলে দণ্ডকারণ্য হইতে সে আবার পশ্চিমবংগে ফিরিয়া আসিবে।

প্রান্তিক জমি

এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়—কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, রিকার্ডো তাহাদিগকে 'নিকৃষ্ট জমি' (Inferior Land) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে উহাদিগকে 'প্রান্তিক জমি' (Marginal Land) বলা হয়।

দণ্ডকারণ্যে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে। তখন লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুঁকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার দাম ঠিক ১০০ টাকা—অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। এখন এই তৃতীয় শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইণ্টাল − ১৫ কুইণ্টাল =) ১০ কুইণ্টাল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২০ কুইণ্টাল − ১৫ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল। এই ১০ কুইণ্টাল ও ৫ কুইণ্টাল

হইল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির বিঘা প্রতি খাজনা। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা ৫ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ১০ কুইণ্টালে দাঁড়াইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে খাজনার সমস্তটাই ঐখানকার জমির মালিক সরকারের হস্তে যাইবে। আর সরকার যদি অর্থনৈতিক খাজনার অতিরিক্ত দাবি করে তবে উদ্বাস্তু বাঙালী আবার পশ্চিমবংগ অভিমুখে যাত্রা করিবে।

১নং জমি ২নং জমি ৩নং জমি

সমালোচনা: তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন উর্বরতাসম্পন্ন জমির উৎপাদনে যে পার্থক্য তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। রিকার্ডোর আর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে খাজনা দামের অংগীভূত নহে, কারণ চাহিদাবৃদ্ধির ফলে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার জন্যই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে এবং এই কারণেই প্রান্তিক জমির উপর কোন খাজনা দেওয়া হয় না।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ রিকার্ডোর উপরি-উক্ত তত্ত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার কতকগুলি বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত,

সমালোচনা:
১। জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই

বলা হয় যে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই। নিয়মিত কৃষিকার্যের ফলে জমির উর্বরতা-শক্তি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অপরদিকে মানুষ সার প্রয়োগ, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

২। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্যও খাজনার উদ্ভব হয়

দ্বিতীয়ত, শুধু বিভিন্ন জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্য হেতুই খাজনার উদ্ভব হয় না; একই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার ফলেও ইহা হইতে পারে।

তৃতীয়ত, রিকার্ডো যে প্রান্তিক জমির কল্পনা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত। কোন জমি কোন বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলে উহা প্রান্তিক

বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহা অন্য এক কার্যে ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর উদ্বৃত্ত বা খাজনার সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। কোন জমিতে ধান্য উৎপন্ন হইলে উহাতে মাত্র উৎপাদন-ব্যয় পোষাইতে পারে, কিন্তু গম উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় কুলাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে।

৩। প্রান্তিক জমির কল্পনা ভুল

পরিশেষে, খাজনা দামের অংগীভূত নহে বলিয়া রিকার্ডোর যে-অভিমত, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহারও বিরোধিতা করেন। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

৪। খাজনা দামের অংগীভূত হইতে পারে

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব (Final or Modern Theory of Rent): রিকার্ডোর মতবাদের সংশোধিত রূপই চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব। সংক্ষেপে ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়: খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনের উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার জন্যই ইহার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে যোগান প্রকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট এবং জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন বলিয়া উৎপাদকের উদ্বৃত্তের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে লোকে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে পারে, অথবা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করিতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ভর করে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির হার ও নিকৃষ্ট জমির উৎপন্নের হারের পার্থক্যের উপর। শ্রম ও মূলধন বাবদ ১০০ টাকা একই জমিতে দ্বিতীয়বার নিয়োগ করা হইলে যদি ২০ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ঐ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে নিয়োগ করিলে যদি ১৮ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় তবে কৃষক প্রথম পন্থাই অবলম্বন করিবে। এ-ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ২৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হইলে, দ্বিতীয় দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে প্রথমবারের দরুন উদ্বৃত্ত হইবে (২৫ কুইণ্টাল—২০ কুইণ্টাল=) ৫ কুইণ্টাল ফসল। ইহাই এই জমির খাজনা, তাহা কৃষক বা জমির মালিক যে-কেহই করুক না কেন।

উৎপাদনের উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Price): রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা দামের অংগীভূত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। দাম বৃদ্ধি পাইলেই নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করা হয়। ইহাকে ব্যাপক কৃষিকার্য বলে। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার উদ্ভব হয় এবং ক্রমশ ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দামবৃদ্ধির ফলেই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে

আধুনিক অর্থবিজ্ঞাবিদগণ বলেন, খাজনা দামের অংগীভূত হয় না—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করাও সর্বাবস্থায় ঠিক নয়। জমি নানা কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া একটি উৎপাদনক্ষেত্র হইতে সরাইয়া উহাকে অন্য উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত করিলে দাম বাবদ কিছু দিতে হয়। এই দামই খাজনা এবং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলে ইহা দামের অংগীভূত হয়। প্রকৃত-পক্ষে, দাম চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া, জমির যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে কোন উৎপাদন-কার্যে উহাকে ব্যবহার করার জন্য সংগঠককে উহার দাম দিতেই হইবে। এই দাম সে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম হইতে উহার সংকুলানের ব্যবস্থা করিবে। যেমন, কৃষক যদি কোন জমি হইতে ১০০ টাকার ফসল পায়, তবে তাহাকে উহার মধ্য হইতেই খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত উৎপাদকের দিক হইতে খাজনাকে দামের অংগীভূত হইতে দেখা যায়।

খাজনা দামের অংগীভূতও হয়

খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Population)ঃ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশ ব্যাপক অথবা আত্যন্তিক কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়।* উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম হারে ঘটিতে থাকে। সুতরাং উৎপাদকের উদ্বৃত্তের উদ্ভব হয়। জনসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্তের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়

সংক্ষিপ্তসার

খাজনা দুই রকমের হইতে পারে—(ক) চুক্তি অনুযায়ী খাজনা, এবং (খ) অর্থনৈতিক খাজনা। অর্থবিজ্ঞায় অর্থনৈতিক খাজনা লইয়াই আলোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক খাজনা হইল 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত'। উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলিতে মোট উৎপন্ন হইতে উৎপাদন-ব্যয় (স্বাভাবিক মুনাফা সমেত) বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহাকে বুঝায়।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্বঃ খাজনাতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যা করেন রিকার্ডো। রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দেয় অর্থই খাজনা। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণেঃ (১) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (২) বিভিন্ন জমির উর্বরতাশক্তিতে পার্থক্য, এবং (৩) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য সমাজকে বিভিন্ন জমি চাষ করিতে হয়; ফলে দেখা যায়—উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য। এই পার্থক্যের পরিমাণই খাজনা।

উদাহরণের সাহায্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমে যখন জনসংখ্যা পরিমিত এবং খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা স্বল্প থাকে তখন সর্বোৎকৃষ্ট জমিই চাষ করা হয়। পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কৃষির অধীনে আনয়ন করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে 'উদ্বৃত্ত' বা খাজনার উদ্ভব হয়। যে-জমিতে কোন উদ্বৃত্ত থাকে না তাহাকে প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলে। রিকার্ডোর মতে, খাজনা দামের অংগীভূত নহে।

---

* ৪৫ পৃষ্ঠা।

নানাভাবে রিকার্ডোর তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল (১) জমির মৌলিক বা অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই; (২) মাত্র বিভিন্ন জমি চাষ করিলেই খাজনার উদ্ভব হয় না, একই জমিতেও খাজনা উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; (৩) প্রান্তিক জমির কল্পনা ভুল; এবং (৪) কয়েক ক্ষেত্রে খাজনা দামের অংগীভূত হইতে পারে।

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব: এই সমালোচনার ভিত্তিতে যে চূড়ান্ত খাজনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা অনুসারে উৎপাদনের উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি এই সীমাবদ্ধতারই একটি দিক।

খাজনা ও দাম: দামবৃদ্ধির ফলে খাজনার উদ্ভব হয় ও বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং খাজনা দামের অংগীভূত নহে। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক দিয়া ইহা অংগীভূত হয়।

খাজনা ও জনসংখ্যা: জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between Contract Rent and Economic Rent. Show how Economic Rent originates.

চুক্তি অনুসারে খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় তাহা দেখাও।

2. Explain Ricardo's Theory of Rent. What is the effect of the pressure of population on Rent?

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। খাজনার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির কি ফল দেখা যায়?

3. Discuss the origin and significance of Rent.

খাজনার উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[ইংগিত: খাজনার প্রকৃতি বলিতে অর্থনৈতিক-খাজনার প্রকৃতি বুঝায়।...... ১৯১-১৯৪ পৃষ্ঠা]

4. Examine the connection between Rent and Price.

খাজনা ও দ্রব্যের দামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [১৯১-১৯৪ এবং ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা]

5. Explain the nature of 'Economic Rent'. Does rent enter into the price of a commodity?

'অর্থনৈতিক খাজনা'র প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। খাজনা কি দ্রব্যের দামের অন্তর্ভুক্ত হয়?

[১৯০-১৯১ এবং ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা]

6. Define 'Economic Rent'. Indicate the effect of the pressure of population on rent.

'অর্থনৈতিক খাজনা'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। খাজনার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির কি ফল হয়, তাহা দেখাও।

[১৯০-১৯১ এবং ১৯৫ পৃষ্ঠা]

7. Why is it necessary to pay rent on land, although land is a gift of nature?

জমি প্রকৃতির দান হইলেও জমি ব্যবহারের দরুন খাজনা দিতে হয় কেন?

[ইংগিত: জমি প্রকৃতির দান হইলেও জমির যোগান সীমাবদ্ধ। রিকার্ডোর ভাষায়, 'প্রকৃতির এই কৃপণতা'ই ('niggardliness of nature') হইল জমি হইতে খাজনার উদ্ভবের প্রকৃত কারণ। যদি উর্বর জমি অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা হইলে খাজনার উদ্ভব হইত না। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় খাজনার উদ্ভবের কারণ হইল তিনটি—(১) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (২) বিভিন্ন জমির মধ্যে উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য, এবং (৩) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা।... এবং ১৯১-১৯৪ পৃষ্ঠা]

ঊনবিংশ অধ্যায়

মজুরি

(Wages)

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real Wages) : উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের দাম বা মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। শ্রমিককে যে মাস-মাহিনা অথবা সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় তাহাই তাহার আর্থিক মজুরি। এই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক তাহার ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার মজুরি আংশিকভাবে টাকাকড়িতে এবং আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্রকৃত মজুরি। আর্থিক মজুরি স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হইতে পারে, কারণ শ্রমিক হয়ত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পায়, ইত্যাদি।

প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে আর্থিক মজুরি ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

অস্থায়ী চাকরির আর্থিক মজুরি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলে স্থায়ী চাকরির অল্প মজুরি শ্রেয়। ইহাতে প্রকৃত মজুরি অনেক বেশী। কারণ, অস্থায়ী চাকরির স্থায়িত্ব নাই বলিয়া শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে।

যে-সকল চাকরিতে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে (যেমন, শিক্ষকদের গৃহ-শিক্ষকতার কার্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা, টাইপিষ্টদের দৈনিক কার্যের পরে অন্যত্র কিছু উপরি-কাজ ইত্যাদি) সেই সকল চাকরিতে প্রকৃত মজুরি বেশী। ইহা ব্যতীত অনেক চাকরিতে অন্যরকম সুবিধাও দেওয়া হয়—যেমন, পূর্বোল্লিখিত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, পেনসন, পারিবারিক পেনসন ইত্যাদি নানা রকম সুবিধা দেওয়া হয়। ঐ সকল চাকরিতে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক।

অপ্রীতিকর কার্য বা আয়াসসাধ্য কার্যের—যথা, ইঞ্জিন-চালকের কার্যের আর্থিক মজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরি কম, কারণ তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিতে পারে না বলিয়া সারা জীবনে মোট উপার্জন কম করে।

প্রকৃত মজুরি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া জিনিসপত্রের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ৫ টাকা দিয়া যে ভোগ্যবস্তু ক্রয় করা যায় যুদ্ধের পূর্বে তাহা ১ টাকায় ক্রয় করা চলিত। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করিত তাহাদের প্রকৃত মজুরি বর্তমানে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অতএব, স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সংগে প্রকৃত মজুরি কমিতে বা বাড়িতে পারে।

প্রকৃত মজুরি বিশেষভাবে নির্ভর করে জিনিসপত্রের মূল্যস্তরের উপর

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মান তাহাদের আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির উপর। শ্রমিকদের অবস্থা ভাল কি মন্দ এবং তাহাদের মজুরি যথেষ্ট কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে দেখা দরকার তাহারা কি পরিমাণ সুযোগসুবিধা ও দ্রব্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ। শুধু আর্থিক মজুরির পরিমাণ দেখিয়া শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার বিচার করা চলে না।

প্রকৃত মজুরিই জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক

আবার জীবনযাত্রার মান ছাড়াও সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতির সুযোগ, সাফল্যের আশা, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে অর্থের মাপকাঠিতে যাহাদের পরিমাপ করা চলে না। প্রকৃত মজুরি নির্ধারণের সময় এগুলি সম্পর্কেও বিচার করিতে হইবে। কেন শ্রমিক অনেক ক্ষেত্রে অধিক মজুরির কাজ ছাড়িয়া অল্প মজুরির কাজই পছন্দ করে তাহার কারণও এই বিচারের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। মার্শালের ভাষায়, কোন বৃত্তির আকর্ষণ উহার আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উহার নীট সুবিধার (net advantages) উপর। অর্থাৎ, এক ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি যতটা বেশী অন্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তবে শ্রমিক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়োগের দিকেই ঝুঁকিবে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রকৃত মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

প্রকৃত মজুরিই শ্রমিককে আকর্ষণ করে

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Wages Determined?): মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(ক) প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব, এবং (খ) জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব।

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages): এই তত্ত্বানুসারে ধরিয়া লওয়া হয় যে শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং সকল শ্রমিকই সমান দক্ষতাসম্পন্ন। ইহার ফলে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সকল শ্রমিক একই মজুরি পায়। অতএব, মজুরি হইল সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের (least productive worker) উৎপাদনের সমান।

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে নিয়োগকর্তা। সুতরাং নিয়োগকর্তা যে মজুরি দিতে রাজী থাকে তাহাই শ্রমের চাহিদা-দাম (Demand Price)। ভোগ্য-দ্রব্যের ক্ষেত্রের ন্যায় শ্রমের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চাহিদা-দামে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের চাহিদা থাকে। নিয়োগকর্তা ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার জন্য শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমিতে থাকে; ফলে শ্রমের চাহিদার পরিমাণও কমিয়া যায়। কমিতে কমিতে প্রান্তিক উৎপাদন এমন এক অবস্থায় আসে যেখানে উহা বাজারে প্রচলিত মজুরির সমান হয়। ইহার পর আরও শ্রমিক নিয়োগ করিলে নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে। সুতরাং সে সেইখানেই থামে। সকল শ্রমিকের দক্ষতা সমান বলিয়া এই প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদনই মজুরির হার নির্ধারিত করে।

প্রান্তিক উৎপাদন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা

ধরা যাউক, কোন নিয়োগকর্তা ইতিমধ্যেই ৯০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে এবং আরও এক বা একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত করা হইবে কি না তাহাই তাহার সমস্যা। এই ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ৯১-তম, ৯২-তম ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কিরূপ হইবে তাহা হিসাব করিবে। যদি ৯০ জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ৪০ টাকা, ৯১ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩৫ টাকা এবং ৯২ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ টাকা হয় তবে ৯২ জন শ্রমিককে নিযোগ করিতে গেলে সংগঠক ঐ শেষ শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মজুরি দিতে পারিবে না; ৯১ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিলে অবশ্য শেষ বা প্রান্তিক শ্রমিককে ৩৫ টাকা করিয়া মজুরি দেওয়া যায়। ধরা যাউক, ৯২-তম শ্রমিক ৩০ টাকা মজুরিতেই কাজ করিতে রাজী হইল। তখন সকল শ্রমিককেই ঐ মজুরি লইতে হইবে, কারণ তাহারা সকলে সমদক্ষতাসম্পন্ন। কেহ যদি উহার বেশী দাবি করে তবে সংগঠক তাহাকে বরখাস্ত করিয়া অন্য একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিবে।

উদাহরণ

এখন প্রশ্ন হইল, শ্রমিকরা ঐ ৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন? ইহার কারণ হইল যে অন্য কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইহার অধিক মজুরি দিবে না। সংগঠক বা নিয়োগকর্তাগণের মধ্যেও প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন অধিক থাকে তাহা আরও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মুনাফা বাড়াইতে আগ্রহশীল হয়। কিন্তু অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া আসে। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের সহিত সমতালাভের চেষ্টা করে। ভারসাম্য অবস্থায় মজুরির হার প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়; এবং প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়া মজুরির হারও এক হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন সমান বলিয়া মজুরিও সকল ক্ষেত্রে সমান হইবে

সমালোচনা: প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লয়। পণ্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্দিষ্ট হইলে উহার দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগ দ্বারাই নির্ণীত হয়, তেমনি শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট থাকিলে মজুরি প্রধানত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট নাও থাকিতে পারে—প্রান্তিক উৎপাদন অতি অল্প বলিয়া শ্রমিক অল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী নাও হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে নিয়োগ-হ্রাসের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং মজুরি-নির্ধারণ ব্যাপারে শুধু শ্রমের চাহিদার দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না। উহার যোগানের দিকও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

ইহা যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত করে না

জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব (Standard of Living Theory of Wages): শ্রমের জীবনযাত্রার মানতত্ত্বে এই যোগানের দিকেরই বিচার করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে মজুরি শুধু জীবনযাত্রার মান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরি শ্রমিকরা যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত তাহা বজায় রাখিবার সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সে মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয় না। ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যায় এবং নিয়োগহ্রাসের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই মজুরি বাড়িয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হয়।

এই তত্ত্বও পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইহা যোগানের দিকটাই দেখে—চাহিদার অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না।

উপসংহার: উপসংহার হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব বা জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব কোনটাই মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা পুরাপুরি ব্যাখ্যা করে না। মজুরি হইল শ্রমের দাম। সুতরাং ইহা যে-কোন দামের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নিরূপিত হয়। চাহিদার দিকে মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা হইল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং যোগানের দিকে নিম্নতম মাত্রা হইল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বা জীবনযাত্রার জন্য ব্যয়। এই দুই মাত্রার মধ্যে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয়

শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি (Trade Unions and Wages): শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার সহিত দর কষাকষি করে শ্রমিক-সংঘের মাধ্যমে। ইহাকে যৌথ দরাদরি (Collective Bargaining) বলা হয়। নিয়োগকর্তা অধিকাংশ সময়ই শক্তিশালী, তাহার সহিত একা দরাদরি করিয়া শ্রমিক পারিয়া উঠে না। উপরন্তু, একদিন শ্রম না করিলে উহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ, একদিন

যৌথ দরাদরি—ইহার উদ্দেশ্য

কর্মহীন অবস্থায় থাকিলে যে উপার্জন হ্রাস পায় তাহা কোন দিনই পূরণ হয় না। শ্রমিকদের অলস অবস্থায় বসিয়া থাকিবার সামর্থ্যও কম। এই সকল কারণের জন্য তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দরাদরির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার নিকট হইতে উপযুক্ত মজুরি আদায়ের চেষ্টা করে।

উপযুক্ত মজুরি বলিতে বুঝায় প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি। মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হইলেও নিয়োগকর্তা সকল সময় শ্রমিককে ইহা অপেক্ষা কম দিতেই চেষ্টা করে। শ্রমিক-সংঘের কাজ হইল দুর্বল নিঃসহায় শ্রম-বিক্রয়কারীদের জন্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি আদায়ের প্রচেষ্টা করা। ইহা ছাড়াও শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া কৃত্রিম সংখ্যাল্পতার সৃষ্টি করে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে যোগান কম হয় এবং প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয় বলিয়া ইহাতে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই শ্রমিক-সংঘের একমাত্র কার্য নহে; উহার অন্যান্য কার্যও রহিয়াছে। শ্রমিক-সংঘ নানাভাবে শ্রম-কল্যাণ (labour welfare) সাধন করে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অতএব, বলা যায় যে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, শ্রম-কল্যাণসাধন ও অন্যান্যভাবে শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহাদের যে স্থায়ী সংগঠন থাকে তাহাকেই শ্রমিক-সংঘ বলা হয়।

শ্রমিক-সংঘের সংজ্ঞা

মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, শ্রমিক-সংঘের কার্যাবলী দুই প্রকারের:

শ্রমিক-সংঘের দুই প্রকার কার্যাবলী

(ক) সৌভ্রাত্রমূলক কার্য (fraternal functions), এবং
(খ) সংগ্রামমূলক কার্য (militant functions)।

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের বুঝায়—যথা, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। আমাদের দেশে অনেক শ্রমিক-সংঘ সম্প্রতি এই সকল দিকে দৃষ্টি দিয়াছে।

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য

সংগ্রামমূলক কার্য বলিতে বুঝায় যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নসাধন। ইহার মধ্যে আছে মজুরি ও মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধি; শ্রমের সময়হ্রাস, কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, নিয়োগহ্রাস বা ছাঁটাই-এ বাধা দেওয়া, ইত্যাদি।

সংগ্রামমূলক কার্য

যৌথ দরাদরির জন্য শ্রমিক-সংঘ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে (ক) কথাবার্তা চালানো (Negotiation), (খ) দাবি পেশ ও আপোষের প্রচেষ্টা (Conciliation), (গ) সালিসী বিচার (Arbitration), এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান। ধর্মঘটই শ্রমিক-সংঘের

যৌথ দরাদরির পদ্ধতি

শ্রেষ্ঠ ও শেষ হাতিয়ার; ইহার দ্বারাই নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক-সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে শ্রমিক-সংঘই ভাঙিয়া যাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্মঘটের মাধ্যমেই হউক আর অন্য পদ্ধতিতেই হউক শ্রমিক-সংঘ কখনও প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি আদায় করিতে পারে না। নিয়োগকর্তাকে যদি প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার পক্ষে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিতে পারে না।

আপেক্ষিক মজুরি (Relative Wages) : আপেক্ষিক মজুরি বলিতে বুঝায় বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য। শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি অবাধ প্রতিযোগিতা চালু থাকে এবং শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হয়—অর্থাৎ, শ্রমিক যদি এক কাজ হইতে সহজে অন্য কাজে যাইতে পারে—তবে সকল ক্ষেত্রেই মজুরির হার এক হইবে। দেশে ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িলে সকল উকিল যদি ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতে পারেন—তবে ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলের উপার্জনে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়।

আপেক্ষিক মজুরি বলিতে কি বুঝায়

মজুরির হারে তারতম্যের কারণ

যে-যে কারণে শ্রমের পূর্ণ গতিশীলতা বা শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকে না তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(ক) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ : যে কাজ যত বেশী অপ্রীতিকর তাহার মজুরি তত অধিক। সাধারণ মজুর অপেক্ষা মেথরকে যে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ইহাই তাহার কারণ। শিক্ষকতা কতকটা প্রীতিকর বলিয়া শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তুলনায় কম।

(খ) অনুশীলন বা শিক্ষানবীসকার্যে সুবিধা-অসুবিধা : যে কার্য অনুশীলন করা যত কঠিন, যত ব্যয়সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ তাহার মজুরিও তত অধিক হইবে। ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হইতে বহু অর্থ, সময় ও পরিশ্রম লাগে। সেইজন্য তাঁহারা সাধারণ গ্র্যাজুয়েট হইতে অধিক মজুরি পাইয়া থাকেন। এই কারণেই আবার দক্ষ শ্রমিকের মজুরি অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হইতে অধিক হয়।

(গ) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা : যে-সকল কার্যে নিয়োগ নিয়মিত তাহাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয়। রাজমিস্ত্রীকে বৎসরে কয়েক মাস বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই সে অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরি দাবি করে। অপরপক্ষে যে শ্রমিক কারখানায় সারা বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত থাকে সে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয়।

(ঘ) দায়িত্বশীল বা দায়িত্বশূন্য কাজ: কার্য দায়িত্বশীল হইলে মজুরিও অধিক হইবে। খাজাঞ্চির কার্যের মজুরি বেশী, কারণ ইহাতে দায়িত্ব আছে; অপরদিকে যে-কেরাণী শুধু চিঠিপত্র ছাড়ার ব্যবস্থা করে (despatcher) তাহার কাজ কতকটা দায়িত্বশূন্য বলিয়া তাহার মজুরিও কম।

(ঙ) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা: ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে লোকে বর্তমানে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হয়। এইজন্য শিক্ষানবীসরা (apprentices) সামান্য ভাতাতেই কাজ করে; আইন-ব্যবসায়ীদিগকেও প্রথম প্রথম সামান্য পারিশ্রমিকে ও বিনা-পারিশ্রমিকে কার্য করিতে দেখা যায়।

(চ) আঞ্চলিক কারণ: আঞ্চলিক কারণেও মজুরির হারের তারতম্য দেখা যায়। যে ব্যক্তি সহরে বাস চালাইয়া থাকে সে পল্লীগ্রামের বাসচালক অপেক্ষা অধিক বেতন পায়; সহরের দিনমজুরও পল্লীগ্রামের দিনমজুর হইতে অধিক মজুরি পায়। আবার আসাম, মণিপুর, হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মজুরির যে-হার তাহা অপেক্ষা পশ্চিমবংগ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে মজুরির হার অধিক।

উপরে যে-বিষয়গুলি বর্ণনা করা হইল তাহারা শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য দেখা যায়। যে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান অধিক সেখানে মজুরির হারও কম। শিক্ষক বহু সংখ্যায় পাওয়া যায় বলিয়া শিক্ষকগণ অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে বাধ্য হন; কেরাণীর কার্যের জন্য শ্রমের যোগান অধিক বলিয়া কেরাণীর বেতন অধিক হয় না। অনুরূপভাবেই চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক বলিয়া গ্রামাঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে মজুরি কম এবং নগরাঞ্চল ও উন্নত অঞ্চলে মজুরি বেশী হয়।

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলেই মজুরি অধিক হয়

সংক্ষিপ্তসার

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি: মজুরি হিসাবে যে টাকাকড়ি পাওয়া যায় তাহা আর্থিক মজুরি; উহার বিনিময়ে যে দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারা যায় তাহা হইল প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত মজুরিই শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক এবং ইহা আর্থিক মজুরি ছাড়া অন্যান্য বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রকৃত মজুরিই শ্রমিককে বিশেষ বৃত্তির দিকে আকর্ষণ করে, আর্থিক মজুরি নহে।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়: এই সম্বন্ধে দুইটি তত্ত্ব আছে—(ক) প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব এবং (খ) জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব। প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব অনুসারে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব অনুসারে মজুরি শ্রমের যোগান দ্বারা নিরূপিত হয় এবং যোগান নির্ধারিত হয় জীবনযাত্রার মান দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, মজুরি চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি: মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা হইল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং নিম্নতম মাত্রা জীবনযাত্রার মান। এই দুই-এর মধ্যে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।

শ্রমিকের পক্ষে দরাদরি করে শ্রমিক-সংঘ। ইহাকে যৌথ দরাদরি বলা হয়। যৌথ দরাদরি ছাড়াও শ্রমিক-সংঘ অন্যান্য কার্য সম্পাদন করে।

আপেক্ষিক মজুরি : আপেক্ষিক মজুরি বলিতে বুঝায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান কমবেশী হয় বলিয়া মজুরির হারেও তারতম্য দেখা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. **Distinguish between Money Wages and Real Wages. Indicate the main factors which determine the Real Wages in a country.**

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। যে যে বিষয় দ্বারা দেশের প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হয় তাহা দেখাও।

2. **Distinguish between Money Wages and Real Wages. What are the factors that attract labourers to a particular occupation ?**

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কি কি বিষয় শ্রমিককে বিশেষ বৃত্তির দিকে আকর্ষণ করে ?

3. **What determines Wages ? Is it the Standard of Living or the Marginal Productivity of Labour ?**

জীবনযাত্রার মান না শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন—কোনটি মজুরি নির্ধারণ করে ?

[ইংগিত : যোগানের দিক দিয়া মজুরি জীবনযাত্রার মান এবং চাহিদার দিক দিয়া প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয়।...(১৯৮-২০০ পৃষ্ঠা)]

4. **State what you understand by the 'marginal product' of a factor. Explain the relation between marginal product of labour and wages.**

উপাদানের 'প্রান্তিক উৎপাদন' বলিতে কি বুঝায় ? শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সহিত মজুরির সম্পর্ক কি তাহা ব্যাখ্যা কর।

5. **Show how Wages are determined.**

কিভাবে মজুরি নির্ধারিত হয় দেখাও।

6. **Explain why wage rates vary in different occupations within a country**

কোন দেশের ভিতর বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারে পার্থক্য হয় কেন ব্যাখ্যা কর।

7. **Consider the influence of Trade Unions on Wages.**

মজুরির উপর শ্রমিক-সংঘের কতদূর প্রভাব আছে আলোচনা করিয়া দেখাও।

8. **Describe the functions and utility of Trade Unions.**

শ্রমিক-সংঘের কার্যাবলী ও উপযোগিতা বর্ণনা কর।

বিংশ অধ্যায়

সুদ

(Interest)

সুদ কাহাকে বলে ? (What is Interest ?) : মূলধন কর্জ লওয়ার জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলে। সাধারণত বাৎসরিক হারে এই দামের হিসাব করা হয়। যেমন, কোন ঋণগ্রহীতা যদি ১০০ টাকা ধার লইয়া বৎসরান্তে ১০৬ টাকা ফেরত দিতে অংগীকারাবদ্ধ হয় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে সুদের বাৎসরিক হার হইল শতকরা ৬টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর আসল ছাড়াও যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাহাই সুদ।

সুদ কাহাকে বলে

নীট সুদ ও মোট সুদ (Net Interest and Gross Interest) : মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই নীট (Net or Pure or Economic) সুদ বলা হয় ; মূলধন কর্জ করিলেই এই সুদ দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে-সুদ প্রদান করিয়া থাকে তাহার মধ্যে নীট সুদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের দাম থাকে—যেমন, আদায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে, ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার দরুন ঋণদাতা নীট সুদ ব্যতীত কিছু অতিরিক্ত আদায় করে। আবার লেনদেন সংক্রান্ত হিসাবপত্র প্রভৃতি বাবদ ঋণদাতাকে ব্যয় করিতে হয় ; অনেক সময় তাহাকে ঋণ আদায়ের জন্য হাংগামা পোহাইতে হয়। ইহার দাম হিসাবেও ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয়া থাকে। অতএব, ঋণগ্রহীতাকে সুদ হিসাবে যাহা দিতে হয় তাহার মধ্যে ঝুঁকি হাংগামা ও আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থও থাকে। সুতরাং উহাকে মোট বা অপরিশুদ্ধ (gross) সুদ বলা হয়। এই মোট সুদ হইতে ঝুঁকি, আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলে নীট সুদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কোন প্রকার ঝুঁকি বা ঝঞ্ঝাট না থাকিলে ঋণের জন্য যে-সুদ আদায় করা হয় তাহাই নীট সুদ।

নীট সুদ

মোট সুদ

এই কারণেই বিভিন্ন প্রকারের ঋণের মধ্যে সুদের পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের যে অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হয় তাহার অন্যতম কারণ হইল যে এই ঋণের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা এবং আদায়ের ঝঞ্ঝাট বেশী। অপরপক্ষে সরকারকে আমরা যে-ঋণ দিয়া থাকি তাহার সুদ যে অপেক্ষাকৃত কম হয় তাহার কারণ এইরূপ ঋণের পরিশোধ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বা আদায়ের ঝঞ্ঝাট কম।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Interest Determined?): সুদ মূলধন ব্যবহারের দাম। সুতরাং জিনিসপত্রের দামের ন্যায়ই উহা চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণগ্রহীতাদের নিকট মূলধনের উপযোগিতা আছে বলিয়াই মূলধনের চাহিদা এবং উহার জন্য সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীশ্রেণী মূলধনের জন্য সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে মূলধনকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় বলিয়া। ঋণ-করা মূলধন সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া উৎপাদকগণ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা পরিমাণ আয় হয় ততটা পরিমাণ সুদই দিতে সে রাজী হইবে। মূলধনের নিয়োগের ফলে যে-আয় হয় সুদের হার তাহার অধিক হইলে সে ঋণ করিবে না। যেমন, ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উৎপাদক বৎসরে ৫ টাকা আয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে রাজী হইবে না। কারণ, তাহা হইলে তাহার লোকসান হইবে। সুতরাং সে যখন মূলধন বাড়ায় তখন সে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখে—(১) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে আয় কত হইবে? এবং (২) মূলধনের সুদ কত? যেখানে মূলধন হইতে আয় ও মূলধনের সুদ সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।

মূলধনের চাহিদা

মূলধনের উৎপাদিকা-শক্তির জন্য সুদ দেওয়া হয়

চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

আমরা দেখিয়াছি যে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সহিত ক্রমাগত একটিমাত্র উপাদান যোগ করা হইতে থাকিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে থাকে।* এখন যদি অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া অধিকমাত্রায় মূলধন প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার কমিতে থাকিবে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে থাকিলে ব্যবসায়িগণ সুদ বেশী দিতে রাজী থাকিবে না এবং তাহাদের ঋণের চাহিদা হ্রাস পাইবে। অতএব, সুদের হার না কমাইলে লগ্নিদারেরা লগ্নি করিতে পারিবে না এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। অতএব, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে মূলধনের চাহিদা কমিবে, কারণ যে সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বেশী মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই

সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূলধনের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হয়

* ৪৫-৪৭ এবং ৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

মূলধন নিয়োজিত হইবে। আর সুদের হার স্বল্প হইলে মূলধনের চাহিদা অধিক হইবে, কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কম সে-সকল ক্ষেত্রেও মূলধন নিয়োজিত হইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়ী যখন উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূলধন নিয়োগ করে তখন সে মূলধন হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা (expectation) আছে সেই বিচার দ্বারাই পরিচালিত হয়। লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া সে কত সুদে ঋণ করিবে তাহা ঠিক করে।

ব্যবসায়ী লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া ঋণগ্রহণ করে

ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ লোক এবং সরকার ঋণ করিয়া থাকে। ইহারাও মূলধনের বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করে। সাধারণ লোকে ঘর বাড়ী বা প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য ঋণ করিয়া থাকে। সরকার যুদ্ধ পরিচালনার মত অনুৎপাদনশীল কার্যের জন্য এবং ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কার্য প্রভৃতির জন্য ঋণ করে। যুদ্ধের জন্য সরকার যে-ঋণ করে তাহা সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না, কারণ যুদ্ধজয়ের জন্য যে-কোন সুদেই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণ করিবার সময় সুদের হারের সহিত উৎপাদনকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যাহা হউক, চাহিদা যে-সূত্র হইতেই আসুক না কেন উহা অধিক হইলে মূলধনের সুদ বাড়িবে এবং উহা স্বল্প হইলে সুদ কম হইবে।

এই ত গেল চাহিদার দিক। এখন যোগানের দিকও দেখা প্রয়োজন। সঞ্চয় হইতে লগ্নি-মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং সুদের হার বেশী হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে; আর সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে লোকে ততটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইবে না। কিছু লোক হয়ত সুদ না থাকিলেও সঞ্চয় করে; কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য দাম হিসাবে সুদ দেওয়া না হইলে অধিকাংশ লোকই সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। ইহার কারণ, লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের ভোগকে অধিক কাম্য মনে করে। সঞ্চয় করার অর্থ হইল বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করা। অতএব, এই প্রতীক্ষার (waiting) জন্য উপযুক্ত মূল্য না দেওয়া হইলে লোকে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে কেন? যেমন, ১০০ টাকা ধার দিয়া যদি দশ বৎসর পরে ঐ ১০০ টাকাই মাত্র ফেরত পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণত লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে চাহিবে না। মানুষ বর্তমান সময়কে যতটা প্রাধান্য দেয় ভবিষ্যৎকে ততটা দেয় না। সেইজন্য লোককে বর্তমান ভোগপ্রবৃত্তি ও বর্তমান সময়প্রীতি হইতে মুক্ত করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়। এই সুদই হইল প্রতীক্ষার বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে পরিহার করিবার

মূলধনের যোগান

জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় দাম। লোককে যত অধিক সঞ্চয় করিতে হয় তত অধিক বর্তমান ভোগ বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ, সঞ্চয়ের দরুন ত্যাগস্বীকারের মাত্রা সঞ্চয়বৃদ্ধির সংগে সংগেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লোককে অধিকমাত্রায় ত্যাগস্বীকার করিতে রাজী করাইবার জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সুদের হার উচ্চ হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ের যোগান দিবে, আর সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের যোগান কমিয়া যাইবে।

বর্তমান ভোগকে স্থগিত বা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্যই সুদ দিতে হয়

দেখা গেল যে, সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে উহার চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-হারে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাজারে সুদের হার বলিয়া গণ্য হয়। ইহাকে সাম্যাবস্থার সুদের হার (Equilibrium Rate of Interest) বলে। সুদের হার ইহার অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান মূলধনের চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণ-দাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলিবে এবং সুদের হার কমিয়া আবার সাম্যাবস্থার হারে দাঁড়াইবে। অপরদিকে সুদের হার সাম্যাবস্থার হার হইতে কম হইলে মূলধনের চাহিদা মূলধনের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে এবং সুদের হার আবার বাড়িয়া সাম্যাবস্থার হারে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা বাজারে সুদের হার সাম্যাবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়

নিম্নের উদাহরণটি হইতে সুদ নির্ধারণের উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজেই বুঝা যাইবে:

(হিসাব টাকায়)

সুদের হার (শতকরা)	মূলধনের চাহিদা	মূলধনের যোগান
৮	১৫,০০০	৫০,০০০
৭	১৮,০০০	৪০,০০০
৬	২২,০০০	৩০,০০০
৫	২৫,০০০	২৫,০০০
৪	৩৫,০০০	২০,০০০
৩	৫০,০০০	১৫,০০০

এই হিসাবে দেখা যায় যে বাজারে সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে ৫ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে, কারণ ঐ সুদে মূলধনের যতটা চাহিদা ঠিক ততটাই যোগান হয়। সুদ যদি ৬ টাকা হয় তাহা হইলে ঋণগ্রহীতারা ২২,০০০ টাকা ঋণ করিতে ইচ্ছুক থাকে, কিন্তু ঋণদাতারা

৩০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে চাহে। ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্ম প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার ৫ টাকায় নামিয়া আসে। অপরদিকে সুদ যখন ৪ টাকা ঋণগ্রহীতারা ৩৫,০০০ টাকা ঋণ করিতে ব্যগ্র কিন্তু ঋণদাতারা মাত্র ২০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে রাজী থাকে। ফলে ঋণগ্রহণের জন্ম ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার বাড়িয়া ৫ টাকা হয়। সুতরাং ৫ টাকা সুদের হারেই চাহিদা ও যোগান সাম্যাবস্থায় আসে।

সুদের হারে পার্থক্য (Differences in the Rate of Interest): যেমন, একই ধরনের পণ্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে একই থাকে, তেমন একই ধরনের ঋণের সুদও বাজারে একই থাকার প্রবণতা দেখা যায়। তবে ঋণের শ্রেণীবিভাগ আছে এবং এইজন্ম বাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণের সুদ বিভিন্ন হইতে দেখা যায়।

মেয়াদ অনুসারে সুদের পার্থক্য

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক। কারণ, এ-ক্ষেত্রে মহাজনের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ দীর্ঘকালব্যাপী ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মিটায়।

ঋণের অনিশ্চয়তার জন্ম সুদের পার্থক্য

অনেক সময় ঋণে অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। দরিদ্র, অপরিচিত ও অসাধু ব্যক্তিকে ঋণদানে মহাজনরা অনিচ্ছুক হয় বা ঋণ দিতে স্বীকৃত হইলেও জামিন রাখিয়া দেয় বা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে। কারণ, অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে আসল টাকা ফেরত না পাইবার আশংকা থাকে। সুতরাং ঝুঁকি বেশী হইলে মহাজনরা উচ্চ হারে সুদ দাবি করে।

আদায়ের পরিশ্রম ও খরচের পার্থক্য

অনেক সময় সুদ আদায়ের জন্ম পরিশ্রম ও ব্যয় হয়। চিঠিপত্র লেখা, লোক নিয়োগ করা, ইত্যাদির জন্ম হাংগামা বেশী হইলে সুদ বেশী দিতে হয়। আমাদের দেশে কাবুলিওয়ালারা যে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করে তাহার অন্যতম কারণ আদায়ের অসুবিধা।

সরকারী ঋণের সুদ অল্প হওয়ার কারণ

সরকার অনেক সময় জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। স্থায়িত্ব অনুসারে এই ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা অল্প হারে সুদ দেওয়া হয়। এই অল্প সুদে ঋণগ্রহণে কেন সরকার সফল হয় তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। সরকারের নিকট হইতে মূলধন ফেরত না পাওয়ার কোন আশংকা থাকে না। সরকারের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতায় লোকের সম্পূর্ণ আস্থা থাকে। উপরন্তু, এই ঋণের জন্ম সুদ আদায়ের কোন হাংগামা নাই। আইনের বলে কোম্পানীগুলি, বীমা কোম্পানী ও ব্যাংকগুলি সরকারী ঋণপত্রে টাকাকড়ি খাটাইতে বাধ্য হয়। সুতরাং যোগান অধিক বলিয়া সরকারী ঋণের সুদের হার কম হয়।

কৃষকদের বেলায় অবস্থা ঠিক বিপরীত। তাহাদের ঋণের চাহিদা প্রচুর। কিন্তু গ্রামে ঋণ দিবার মত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ অল্প। আমাদের দেশে

পল্লীগ্রামে মহাজনই হইল ঋণপ্রদানের প্রধান সূত্র। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র কৃষককে ঋণ দেওয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি থাকে। শস্যের ফলন ভাল হইলে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা থাকে, না-হইলে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা কম হয়। অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া কৃষকেরা ধার লইবার সময় কোন জামিন বা বন্ধক দিতে পারে না। সমবায় সমিতির ঋণ, তাকাভি ঋণ বা জমিবন্ধকী ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণও অতি অল্প বলিয়া মহাজনরা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে এবং কৃষকদের প্রয়োজন বেশী বলিয়া উহা দিতে বাধ্য হয়।

কৃষকদের ঋণের সুদ অধিক হওয়ার কারণ

সহরের ব্যাংকগুলি শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীকে যে স্বল্পমেয়াদী ধার দেয় তাহার জন্য জামিন রাখিয়া দেয়; এইজন্য ঋণের ঝুঁকি বিশেষ থাকে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদের আয় কৃষকদের আয়ের মত অতটা অনিশ্চিত নয়; সুতরাং মূলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম। এই সকল কারণে সহরের ব্যাংকগুলি মহাজনদের তুলনায় অনেক কম সুদে টাকা ধার দেয়।

ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের ঋণের সুদ অপেক্ষাকৃত কম

সংক্ষিপ্তসার

মোট সুদ ও নীট সুদ : মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে সুদ দেওয়া হয় তাহাকে নীট সুদ বলে। নীট সুদের উপর যদি কিছু আদায় করা হয় তবে মোট দেয় অর্থকে মোট সুদ বলা হয়।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় : সুদ নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূলধনের চাহিদাও বাড়াকমা করে। সঞ্চয় হইতেই মূলধন যোগান দেওয়া হয়। সঞ্চয়ের অর্থই বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখা। এই বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখা বা অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্যই সুদ দিতে হয়। সুদের হার যত অধিক হইবে লোকে ততই বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিতে আগ্রহান্বিত হইবে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সুদের হার ভারসাম্য অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়।

সুদের হারে পার্থক্য : এক ধরনের পণ্যের দাম বাজারে যেমন একই থাকে তেমনি এক ধরনের ঋণের সুদও এক হয়। কিন্তু সকল সুদ এক ধরনের নয় বলিয়া সুদের হারেও পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মেয়াদ অনুসারে সুদের হারে পার্থক্য, অনিশ্চয়তার জন্য সুদের হারে পার্থক্য, আদায়ের পরিশ্রম ও ব্যয়ের জন্য সুদের হারে পার্থক্যের উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between Gross Interest and Net Interest. How is the rate of Interest determined ?

মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ?

2. Account for the variation in the rates of Interest borne by different types of loans.

বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য সুদের হারের পার্থক্যের কারণ বর্ণনা কর।

3. Why does a lender demand the payment of interest on a loan ? Why does he charge different rates of interest for different types of loans ?

ঋণদাতা ঋণের উপর সুদ দাবি করে কেন ? সে বিভিন্ন ধরনের ঋণের উপর বিভিন্ন হারে সুদ দাবি করে কেন ?

একবিংশ অধ্যায়

মুনাফা

(Profit)

মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit): উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার প্রকৃতি একটু পৃথক। প্রথমত, মুনাফা হইল পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সংগঠকের পুরস্কার বা দাম। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের দাম চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে। জমির মালিক কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক কত মজুরি পাইবে এবং মূলধন সরবরাহকারী কত সুদ পাইবে তাহা এই সকল ব্যক্তি ও সংগঠকের মধ্যে পূর্ব চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সংগঠকের পুরস্কার এইভাবে কোনমতে নির্দিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়ত, জমি (কাঁচামাল ও খাজনা), শ্রমিক ও মূলধন সরবরাহকারীর প্রাপ্য মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাই মুনাফা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই কারণে মুনাফা একেবারে শূন্য হইতে পারে, অথবা ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। খাজনা, মজুরি বা সুদ কিন্তু কখনই ঋণাত্মক হয় না। তৃতীয়ত, খাজনা, মজুরি ও সুদের হারের সহসা খুব বেশী পরিবর্তন হয় না; কিন্তু মুনাফার হারে অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এক বৎসর হয়ত মুনাফা প্রচুর হইল, পরের বৎসর প্রচুর ক্ষতি হইল—এইরূপও দেখা যায়।

মুনাফার সহিত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের পার্থক্য

মোট ও নীট মুনাফা (Gross and Net Profit): ব্যবসায়-সংগঠক প্রাপ্ত আয় হইতে খাজনা, মজুরি ও সুদ চুকাইয়া দিয়া যে অর্থ পুরস্কার বা সংগঠন পরিচালনার দাম বলিয়া দাবি করে তাহাকে মুনাফা বলে। অনেক সময় সংগঠক নিজের জমিতে উৎপাদন করে এবং নিজেই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে ও মূলধন নিয়োগ করে। সে-ক্ষেত্রে মজুরি বাদ দিয়া আয়ের সবটাই সে মুনাফা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, নিজের জমি ও মূলধন বলিয়া খাজনা ও সুদ পরকে দিতে হয় না। এই মুনাফাকে মোট মুনাফা (Gross Profit) বলা হয়। কিন্তু জমি ও মূলধন নিজেরই হউক, বা পরেরই হউক মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা, মজুরি ও সুদ বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে নীট মুনাফা (Net Profit) বলা হয়। নীট মুনাফার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি থাকে:

মোট মুনাফা কাহাকে বলে

নীট মুনাফার উৎপাদন

(ক) সংগঠক ব্যবসায়ে স্বয়ং পরিশ্রম করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে। এই ধরনের শ্রমের জন্য লোক রাখিতে হইলে তাহাকে মজুরি দিতে হইত,

অথবা সংগঠক যদি অন্যত্র কাজ করিত তাহা হইলেও সে পারিশ্রমিক পাইত। সুতরাং সংগঠকের নিজের শ্রমের মজুরি হইল মুনাফার একটি উপাদান।*

(খ) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্য ঝুঁকি বহন করা। 'হয় রাজা নয় ফকির' হইবার সম্ভাবনা সকল ব্যবসায়ে অল্পবিস্তর আছেই। সংগঠকের যেমন লাভের আশা আছে তেমনি লোকসানের আশংকাও আছে। এই ঝুঁকিবহনের জন্য সে যে-অর্থ দাবি করে তাহাই মুনাফার প্রধান অংশ। অর্থাগমের আশা না থাকিলে কেহই ঝুঁকি লইতে স্বীকৃত হইত না।

(গ) অনেক সময় একচেটিয়া বা আংশিক একচেটিয়া কারবার থাকিলে সংগঠক অধিক মুনাফার আশা করে। এই ধরনের মুনাফাকে 'একচেটিয়া কারবারের মুনাফা' বলা হয়। বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ- প্রতিযোগিতা বিরল বলিয়া অধিকাংশ ব্যবসায়ের মধ্যে 'একচেটিয়া মুনাফা'র অংশ অল্পবিস্তর আছেই।

(ঘ) অনেক সময় হঠাৎ সুযোগ আসিলে সংগঠকরা 'বেশ মোটা' লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে অনেক জিনিসের আমদানি বন্ধ হওয়ায় যাহাদের নিকট ঐ জিনিস পূর্ব হইতেই মজুত করা আছে, তাহারা অচিন্তনীয় মুনাফা করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় ১ পাউণ্ড কুইনাইন্ অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এই ধরনের মুনাফাকে আকস্মিক মুনাফা (windfall profit) বলা হয়।

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) : স্বাভাবিক মুনাফার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সংগঠকের পক্ষে পরিচালনার পারিশ্রমিক ও ব্যবসায় বা উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কারকে স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অল্পদিনের জন্য সে বেগার খাটিতে পারে, ভবিষ্যৎ লাভের আশায় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী ঝুঁকিবহন ও পরিশ্রম বাবদ কিছু মুনাফা অর্জন করিবেই। নচেৎ সে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে।

সংক্ষিপ্তসার

মুনাফা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে পৃথক : ১। মুনাফা চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় না ; ২। মুনাফা ঋণাত্মক হইতে পারে ; ৩। মুনাফার হারের ভীষণ পরিবর্তন হয়।

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা : অন্যান্য সকলকে প্রদান করিয়া সংগঠকের হস্তে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই মোট মুনাফা। ইহা হইতে সংগঠকের নিজস্ব মূলধন ও জমির দরুন প্রাপ্য বাদ দেওয়া হইলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। নীট মুনাফার উপাদানের মধ্যে ১। সংগঠকের পারিশ্রমিক, ২। ঝুঁকিবহনের পুরস্কার, ৩। একচেটিয়া কারবারের লাভ, ৪। আকস্মিক লাভ, প্রভৃতি থাকে। ইহা হইতে আবার শেষের দুইটি—অর্থাৎ, একচেটিয়া কারবারের লাভ ও আকস্মিক লাভ বাদ দেওয়া হইলে তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে।

* অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ইহা বাদ দিয়াই মুনাফা হিসাব করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. **How is Profit distinguished from other Factor Incomes? Indicate the different elements of Profit.**

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার পার্থক্য কোথায়? মুনাফার উপাদানগুলি কি কি দেখাও। [২১১-২১২ পৃষ্ঠা]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

জাতীয় আয় কাহাকে বলে? (What is National Income?): ইতিমধ্যেই আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের উপাদানসমূহ পরস্পরের সহায়তায় জাতীয় আয় সৃষ্টি করে এবং নীট জাতীয় আয়ই তাহাদের মধ্যে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয়।* বস্তুত, উৎপাদন হইতেই জাতীয় আয় সৃষ্ট হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদনকার্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। জমিতে কৃষিকার্য হইতেছে, কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, খনি হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হইতেছে, শিক্ষক শিক্ষাদান করিতেছেন, উকিল-মোক্তার মামলা লড়িতেছেন, পুলিস-চৌকিদার শান্তিশৃংখলা রক্ষা করিতেছে। এইরূপ বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষের অভাবপূরণের বহু রকমের উপকরণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল বস্তুগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তুগত সেবা। ইহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়। (অতএব, জাতীয় আয় হইল কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে) দেশে উৎপাদিত সমগ্র দ্রব্য ও সেবার (নীট) অর্থমূল্য।)

দেশে বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়

উৎপাদনের পরিবর্তে আয়ের দিক হইতেও জাতীয় আয়কে দেখা যাইতে পারে। যাহারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হাতেই উৎপন্ন দ্রব্য আয় হিসাবে গিয়া পৌছায়। কোন কারখানায় উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় হয় তাহার একাংশ পায় জমির মালিক খাজনা হিসাবে, একাংশ শ্রমিকরা পায় মজুরি হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন-সরবরাহকারীদের নিকট সুদ হিসাবে এবং বাকিটা সংগঠক মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। এইভাবে কল-কারখানা ক্ষেতখামার খনি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ

দেশের মোট খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা যোগ করিলেও জাতীয় আয় পাওয়া যায়

* ১৮৬ পৃষ্ঠা।

করিয়া দেশের লোক খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা অর্জন করিতেছে। দেশের সমস্ত লোকের অর্জিত আয়কে যোগ দেওয়া হইলে দেশের সামগ্রিক বা জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে।

দেশের মোট ভোগ ও সঞ্চয় যোগ দিলেও জাতীয় আয় পাওয়া যায়

আবার লোকে যাহা আয় করে তাহার একাংশ ভোগ ও অপরাংশ সঞ্চয় করে। সুতরাং দেশের সকল লোকের ভোগ ও সঞ্চয় যোগ দিলেও জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যাইবে।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একদল স্কুলের ছাত্র শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া পিকনিক করিতে গেল। তাহারা কত সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া গিয়াছিল তাহা তিনটি উপায়ে জানা যাইতে পারে। প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকান এবং আমওয়ালার নিকট হইতে সংবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত কত সন্দেশ, কেক ও আম সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে কয়টি করিয়া সন্দেশ, আম ও কেক পাইয়াছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহারা কে কয়টি আম, সন্দেশ ও কেক খাইয়াছে এবং কে কয়টি পকেটে পুরিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই তিন প্রকার অনুসন্ধানের ফল একই হইবে।

প্রথম পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইলে, অর্থাৎ এক বৎসরে দেশে উৎপন্ন সমগ্র দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্যের সমষ্টি গণনা করা হইলে, উহাকে

জাতীয় আয় হিসাবের তিনটি পদ্ধতি

উৎপাদন-পদ্ধতি (The 'Output' Method) বলা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে হিসাব করা হইলে—অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের বার্ষিক আয় যোগ দেওয়া হইলে, উহাকে আয়-পদ্ধতি (The 'Incomes Received' Method) বলা হয়। তৃতীয় পদ্ধতিতে হিসাব করা হইলে—অর্থাৎ, বৎসরে দেশের মোট ভোগ ও বিনিয়োগ বা সম্পদসৃষ্টি কত হইয়াছে তাহার সমষ্টি গণনা করা হইলে, উহাকে ভোগসহ বিনিয়োগ (The 'Consumption *plus* Investment' Method) বলা হয়। অবশ্য যে-পদ্ধতিই অনুসৃত হউক না কেন ফল একই পাওয়া যাইবে।

এইভাবে জাতীয় আয় হিসাব করার পদ্ধতি তিনটি হইলেও সাধারণত

তবে দুইটি পদ্ধতিই সাধারণত অনুসৃত হয়

প্রথম দুইটি পদ্ধতিই—উৎপাদন-পদ্ধতি ও আয়-পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এখন পদ্ধতি দুইটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যাইতে পারে।

উৎপাদন-পদ্ধতি (The Output Method): উৎপাদন-পদ্ধতিতে 'নীট জাতীয় উৎপাদনে'র (Net National Product) অর্থমূল্যের হিসাব

করা হয়। এই 'নীট' শব্দটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশে বৎসরে যে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদিত হয় তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় 'মোট জাতীয় উৎপাদন' (Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP)। ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইবার ফলে কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা না করিলে উৎপাদন একদিন কমিয়া যাইবে।* অতএব, মূলধন-দ্রব্যকে অটুট রাখিয়াই বৎসরের উৎপন্নের হিসাব করিতে হইবে। এইজন্য দেখা যায় যে কারখানার মালিক প্রভৃতি প্রত্যেক বৎসর ক্ষয়ক্ষতি বাবদ আলাদাভাবে আয়ের একাংশ 'অবপূর্তি তহবিলে' (depreciation fund) জমা রাখে। একটি সেলাই-কলের দাম যদি ৩০০ টাকা হয় এবং কলটি যদি ১০ বৎসর চলে তবে দর্জির দোকানের মালিকের পক্ষে বৎসরে ৩০ টাকা করিয়া জমা রাখা উচিত। নচেৎ ১০ বৎসর পরে তাহাকে সেলাই-কলের অভাবে দোকান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে বৎসরে মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে ঐ সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ বাদ দিয়া জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইলে তাহাকেই বলা হয় 'নীট জাতীয় উৎপাদন' (Net National Product বা সংক্ষেপে NNP)। সংক্ষেপে নীট জাতীয় উৎপাদনকে এইভাবে দেখানো যায়ঃ
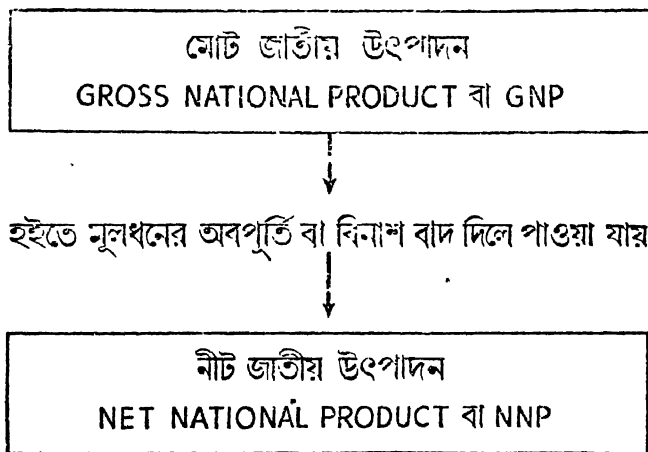
নীট জাতীয় উৎপাদনই জাতীয় আয়

* একটি সহজ দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। বাড়ীর মালিক যদি ভাড়াটে-বাড়ী একেবারে না সারাইয়া সমস্ত ভাড়াটাই ভোগ করিতে থাকে, তবে এমন একদিন আসিবে যে ঐ বাড়ী কেহ ভাড়া লইতে চাহিবে না, কারণ উহা বাসোপযোগী থাকিবে না।

এই নীট জাতীয় উৎপাদনই খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়, মোট জাতীয় উৎপাদন নহে।

উৎপাদন-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা করিবার সময় আরও দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: (ক) যে-সকল দ্রব্য ও সেবা বাজারে বিক্রীত হয় না, উৎপাদকগণ যাহাদের নিজেরাই ভোগ করে তাহাদের অর্থ-মূল্যও সাধারণত জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। যেমন, আমাদের দেশে কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের একাংশ বিক্রয় না করিয়া নিজেরাই ভোগ করে, বা অনেকেই নিজের বাড়ীতে বসবাস করে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ শস্যের এবং ঐ বাড়ীর আশ্রয়দানের অর্থমূল্য হিসাব করিয়া উহাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

দ্রব্যাদি বিক্রীত না হইলেও তাহাদের হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে

অবশ্য আমরা নিজেরাই যে-সকল কাজ করিয়া লই—যেমন, মুচি না ডাকিয়া নিজের জুতায় কালি দিয়া থাকি—তাহার হিসাব ধরা হইবে না। কারণ, উহার অর্থমূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। (খ) জাতীয় আয় পরিমাপের সময় একই দ্রব্যের অর্থমূল্য যাহাতে দুইবার গণনা করা না হয় তাহা দেখিতে হইবে। যেমন, কাপড়ের দামের মধ্যেই—কাপড় তৈয়ারির সুতার দাম রহিয়া গিয়াছে বলিয়া কাপড়ের দামের সহিত আবার সুতার দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া চলিবে না। এইজন্য উৎপাদন-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের সময় চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের (final product) অর্থমূল্যই ধরা হয়, অর্ধসমাপ্ত বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না।

মাত্র চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যই ধরিতে হইবে

আয়-পদ্ধতি (The Incomes Received Method): বলা হইয়াছে, নীট জাতীয় উৎপাদনই উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে তাহাদের আয় হিসাবে বণ্টিত হয়। ইহাকে বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয় বা জাতীয় লভ্যাংশ (National Dividend) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: যাহার সহিত উৎপাদন-কার্যের কোন সম্পর্ক নাই সেরূপ আয়কে হিসাবে ধরা হইবে না। এইজন্য হস্তান্তর পাওনাকে হিসাবের বাহিরে রাখা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি বৎসরে ২০০০ টাকা আয় করিয়া তাহা হইতে ১০০ টাকা কোন আত্মীয়কে সাহায্য করে তবে আত্মীয়ের সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্তি ঐ ১০০ টাকাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। অনুরূপভাবে সরকার যুদ্ধপরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া ঋণদাতাদের যে-সুদ দেয় তাহাকেও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না। কারণ, এই সুদ উৎপাদনকার্যে মূলধন সরবরাহের জন্য সুদ নহে, ইহার ফলে জাতীয় উৎপাদন কোনপ্রকার বৃদ্ধি পায় নাই।

কোন্ কোন্ আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India): ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয়ের প্রাথমিক হিসাব (preliminary estimates) পাওয়া গিয়াছে। হিসাবটি হইতে দেখা যায় যে ঐ ১৯৬১-৬২ সালে মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩০২০ কোটি টাকা। মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে গড়পড়তা বা মাথাপিছু জাতীয় আয় (Per Capita National Income) পাওয়া যায়। ১৯৬১-৬২ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় ছিল ২৯৩.৪ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সুরুর ঠিক পূর্বে ভারতের মোট জাতীয় আয় ছিল ৮৮৫০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২৪৭.৫ টাকা।* অতএব, ১৯৬১-৬২ সালের প্রাথমিক হিসাব ঠিক হইলে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন এগার বৎসরে মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪৭ ভাগ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় শতকরা ১৮.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।* ভারতের জাতীয় আয়ের গতি ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল:

জাতীয় আয়ের পরিমাণ

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন এগার বৎসরে (১৯৫১-৬২ সাল) ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি
(হিসাব কোটি টাকায়—১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল (ভিত্তি বৎসর)	১৯৬১-৬২ সাল	শতকরা বৃদ্ধি
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৪৩৩০	৫৮৬০	
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৪৮০	২২০০	
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৬৬০	২৫৩০	
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৩৯০	২৪৯০	
৫। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয়	—২০	—৬০	
মোট	৮৮৫০	১৩০২০	৪৭*
মাথাপিছু আয় (টাকা)	২৪৭.৫	২৯৩.৪	১৮.৫

* পূর্ববর্তী সংস্করণে বিপরীত দিক হইতে—অর্থাৎ, পাটীগণিতের বিক্রয়-মূল্যের (sales price) দিক হইতে হিসাব দেখানোর দরুন মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জাতীয় আয় উভয়েরই বৃদ্ধি অনেক কম হইয়াছিল।

ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতের জাতীয় আয় প্রধানত চারিটি সূত্র হইতে অর্জিত হয়—যথা, (১) কৃষি ও অনুরূপ কার্য, (২) খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, (৩) ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ, এবং (৪) অন্যান্য সেবামূলক কার্য। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয় ধনাত্মক (positive) নহে, ঋণাত্মক (negative)। সুতরাং ইহাকে জাতীয় আয়ের অন্যতম সূত্র বলিয়া গণ্য করা চলে না এখন সূত্রগুলির সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ভারতের জাতীয় আয়ের চারিটি প্রধান সূত্র :

কৃষি ও অনুরূপ কার্য বলিতে বুঝায় কৃষিকার্য, পশুপালন, মৎস্যের চাষ, অরণ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি। এইগুলিই সামগ্রিকভাবে ভারতের জাতীয় আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র। মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এই সূত্র হইতেই অর্জিত হয়। ভারত যে কৃষিপ্রধান দেশ ইহা তাহারই পরিচায়ক।

১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য—ইহাই সর্বপ্রধান সূত্র

জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় প্রধান সূত্র হইল খনিজ দ্রব্য উৎপাদন এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প। এই সূত্র হইতে মোট শতকরা ১৮-১৯ ভাগের মত জাতীয় আয় অর্জিত হয়। ভারত যে শিল্পে অনুন্নত দেশ তাহা ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়। তবে শিল্প-প্রসারের ফলে এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। খনিজ ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন

জাতীয় আয়ের তৃতীয় সূত্র হইল ব্যবসাবাণিজ্য (Commerce), পরিবহণ ও সংসরণ (Transport and Communications)। ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ আরও কম—মোট শতকরা ১৬-১৭ ভাগের মত।

৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ

অন্যান্য সেবামূলক কার্য বলিতে বুঝায় ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা এবং সকল প্রকারের চাকরি ইত্যাদি। এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ ঐ তৃতীয় সূত্রেরই মত শতকরা ১৭-১৮ ভাগ।

৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য

নিম্নে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের বিভিন্ন সূত্রের অংশ (শতকরা ভাগ) একসংগে দেখানো হইল :

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল	১৯৬১-৬২ সাল
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৫১·৩	৪৬·৭
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৬·০	১৯·১
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৭·৭	১৬·৭
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৫·০	১৭·৫
	১০০·০	১০০·০

ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও অনুরূপ কার্যের অংশ হ্রাস পাইয়া খনি ও শিল্পের অংশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে যে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে ইহা তাহাই নির্দেশ করে। তবুও মোট জাতীয় আয় অর্জনে কৃষি ও অনুরূপ কার্যেরই প্রাধান্য রহিয়াছে, এবং শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির অংশ অতি সামান্য। ইহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানেরই লক্ষণ।

ভারতের জাতীয় আয় হইতে কি জানা যায়:
১। দেশে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে
২। তবুও কৃষির প্রাধান্য রহিয়াছে

৩। ভারতে জীবন-যাত্রার মান বা স্তর অতি নিম্ন

ভারতে জীবনযাত্রার মান বা স্তর যে বিশেষ নিম্ন এবং উহার উন্নয়নের গতি যে অতি মন্থর তাহা মাথাপিছু আয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেও অতি সহজে বুঝা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) ভারতে মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয় ছিল

ভারতের জাতীয় আয়ের গতি
(প্রথম পরিকল্পনার সুরু হইতে)

অন্যান্য সেবামূলক কার্য
খনি, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প
ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ
কৃষি ও অনুরূপ কর্ম

(১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)

১৪০০০ কোটি টাকা
১৩০৯০ ,, ,,
১২০০০ ,, ,,
১০০০০ ,, ,,
৮৮৫০ ,, ,,
৮০০০ ,, ,,
৬০০০ ,, ,,
৪০০০ ,, ,,
২০০০ ,, ,,

১৯৫০-৫১ '৫১-৫২ '৫২-৫৩ '৫৩-৫৪ '৫৪-৫৫ '৫৫-৫৬ '৫৬-৫৭ '৫৭-৫৮ '৫৮-৫৯ '৫৯-৬০ '৬০-৬১ '৬১-৬২
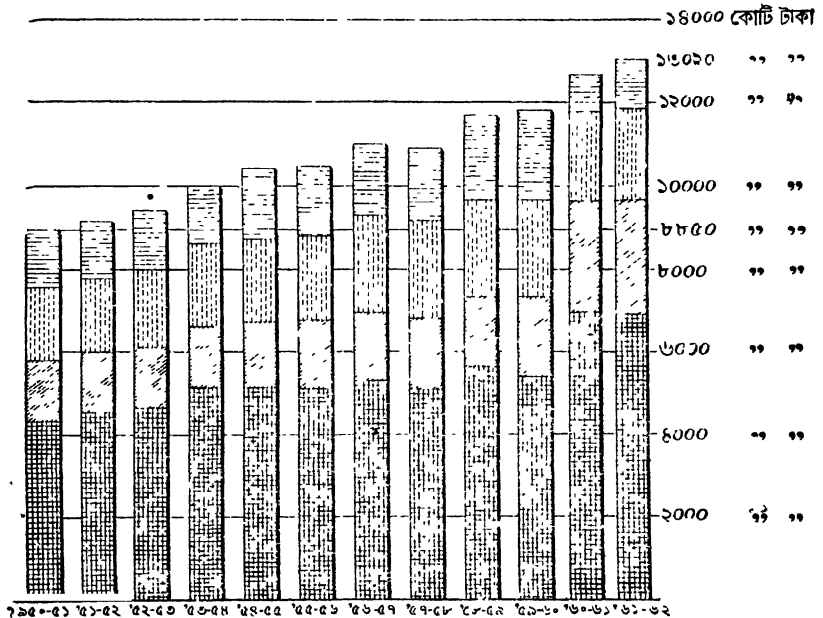
মাত্র ২৯২ টাকা। তুলনায় ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৯৮০০ টাকা ও ৪৩০০ টাকার মত। উপরন্তু, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন সময় হইতে জাতীয় আয় বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু মাথাপিছু আয়ের সম্প্রসারণ ততটা দ্রুত হারে হইতেছে না। ২১৭ পৃষ্ঠার ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন এগার বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল শতকরা ৪৭ ভাগ, কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয়

৪। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি জাতীয় আয়বৃদ্ধি অপেক্ষা কম

মাথাপিছু আয়ের গতি
(১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)
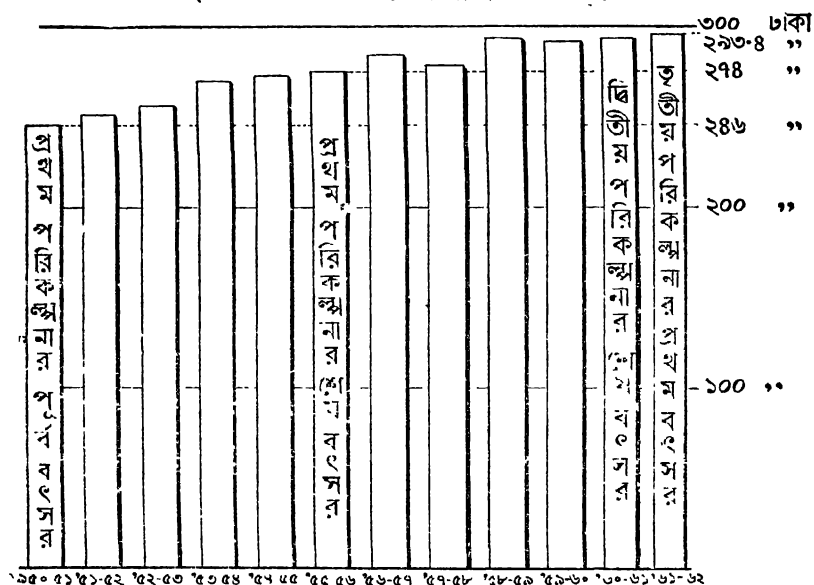
বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা ১৮·৫ ভাগ। অতএব, মাথাপিছু আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে—(১) জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারকে আরও বাড়াইতে হইবে, এবং (২) সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হইলে বর্ধিত জাতীয় আয় বর্ধিত জনসংখ্যাকে খাওয়াইতে পরাইতেই ব্যয় হইয়া যাইবে; লোকের জীবনযাত্রার মানে কোন উন্নতি দেখা দিবে না।

৫। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অতি প্রয়োজনীয়

জাতীয় আয়

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় আয় কাহাকে বলে: উৎপাদন হইতেই আয় হয়। দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে বৎসরে যে-পরিমাণ নীট দ্রব্য মোট উৎপন্ন হয় তাহাদের অর্থমূল্যই জাতীয় আয়। আয়ের দিক হইতেও জাতীয় আয়কে দেখা যাইতে পারে। দেশে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাই খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে দেশের লোকের মধ্যে বণ্টিত হয়। সুতরাং দেশের লোকের মোট খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে অর্জিত আয়কে যোগ দিলেও জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

লোকে যাহা আয় করে তাহার একাংশ ভোগ ও অপরাংশ সঞ্চয় করে। সুতরাং দেশের লোকের মোট ভোগ ও সঞ্চয় যোগ দিলেও জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় হিসাবের পদ্ধতি তিনটি: (ক) উৎপাদন-পদ্ধতি, (খ) আয়-পদ্ধতি, এবং (গ) ভোগসহ বিনিয়োগ পদ্ধতি। প্রথম দুইটি পদ্ধতিই সাধারণত অনুসৃত হয়।

উৎপাদন-পদ্ধতি কি: এই পদ্ধতিতে প্রথমে মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য গণনা করা হয়। পরে উহা হইতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয় উৎপাদন বা প্রকৃত জাতীয় আয় বাহির করা হয়।

এই পদ্ধতিতে গণনার সময় যে-সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রীত হয় না, অথচ বিক্রীত হইতে পারিত তাহাদেরও ধরা হয় এবং মাত্র চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের অর্থমূল্যই গণনা করা হয়।

আয়-পদ্ধতি: নীট জাতীয় উৎপাদনই আয় হিসাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। সুতরাং উৎপাদনকার্যের সহিত যাহার সম্পর্ক নাই সেরূপ আয়কে বর্ণনা করা হয় না।

ভারতের জাতীয় আয়: ভারতের বর্তমান জাতীয় আয় ১৩০২০ কোটি টাকা। মোট জাতীয় আয়কে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে গড়পড়তা বা মাথাপিছু জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন এগার বৎসরে মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জাতীয় আয় যথাক্রমে শতকরা ৪৭ ভাগ ও শতকরা ১৮.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

ভারতের জাতীয় আয়ের উৎসের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল কৃষি ও অনুরূপ কার্য, দ্বিতীয় স্থলে আছে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ। তৃতীয় স্থানাধিকারী হইল শিল্প ও খনি। বিভিন্ন পেশার স্থান চতুর্থ। জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে কৃষির স্থান দেশের অনগ্রসরতারই পরিচায়ক।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain the concept of National Income. How is such income calculated ?

জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর। কিভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়?

[ইংগিত: বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের সময় যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহাদেরও উল্লেখ করিতে হইবে।...২১৩-২১৬ পৃষ্ঠা]

2. What is meant by National Income ? Give a brief account of the principal sources of India's National Income.

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

3. What is National Income ? What picture of the Indian economy do you get by studying India's National Income ?

জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের যে চিত্র পাও তাহা বর্ণনা কর।

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত: ভারতের জাতীয় আয়ের আলোচনা হইতে দেখা যায়—১। ভারত

কৃষিপ্রধান দেশ, ২। কিন্তু ভারতে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে, ৩। তবে জীবনযাত্রার স্তর এখনও অতি নিম্ন, ৪। জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে শুধু উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইলেই চলিবে না—সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে

4. **Explain clearly what is meant by National Income.**

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায় তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর।

লেখক-পরিচিতি

উইলসন (President Woodrow Wilson) : উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ঐ বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি তাঁহারই সর্তের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়। রাষ্ট্রপতি উইলসন জাতিসংঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠাতেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ঐ জাতিসংঘে যোগদান করে নাই।

উইলসন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। সার্বভৌমিকতা, দলপ্রথা, জনমত, আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব প্রচার করেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্থলে আন্তর্জাতিকতাই ছিল তাঁহার আদর্শ। এই আন্তর্জাতিকতার আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া তিনি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর উইলসন রচিত গ্রন্থের মধ্যে তিনখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ—১। 'An Old Master and Other Essays', ২। 'Congressional Government', এবং ৩। 'The State'.
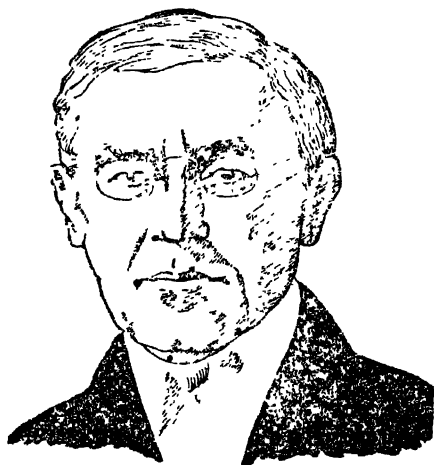
উইলসন লিংকন

এ্যাব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) : লিংকন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহবিবাদের সময় ঐ দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদের প্রশ্ন লইয়া। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থন করিয়া একটি স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি গণতন্ত্রকে 'জনগণের কল্যাণার্থে জনগণের শাসন' বলিয়া বর্ণনা করেন। তখন হইতে গণতান্ত্রিক সরকারের এই সংজ্ঞাই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া রহিয়াছে।

এ্যারিষ্টটল (Aristotle) ঃ বিখ্যাত গ্রীক চিন্তাবীর এ্যারিষ্টটলকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জনক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গুরু বলিয়া অভিহিত করা হয়। জীবনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২। এ্যারিষ্টটল ষ্টাগিরা (Stagira) নামক গ্রীসের একটি অখ্যাত স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭বৎসর বয়সে এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে আসিয়া চিরস্মরণীয় দার্শনিক প্লেটোর (Plato) ছাত্র হন। পরে কিছুদিন ম্যাসিডনবীর আলেক-জেণ্ডারের গৃহশিক্ষকতা করেন।

এ্যারিষ্টটল

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া যুক্তিবিজ্ঞান (Logic), অর্থবিদ্যা, ইতিহাস, নীতি-শাস্ত্র, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এ্যারিষ্টটলের অবদান রহিয়াছে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Politics)। তৎকালীন গ্রীক পটভূমিকায় রচিত হইলেও ইহাতে যথেষ্ট আধুনিকতার ছাপ আছে।

গার্ণার (Prof. Wilfred Garner) ঃ গার্ণার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনই (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রথমে 'Introduction to Political Science' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ইহাকে বৃহদাকারে পরিবর্তিত করিয়া নাম দেন 'Political Science and Government'।

মিল

রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় গার্ণারের বিশেষ কিছু দান নাই; তিনি পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা হিসাবেই পরিচিত।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ঃ জন ষ্টুয়ার্ট মিল উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ চিন্তাবীর। জীবনকাল ১৮০৬-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। পিতা জেমস মিলও একজন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক।

রাষ্ট্রনীতি ছাড়া অর্থবিদ্যা, যুক্তি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতেও মিলের দান রহিয়াছে। এদিক দিয়া মিল এ্যারিষ্ট-টলের সহিত তুলনীয়। পাণ্ডিত্যেও মিলকে এ্যারিষ্টটলের সমকক্ষ মনে করা হয়।

মিলের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক রচনা 'On Liberty'-র প্রকাশের সময় হইল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। এক বৎসর পরেই (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকাশিত হয় 'Considerations on Representative Government'।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell): বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাবীর। জন্ম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসেল পরিবারের সন্তান। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্তালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধ্যাপক। যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া শান্তিবাদ প্রচারের জন্য রাসেল পদচ্যুত হন। পদচ্যুতির পর তিনি সমগ্র বিশ্বে তাঁহার মতবাদ ও চিন্তাধারা প্রচারের আদর্শ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করিতে থাকেন। ফলে বিশ্বই হইয়া দাঁড়ায় তাঁহার বিশ্ববিত্তালয়, এবং রাসেল পরিচিত হন মানব-বন্ধুরূপে। বর্তমানে ৯২ বৎসর বয়স্ক এই মানব-বন্ধু আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতেছেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের রচনার মধ্যে 'A History of Western Philosophy', 'Principles of Social Reconstruction', 'Authority and the Individual', 'Impact of Science on Society' ইত্যাদিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এ-পর্যন্ত তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থ হইল 'Has man a Future?' এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ববাসীকে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের বিরোধিতায় সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উপরই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

ব্রাইস (Lord James Bryce): ইংরাজ লেখক লর্ড ব্রাইস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য ব্যাপক ভ্রমণ করেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে অধিক বিখ্যাত 'Modern Democracies' (Vols. I & II) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনৈতিক দল, রাষ্ট্রনৈতিক প্রথা ও রীতিনীতি লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থ হইল 'Studies in History and Jurisprudence', 'American Commonwealth' এবং 'South America, Observations and Impressions'.

ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli)ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের জার্মান দার্শনিক। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও জীবদেহের প্রকৃতি একই।

মণ্টেস্কু (Baron de Montesquieu)ঃ মণ্টেস্কু রুশোর কিছু পূর্ববর্তী ফরাসী দার্শনিক। জীবনকাল ১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। শৈশব হইতেই তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। তারপর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'Espirit des Lois' (Spirit of Laws) গ্রন্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদ প্রচার করেন।

ম্যাট্‌সিনি
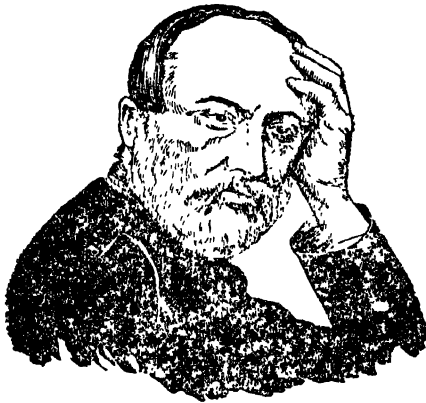
ম্যাট্‌সিনি (Mazzini)ঃ উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীর নেতা। ইতালীর জনগণকে জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রভুত্ব ও বিদেশী নৃপতিদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য 'নব্য ইতালী' নামে গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমে সাধারণতন্ত্রী সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে নির্বাসিত হন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Manifesto of Young Italy' নামক গ্রন্থে ম্যাট্‌সিনি ইতালীয়গণের মধ্যে জাতীয়তা-বাদ প্রচার করেন।

রবীন্দ্রনাথঃ রাষ্ট্রনীতি চিন্তাতে যে রবীন্দ্রনাথের দান আছে তাহা অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'Nationalism' গ্রন্থ রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যের (Political Literature) একখানি মূল্যবান সম্পদ। ইহা কলিকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.-এর পাঠ্য। রাষ্ট্র-নীতির উপর অন্যান্য লেখাও রবীন্দ্রনাথের আছে।

রবীন্দ্রনাথ

রুশো (Jean Jacques Rousseau): রুশোকে ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু (spiritual father) আখ্যা দেওয়া হয়। জীবনকাল ১৭১২-১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।

রুশোর জীবন বিপ্লবীর জীবন। ১৬ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহাকে ভ্রাম্যমাণ ও নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতে হয়। তাঁহার অনুকরণীয় গ্রন্থ 'Contract Social' (Social Contract) ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধারণের সার্বভৌমিকতা (popular sovereignty) সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্ব এবং রুশোর সমসাময়িক চিন্তাবীর ভোলটেয়ারের (Voltaire) ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে রচনা ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

রুশো

লক্ (John Locke): সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিকগণের মধ্যে লক্ হবসের পরবর্তী। জীবনকাল ১৬৩২-১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ।
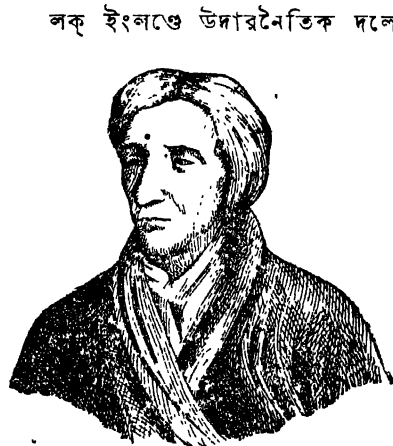
লক্ ইংলণ্ডে উদারনৈতিক দলের (Whig Party) প্রতিষ্ঠার সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এবং হবস্ কর্তৃক প্রচারিত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব উভয়েরই বিরোধিতা করেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রক্তহীন বা গৌরবজনক বিপ্লব (Glorious Revolution) সংঘটিত হইলে ইহার সমর্থনে লক্ তাঁহার গ্রন্থদ্বয় 'Two Treatises on Civil Government' রচনা করেন (১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাতে তিনি প্রচার করেন যে সামাজিক চুক্তি দ্বারা আদিম মনুষ্য-সম্প্রদায় রাজার হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করে নাই। সুতরাং রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং রাজার দায়িত্ব রহিয়াছে প্রজাপালন করিবার। রাজা তাঁহার দায়িত্ব পালন না করিলে প্রজারা আইনসংগতভাবেই বিদ্রোহ করিতে পারে।

লক

রাজক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট তত্ত্বই রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় লকের অবদান।

ল্যাস্কি (Harold Joseph Laski)ঃ ল্যাস্কি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) গত হইয়াছেন।

ল্যাস্কির রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'Grammar of Politics', 'Problem of Sovereignty', 'Authority in the Modern State', 'Democracy in Crisis' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলিতে ল্যাস্কি ব্যক্তি-স্বাধীনতার এবং সার্বভৌমিকতার বিকেন্দ্রিকরণের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

লেনিন (V. I. Lenin)ঃ রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা ও সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত রাষ্ট্রের স্রষ্টা। জীবনকাল ১৮৭০-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথমে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত রুশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী শ্রমিকদলের (Russian Social Democratic Labour Party) অন্যতম নেতা ছিলেন। এই দল কার্ল মার্কসের (Karl Marx) মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। পরে দলটি
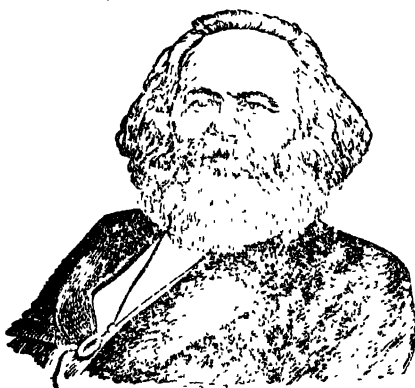
কার্ল মার্কস্ লেনিন

'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক' এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলে লেনিন বলশেভিক দলের নেতা হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর বলশেভিক দল কমিউনিস্ট দল নামে পরিচিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লব লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং ফলে সোবিয়েত সরকার প্রবর্তিত হয়। লেনিনের দুরদর্শিতার ফলেই বিপ্লবের পর বিশৃংখলার মধ্য

হইতেই এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। তাঁহার রচনার মধ্যে অন্যতম হইল 'State and Revolution'। এই পুস্তকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মার্কসীয় মতবাদের ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নূতন রূপ ও নূতন পথ গ্রহণ করিলে কয়েকজন জননেতা ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া মধ্যপন্থী (Moderate) আখ্যা লাভ করেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইঁহাদের অন্যতম। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী জননেতৃত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার জন্যই অধিক প্রসিদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি যে কমলা-বক্তৃতা (Kamala Lecture) প্রদান করেন তাহা উচ্চস্তরের রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্য (political literature) হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

হবস্ (Thomas Hobbes) ঃ হবস্ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক। জীবনকাল ১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

হবস্ কিছুদিন দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজতন্ত্রের সমর্থক হিসাবে তিনি দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যচ্যুতি ও ক্রমওয়েলের অধীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মোটেই সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'লেভায়াথানে'* (Leviathan) সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার প্রজাদের নাই।

এইভাবে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিবাদে হবস্ যে সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক হইতে তাহা বিশেষ মূল্যবান।

* লেভায়াথান কল্পিত এক বিরাট সামুদ্রিক জীব, তিমি মাছ অপেক্ষাও বড়

অ্যালফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall)ঃ কেম্ব্রিজের প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ। আধুনিক অর্থবিদ্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত এই অর্থবিদ্যাবিদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে 'Principles of Economics'-ই অধিক পরিচিত। অর্থবিদ্যার আলোচনায় তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হইল চাহিদা ও যোগান রেখা এবং চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার বিশ্লেষণ। আধুনিক অর্থবিদ্যার আলোচনায় এই বিশ্লেষণ অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করিয়া মূল্যতত্ত্বের আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তার দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
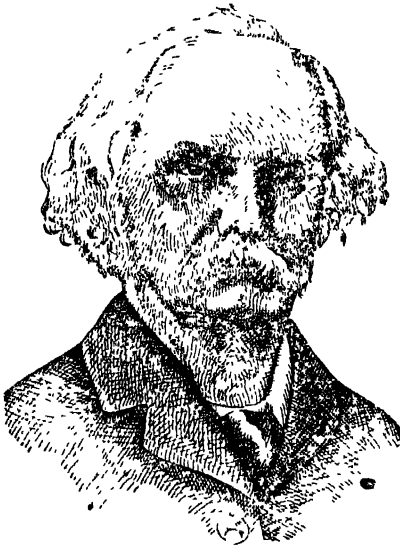
মার্শাল

এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)ঃ ব্রিটেনে বিশদ ও সুশৃংখলভাবে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু করেন এ্যাডাম স্মিথ। জীবনকাল ১৭২৩-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'Wealth of Nations' প্রকাশিত হয়। স্মিথ শ্রমবিভাগ, শ্রমের সহিত দামের সম্পর্ক, মূলধন, প্রতিযোগিতা, করনীতি, বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনই স্বাভাবিকভাবেই সুশৃংখল দেখা যায়। বহুদিন ধরিয়া তাঁহার চিন্তাধারা অর্থবিদ্যাবিদগণকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত পথ ধরিয়াই ম্যালথাস, রিকার্ডো, মিল প্রভৃতি 'ক্লাসিক্যাল' লেখকগণ নিজ নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং অর্থবিদ্যার আলোচনাকে অগ্রসর করেন।

ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo)ঃ উনবিংশ শতাব্দীর অর্থবিদ্যাবিদ। এ্যাডাম স্মিথের মতই খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাংক-নোটের মূল্যহ্রাস সম্পর্কে রচনা প্রকাশ করেন। তাঁহার লেখা তুমুল তর্ক-বিতর্কের সূচনা করে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'The Principles of Political Economy' প্রকাশিত হয়। খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও ধনবণ্টন, মুদ্রানীতি, মূল্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখার মূল সূত্র ধরিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John

Stuart Mill) এবং কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) নিজেদের মতবাদ গড়িয়া তুলেন।

ম্যালথাস (T. R. Malthus) ঃ ইংরাজ ধর্মযাজক ম্যালথাস জনসংখ্যা-নীতির ব্যাখ্যাকার হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'Essay on the Principle of Population' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার জীবদ্দশায় উহার আরও চারিটি সংস্করণ হয়। এই পুস্তকে তিনি দেখান যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খাদ্যবৃদ্ধির হারের তুলনায় অধিক ; সুতরাং মানুষ স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করিলে মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে বাধ্য। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে 'The Principles of Political Economy'-র কথা উল্লেখ করিতে হয়। বর্তমান যুগের প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ কেইন্সের (Keynes) মতবাদের অনেকগুলিরই সন্ধান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা: সকল প্রকারের শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (১) বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industries), (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industries), এবং (৩) কুটির শিল্প (Cottage Industries)। কিছুদিন পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N.) নিযুক্ত এক কমিশন* কুটির শিল্পের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে: আংশিক বা পূর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্পকে কারিগর সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত পরিবারের অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় পরিচালনা করে তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশন এই সংজ্ঞা অনুমোদন করে।

কুটির শিল্পের সংজ্ঞা

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে ঐ ফিসক্যাল কমিশন বলে যে, এরূপ শিল্প প্রধানত ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যেই পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে শিল্পপতি বা কর্মকর্তা (entrepreneurs) মজুর নিয়োগ করিয়া ছোট কারখানায় উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। সংক্ষেপে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য-গুলির বর্ণনা এইভাবে করা যায়: কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শ্রমিক নিয়োগ না করিয়া নিজের গৃহে চিরাচরিত পন্থায় উৎপাদনকার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ, কারিগর নিজস্ব চেষ্টা ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল; সে অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্য লয়। উপরন্তু, এই শিল্প কারিগরের আসল পেশা নাও হইতে পারে। কৃষিকার্য বা অন্য কোন প্রধান বৃত্তির সহিত পার্শ্বজীবিকা হিসাবে ইহা পরিচালিত হইতে পারে। অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদনকার্য কারিগরের গৃহে পরিচালিত হয় না; ক্ষুদ্রায়তন কারখানায় শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদনকার্য চলে। বর্তমানে 'ক্ষুদ্রায়তন' বলিতে ৫ লক্ষ টাকা অবধি বিনিয়োগকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board) প্রদত্ত সাম্প্রতিক সংজ্ঞা অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শক্তিচালিত এবং সাধারণত নগরাঞ্চল বা সহরতলীতে অবস্থিত হয়। এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গ্রামাঞ্চলেও বেশ কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ময়দা ও চাউলের কলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, কুটির শিল্প কিরূপ আকার ধারণ করিলে তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হইবে সে-সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য

কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

---

* Economic Commission for Asia and Far East বা সংক্ষেপে ECAFE

পরিভাষা

অ

অগণতান্ত্রিক—undemocratic
অতিদীর্ঘকালীন বাজার—secular market
অত্যল্পকালীন বাজার—very short-period market
অত্যুন্নত—highly developed
অদৃশ্য রপ্তানি ও আমদানি—invisible export and import
অধিকার-পৃচ্ছা—*quo warranto*
অনগ্রসর অঞ্চল—backward area
অনন্য—exclusive
অন্তনিয়োগ শিক্ষা—training-on-job
অনিবদ্ধ মূলধন—floating capital, non-specific capital
অনিশ্চিত ব্যয়-তহবিল—contingency fund
অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত—favourable balance of trade
অনুকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত—favourable balance of payments
অনুচ্ছেদ—articles
অনুমোদনসিদ্ধ (নাগরিক)—naturalized (citizen)
অনুসন্ধানকারী দল—study group
অনুৎপাদনশীল—unproductive
অনুৎপাদনশীল ঋণ—unproductive debt
অন্তঃশুল্ক—excise duty
অপরিশুদ্ধ—gross
অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা—unplanned economy
অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—inconvertible paper currency
অপ্রচুর—scarce
অপ্রাচুর্য—scarcity
অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা—imperfect competition
অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্র—quasi-federal State
অবস্তুগত—non-material
অবাধ বাণিজ্য—free trade
অবাধলভ্য—free
অভাব—wants
অভাবের সংগতি—coincidence of wants
অভিজাততন্ত্র—aristocracy
অভিজাতশ্রেণী—patricians
অভাব হইতে মুক্তি—freedom from want
অভিভাবক পরিষদ—Trusteeship Council (U N.)
অরাজকতা—anarchy
অর্থ কমিশন—Finance Commission
অর্থদপ্তর—finance department
অর্থনৈতিক—economic
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—Economic and Social Council (U. N.)
অর্থনৈতিক খাজনা—economic rent
অর্থবিদ্যা—economics
অর্থ-ব্যবস্থা—economic system
অর্থনৈতিক বিপ্লব—economic revolution
অর্থনৈতিক সংগঠন—economic organisation
অর্থনৈতিক সমস্যা—economic problem

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা—economic liberty
অর্থসাহায্য—bounty, grants-in-aid, subsidy
অর্ধ-নিয়োগ—underemployment
অর্ধোন্নত (স্বল্পোন্নত) অঞ্চল—underdeveloped area or region
অর্ধোন্নত (স্বল্পোন্নত) দেশ—underdeveloped country
অল্পকালীন বাজার—short-period market
অসাধু প্রতিযোগিতা—unfair competition
অসীম দায়—unlimited liability
অসীম বিহিত মুদ্রা—unlimited legal tender money
অস্থায়ী বিচারক—*ad hoc* judges
অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা—temporary equilibrium position
অস্থায়ী ভারসাম্যের দাম—temporary equilibrium price
অহস্তান্তরযোগ্য—non-transferable
অংগ—organ, unit
অংগরাজ্য—constituent unit
অংশীদার—partner
অংশীদারী—partnership

আ

আইন—law
আইনাভিজ্ঞ—jurist
আইনগত অধিকার—legal rights
আইনগত ধারণা—legal idea
আইন প্রণয়ন—legislation, law-making
আইনসভা—legislature
আইনসংগত স্বাধীনতা—legal liberty
আইনের অনুশাসন—rule of law
আকর—ore
আকস্মিক মুনাফা—windfall profit
আকাংক্ষা—desiredness
আঞ্চলিক—territorial, regional
আঞ্চলিক পরিষদ—territorial council, zonal council
আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ—territorial division of labour
আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী—territorial army
আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য—regional autonomy
আত্যন্তিক চাষ—intensive cultivation
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—right of self-determination
আন্তঃরাজ্য পরিষদ—Inter-State Council
আন্তর্জাতিক—international
আন্তর্জাতিকতা—internationalism
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—international organisation
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান—International Trade Organisation (ITO)
আন্তর্জাতিক বিচারালয়—International Court of Justice
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল—International Monetary Fund (IMF)
আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ—International Labour Organisation (ILO)
আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ—United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
আনুগত্য—allegiance
আপিল এলাকা—appellate jurisdiction

আপেক্ষিক—relative
আপেক্ষিক দক্ষতা—comparative advantage
আপেক্ষিক ব্যয়—comparative cost
আপেক্ষিক মজুরি—relative wages
আপেক্ষিক মূল্য—relative value
আপোষ—conciliation
আবগারী শুল্ক—excise duty
আবাদী শিল্প—plantation industry
আভ্যন্তরীণ—internal
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য—domestic trade, internal trade
আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা—internal sovereignty
আমদানি—import
আলোচনা—discussion, commentaries
আর্থিক আয়—money income
আর্থিক নীতি—economic policy
আর্থিক মজুরি—money wages
আর্থিক মূলধন—money capital
আশাবাদী—optimist
আসল টাকাকড়ি—actual money
আয়—income
আয়কর—income-tax

উ

উচ্চতর—senior
উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি—consumers' surplus
উন্নয়নমূলক কার্য—development services
উন্নয়ন ব্লক—development block
উন্নয়নের গতি—pace of development
উন্নয়নমূলক ব্যয়—development expenditure
উপ-অঞ্চল—sub-area
উপজাতি—tribe
উপদল—faction
উপাদান—factor
উপদেষ্টা কমিটি—advisory committee
উপপরিষদপাল—Deputy Speaker
উপবিধি—bye-law
উপযোগ—utility
উপযোগের তহবিল—store of utility
উপযোগের স্রোত—flow of utility
উপরাষ্ট্রপতি—Vice-President
উপরিস্থ কর—super tax
উষ্ণমণ্ডলীয়—tropical
উৎকর্ষ—efficiency
উৎপন্নের বিধি—law of returns
উৎপাদক—producer
উৎপাদকের উদ্বৃত্ত—producer's surplus
উৎপাদিকাশক্তি—productivity
উৎপাদন—production
উৎপাদনের উপাদান—factors of production
উৎপাদনের উপাদানের আয়—factor income
উৎপাদন-ব্যয়—cost of production
উৎপাদন-শুল্ক—excise duty
উৎপাদনের লক্ষ্য—target of production
উৎপাদনশীল—productive
উৎপাদনশীল ঋণ—productive debt
উৎপাদনশীলতার নীতি—canon of productivity
উৎপ্রেষণ—*certiorari*
উৎস—sources

ঋ

ঋণ—loan, credit, debt
ঋণজনিত ব্যয়—debt services

ঋণদান সমিতি—credit society
ঋণ-নিয়ন্ত্রণ—credit control
ঋণপত্র—credit instruments
ঋণবরাদ্দ-নীতি—rationing of credit
ঋণ-ব্যবস্থা (গ্রামীণ)—credit system (rural)
ঋণ-মূলধন—loan capital
ঋতুগত বেকারত্ব—seasonal unemployment

এ

এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি—single-purpose society
একক—unit
এককেন্দ্রিক—unitary
একজাতীয় রাষ্ট্র—mononational State
একচেটিয়া কারবার (বিভেদমূলক)—monopoly (discriminating)
একচেটিয়া কারবারী—monopolist
একচেটিয়া প্রতিযোগিতা—monopolistic competition
একদেশতা—localisation
একধাতুমান—monometallic standard
একধাতু রৌপ্যমান—monometallic silver standard
একনায়ক—dictator
একনায়কতন্ত্র—dictatorship
একনায়কতন্ত্রী—dictatorial
এক-পরিষদসম্পন্ন—unicameral
একবার ব্যবহার্য দ্রব্য—single-use goods
এক-মালিক—single owner
এলাকা—jurisdiction

ঐ

ঐতিহাসিক মতবাদ—Historical Theory
ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ—Divine Origin Theory

ঔ

ঔপনিবেশিক—colonial

ক

কথাবার্তা চালানো—negotiation
কর—tax
কর নিরপেক্ষ রাজস্ব—non-tax revenue
করপ্রদানের ক্ষমতা—taxable capacity
কর-রাজস্ব—tax-revenue
কর্মগত বণ্টন—functional distribution
কর্মপ্রচেষ্টা—efforts
কর্মবিভাগ—division of labour
কর্মসূচী—programme
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি—Law of Increasing Returns
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি—Law of Increasing Cost
ক্রমবিকাশ—evolution
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বিধি—Law of Diminishing Cost
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বিধি—Law of Decreasing Cost
ক্রয়শক্তি—purchasing power
কাগজী মুদ্রা—paper money
কাগজী মুদ্রামান—paper money standard
কাঁচামাল—raw materials
কাঠামো—structure
কাম্য—optimum
কাম্যতা—desiredness
কাম্য অনুপাত—optimum proportion

কাম্য উৎপাদন—optimum production
কাম্য জনসংখ্যা—optimum population
কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান—optimum firm
কারবার—firm
কারিগরি—technical
কার্যকরী—operative
কার্যকাল—tenure
কার্য পরিদর্শক—overseer
ক্রান্তীয়—tropical
ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থা—clearing house system
ক্রিয়াশীল—active
কুটির শিল্প—cottage industry
কৃষি-আয়কর—agricultural income-tax
কেনাবেচা—transaction
কেন্দ্রীয় কৃত্যক—All-India Services
কেন্দ্রীয় সংগঠন—central organisation

খ

খসড়া—draft
খাজনা—rent
খাজনাতত্ত্ব—theory of rent
খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ—food-rationing
খাদ্য সরবরাহ—food supply
খাদ্য-সমস্যা—food problem
খাদ্যাহরণ জীবন—food-gathering life
খাদ্যোৎপাদন জীবন—food-producing life
খুচরা দাম—retail price
খোলাবাজারে কারবার—open market operations

গ

গণ-উদ্যোগ—initiative
গণতন্ত্র—democracy
গণতান্ত্রিক—democratic
গণভোট—referendum
গড় উৎপাদন-ব্যয়—average cost of production
গড়পড়তা—average (*per capita*)
গতিশীল—mobile
গতিশীলতার নীতি—principle of progression
গাণিতিক প্রগতি—arithmetical progression
গুণগত—qualitative

ঘ

ঘাটতি—deficit
ঘাটতি অঞ্চল—deficit area
ঘাটতি ব্যয়—deficit financing

চ

চক্রীদল—clique, coterie
চতুর্পর্যায়ী পরিকল্পনা—point-four programme
চরম—absolute
চলতি আমানত—demand deposit
চলতি মূলধন—circulating capital
চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত—balance of payments on current account
চাহিদা—demand
চাহিদা-রেখা—demand curve
চাহিদা-সূচী—demand schedule
চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা—income-elasticity of demand
চাহিদা-দাম—demand price
চাহিদার সূত্র—law of demand

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—elasticity of demand
চুংগি—octroi
চুক্তি অনুযায়ী খাজনা—contract rent
চেক—cheque
চেতনাসম্পন্ন—enlightened

ছ

ছদ্ম বেকারত্ব—disguised unemployment

জ

জনগোষ্ঠী—clan, party
জনপ্রিয় পরিষদ—popular chamber
জনমত—public opinion
জনপাল কৃত্যক—public services
জনাধিক্য—overpopulation
জন্মসূত্র—natural-born
জন্মস্থান-নীতি—*jus loci, jus soli*
জনস্বাস্থ্য—public health
জনসংখ্যা—population
জমা আমানত--savings deposit
জমার অনুপাত—reserve ratio
জমির (জোতের) সংহতিসাধন—consolidation of holdings
জমিবন্ধকী ব্যাংক—land mortgage bank
জলবায়ু—climate
জরুরী আইন—ordinance
জাতি—nation, race
জাতিগত—racial
জাতিগত বৈশিষ্ট্য—racial qualities
জাতীয় আয়—national income
জাতীয় উন্নয়ন—national development
জাতীয় উৎপাদন—national product
জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান—National Defence Academy
জাতীয় ব্যয়—national outlay
জাতীয় মূলধন—national capital
জাতীয় রাষ্ট্র—Nation-State
জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী—National Cadet Corps (N. C. C.)
জাতীয় সমাজ—national society
জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা—National Extension Service (N. E. S.)
জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা—national self-sufficiency
জাতীয় স্বাধীনতা—national liberty
জাতীয়করণ—nationalisation
জাতীয়তাবাদ—nationalism
জ্যামিতিক প্রগতি—geometric progression
জীববিজ্ঞানী—biologist
জীবন-সংগ্রাম—struggle for existence
জীবনযাত্রার মান—standard of living
জীবনযাত্রার স্তর—level of living
জুয়া—gambling
জোত—holding
জোতের অসম্বদ্ধতা—fragmentation of holdings

ট

টাকাকড়ি—money
টাকাকড়ির কার্য—functions of money
টাকাকড়ির মূল্য—value of money

ড

ডিবেঞ্চার—debenture

ত

তত্ত্ব—theory
তত্ত্বগত—theoretical
তপশীলভুক্ত জনগোষ্ঠী—scheduled tribes

তপশীলভুক্ত জাতি—scheduled castes
তপশীলভুক্ত (তপশীলী) ব্যাংক—scheduled bank
তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক—non-scheduled bank
তমসুক—bonds
ত্যাগের সমতা—equality of sacrifice
তেজী (অবস্থা)—boom
তেজী বাজার—boom market

দ

দক্ষতা—skill
দল—party, clan
দলীয় সরকার—party government
দলীয় মনোবৃত্তি—party spirit
দ্রব্য—goods
দ্রব্য-বিনিময়—barter
দাম—price
দায়—liability
দায়রা জজ—sessions judge
দ্বি-দলীয় প্রথা—bi-party system
দ্বি-ধাতুমান—bi-metallic
দ্বি-পরিষদসম্পন্ন—bi-cameral
দ্বি-বিক্রেতা প্রতিযোগিতা—duopoly
দায়িত্বশীল (পার্লামেন্টীয়)—responsible (parliamentary)
দীর্ঘকালীন বাজার—long-period market
দূত—consul, ambassador
দূতাবাস—consulate, embassy
দৃশ্য-আমদানি—visible import
দৃশ্য-রপ্তানি—visible export
দেনাপাওনার মান—standard of deferred payment
দেশীয় ব্যাংক—indigenous bank
দৈনন্দিন—ordinary

ধন—wealth
ধনতান্ত্রিক—capitalistic
ধনতান্ত্রিক রূপ—capitalistic form
ধনবৈষম্য—inequality of wealth
ধর্মঘট—strike
ধর্মীয় রাষ্ট্র—theocratic State
ধ্বংসাত্মক (নাশকতামূলক) কার্য—sabotage
ধাতব মুদ্রা—metallic money
ধাতব মুদ্রামান—metallic standard

ন

নগর-রাষ্ট্র—city-State
নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান—improvement trust
নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা—river valley project
নাগরিক—citizen
নাগরিক জীবন—civic life
নাগরিকতা—citizenship
নামসর্বস্ব—nominal
নায়ক—leader
ন্যায্য মজুরি—fair wage
ন্যায়—justice
ন্যায়বিচার—equity
ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি—natural law
নিদর্শক মুদ্রা—token coin
নিবদ্ধ মূলধন—sunk capital, specific capital
নিবারক নিরোধ—preventive detention
নিম্নতর—junior
নিম্নতর আদালত—subordinate court
নিরাপত্তা—security
নিরাপত্তা পরিষদ—Security Council

নির্দেশ—writ
নির্দেশমূলক নীতি—Directive Principles
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড—territory
নির্বাচন—choice, election
নির্বাচন কমিশন—Election Commission
নির্বাচকমণ্ডলী—electorate
নির্বাহী বাস্তকার—executive engineer
নির্লিপ্ততা—indolence
নিশ্চয়তার নীতি—canon of certainty
নিষ্ক্রিয় অংশীদার—sleeping partner
নিয়ন্ত্রণ—check, control
নিয়মতান্ত্রিক শাসক—constitutional head
নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা—parliamentary government
নিয়োগ-সংস্থা—employment exchange
নিখুঁত—absolute, pure
নীট—net, pure
নীতি—canon, principle
ন্যূনতম জীবনধারণ—subsistence level
ন্যূনতম জীবনধারণের মান—minimum-subsistence standard
ন্যূনতম মজুরি—minimum wage
নৈতিক অধিকার—moral right
নৈতিক প্রণোদন—moral suasion
নৌবাহিনী—navy
নৌবাহিনীর প্রধান (অধ্যক্ষ)—Chief of the Naval Staff

প

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—Five Year Plan
পণ্য—commodity, merchandise
পণ্যোৎপাদন—commodity production
পদচ্যুতি—recall
পরমাদেশ—*mandamus*
পরামর্শদান এলাকা—advisory jurisdiction
পরিকল্পনা—project, planning
পরিকল্পনা অঞ্চল—project area
পরিকল্পনা কমিশন—planning Commission
পরিকল্পনা কাঠামো—plan-frame
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা—planned economy
পরিচালক—director
পরিচালন—operation
পরিচালিত মুদ্রা—managed money
পরিচালনা—management
পরিচালকমণ্ডলী—board of directors
পরিতৃপ্তি—satisfaction
পরিধি—extent
পরিবর্ত-দ্রব্য—substitute
পরিবর্তনশীলতার নীতি—canon of elasticity
পরিবর্তনীয়—convertible
পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—convertible paper money
পরিবেশ—environment, atmosphere
পরিবহণ ও সংসরণ—transport and communication
পরিমাণগত—quantitative
পরিশুদ্ধ—pure
পরিষদ—council
পরিষদপাল—Speaker
পরোক্ষ গণতন্ত্র—indirect democracy

পশুপালন—animal husbandry
পাইকারী দাম—wholesale price
পালটি শস্য উৎপাদন—rotation of crops
পার্লামেন্ট—Parliament
পিতৃতান্ত্রিক—patriarchal
পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ—Patriarchal Theory
পুঁজিপতি—capitalist
পুঁজিবাদ—capitalism
পুনরুৎপাদন-ব্যয়—cost of reproduction
পুনর্বাট্টা—rediscount
পুরঃশুল্ক—octroi
পুষ্টিকারিতা—nutritional
পূর্ণাংগ বাজার—perfect market
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা—perfect competition
পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়—predetermined income
পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়—predetermined expenditure
পৃথকিকরণ—separation
পৃথকীকৃত—differentiated
পৌনঃপুনিক মূলধন—recurring circulating capital
পৌর—urban
পৌর-কর্তব্য—civic duties
পৌর-চিকিৎসক—civil surgeon
পৌরবিজ্ঞান—Civics
পৌরসংঘ—municipality
প্রকৃত আয়—real income
প্রকৃত মজুরি—real wage
প্রক্রিয়া—process
প্রজা—subject
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র—direct democracy
প্রতিকূল—unfavourable
প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—representative democracy
প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা—representative money
প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা—representative government
প্রতিরক্ষা—defence
প্রতিরক্ষা দপ্তর—Defence Department
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—Defence Minister
প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ—defensive type of protection
প্রতিরোধ—prohibition
প্রতিরোধকারী উৎপাদন-শুল্ক—prohibitive excise duties
প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ—preventive check
প্রতিশ্রুতি পত্র—promissory note
প্রতিযোগিতা—competition
প্রতীক্ষা—waiting
প্রথা—custom
প্রথাগত আইন—customary law
প্রধান কর্মকর্তা—chief executive
প্রধান কর্মসচিব—Secretary-General
প্রধান ধর্মাধিকরণ—Supreme Court
প্রপন্নাধিকার—court of wards
প্রমোদ কর—entertainment tax
প্রস্তাবনা—Preamble
প্রাকৃতিক অবস্থা—State of Nature
প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য—natural resources
প্রাকৃতিক পরিবেশ—natural environment
প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ—positive check
প্রাকৃতিক সম্পদ—natural resources
প্রাথমিক লাভ—immediate gain
প্রান্তিক—marginal

প্রান্তিক আয়—marginal profit
প্রান্তিক উপযোগ—marginal utility
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—marginal cost of production
প্রান্তিক জমি—marginal land
প্রান্তিক মুনাফা—marginal profit
প্রাপ্তবয়স্ক—adult
প্রামাণিক মুদ্রা—standard coin

ফ

ফৌজদারী আদালত—criminal court

ব

বণ্টন—distribution
বন্দী-প্রত্যক্ষিকরণ—*habeas corpus*
বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান—port trust
বরাদ্দ—quota
বরাদ্দ-নীতি—rationing
বর্ণভেদ প্রথা—caste system
বহু-উদ্দেশ্যমূলক—multi-purpose
বহুজাতীয় রাষ্ট্র—multi national State
বহুদলীয় ব্যবস্থা—multi-party system
বলপ্রয়োগ মতবাদ—Theory of Force
বস্তুগত—material
বাজার—market
বাজার-দাম—market price
বাজার বসার জায়গা—market place
বাট্টা—discount
বাণিজ্য—commerce
বাণিজ্য-শুল্ক—customs
বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত—balance of trade
বাণিজ্যিক—commercial
বাণিজ্যিক পদ্ধতি—commercial
বাণিজ্যিক ব্যাংক—commercial bank
বাণিজ্যিক সংগঠন—trade organisation
বাধ্যতামূলক সঞ্চয়—forced savings
বাস্তব মূলধন—concrete capital, real capital
বাহ্যিক—external
বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা—external sovereignty
বিকল্প—alternate
বিকৃত রাষ্ট্র—perverted State
বিচার বিভাগ—judiciary
বিক্রয়যোগ্য—marketable
বিক্রয়কর—sales tax
বিচারমূলক সংরক্ষণ—discriminating protection
বিচারের রায়—judicial decisions
বিদেশীয়—alien
বিধান পরিষদ—legislative council
বিধানসভা—legislative assembly
বিধি—law
বিনিময়—exchange
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ—exchange control
বিনিময় ব্যাংক—exchange bank
বিনিময়-মূল্য—value-in-exchange
বিনিময়ের মাধ্যম—medium of exchange
বিনিয়োগ—investment
বিনিয়োগ অভ্যাস—investment habit
বিনিয়োগকারী—investor
বিবর্তন—evolution
বিবর্তনবাদ—Evolutionary Theory
বিভিন্ন জাতীয়—heterogeneous
বিবেচনা-সাপেক্ষ খসড়া—tentative draft

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার—discriminating monopoly
বিমান বাহিনী—air force
বিলম্বিত—deferred
বিলম্বিত শোধ—deferred payment
বিলাস-দ্রব্য—luxuries
বিশ্বব্যাংক—World Bank
বিশ্বস্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান—World Health Organisation (WHO)
বিশেষ অনুমতি—special leave
বিশেষজ্ঞ কর্মী—specialised expert
বিশেষিকরণ—specialisation
বিশেষীকৃত—specialised
বিশেষীকৃত স্থায়ী মূলধন—specialised fixed capital, specialised fixed equipment
বিহিত মুদ্রা—legal tender money
বৃত্তি—stipend
বৃহদায়তন শিল্প—large-scale industry
বেকারত্ব—unemployment
বেকার-সমস্যা—unemployment problem
বেসরকারী উদ্যোগ—private sector
বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা—civil administration
বৈচিত্র্য আনয়ন—diversification
বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক—foreign exchange bank
বৈদেশিক মুদ্রা—foreign exchange
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি—private property
ব্যক্তিগত বণ্টন—personal distribution
ব্যক্তিগত মূলধন—private capital
ব্যক্তিগত মূল্য পৃথকিকরণ—personal discrimination
ব্যক্তিগত সঞ্চয়—personal savings
ব্যক্তিগত সম্পদ—individually owned wealth
ব্যক্তিগত স্বার্থ—private interest
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—individualism
ব্যবহার-মূল্য—value-in use
ব্যবসায়—business
ব্যয়—cost, expenditure
ব্যয়কর—expenditure tax
ব্যয়সংক্ষেপ—economies
ব্যয়সংক্ষেপের নীতি—canon of economy
ব্যাখ্যাকর্তা—interpreter
ব্যাপক—comprehensive, extensive
ব্যাপক চাষ—extensive cultivation
ব্যাপক চাহিদা—wide demand
ব্যাংক-ব্যবস্থা—banking system
ব্যাংকের আমানত—bank deposit
ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি—bank money

ভ

ভারসাম্য—equilibrium
ভারসাম্য-দাম—equilibrium price
ভারী শিল্প—heavy industry
ভ্রাতৃভাব—fraternity
ভ্রাম্যমাণ—nomadic
ভিত্তি বৎসর—base year
ভূমিদাস—serf
ভূমি-রাজস্ব—land revenue
ভূমি-সংস্কার—land reforms
ভোক্তা—consumer
ভোগ—consumption
ভোগ্যদ্রব্য—consumers' goods, consumption goods
ভোগ্য (পণ্য) দ্রব্যক্রেতা—consumer
ভোগোদ্বৃত্ত—consumers' surplus
ভোটাধিকার—franchise, suffrage

ম

মজুরি—wages
মজুরিতত্ত্ব—theory of wages
মতবাদ—theory
মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী—middleman
মন্দাজনিত বেকারত্ব—cyclical unemployment
মন্দাবস্থা—depression
মন্ত্রি-পরিষদ—Council of Ministers
মন্ত্রিসভা—Cabinet
মহাধর্মাধিকরণ—high court
মাথাপিছু—*per capita*
মাথাপিছু আয়—*per capita* income
মাতৃতান্ত্রিক—matriarchal
মান—standard
মানসিক—subjective
মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয়—friendly aliens
মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা—mixed economy
মুদ্রা—coin, currency
মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাংকন—currency and coinage
মুদ্রামান—monetary standard
মুদ্রাস্ফীতি—inflation
মুনাফাতত্ত্ব—theory of profit
মূলধন—capital
মূলধন খাতে ব্যয়—expenditure on capital account
মূলধন-গঠন—capital formation
মূলধন-দ্রব্য—producers' goods, production goods, capital goods
মূলধনবৃদ্ধি—accumulation of capital
মূলধন-লাভ—capital gains
মূলধন-লাভকর—capital gains tax
মূলধনপ্রদানকারী অংশীদার—share-holders
মূলধনের হিসাবের খাতে—on capital account
মূল শিল্প—key industry, basic industry
মূল্য—value
মূল্যতত্ত্ব—theory of value
মূল্যস্তর—price level
মূল্যস্থিতিকরণ—price stabilisation
মূল্যের পরিমাপ—measure of value
মূল্যের শ্রমতত্ত্ব—Labour Theory of Value
মেয়াদী আমানত—time deposit
মোট—gross
মোট আয়—gross income
মোট উপযোগ—total utility
মোট জাতীয় উৎপাদন—gross national product
মোট মুনাফা—gross profit
মোট সুদ—gross interest
মৌলিক অধিকার—fundamental rights

য

যন্ত্রপাতি—machinery
যুক্তরাষ্ট্রীয়—federal
যুগ্ম তালিকা—concurrent list
যুদ্ধনায়ক—war-lord
যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্প—strategic industry
যোগান—supply
যোগান-দাম—supply price
যোগান-রেখা—supply curve
যোগান-সূচী—supply schedule
যোগানের সূত্র—law of supply
যৌথ দরাদরি—collective bargaining
যৌথ দায়িত্ব—joint responsibility
যৌথ পরিবার—joint family

যৌথ পুঁজি ব্যাংক—joint stock bank
যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ—Syndicalism
যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান—joint stock company

র

রক্ষণশীল—conservative
রক্ষাকবচ—safeguards
রক্তের সম্পর্ক—kinship
রক্তের সম্পর্ক-নীতি—*jus sanguinis*
রপ্তানি—export
রাজতন্ত্র—monarchy
রাজনৈতিক দল—political party
রাজস্ব খাতে ব্যয়—expenditure on revenue account
রাজস্ব দপ্তর—treasury
রাজ্যকৃত্যক—State Services
রাজ্য-তালিকা—State List
রাজ্যপাল—Governor
রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন—State Reorganisation Commission
রাজ্যসভা—Council of States
রাজ্যসংঘ—Union of States
রাষ্ট্র—State
রাষ্ট্রকৃত্যক—public services
রাষ্ট্রদ্রোহিতা—sedition
রাষ্ট্রমন্ত্রী—Minister of State
রাষ্ট্রপতি—President
রাষ্ট্রপতি-শাসিত—presidential
রাষ্ট্র পরিচালনা—State-management
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—political rights
রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—political consciousness
রাষ্ট্রনৈতিক দল—political party
রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন—political organisation
রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা—political liberty
রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ কমিশন—Public Service Commission
রাষ্ট্রহীন—Stateless
রাষ্ট্রীয় ধর্ম—State religion
রাষ্ট্রীয় মালিকানাকরণ—nationalisation
রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ—State socialism
রাষ্ট্রের ইচ্ছা—will of the State
রীতি—convention
রূপগত উপযোগ—form utility
রোপণ শিল্প—plantation industry

ল

লক্ষ্য—target
লিখিত মূল্য—face value
লেখ—writ
লেনদেন—transaction
লেনদেন-উদ্বৃত্ত—balance of payments
লোকসভা—House of the People

শ

শক্তি—power
শক্তিজোট—power bloc
শান্তিশৃংখলা—peace and security
শাসক—administrator
শাসন—administration
শাসন-ব্যবস্থা—government, administration
শাসন বিভাগ—executive
শাসনতান্ত্রিক সুবিধা—administrative expediency
শিল্প—industry
শিল্পপ্রতিষ্ঠান—firm

শিল্প-ব্যাংক—industrial bank
শিল্পগত ভিত্তি—industrial base
শিক্ষানবীস—apprentice
শিক্ষানবীসী—apprenticeship
শোষণ—exploitation
শ্রম—labour
শ্রমবিভাগ—division of labour
শ্রমিক সমবায়—confederation of labour
শ্রমিক-সংঘ—trade union, guild

স

সক্রিয়—active
সঞ্চয়—savings
সঞ্চয়মূলক—cumulative
সঞ্চয়ের ইচ্ছা—will to save
সঞ্চয়ের ক্ষমতা—power to save
সঞ্চয়ের ভাণ্ডার—store of value
সতর্কতা—vigilance
সদর কার্যালয়—headquarters
সভাপতি—chairman
সভাসমিতি—platform
সমজাতীয়—homogeneous
সমবায়—cooperation (co-operation)
সমবায়িক—cooperative (co-operative)
সমাজ—society
সমাজ-কল্যাণকর—social welfare
সমাজজীবন—social life
সমাজবিজ্ঞানী—sociologist
সমাজতন্ত্রবাদ—socialism
সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা—Socialist Pattern of Society
সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত—socialistic bias
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা—Community Development Projects
সমতার নীতি—canon of equality
সম্পত্তি—asset
সম্পদ—wealth
সম্পদকর—wealth tax
সমষ্টিগত সম্পদ—collectively owned capital
সময়গত উপযোগ—time utility
সমহারে উৎপন্নের বিধি—Law of Constant Returns
সমানুপাতিক কর—proportional tax
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব—proportional representation
সম্ভাবনা—potentiality
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—United Nations
সম্মিলিত সরকার—coalition government
সরকারী—government
সরকারী আয়—public income
সরকারী আয়-ব্যয—public finance
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র—public sector
সরকারী ঋণ—public debt
সরকারী ব্যয়—public expenditure
সরল সূচক-সংখ্যা—simple index numbers
সরলতার নীতি—canon of simplicity
সর্বজনীন (প্রাপ্তবয়স্কের) ভোটাধিকার—universal (adult) suffrage
সর্বহারা—proletariat
সর্বহারার বিপ্লব—proletarian revolution
সর্বাধিককরণ—maximisation
সর্বাগ্রগণ্য অংশ—preference share
সর্বাধিনায়কতা—supreme command
সসীম দায়—limited liability
সহজে চেনার যোগ্যতা—cognisability
সহায়ক শিক্ষার্থীবাহিনী—Auxiliary Cadet Corps

সংখ্যাগরিষ্ঠতা—majority
সংগ্রামমূলক কার্য—militant function
সংঘজীবন—organised life
সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ—guild socialism
সংঘর্ষ—friction
সংঘাতজনিত বেকারত্ব—frictional unemployment
সংবিধান—constitution
সংরক্ষণ—protection, maintenance
সংরক্ষণ নীতি—fiscal policy
সংরক্ষণমূলক খাদ্য—protective food
সংরক্ষণমূলক শুল্ক—protective duty
সংসদ—Parliament
সংসরণ-ব্যবস্থা—communication system
সংহতি—consolidation
স্বজাতীয়—national
স্বরাষ্ট্র দপ্তর—Home Department
স্বর্ণ দাবিপত্র—gold certificate
স্বর্ণপিণ্ডমান—gold bullion standard
স্বর্ণবিনিময়মান—gold exchange standard
স্বর্ণমুদ্রামান—gold currency standard, gold circulation standard
স্বর্ণমূল্য—gold value
স্বর্ণসমতামান—gold parity standard
স্বল্পবিক্রেতা প্রতিযোগিতা—oligopoly
স্বয়ংনিযুক্ত—self-employed
স্বয়ংসম্পূর্ণতা—self sufficiency
সাধারণ অংশ—ordinary share
সাধারণ দানকর—general gift tax
সাধারণ মুনাফা—normal profit
সাধারণ বিভাগ—General Assembly (U. N.)
সাধারণতন্ত্র—republic
সাধারণতান্ত্রিক—republican
সামগ্রিক নিরাপত্তা—collective security
সামগ্রিক মূলধন—collective capital
সামগ্রিক সম্পত্তি—collective wealth
সামন্ততন্ত্র—feudalism
সামন্ত যুগ—feudal age
সামাজিক অধিকার—civil rights
সামাজিক চুক্তি মতবাদ—Social Contract Theory
সামাজিক নিরাপত্তা—social security
সামাজিক মূলধন—social capital
সামাজিক স্বাধীনতা—social liberty
সামাজিক সংগঠন—social organisation
সাম্য—equality
সাম্যবাদ—communism
সাম্যবাদী—communist
সাম্যবাদী সমাজ—communistic society
সাম্যাবস্থায় সুদের হার—equilibrium rate of interest
সার্বভৌম—sovereign
সার্বভৌম ক্ষমতা—sovereignty
সার্বভৌমিকতা—sovereignty
সালিসী বিচার—arbitration
সাংস্কৃতিক—cultural
সাংস্কৃতিক সংগঠন—cultural organisation
স্থানগত উপযোগ—place utility
স্থানগত পৃথকিকরণ—local discrimination

স্থানান্তর গমন—migration
স্থানান্তর প্রেরণের সুবিধা—portability
স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের সুবিধা—remittance facilities
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা—local self-government
স্থায়িত্ব—durability
স্থায়ী—durable
স্থায়ী বসবাস—domicile
স্থায়ী মূলধন—fixed capital
স্থিতিস্থাপক—elastic
স্নাতকোত্তর—post-graduate
স্বাতন্ত্র্যনীতি—principle of independence (autonomy)
স্বাদেশিকতা—patriotism
স্বাধীন—free
স্বাধীনতা—freedom, liberty
স্বাভাবিক উপযোগ—elementary utility, natural utility
স্বাভাবিক দাম—normal price
স্বল্পোন্নত (অঞ্চল, দেশ প্রভৃতি)—underdeveloped (area, country, etc.)
স্বাস্থ্যাধিকারক—health officer
স্বায়ত্তশাসন—self-government
সুনাগরিকতা—good citizenship
সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক—hindrances to good citizenship
সুনাম—goodwill
সুবিধা—benefit
সুবিধার নীতি—canon of convenience
সুসংবদ্ধ—organised
সুষম উন্নয়ন—balanced development
সুষম খাদ্য—balanced diet
সুষম শিল্প-ব্যবস্থা—balanced industrial system
সূক্ষ্মতা—precision
সূত্র—law
সেচ—irrigation
সেনাবাহিনী—army
সেনানিবাস সংঘ—cantonment board
সেবাগত উপযোগ—service utility
সেবামূলক কার্য—services
স্বেচ্ছামূলক—voluntary
সৈন্যবাহিনী—army
স্বৈরাচার—despotism
স্বৈরাচারী—despot
সৌভ্রাত্রমূলক কার্য—fraternal functions

হ

হস্তান্তর-পাওনা—transfer payment
হস্তান্তরযোগ্য—transferable
হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি—money of account
হুণ্ডি—bill of exchange

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

COMMERCE GROUP

1960

Group A (*Answer any* three)

1. State the functions of a modern State. Would you regard India as a modern State according to this concept ?

2. Define the term 'Constitution' and distinguish between written and unwritten Constitutions. State the merits and demerits of each.

3. What is meant by adult suffrage ? How do you justify it ? Should there be any limitation to adult suffrage ?

4. What are the Fundamental Rights of the Indian Citizen under the Constitution of India ? Why are they called 'Fundamental' ?

5. State the nature of the Indian federation as established by the Constitution of India.

Group B (*Answer any* three)

6. Explain the meaning of the following and their relation with each other :—

(*a*) Production and Consumption. (*b*) Value and Price.

7. What is meant by internal and external economies of large-scale production ? Illustrate your answer by giving two concrete examples of each.

8. What is meant by a perfectly competitive market ? Explain how the value of a commodity is determined in such a market.

9. On what grounds would you justify the present policy of protection of Industries of the Government of India ?

10. State the functions of commercial banks in India.

1960 (Compartmental)

Group A (*Answer any* three)

1. Distinguish between citizens and aliens. How can the citizenship be acquired and how is it lost ?

2. 'Law is a condition of Liberty'.—Explain.

3. What are the advantages and disadvantages of a bi-cameral form of legislature ?

4. What are the essential conditions for the success of a democracy ? Do they exist in India ?

5. What are the functions and utilities of Political parties in a democracy ?

Group B (*Answer any* three)

6. State and explain the Law of Diminishing Utility. Name at least *two* cases of exceptions to the Law.

7. What do you mean by efficiency of labour ? What are the conditions on which the efficiency of labour depends ?

8. What are the causes of localisation of industries ? What are its advantages and disadvantages ?

9. Explain the Quantity Theory of value of money.

10. State and explain the functions of a Central Bank in a modern banking organisation.